নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

দামাত বারাকাতুহুম

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস

মূলঃ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদঃ মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
পরিমার্জিত সংস্করণ : এপ্রিল ২০২২ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : জুন ২০১২ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স, ৩/২ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-8950-16-6

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/maktabatulashraf, ✆ 16297 or 01519521971
www.wafilife.com, ✆ 01799925050
khidmashop.com ✆ 01939773354

আমাদের বই পেতে কল করুন : ০১৯৭৭-১৪১৭৬৪, ০১৭৪১-৯৭১৯৬৭
ভিজিট করুন: www.maktabatulashraf.com, facebook.com/maktabatulashraf

মূল্য : পাঁচশত বিশ টাকা মাত্র

ISLAMI AQIDA-BISWAS
By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by : Maulana Abul Bashar Muhammad Saiful Islam
Price: Tk. 520.00 US$ 10.00

ইসলাম ও আমাদের জীবন

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যতসব জটিলতা ও দুর্ভাবনার সম্মুখীন হই, কেবল কুরআন-হাদীছেই আছে তার নিখুঁত সমাধান। সে সমাধান অবহেলা ও সীমালংঘন উভয়রূপ প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত। ইসলামের সেই অমূল্য শিক্ষা মোতাবেক আমরা কিভাবে পরিমিত ও ভারসাম্যমান পথে চলতে পারি? কিভাবে যাপন করতে পারি এমন এক জীবন, যা দ্বীন দুনিয়ার পক্ষে হবে স্বস্তিদায়ক ও হৃদয়-মনের জন্য প্রীতিকর? এসব মুসলিমমাত্রেরই প্রাণের জিজ্ঞাসা। 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' সরবরাহ করে সেই জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক জবাব।

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وکفیٰ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ

اما بعد:

بندہ بنگلہ دیش کے سفروں میں جناب مولانا حبیب الرحمٰن خان صاحب سے متعارف ہوا، اور معلوم ہوا کہ انہوں نے مکتبۃ الاشرف کے نام سے یہاں ایک باوقار اشاعتی ادارہ قائم کیا ہوا ہے جس سے وہ اکابر علماء دیوبند کی اہم کتابوں کے بنگلہ تراجم شائع کرتے رہتے ہیں جن میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رح، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رح، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رح اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب قدس سرہم کی اہم تالیفات شامل ہیں۔ نیز انہوں نے اس ناکارہ کی تالیفات میں سے ذکر و فکر، جہان دیدہ، اصلاحی مجالس اور دوسری متعدد اہم کتابوں کا معیاری بنگلہ ترجمہ بھی شائع فرمایا ہے۔ اور اس مرتبہ [illegible] حاضری کے وقت دیکھ کر خوشی ہوئی کہ "آسان ترجمۂ قرآن" کی پہلی جلد کا ترجمہ بھی جو مولانا ابو البشر صاحب نے کیا ہے، نہایت دیدہ زیب طباعت کے ساتھ شائع ہو گئی ہے، اور باقی جلدیں زیر طبع ہیں۔

بندہ بنگلہ زبان سے نابلد ہے، لیکن مستند و معتمد علماء کو ان تراجم کے بارے میں نہ صرف مطمئن بلکہ ترجمے درست اور بامحاورہ ہونے پر رطب اللسان پایا، اور یہ دیکھ کر مزید خوشی ہوئی کہ تمام کتابیں جدید ذوق کے مطابق کتابت و طباعت اور ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی ماشاء اللہ اعلیٰ معیار پر ہیں۔

الحمد للہ، مکتبۃ الاشرف نے یہ بڑی عظیم خدمت انجام دی ہے اور مسلسل دے رہا ہے جس کی اہل علم و دانش کو پذیرائی کرنی چاہئے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اسے خدمت دین کا ذریعہ اور تمام متعلقین کیلئے ذخیرۂ آخرت بنائیں۔ آمین

بندہ

محمد تقی عثمانی عفی عنہ

نزیل حال ڈھاکا

۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ

۹ مئی ۲۰۱۰ء

[শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর স্বহস্তে লিখিত অভিমত ও দুআ]

মাকতাবাতুল আশরাফ সম্পর্কে

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর

অভিমত ও দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ.

বাংলাদেশের বিভিন্ন সফরে জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেবের সাথে বান্দার পরিচয়। এ সূত্রেই জানতে পারলাম মাকতাবাতুল আশরাফ নামে তাঁর একটি অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি উলামায়ে দেওবন্দের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর বাংলা তরজমা প্রকাশ করে থাকেন। ইতোমধ্যে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মুফতী আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রহ.-এর বেশকিছু মূল্যবান রচনার তরজমা তাঁর এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই অকর্মন্যের যিক্‌র ও ফিক্‌র, জাহানে দীদাহ, ইসলাহী মাজালিসসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনার মানসম্মত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। এবারের এই সফরে দেখতে পেলাম বান্দার আসান তরজমায়ে কুরআন-এর প্রথম খণ্ডও মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের অনুবাদে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে প্রকাশিত হয়েছে, বাকি দুই খণ্ডও মুদ্রণাধীন।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে বান্দা পরিচিত নয়। তবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামকে দেখেছি তাঁরা এসব অনুবাদের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল। তাঁদের মতে এগুলো বাংলা ভাষাশৈলী ও বিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণও বটে। অধিকতর আনন্দের বিষয় হল, সবগুলো বইয়ের লিপি ও মুদ্রণ আধুনিক রুচিসম্মত এবং এগুলোর বাহ্যিক অলংকরণও মাশাআল্লাহ উৎকৃষ্টমানের।

আলহামদুলিল্লাহ মাকতাবাতুল আশরাফ উম্মতের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন দিয়ে যাচ্ছে। উলামায়ে কেরাম ও জ্ঞানী-গুণীজনের এ খেদমতের বিশেষ সমাদর করা উচিত। অন্তর থেকে দু'আ করি আল্লাহ তাআলা এসব মেহনত কবুল করে নিন এবং একে দ্বীনী খেদমতের মাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন।

বিনীত

(বান্দা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী)
ঢাকায় অবস্থানকালে

২৯ জুমাদাউল উলা ১৪৩১ হিজরী
৯ মে ২০১০ ঈসায়ী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ . اَمَّا بَعْدُ!

বছরের পর বছর ধরে কলম ও যবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী কসরত করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের যে কালজয়ী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হওয়া এবং অন্যদের কাছেও সে দিকনির্দেশকে পৌঁছিয়ে দেয়া। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ জাতীয় লেখাজোখা ও বক্তৃতা-বিবৃতি যেমন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা বিশেষ সংকলনের অংশরূপেও প্রকাশিত হয়েছে। এবার স্নেহের ভাতিজা জনাব সঊদ উসমানী সেগুলোর একটি 'বিষয়ভিত্তিক সমগ্র' প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন এবং জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেবকে সেটি তৈরি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি অত্যন্ত মেহনতের সাথে বিক্ষিপ্ত সেসব রচনা ও বক্তৃতাসমূহ, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে-খুঁজে সংগ্রহ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক আকারে সেগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একই জায়গায় জমা হয়ে যায়। তাছাড়া বক্তৃতাসমূহে যেসব কথা বিনা বরাতে এসে গিয়েছিল, তিনি অনুসন্ধান করে তার বরাতও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং এ সমগ্রটিকে তার, অধম বান্দার ও প্রকাশকের জন্য আখেরাতের সঞ্চয়রূপে কবূল করুন আর পাঠকদের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪১৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সন্ধ্যায় হাঁটতে গেলেন ঢাকার একটি পার্কে। এসময় আমাদের এক সাথী আমাকে দেখিয়ে হযরতকে বললেন, 'হযরত! আমাদের হাবীব ভাই! তার প্রকাশনী মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে আপনার সফরনামাসহ অনেক কিতাবের খুবই উন্নত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। মাশাআল্লাহ সারাদেশের উলামায়ে কেরাম এ সকল কিতাবকে খুবই পছন্দ করেছেন। হযরত একথা শুনে খুব দু'আ দিলেন। সেসময় থেকেই হযরতের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত হলো। এ সফরেই অথবা অন্য কোন সফরে আমি হযরতকে বলেছিলাম, এ পর্যন্ত হযরতের যত কিতাবের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো ছিলো আমাদের নির্বাচিত, হযরতের দৃষ্টিতে কোন কিতাবের অনুবাদ হলে এদেশের সাধারণ মুসলমানের জন্য বেশি উপকারী হবে? হযরত সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আমার মতে 'আসান নেকীয়াঁ' ও 'ইসলাহী খুতবাত'-এর অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য বেশী উপকারী হবে।

হযরতের এ পরামর্শের পর থেকেই আমরা হযরতের খুতবাত অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু মূল খুতবাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমার মনে হলো, এসকল বয়ানকে যদি বিষয়ভিত্তিক সাজানো যেতো, তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়াটা তুলনামূলক সহজ হতো। এ চিন্তা থেকেই আমাদের কয়েকজন অনুবাদক বন্ধুকে খুতবাসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করতে বলি। কেউ কেউ কিছু কিছু কাজ করলেও তাকে পরিপূর্ণতায়

পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। ইতোমধ্যে আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে পাকিস্তানের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত'-এর তত্ত্বাবধানে জনাব মাওলানা ওয়ায়স সরওয়ার ছাহেব, হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের সকল উর্দূ রচনা হতে সাধারণ মুসলমানের উপকারী বিষয়সমূহ এবং ইসলাহী বয়ানসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেন এবং আপাতত দশ খণ্ডে প্রকাশ করেন। এ কিতাবের প্রথম খণ্ড 'ইসলামী আকীদা বিষয়ক', দ্বিতীয় খণ্ড 'ইবাদাত-বন্দেগী-এর স্বরূপ', তৃতীয় খণ্ড 'ইসলামী মু'আমালাত', চতুর্থ খণ্ড 'ইসলামী মু'আশারাত', পঞ্চম খণ্ড 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন', ষষ্ঠ খণ্ড 'ইসলাহ ও তাসাওউফ', সপ্তম খণ্ড 'ইসলামী জীবনের সোনালী আদাব', অষ্টম খণ্ড 'অসৎ চরিত্র ও তার সংশোধন', নবম খণ্ড 'উত্তম চরিত্র ও তার ফযীলত' এবং দশম খণ্ড 'দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাত ও আদাব' বিষয়ক।

গ্রন্থনাকালে হযরত মাওলানা ওয়ায়স সরওয়ার ছাহেব এমনকিছু বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যাতে কিতাবের মান আরো উন্নত হয়েছে।

ক. তিনি সকল কুরআনী আয়াতের সূরার নাম উল্লেখপূর্বক আয়াত নম্বর লাগিয়েছেন।

খ. সকল আয়াত ও হাদীসে হরকত লাগিয়েছেন।

গ. হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বর দিয়েছেন।

ঘ. এ সংকলনে এমন অনেক খুতবা আছে যা পূর্বে ছাপা হয়নি।

আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা সবগুলো খণ্ডই অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! তিন খণ্ড কম্পোজ হয়ে গেছে। চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ চলছে।

প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

(আ. বা. ম. সাইফুল ইসলাম) দামাত বারাকাতুহুম। আল্লাহপাক তাঁকে আফিয়াত ও সালামাতির সাথে দীর্ঘ জীবন নসীব করুন, যাতে মুসলিম উম্মাহ তাঁর দ্বারা আরো বেশি উপকৃত হতে পারে।

আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এ গ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন ভুল-ত্রুটি (বিশেষত হরকতের ভুল) থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো।

আমাদের ধারণা উলামা-তলাবা, খতীব-ইমাম, ওয়ায়েয ও সাধারণ মুসলমানসহ সকলের জন্য এ গ্রন্থ অতীব উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই অনেকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং মূল গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক ও প্রকাশক, পাঠকসহ সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

তারিখ
২৭ রজব ১৪৩৩ হিজরী

পরিমার্জিত সম্পাদিত সংস্করণ সম্পর্কে দুটি কথা

আলহামদুলিল্লাহ, **ইসলাম ও আমাদের জীবন** সিরিজ সর্বস্তরের মুসলমানের দ্বীনী জরুরত পূরণে অসামান্য অবদান রেখে চলছে। বিপুল গ্রহণযোগ্যতা ও পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সিরিজটির প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও ব্যাপক সমাদৃতির প্রতি লক্ষ করে আমরা এর পুনঃসম্পাদনা ও পরিমার্জনের সিদ্ধান্ত নিই। যাতে তা অধিকতর শুদ্ধ, সুন্দর ও সমৃদ্ধরূপে পাঠকের দ্বীনী জরুরত পূরণে আরও গভীর ভূমিকা রাখে।

সেই ধারাবাহিকতার প্রথম প্রয়াস হিসেবে আমরা এর প্রথম খণ্ড ঈমান ও আকীদা অংশের বিস্তর সম্পাদনার ব্যবস্থা করি। সুতরাং প্রথমে মূল উর্দূর সাথে শুরু-শেষ অনুপুঙ্খ মিলিয়ে নিই। এর মাধ্যমে পূর্বের মুদ্রণে রয়ে যাওয়া কিছু অসংগতি ও শূন্যতা পূরণ এবং মৌলিক অনেকগুলি সংশোধনী আনি। প্রচুর ধৈর্য ও কষ্টসাধ্য খেদমতটি করেছেন আমাদের মুহতারাম মাওলানা আশরাফ সিদ্দীক ছাহেব (উস্তায : আল জামিআ আল মাদানিয়া ফেনী)। তারপর তার মিলানো ও সম্পাদনাকৃত কপির উপর আদ্যোপান্ত নজর বুলিয়েছেন ও পুনঃসম্পাদনা করেছেন অনুবাদক হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম নিজেই। এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে তাঁর মেঝো ছাহেবযাদা মাওলানা আসআদুদ্দীন মাহ্‌দী। এরপর আমাদের দারুত তাসনীফের সদস্য মাওলানা হুসাইন আহমাদ বানানগত দিক লক্ষ করে আরেকবার প্রুফ দেখেছেন। তারপর তিনি ও মাওলানা জাহিদুল ইসলাম পূর্বের মুদ্রণের সাথে এ মুদ্রণের সম্পাদিত ও চূড়ান্ত কপিকে অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য মিলিয়ে দেখেছেন।

এভাবে আশা করি এ মুদ্রণ আরও বেশি শুদ্ধ, যথার্থ ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তাআলা সকল মেহনতকারীর মেনহতকে কবুল করুন। আখেরাতের নাজাতের উসীলা করুন। আমীন

তারিখ
২৩ রমাযান ১৪৪৩ হিজরী
২৫ এপ্রিল ২০২২ ঈসায়ী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
স্বত্বাধিকারী : মাকতাবাতুল আশরাফ
দারুত তাসনীফ : মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ৪র্থ তলা
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা
আখিরাতের চিন্তা	**৩৪৫-৩৬৭**
মানুষের মূল রোগ	৩৪৫
রোগের প্রতিকার	৩৪৬
ত্রিজগতের তিন অবস্থা	৩৪৮
আখিরাতের সুখই হবে পরিপূর্ণ	৩৫০
মৃত্যু এক অমোঘ সত্য	৩৫১
হযরত বাহলূল রহ.-এর ঘটনা	৩৫২
মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা চাই	৩৫৪
হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর ঘটনা	৩৫৬
হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর ঘটনা	৩৫৭
চিন্তা-চেতনাকে আখিরাতমুখী করে তোলার উপায়	৩৫৮
সাহাবায়ে কেরামের আখিরাতমুখিতা	৩৫৯
যাদুকরদের ঈমানী দৃঢ়তা	৩৬০
সাহচর্যের উপকারিতা	৩৬৪
অধুনা বিশ্ব পরিস্থিতি	৩৬৪
মৃত্যুর আগে মৃত্যুর প্রস্তুতি	**৩৬৮-৩৯১**
মৃত্যু এক অবধারিত জিনিস	৩৬৮
মৃত্যুর আগে মরে নাও	৩৬৯
অন্তরে মৃত্যুচিন্তা জাগ্রত করো	৩৭০
দুটি মহা নি'আমত ও তা নিয়ে অবহেলা	৩৭০
হযরত বাহলূল রহ.-এর উপদেশমূলক ঘটনা	৩৭২
বুদ্ধিমান কে?	৩৭৪
আমরা বোকাই বটে	৩৭৫
মৃত্যু ও আখিরাতের কথা চিন্তা করার পদ্ধতি	৩৭৬
হযরত আবদুর রহমান ইবন আবী নু'ম রহ.	৩৭৭
আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ	৩৭৮
আজই নিজের হিসাব গ্রহণ করুন	৩৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

তাওহীদ*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَصَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

সম্মানিত মুরুব্বীগণ ও আমার প্রিয় ভায়েরা!

আজকের মাহ্ফিলে আমরা ইসলামের সর্বাপেক্ষা মৌলিক আকীদা 'তাওহীদ' সম্পর্কে কিছু জরুরি আলোচনা করতে চাই, প্রতিটি মুসলিম জানে ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে কালিমায়ে তাওহীদের উপর। কোনও ব্যক্তি ইসলামের সীমারেখার ভেতর প্রবেশ করতে পারে কেবল কালিমায়ে তাওহীদ অর্থাৎ, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ' -এর সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে। তাই এ কালিমার বৈপ্লবিক গুরুত্বও প্রতিটি

---

* "নাশরী তাকরীরেঁ" নামক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫-১৬

মুসলিম জানে। জানে এই কালিমা পড়ার ফলে মানুষের জীবনে এক মহাবিপ্লব সাধিত হয়। এ কালিমা পড়ার আগে যে ছিল কাফের, সে এই কালিমা পড়ামাত্র মুসলিম হয়ে যায়। পূর্বে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে ছিল ঘৃণিত, এ কালিমা পড়ার পর সে হয়ে যায় তাঁর প্রিয়। পূর্বে যে ব্যক্তি ছিল জাহান্নামের উপযুক্ত, এ কালিমা পড়ার পর সে জান্নাতের উপযুক্ত ও রহমত লাভের যোগ্য হয়ে যায়। আমি যদি বলি মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, এটা এমনই এক কালিমা, যা মানুষকে এক লমহার মধ্যে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর থেকে উদ্ধার করে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। আর এটা কোনও কবিসুলভ অতিরঞ্জন নয়; বরং এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা, ইসলামের ইতিহাসে যার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বিষয়টা একটু স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আপনাদেরকে একটা ঘটনা শোনাতে চাই। ঘটনাটি খায়বার যুদ্ধের। এ যুদ্ধ ছিল ইহুদীদের বিরুদ্ধে। ইহুদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের বাহিনী নিয়ে তাদের উপর চড়াও হন। তিনি তাদের দুর্গ অবরোধ করেন, যা একটানা বহুদিন বলবৎ থাকে।

এই অবরোধকালেই ঘটনাটি ঘটেছিল। খায়বারের এক রাখাল। ইতিহাসে তার নাম বলা হয়েছে 'আসওয়াদ'। একদিন তার মনে এই ভাবনা জাগল যে, এই যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় বাহিনী নিয়ে এত দূর থেকে এসে আমাদের উপর চড়াও হয়েছেন এবং এত কষ্ট-ক্লেশ করে আমাদের দুর্গ অবরোধ করে রেখেছেন, তা তাঁর উদ্দেশ্য কী? তাঁর বুনিয়াদী দাওয়াত কী? তিনি কীসের দিকে ডাকছেন? বিষয়টা জেনেই দেখি না! তো এই উদ্দেশ্যে রাখাল আসওয়াদ নগরের বাইরে চলে আসল এবং মুসলিমদের সেনাশিবিরের দিকে অগ্রসর হল। শিবিরের এক মুসলিমের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়ে গেল। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, আমি জানতে চাচ্ছি আপনারা খায়বারে কেন চড়াও হয়েছেন? আমাদের নগরবাসী আপনাদের শত্রু হওয়ার কারণ কী? তার

সাক্ষাত হয়েছিল একজন সাহাবীর সঙ্গে। তিনি নিজে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ব্যাখ্যা না করে বরং তাকে বললেন, তুমি নিজেই গিয়ে আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাক্ষাত করো এবং তাঁকেই এসব কথা জিজ্ঞেস করো। তিনিই তোমাকে বিস্তারিতভাবে নিজ দাওয়াতের কথা বুঝিয়ে দেবেন।

সাহাবীর এ কথা রাখাল আসওয়াদের পক্ষে ছিল চরম বিস্ময়কর। কেননা সে কখনও কল্পনাও করতে পারত না যে, কোনও বাহিনীর সেনাপতি বা কোনও রাষ্ট্রের অধিপতি স্বয়ং তাকে নিজ দরবারে উপস্থিতির সুযোগ দিয়ে ধন্য করবেন। সে তো জীবনভর এটাই দেখে আসছে যে, সে যেহেতু একজন সাধারণ রাখাল, তাই যে-কোনও ধনাঢ্য লোক এবং যে-কোনও পদস্থ লোক তার সাথে কথা বলাকে নিজের জন্য অবমাননাকর গণ্য করে।

কাজেই রাখাল তাঁকে বলল, আমি আপনাদের নেতার সাথে কিভাবে দেখা করতে পারি, যখন আমি একজন তুচ্ছ রাখাল, আর তিনি হচ্ছেন আপনাদের রাষ্ট্রনায়ক ও আপনাদের সেনাপতি? সাহাবী বললেন, আমাদের নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীরবদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং তার দরবারে গরীব-ধনী, শাসক-শাসিত ও রাজা-প্রজার মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। যা হোক রাখাল এক রাশ বিস্ময় নিয়ে সামনে অগ্রসর হল এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে হাজির হল। তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার বুনিয়াদী দাওয়াত কী এবং আপনি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? উত্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে তাকে তাওহীদী বিশ্বাস বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি বহুবার এ বিশ্বাসের ব্যাখ্যাদান করেছি। তাওহীদের ব্যাখ্যা শোনার পর রাখাল জিজ্ঞেস করল, কোনও ব্যক্তি এ বিশ্বাস গ্রহণ করে আপনার দলভুক্ত হয়ে গেল তার কী লাভ হবে? তিনি বললেন, তোমরা যদি এ বিশ্বাস গ্রহণ করে নাও এবং ইসলামে দাখিল হয়ে যাও, তবে তোমরা আমাদের ভাই হয়ে যাবে; আমরা তোমাদেরকে আমাদের বুকে টেনে নেব। তখন আমরা যেসব অধিকার ভোগ করি তোমরাও তা ভোগ করবে।

রাখাল আসওয়াদ বলল, আমি কী করে সেসব অধিকার ভোগ করব, যখন আমি একজন নগণ্য রাখাল? আমার গায়ের রং কালো, আমার শরীরে ময়লা এবং আমার থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, এ অবস্থায় আপনারা আমাকে কী করে বুকে জড়াবেন? কী করে আমাকে আপনাদের সমমর্যাদা দান করবেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করলেন এবং সে আশ্বস্ত হয়ে গেল, তখন সে বলল, যদি এটা বাস্তব সত্য হয় যে, আপনি আমাকে আপনাদের সমমর্যাদা দান করতে প্রস্তুত আছেন, আবার আপনার এই তাওহীদী আকীদার ভেতরও এক দুর্দান্ত আকর্ষণ রয়েছে যা উপেক্ষা করা কঠিন, এবং ইতোমধ্যেই আমি এর প্রতি এক তীব্র আসক্তি বোধ করছি, তারপরও আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আমার গায়ের রং এবং দেহের ময়লা ও দুর্গন্ধ কিভাবে দূর হবে?

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি তাওহীদের আকীদা গ্রহণ করে নিলে যদিও দুনিয়ায় তোমার চেহারার কালোত্ব ঘুচবে না, কিন্তু আখেরাতে তোমার চেহারা ঠিকই চমকাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমার কালো রংকে নূর দ্বারা বদলে দেবেন এবং তোমার শরীরের বদবুকে সুরভিতে পরিণত করবেন। রাখাল বলল, যদি তাই হয়, তবে আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এই বলে সে মুসলিম হয়ে গেল। তারপর সে বলল, এবার বলুন, এখন আমার দায়িত্ব কী? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমনিতে তো ইসলামে বহু বিধি-বিধান আছে, কিন্তু এখন তো সালাতের ওয়াক্ত নয় যে, তোমাকে সালাত আদায়ের হুকুম দেওয়া হবে, রোযারও মাস নয় যে, তোমাকে রোযা রাখতে বলা হবে। তোমার উপর যাকাতও ফরয নয় যে, তোমাকে তা আদায় করতে বলা হবে আর না এটা হজ্জের মওসুম যে, তোমাকে দিয়ে হজ্জ করানো হবে। এখন আল্লাহ তা'আলার জন্য একটি ইবাদতই আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। খায়বারে সত্য ও মিথ্যার লড়াই চলছে। আল্লাহর

পথে ইসলামী যোদ্ধারা জান কুরবানী দিচ্ছে। এখন তোমার কর্তব্য কেবল এই জিহাদে শরীক হয়ে যাওয়া। আসওয়াদ বলল, এ জিহাদে শহীদ হয়ে গেলে আমার কী লাভ হবে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যিম্মাদারী নিচ্ছি যে, তুমি এ জিহাদে শহীদ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সোজা জান্নাতে পৌছে দেবেন। তোমার চেহারার কালোত্ব নূর দ্বারা বদলে যাবে এবং তোমার শরীর থেকে বদবুর বদলে সৌরভ বিচ্ছুরিত হবে।

রাখাল আর দেরি করল না। সে তার বকরিগুলো শহরের দিকে হাঁকিয়ে দিল এবং নিজে মুজাহিদদের সাথে শামিল হয়ে গেল। এ যুদ্ধ অনেক দীর্ঘ হয়েছিল। পরিশেষে খায়বার বিজিত হল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদদের লাশ খুঁজতে বের হলেন। তাদের মধ্যে সেই রাখালের লাশও পাওয়া গেল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে সে লাশ উপস্থিত করা হলে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, এ এক অসাধারণ লোক, বড় বিস্ময়কর লোক। এ এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে একটি সিজদাও করেনি। এ এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে একটি পয়সাও খরচ করেনি। এ এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে অন্য কোনও রকম ইবাদতই করেনি। কিন্তু আমি নিজ চোখে দেখছি, সে সোজা জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌছে গেছে এবং আমি নিজ চোখে দেখছি, আল্লাহ তা'আলা তার কালো রংকে নূর দ্বারা বদলে দিয়েছেন এবং তার শরীরের বদবুকে সুরভিতে পরিণত করে দিয়েছেন।[১]

আমি যে আরয করেছিলাম, কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এক লমহার মধ্যে একজন মানুষকে জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদ্ধার করে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে দেয়, এটা কোনও অতিশয়োক্তি নয়। এ ঘটনা দ্বারা এ দাবির এক বাস্তব প্রমাণ মেলে। কেবল এই এক কালিমা রাখাল আসওয়াদের জীবন ও পরিণামে কী বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধন করেছে। চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে, মানুষের জীবন ও তার পরিণামে এ কালিমার

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬০৯-৬১১

বদৌলতে যে এত বড় পরিবর্তন সাধিত হয়, এর কারণ কী? এ কালিমা কি কোনও মন্ত্র, না কোনও যাদু যে, এটা পড়ামাত্র মানুষ জাহান্নাম থেকে এবং আল্লাহর আযাব ও তাঁর গযব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়?

বাস্তবতা হল, এটা কোনও মন্ত্রও নয় এবং যাদুও নয়। প্রকৃতপক্ষে কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ' একটি অঙ্গীকার ও একটি স্বীকারোক্তি, যা মানুষ নিজ প্রতিপালকের সাথে করে থাকে। কেউ যখন বলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তার মানে সে স্বীকার করে নেয় আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবূদ নেই, অন্য কোনও মাবূদের সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই এবং আমি সব রকম মাবূদের দাসত্ব অস্বীকার করছি। আর আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার সত্য রাসূল বলে স্বীকার করছি। এভাবে সে অঙ্গীকার করছে, আমি আমার সমগ্র জীবন আল্লাহ তা'আলার পসন্দমতো, তাঁর বিধানমতো ও তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাটানোর চেষ্টা করব। এই অঙ্গীকারের বদৌলতেই তার জীবনে এই মহাবিপ্লব ঘটে যায় যে, আগে সে আল্লাহ তা'আলার অপ্রিয় ছিল, এখন তাঁর প্রিয় হয়ে গেছে, আগে সে কাফের চিল, এখন মুসলিম হয়ে গেছে এবং আগে জাহান্নামী ছিল, এখন জান্নাতী হয়ে গেছে। এসব পরিবর্তন তার ওই অঙ্গীকারের কারণেই সাধিত হয়। শরী'আতে ওই অঙ্গীকারেরই নাম 'তাওহীদ'।

আপনারা জানেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী-রাসূল এসেছেন, সকলেই এই বুনিয়াদী দাওয়াত দিয়েছেন। তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। পূর্বে যত সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল হয়েছিল, তা এই তাওহীদ থেকে মুখ ফেরানোর কারণেই নাযিল হয়েছিল। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যত কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেছিলেন, তা কেবল এই তাওহীদেরই প্রচার-প্রসারের জন্য ভোগ করেছিলেন। এটা এক বুনিয়াদী আকীদা, যাকে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন-ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর বলাই সংগত। ইসলামের সারকথাই হল আল্লাহ তা'আলাকে মাবূদ স্বীকার করে নিয়ে অন্য সব মাবূদকে অস্বীকার করা, সব মাবূদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম মান্য না করা।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, তাওহীদ দু'প্রকার। বিশ্বাসগত তাওহীদ ও কর্মগত তাওহীদ। বিশ্বাসগত তাওহীদের অর্থ হল, মানুষ এ কথার পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে, এ বিশ্বজগতে আল্লাহ ছাড়া কোনও স্রষ্টা ও মাবূদ নেই, তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলিতে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহর সত্তায় শরীক না করার অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মাবূদ সাব্যস্ত না করা। আর তার গুণাবলিতে শরীক না করার অর্থ যেসকল গুণ কেবল আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য ও তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত, তাতে অন্য কাউকে শরীক না করা।

উদাহরণত আল্লাহ তা'আলা রায্যাক– তিনি রিযিক দান করেন। এই রিযিক দানের গুণে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করবে না, অর্থাৎ এই ধারণা রাখবে না যে, অমুক-অমুকও রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সমস্ত মানুষের উপকার-অপকার আল্লাহ তা'আলারই হাতে। কাজেই বিশ্বাস রাখবে যে, উপকার-অপকার কেবল তিনিই করতে পারেন। অন্য কাউকে এ গুণের অধিকারী মনে করবে না। রোগ ও আরোগ্য দানের মালিক কেবলই আল্লাহ তা'আলা। কাজেই অন্য কাউকে রোগদাতা ও আরোগ্যদানকারী মনে করবে না। এভাবে তাঁর আরও যত গুণ আছে, তাতে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না।

এ বিষয়টা পরিষ্কার করার প্রয়োজন এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তায় শরীক না করার বিষয়টা দুনিয়ার সমস্ত ধর্মে অবিসংবাদিত। এমন কি যেই কাফের ও মুশরিকদের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন এবং যাদেরকে তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তারাও স্বীকার করত সৃষ্টিকর্তা কেবল আল্লাহ তা'আলাই, অন্য কেউ নয়। তারাও মানত এ বিশ্ব চরাচর আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি এবং আমাদেরকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তারপরও তো তারা মুশরিক। তাহলে তাদের শিরক কী ছিল? তাদের শিরক ছিল এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিতে কিছু দেবতাকে শরীক মানত। তারা বলত, আল্লাহ

তা'আলা রিযিকের বিভাগ অমুক দেবতার উপর ন্যস্ত করে রেখেছেন। বৃষ্টিদানের দায়িত্ব অমুক দেবতার উপর এবং আরোগ্যদানের কাজ অমুক দেবতার উপর ন্যস্ত করেছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিতে তারা দেব-দেবীকে শরীক করত। আর এ কারণেই তাদেরকে মুশরিক বলা হয়েছে। নচেৎ খোদ কুরআন মাজীদই বলছে,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? তারা বলবে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।'[২]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলছেন-

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

'আল্লাহর সঙ্গে আর কোনও মাবূদ আছে কি?'

অর্থাৎ তোমরা তো স্বীকার করছ আল্লাহ ছাড়া কোনও সৃষ্টিকর্তা নেই, তা সত্ত্বেও তোমরা তাঁর গুণাবলিতে অন্যদেরকে শরীক মানছ? এটা তো কোনও বুদ্ধির কথা নয়।

এ কারণেই বিশ্বাসগত তাওহীদ তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন আল্লাহ তা'আলার সত্তায় কাউকে শরীক না মানার সাথে সাথে তাঁর গুণাবলিতেও কাউকে শরীক না মানা হবে। অর্থাৎ মানুষ ইবাদত করবে তো কেবল আল্লাহ তা'আলারই করবে, মাবূদ মানবে তো কেবল আল্লাহকেই মানবে, আরাধনা করবে তো আল্লাহরই করবে, কিছু চাবে তো আল্লাহরই কাছে চাবে। কেবল আল্লাহ তা'আলাকেই সংকট মোচক, রিযিকদাতা ও আরোগ্যদানকারী বলে বিশ্বাস করবে, অন্য কাউকে নয়। এটাই পরিপূর্ণ তাওহীদ, যার দাওয়াত হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূল দিয়েছেন।

---

[২] যুমার, আয়াত ৩৮

তাওহীদের দ্বিতীয় প্রকার হল আমলী বা কর্মগত তাওহীদ। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবূদ নেই– এই বিশ্বাস মানুষের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের সাথে সংলিপ্ত হয়ে যাবে। প্রতিটি মুহূর্তে এর তাৎপর্য তার চেতনায় জাগ্রত থাকবে। সে অনুক্ষণ এই বিশ্বাসে উজ্জীবিত থাকবে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ আমার কোনও ক্ষতি করারও সামর্থ্য রাখে না, উপকার করারও না। আল্লাহ ছাড়া এমন কোনও সত্তা নেই, যার আনুগত্য করা আমার অবশ্যকর্তব্য। আমাকে আনুগত্য করতে হবে কেবলই আল্লাহর। তাঁর আনুগত্য করতে গিয়ে আমাকে যত বড় ত্যাগই স্বীকার করতে হোক না কেন, তাতে আমি দ্বিধাবোধ করব না। এ বিশ্বাস যখন কারও বাস্তব জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে মিশে যায়, তখন সূফী-সাধকদের পরিভাষায় বলা হয়, সে 'আমলী তাওহীদ'-এর স্তরে পৌঁছে গেছে।

কারও আমলী তাওহীদ অর্জিত হয়ে গেলে সে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে সামনে রেখে কাজ করে। সে চিন্তা করে, আমার এই পদক্ষেপে আল্লাহ তা'আলা খুশী হবেন, না অখুশী হবেন? এমন তো নয় যে, আমার এ কাজের ফলে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী হয়ে যাবে? নাফরমানীর আশঙ্কা থাকলে সে সেই কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকে। সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। সে আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কিছু আশা করে না। আল্লাহ তা'আলার হুকুমের খেলাফ জগতের সমগ্র সম্পদও যদি তার পায়ের উপর রেখে দেওয়া হয়, তবুও সে সম্পদ তার সংকল্পকে টাল খাওয়াতে পারে না। কোনও রকম প্রলোভনই তাকে আল্লাহর হুকুম থেকে বিমুখ করতে পারে না। কেউ যদি তার উপর চূড়ান্ত পর্যায়ের চাপ সৃষ্টি করে, এমনকি মৃত্যুর ভয়াল নৃত্যও যদি তার দৃষ্টিগোচর হয়, তবুও সে আল্লাহর হুকুম থেকে মুখ ফেরাতে প্রস্তুত হয় না। কারণ সে তো জানে জীবন-মরণ, রোগ ও আরোগ্য আল্লাহ তা'আলারই হাতে। তিনি এই মুহূর্তকে আমার মৃত্যুর জন্য স্থির করে থাকলে কেউ তা টলাতে পারবে না। আর যদি আমার আয়ু আরও

অবশিষ্ট থাকে, তবে কারও পক্ষে আমার মৃত্যু ঘটানো সম্ভব হবে না। এ বিষয়টাকেই শায়খ সাদী রহ. এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

موحد چہ درپائے ریزی زرش
چہ شمشیر ہندی نہی بر سرش
امید وہراش نباشد نہ کس
بریں است بنیاد توحید و بس

'একজন তাওহীদের বিশ্বাসীর অবস্থা তো এই যে, তুমি যদি তার পায়ের উপর সারা দুনিয়ার সমস্ত সোনা এনে ঢেলে দাও কিংবা তার মাথার উপর সুতীক্ষ্ণ তরবারি উচিয়ে ধর, তবু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। কারণ সে তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে কিছু আশা করে না এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। বস্তুত এরই উপর তাওহীদের ভিত্তি।'[৩]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা আপনি শুনে থাকবেন। এক যুদ্ধের সফরে দুপুর বেলা তিনি একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর তরবারিখানি গাছের ডালে লটকানো ছিল। এ সময় হঠাৎ করে শত্রুদলের এক ব্যক্তি সেখানে এসে পৌছল এবং গাছ থেকে তরবারিটি হাতে নিয়ে নিল। তারপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাগিয়ে বলল, এবার আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? চিন্তা করে দেখুন কেমন দৃশ্য! মৃত্যু সামনে নৃত্য করছে! নাঙ্গা তরবারি হাতে শত্রু দণ্ডায়মান। সে তাঁর রক্তের পিপাসু। তার বাহুতে বলও আছে। আক্রমণের উদ্দেশ্যেই সে এসেছে। আপাতদৃষ্টিতে কোনও বাধাও তাঁর সামনে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্ত সমাহিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন। অর্থাৎ এই ক্ষণে আমার মৃত্যুই যদি আল্লাহ তা'আলার

---

৩. গুলিস্তাঁ, পৃষ্ঠা ২৪৩

অভিপ্রায় হয়, তবে দুনিয়ার কোনও শক্তি আমাকে বাঁচাতে পারবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যদি আমার আয়ু আরও অবশিষ্ট রেখে থাকেন, তবে তোমার তরবারি ও তোমার শত্রুতা আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। এমনই বিশ্বাস ও আস্থার সাথে তিনি এ জবাব দিয়েছিলেন যে, শত্রুর শরীরে কাঁপন ধরে গেল এবং সেই কাঁপনে তাঁর হাত থেকে তরবারি নিচে পড়ে গেল। এবার সেই তরবারি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে নিলেন। তারপর বললেন, বলো, এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে? লোকটির কাছে এর কোনও উত্তর ছিল না। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বিশ্বাস ও আস্থা দেখে এমনই প্রভাবিত হল যে, তখনই ইসলাম গ্রহণ করল।[৪]

বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল, আমলী তাওহীদ বলা হয় মানুষের এই অবস্থাকে যে, সে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর তাৎপর্যকে নিজ চেতনায় জাগ্রত রাখবে। সে চিন্তা করবে, এ কালিমার মাধ্যমে সে তার প্রতিপালকের সাথে এক অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে। সে অঙ্গীকারের দাবি হল, আমি আমার জীবনের কোনও পদক্ষেপেই আল্লাহর কোনও হুকুম অমান্য করব না। আমলী তাওহীদের এ অবস্থাই মূলত মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটায় এবং এটাই সে জিনিস, যা মানুষকে জাহান্নাম হতে উদ্ধার করে জান্নাতী বানিয়ে দেয় এবং আল্লাহর কাছে ঘৃণিত থাকার পর তাকে তাঁর প্রিয় বান্দায় পরিণত করে দেয়।

'আমলী তাওহীদ' অর্জন করার উপায় এই যে, মানুষ সর্বপ্রথম জানার চেষ্টা করবে, কালিমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পর তার উপর শরী'আতের পক্ষ থেকে কী কী দায়িত্ব অর্পিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তার উপর কী কী বিধান আরোপ করেছেন। কোন্ কোন্ কাজ তাকে করতে বারণ করেছেন। সর্বপ্রথম কাজ হল এসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

---

৪. সহীহ বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, হাদীছ নং ২৬৯৪; সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : মুসাফিরদের সালাত ও কসর প্রসঙ্গ, হাদীছ নং ১৩৯১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৩৮১৬

করা। এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

'ইল্‌ম অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয।'[৫]

অর্থাৎ ঈমান আনার পর প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হল এই জ্ঞান অর্জন করা যে, আল্লাহ তা'আলা কী পসন্দ করেন? কী করলে তার নাফরমানী হয়? এসব বিষয় জানা হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলার হুকুম তামিল করা ও তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওহীদের প্রকৃত দাবি বোঝার ও সে দাবি পরিপূর্ণভাবে আদায় করার তাওফীক দান করুন এবং তার সুফল দ্বারা আমাদেরকে ধন্য ও পরিপ্লুত করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

---

৫. সুনানু ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ২২০

কালিমা তাইয়্যিবার দাবি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ (التوبة : ١١٩)

সম্মানিত মুরব্বীগণ ও প্রিয় ভায়েরা!

আজ এ মুবারক মাদ্‌রাসায় হাজির হতে পেরে আমার দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হচ্ছে। বহুদিন থেকেই এই পবিত্র দরসগাহে হাজির হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমার মাখদূম বুযুর্গ হযরত মাওলানা মুফতী 'আব্দুশ শাকুর তিরমিযী (দা. বা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার ও তার সাহচর্য লাভে ধন্য হওয়ার লক্ষ্যে এখানে আসার আগ্রহ অনেক দিনের। কিন্তু নানা ব্যস্ততার কারণে এ যাবৎ তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী যে আজ তিনি সেই পুরানো আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দিলেন।

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৯১-১১৮

এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করা এবং তাঁর হুকুম তামিল (পালন) করা। আমি যখন এখানে আসার ইচ্ছা করছিলাম, তখন মাথায়ই ছিল না যে, এখানে মাশাআল্লাহ মুসলিমদের এত বড় ইজতিমা অনুষ্ঠিত হবে এবং তাতে কথা বলার অবকাশ আসবে। আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করম যে, তিনি হযরত মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাতের সাথে সাথে মুসলিমদের এত বড় সমাবেশেও শরীক হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এটা তো স্পষ্ট যে, এ সমাবেশের লোকজন কেবল আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে এবং আল্লাহ তা'আলার দ্বীন সম্পর্কে জানার আগ্রহেই এই চত্বরে একত্র হয়েছে।

তাদের সুধারণা সত্যে পরিণত হোক

শ্রদ্ধেয় মাওলানা মোশাররফ আলী ছাহেব– আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা দান করুন এবং তার ফয়য ও বরকত দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করুন– এই অকর্মণ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে যেসব কথা বলেছেন, তাতে আমি খুবই লজ্জা পাচ্ছি। বস্তুত তিনি এ অকর্মণ্য সম্পর্কে নিজের যে ধারণা ও অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, সেটা আমার প্রতি তার স্নেহ-মমতারই পরিচায়ক। আমি তার উত্তরে এ ছাড়া আর কী বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সম্পর্কে তাঁর সুধারণাকে সত্যে পরিণত করুন। আপনাদের কাছেও আমি এই দু'আ-ই চাচ্ছি।

আমি চিন্তা করছিলাম আপনাদের সামনে কোন্ বিষয় আরম্ভ করব। হযরত মুফ্তী 'আব্দুশ শাকূর ছাহেব মুদ্দাযিল্লুহু'ল-আলীকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আলোচনা কোন্ বিষয়ে করব। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এখানে বসার পর একটা কথা অন্তরে জেগেছে এবং সংক্ষেপে সে সম্পর্কেই আপনাদের খেদমতে আরম্ভ করব।

আমি দেখতে পাচ্ছি এই বিশাল সমাবেশের সকলেরই চেহারায় আনন্দের ছাপ, আনন্দ-উদ্দীপনার ঝলক এবং তলব ও অনুসন্ধিৎসার আলামত। কিন্তু তা কেন?

আমার মতো একজন অকর্মণ্য, ইলমের কাঙাল ও বেআমল ব্যক্তি তাদের সামনে বসা। অধিকাংশই এমন, যাদের সঙ্গে ইতঃপূর্বে আমার সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু এর কী রহস্য যে, একজন অচেনা, অদেখা লোককে দেখার জন্য এতটা আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং তার কথা শোনার জন্য এতটা ব্যাকুলতা? ব্যাপার কী? আমার অন্তরে এর যে উত্তর জেগেছে তা এই যে, আমার যা অবস্থা তা তো আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ তা'আলা ইসলাহ করে দিন। কিন্তু যে আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং যে অনুসন্ধিৎসা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার এই বান্দাগণ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণ এই চত্বরে সমবেত হয়েছে, তা আমাদের সকলেরই জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, এত বড় সৌভাগ্যের বিষয় যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা মহব্বতের ব্যাপার। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নয়; বরং এ মহব্বত আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। সেই মহব্বতের কারণেই এসব দৃশ্য চোখে পড়ে। আজ প্রথম নয়; এরকম দৃশ্য আমি এর আগেও দেখেছি এবং এমন এমন স্থানে দেখেছি, যেখানে এটা দেখার কথা কল্পনাও করা যায় না।

কালিমা তাইয়্যিবা আমাদের সকলকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছে

আল্লাহ তা'আলা আমাকে পৃথিবীর বহু দেশে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। এমন এমন ভূমিতে যাওয়া হয়েছে, যা কুফ্রের অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন। এমন বহু স্থানেও, যেখানে মানুষ আমাদের ভাষা জানে না। আমি একটা বাক্য বললে তারা তা বুঝতে পারে না। তারাও কিছু বললে আমি বুঝতে পারি না। গেল বছর আমার চীনে যাওয়া হয়েছিল। জন-বসতির দিক থেকে দুনিয়ার সর্ববৃহৎ দেশ। সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই অমুসলিম। তবে মুসলিমও কিছু আছে। সেখানে গিয়ে এই প্রথমবার জানতে পারলাম, চীনের মুসলিম জনসংখ্যা অন্ততপক্ষে আট কোটি। যখন গ্রাম-গঞ্জে খবর পৌঁছল, পাকিস্তান থেকে কয়েকজন মুসলিম আসছে, দলে দলে লোকজন ছুটে আসল। কয়েক ঘণ্টা আগে এসে তারা রাস্তার দু'পারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, অথচ তখন

প্রচণ্ড বরফ পড়ছিল। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম, তারা আমাদের সাথে একটি বাক্যও বলতে পারছিল না, আমরাও তাদেরকে কিছু বলতে পারছিলাম না। কারণ, না আমরা তাদের ভাষা জানি, না তারা আমাদের ভাষা জানে। কিন্তু আমাদের দ্বীন আমাদেরকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছে, যা আমরা সাধারণভাবে সকলেই বলতে পারি। মাতৃভাষা যাই হোক না কেন, সেই বাক্যটি দ্বারা যে-কোনও ভাষাভাষীর কাছে হৃদয়ের বাণী প্রকাশ করা যায়। বাক্যটি হল 'আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রত্যেকেই দেখার পর উচ্চস্বরে 'আস সালামু আলাইকুম' বলে উঠছিল। তাদের মুখে ছিল এই সার্বজনীন সালাম আর চোখে ছিল মহব্বতের আঁসু।

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা কালিমা তায়্যিবার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে একটা বন্ধন এঁটে দিয়েছেন। প্রাচ্যের মুসলিম হোক বা প্রতীচ্যের, মুখের ভাষা যাই হোক না কেন– তা বুঝে আসুক বা নাই আসুক, সভ্যতা-সংস্কৃতি-জাতীয়তায় যত প্রভেদই হোক না কেন, যখন জানা যায় সে একজন মুসলিম, কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর সূত্রে আমাদের সাথে আবদ্ধ, তখন তার জন্য হৃদয়ের ভেতর ভালোবাসার ঢেউ খেলতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের মধ্যে আরও বিভিন্ন রকমের যোগসূত্র দান করেছেন, কিন্তু এই কালিমা তায়্যিবার যে যোগসূত্র, এটা সকলের সেরা। এটা এমনই অটুট, যা কখনও ছিন্ন হওয়ার নয়, শেষ হওয়ার নয়, জীর্ণ হওয়ার নয়।

কোনও শক্তি এ সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না

আমার বাংলাদেশে যাওয়ারও সুযোগ হয়েছে। এককালে এ দেশ পাকিস্তানেরই অংশ ছিল। পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো। সেখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, বাংলাদেশ হওয়ার পর ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম-সিলেট তথা সমগ্র বাংলাদেশের কোথাও উর্দু শোনা যেত না। কারও মুখে উর্দু শোনা গেলে লোকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত যে, লোকটা উর্দুতে কেন কথা বলল? বাংলায় বলো বা ইংরেজিতে বলো!

আমি চট্টগ্রাম পৌছলে ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হল, অমুক মাঠে বয়ান হবে। মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। আমি উর্দুতে বয়ান করলাম। অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল। লোকে বলাবলি করছিল, বাংলাদেশ হওয়ার পর আমরা এত বড় জনসমাবেশ দেখিনি। তারা আরও বলছিল, এত বড় সমাবেশে কেউ উর্দুতে ভাষণ দিলে তার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়া হতো। হৈচৈ শুরু হয়ে যেত। কিন্তু লোকে আমার কথা এতটা মহব্বত, আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে শুনল, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। একেবারে হতবিহ্বলকর অবস্থা। সেখানেও আমি বলেছিলাম, আমাদের মধ্যে সীমান্ত স্থির হতে পারে, পুলিশ ও সেনাচৌকির বাধা সৃষ্টি হতে পারে, নদী সাগর পাহাড়ের ব্যবধান থাকতে পারে, কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন এক সম্পর্কের সাথে গেঁথে দিয়েছেন, দুনিয়ার কোনও শক্তি তা ছিন্ন করতে পারবে না। আমাদের মধ্যকার সে যোগসূত্র হল কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ।

এ কালিমার দ্বারা জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়

এই যে কালিমা আমাদের ও আপনাদেরকে পরস্পরে জুড়ে দিয়েছে, এটা বড় আশ্চর্য জিনিস। এটা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়ে থাকে। আপনারা জানেন, এ কালিমা পড়ামাত্র মানবজীবনে এত বড় বিপ্লব ঘটে যায়, যার চেয়ে বড় কোনও বিপ্লব হতে পারে না। কোনও কাফের যখন এ কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে যায়, তখন তার অর্থ এই যে, সে এ যাবৎকাল জাহান্নামী ছিল, আল্লাহ তা'আলার অপ্রিয় ও অভিশপ্ত ছিল এবং জাহান্নামের উপযুক্ত ছিল। পরিশেষে যখন কালিমা পড়ল, মুহূর্তের মধ্যে সে জান্নাতী হয়ে গেল এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হয়ে গেল। হাদীছে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, সে জান্নাতে প্রবেশ করল।[৬]

---

৬. তিরমিযী, ঈমান অধ্যায়, হাদীছ নং ২৫৬২

যদি গুনাহ করে থাকে এবং তা থেকে তাওবা না করে, তবে একটা কাল যাবৎ সে শাস্তি ভোগ করবে। গুনাহের শাস্তি শেষ হওয়ার পর শেষ ঠিকানা তার জান্নাতই হবে। এটা আমার কথা নয়। দোজাহানের বাদশা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। তাঁর কথা অপেক্ষা সত্য কথা বিশ্বজগতে আর কারও হতে পারে না। তিনি বলেছেন, সে জান্নাতী। কালিমা শরীফ পড়ার পর এক ব্যক্তি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থান থেকে উদ্ধার পেয়ে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে যায়।

এক রাখালের ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা

খায়বার যুদ্ধের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। এ যুদ্ধ হয়েছিল ইহুদীদের সাথে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের বাহিনী নিয়ে তাদের উপর চড়াও হয়েছিলেন। তিনি খায়বারের দুর্গসমূহ দীর্ঘদিন অবরোধ করে রেখেছিলেন, কিন্তু কোনও ক্রমেই বিজয় লাভ হচ্ছিল না। এ অবস্থায় ইহুদীদের এক রাখাল শহর থেকে বের হয়ে আসল। সে বকরি চরাত। সে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ। এক ইহুদী তাকে বকরি চরানোর কাজে নিযুক্ত করেছিল। সে বাইরে এসে মুসলিম বাহিনীর শিবির দেখতে পেল। সে শুনেছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজাযের বাদশা। তিনি সসৈন্যে এখানে আক্রমণ চালাতে এসেছেন। সে চিন্তা করল, এ জীবনে তো কোনও রাজা-বাদশা দেখিনি একটু গিয়ে দেখে আসি হিজাযের বাদশা কেমন এবং তিনি কী কথা বলেন। সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল, তিনি কোথায় আছেন, সাহাবায়ে কেরাম ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন, ওই তাঁবুর ভেতর। তাঁবু দেখেই রাখাল হতভম্ব হয়ে গেল। তার মাথায় তো ছিল, ইনি যখন হিজাযের রাজা এবং চারদিকে তার বিজয়-ডঙ্কা বাজছে, তখন তাঁর তাঁবু তো সাধারণ কিছু হবে না। নিশ্চয়ই তাতে বহু মূল্যবান গালিচা বিছানো থাকবে। অনেক কারুকার্য থাকবে। শানদার পর্দা লটকানো থাকবে। বাইরে সতর্ক প্রহরী থাকবে। কিন্তু সে গিয়ে দেখতে পেল এক সাধারণ তাঁবু, খেজুর পাতার তৈরি। কোনও চৌকিদার-পাহারাদার নেই এবং নেই পারিষদ-পার্শ্বচর। যা-হোক সে ভেতরে প্রবেশ করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নূরানী-সৌম্য-সমুজ্জ্বল চেহারা সে দেখতে পেল। সেই অনির্বচনীয় জ্যোতির্ময় চেহারা দেখামাত্রই তার হৃদয়ে আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। সামনে গিয়ে আরয করল, আপনি এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? আপনার পয়গাম কী? আপনি কিসের দাওয়াত দেন?

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার দাওয়াত তো একটাই। তা এই যে, তোমরা স্বীকার করে নাও আল্লাহ ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। বলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তাঁর প্রোজ্জ্বল-প্রসন্ন চেহারা ও হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তা রাখালকে দারুণভাবে মুগ্ধ করল। সে বলল, আচ্ছা বলুন তো আমি যদি আপনার দাওয়াত কবুল করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে নিই, তবে আমার কী লাভ হবে। তিনি বললেন, তুমি সমস্ত মুসলিমের মতো একই অধিকার ভোগ করবে এবং আমরা তোমাকে আমাদের বুকে জড়িয়ে নেব। সে বলল, আপনি আমাকে আপনার বুকে জড়িয়ে ধরবেন? জীবনে কখনও সে কল্পনাও করেনি যে, কোনও নেতা বা বাদশাহ তার মতো লোককে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে। সে বলল, আমি যে একজন কালো লোক! আমার দেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়! আপনি কিভাবে আমাকে বুকে জড়াবেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ঈমান আনলে সমস্ত মুসলিম তোমাকে বুকে জড়িয়ে নেবে এবং তুমি তাদের সমমর্যাদা ও সমান অধিকারপ্রাপ্ত হবে।

কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, সে বলেছিল, আপনি এত বড় বাদশা হয়ে আমার সাথে উপহাস করছেন যে, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না উপহাস নয়, আমি এমন এক দ্বীনের বার্তা নিয়ে এসেছি, যে দ্বীন সাদা-কালো ও আমীর-গরীবের মধ্যে প্রভেদ করে না। এ দ্বীনে শ্রেষ্ঠ কেবল সেই, যে আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় করে, যে বেশি মুত্তাকী-পরহেযগার।

কাজেই এ দ্বীন গ্রহণ করলে তুমি আমাদের সমমর্যাদার হয়ে যাবে। ফলে আমরা তোমাকে আলিঙ্গন করব। সে বলল, যদি তাই হয়, তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। এই বলে সে রাখাল মুসলিম হয়ে গেল।

তারপর সে বলল, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করলাম, এবার বলুন আমার কাজ কী? আমাকে কী করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এমন এক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছ, যখন কোনও সালাতের সময় নয় যে, তোমাকে সালাত আদায় করতে বলব। রমাযান মাসও নয় যে, রোযা রাখতে বলব। তোমার কাছে অর্থ-সম্পদও নেই যে, যাকাতের হুকুম দেব। আবার তখনও পর্যন্ত হজ্জও ফরয হয়নি। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ইবাদতসমূহের কোনওটিই এখন তুমি করতে পারছ না। অবশ্য একটি বিশেষ ইবাদত এখন খায়বারে চলছে। সে ইবাদত আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে তরবারির ছায়াতলে। আল্লাহর পথে জিহাদ। যাও অন্যান্য মুসলিমদের সাথে মিলে জিহাদে শামিল হও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তা অবশ্যই হব। প্রশ্ন হচ্ছে, জিহাদে দু'য়ের যে-কোনও একটি ঘটতে পারে। হয় আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। অথবা শাহাদাত নসীব হবে। আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, তবে আমার পরিণাম কী হবে?

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি এ জিহাদে শহীদ হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সোজা জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌছিয়ে দেবেন। তখন তোমার গায়ের কালো রং আলোকৌজ্জ্বল করে দেওয়া হবে। তোমার দেহকে নূরানী করে দেওয়া হবে। তুমি যে বলছ, তোমার দেহ থেকে বদবু ছড়ায়, আল্লাহ তা'আলা তোমার এ বদবু সুরভিতে পরিণত করে দেবেন।

রাখাল বলল, যদি তাই হয়, তবে আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই, সে যে বকরি পাল এনেছিল, সে সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো তোমার নয়; বরং অন্য কারও। কাজেই

এগুলো মালিককে ফিরিয়ে দিয়ে আসো। চিন্তা করে দেখুন, এটা যুদ্ধের ময়দান। বকরির পালটি শত্রুর। রাখাল সে পালটি চরানোর জন্য বাইরে নিয়ে এসেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করলে বকরির পালটিকে ধরে গনীমতের মাল বানাতে পারতেন। কিন্তু রাখালের কাছে যেহেতু সেগুলো আমানত হিসেবে ছিল আর আমানত রক্ষা ইসলামী শিক্ষামালার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা, তাই তিনি নির্দেশ দিলেন, আগে এগুলোকে দুর্গের দিকে হাঁকিয়ে দাও, যাতে এগুলো মালিকের হাতে পৌছতে পারে। নির্দেশমতো রাখাল সেগুলো দুর্গের দিকে হাঁকিয়ে দিল। তারপর নিজে জিহাদে শামিল হয়ে গেল। জিহাদ বেশ কিছুদিন দীর্ঘায়িত হল। পরিশেষে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করল। যুদ্ধশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ম অনুযায়ী শহীদ ও আহতদের খোঁজে বের হলেন। বেশ কয়েকজন সাহাবী এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যেখানে লাশগুলো পড়ে রয়েছিল সেখানে পৌছে তিনি দেখতে পেলেন সাহাবীগণ একটি লাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং লাশটি কার হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করছেন, তাঁরা তাকে চিনতে পারছিলেন না যে, সে কে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ করে দেখলেন যে, এ তো সেই রাখাল আসওয়াদের লাশ। তিনি ইরশাদ করলেন, এই ব্যক্তি বড়ই বিস্ময়কর। সে আল্লাহ তা'আলার জন্য জীবনে একটি সিজদাও করেনি। কখনও নামায পড়া ও রোযা রাখার অবকাশ হয়নি। কখনও আল্লাহর পথে একটি পয়সাও ব্যয় করেনি, অথচ আমি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি, সে সোজা জান্নাতুল-ফিরদাউসে পৌছে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তার দেহের দুর্গন্ধকে সুরভিতে বদলে দিয়েছেন। আমি নিজ চোখে দেখছি, আল্লাহ তা'আলা তাকে এই শুভপরিণাম দান করেছেন।

আমি আরয করছিলাম যে, এই পবিত্র কালিমা এক মুহূর্তে মানুষকে জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদ্ধার করে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে দেয়। এটা কোনও অতিশয়োক্তি নয়। সত্যিই আল্লাহ তা'আলা এ কালিমাকে এমন শক্তি দান করেছেন।

কালিমা পাঠ মূলত একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার নাম

প্রশ্ন হচ্ছে, এ কালিমার ভেতর এমন কী আছে, যদ্দরুন এটা পড়ামাত্রই মানব জীবনে এত বড় পরিবর্তন ঘটে? কী কারণে এ কালিমা পাঠমাত্র আগেকার বন্ধু শত্রু হয়ে যায় এবং শত্রু বন্ধু হয়ে যায়? এই কালিমার কারণেই তো বদরের যুদ্ধে পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে এবং পুত্র পিতার বিরুদ্ধে তরবারি ধরেছিল! এত বড় বিপ্লব যা দ্বারা সাধিত হয়, সেটা কি কোনও মন্ত্র না যাদু? কালিমার শব্দসমূহের মধ্যে কি বিশেষ কোনও শক্তি আছে, না ব্যাপার অন্য কিছু? প্রকৃতপক্ষে এটা কোনও যাদু বা মন্ত্র নয়। এর কারণে যে বিপ্লব সাধিত হয়, তার রহস্য এই যে, এ কালিমার মাধ্যমে বান্দা মূলত আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে চলার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। আমরা যখন বলি,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনও মাবূদ নেই।'

তার মানে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম, এখন থেকে আমি আদেশ মানব কেবলই আল্লাহ তা'আলার, তার আদেশের সামনেই মাথা নোয়াব, তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে মা'বূদ বানাব না এবং তাঁর হুকুমের বিপরীতে অন্য কারও হুকুম মানব না। আর وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ 'এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে বার্তা নিয়ে এসেছেন, তা শিরোধার্য করে নিলাম। সর্বাবস্থায় তার আনীত বিধানাবলি মেনে চলব। তা আমার বুঝে আসুক বা নাই আসুক, মনে চাক বা নাই চাক। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম যখন এসে গেছে তখন তা অমান্য করব না। এই হল কালিমার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি। এটা হল এ কথার ঘোষণা যে, আজ থেকে আমি নিজ জীবনকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি মোতাবেক চালাব। এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ও এই ঘোষণাদান মাত্রই জীবনে বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। ফলে মানুষ মুহূর্তের ভেতর আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বনে যায়।

কালিমা তাইয়্যিবার দাবি

বোঝা গেল, কালিমা তায়্যিবা কোনও মৌখিক বুলিমাত্র নয় যে, মুখে বলে দিলাম আর হয়ে গেল। বরং যেদিন আপনি কালিমা পাঠ করলেন, সেদিন আপনি নিজেকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমর্পণ করলেন, ওয়াদা করলেন যে, এখন আর আমার নিজের কোনও ইচ্ছা চলবে না। এখন থেকে আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন হয়ে জীবন-যাপন করব। সুতরাং এ কালিমার কিছু দাবি আছে। কিভাবে জীবন-যাপন করতে হবে, ইবাদত-বন্দেগী কিভাবে করতে হবে, মানুসের সঙ্গে আচার-ব্যবহার ও লেন-দেন কিভাবে চলবে, আখলাক-চরিত্র কেমন হবে ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে রয়েছে হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা এবং তা সবই এই কালিমার আওতাভুক্ত। সেসব দিক-নির্দেশনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন নিজ বাণী দ্বারা দিয়ে গেছেন, তেমনি নিজ জীবনের প্রতিটি কাজ-কর্ম ও প্রতিটি গতি-যতি দ্বারা তিনি তার বাস্তব শিক্ষা দিয়ে গেছেন। পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে তিনি তাঁর পবিত্র জীবন দ্বারা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। এখন মানুষের কাজ হল শরী'আতের বিধানাবলি শিখে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করা। বস্তুত সেই অনুযায়ী জীবন-যাপন করার নামই হল তাকওয়া। তাক্ওয়া অর্থ আল্লাহকে ভয় করে চলা। অর্থাৎ এমন তো নয় যে, আমি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি ঠিকই, কিন্তু আখিরাতে যখন আমাকে তাঁর দরবারে হাজির করা হবে, তখন আমর লজ্জার শেষ থাকবে না। কারণ আমি সে অঙ্গীকার রক্ষা করিনি। অন্তরে এই ভয়কে জাগ্রত রাখারই নাম তাক্ওয়া।

তাক্ওয়া অর্জনের উপায়

বস্তুত তাক্ওয়ার ভেতরই রয়েছে গোটা দ্বীনের নির্যাস। সমগ্র কুরআন মাজীদে বারবার বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ! তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করো। তারপর ইরশাদ হয়েছে,

كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

'সাদিকীন তথা সাচ্চা লোকদের সঙ্গী হয়ে যাও।'[৭]

---

৭. সূরা তাওবা, আয়াত ১১৯

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালাম বড় বিস্ময়কর। তাঁর বাণীর অসাধারণত্ব ও অলৌকিকতা অভাবনীয়। তিনি এক-একটি বাক্যের ভেতর মানুষের করণীয় সবকিছু যেমন বলেছেন, তেমনি তা করার পদ্ধতি ও সহজ নিয়মও তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে বান্দা আমল করতে গিয়ে কোনও রকমের সংকটের সম্মুখীন না হয়। কত বড় দয়াময় তিনি! ইরশাদ করেছেন, হে মুমিনগণ! তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো। তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে ফেললে তারপর আর কোনও কিছুর প্রয়োজন থাকে না। তাক্‌ওয়ার মধ্যে সবকিছুই এসে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, তাক্‌ওয়া কিভাবে অবলম্বন করা হবে? তাক্‌ওয়া তো অনেক উচ্চ স্তরের জিনিস। তার অনেক বড় বড় দাবি আছে। বড় বড় শর্ত আছে। তা কিভাবে অবলম্বন করব। কোথা থেকে অর্জন করব? পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ তা'আলা তার জবাব দিয়েছেন যে, তোমাদের পক্ষে নিজে নিজে তাক্‌ওয়া অবলম্বন কঠিন হবে। আমি তোমাদেরকে তার সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। তা এই যে, كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ 'তোমরা সাচ্চা লোকদের সঙ্গী হয়ে যাও।' সাদিকীনের সাথী বনে যাও। 'সাচ্চা' হওয়ার অর্থ কেবল তারা সত্য কথা বলে, মিথ্যা বলে না, এতটুকু নয়; বরং এর অর্থ তারা মুখে সত্য বলে, কাজে সততার পরিচয় দেয়, সকলের সঙ্গে সৎ হয়ে চলে এবং আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করে দেখায়। তোমরা এ ধরনের লোকদের সাথী হয়ে যাও, তাদের সাহচর্য অবলম্বন করো, তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করো। তাদের তাক্‌ওয়া-পরহেযগারীর ঝলক তোমাদের মধ্যেও সৃষ্টি করে দেবেন। এটাই হচ্ছে তাক্‌ওয়া অর্জনের পদ্ধতি। এ পথেই দ্বীন প্রজন্ম পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে আজ অবধি আমাদের পর্যন্ত যে দ্বীন এসে পৌছেছে, তা এভাবে সাচ্চা লোক বা সাদিকীনের সাহচর্যের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন শিখেছেন কোথা থেকে?

সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন শিখেছেন কোথা থেকে? সাহাবায়ে কেরাম কি কোনও ইউনিভার্সিটি থেকে দ্বীন শিখেছিলেন? তারা কি কোনও কলেজে

পড়াশোনা করেছিলেন? তারা কোন সার্টিফিকেট অর্জন করেছিলেন? কোন ডিগ্রি হাসিল করেছিলেন? তাঁদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল একটিই এবং তা কেবলই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত-পবিত্র সাহচর্য। তাঁরা তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন, তাঁর সান্নিধ্যে সময় কাটিয়েছেন এবং এরই মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দ্বীনের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন। এমনই রাঙিয়েছেন যে, আকাশ ও পৃথিবী দ্বীনের রঙে রঙিন হওয়া এরকম মানুষ না এর আগে কখনও দেখেছে, না পরে কখনও। আর না কখনও দেখতে পাবে। যাদের অবস্থা একদিন তো ছিল এমন যে, দুনিয়ার অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়েও প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে যেত, একে অন্যের রক্ত-পিপাসু বনে যেত, মামুলি বস্তু নিয়ে পরস্পর খুনোখুনিতে লিপ্ত হতো, সেই তারাই এমন হয়ে গেলেন যে, এখন দুনিয়া তাঁদের চোখে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে গেল, অতি তুচ্ছ ও চরম হীন হয়ে গেল। ফলে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন ও আখিরাতের সাফল্য অর্জনের বিপরীতে গোটা দুনিয়ার ধন-ভাণ্ডারও তাদের চোখে গ্রাহ্য করার উপযুক্ত থাকল না।

হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রাযি.-এর বিত্ত-বিমুখতা

হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল-জার্‌রাহ রাযি.-এর ঘটনা মনে পড়ে গেল। হযরত উমর ইবনুল-খাত্তাব রাযি.-এর আমলে রোম ও ইরানকে দুনিয়ার সুপার পাওয়ার মনে করা হতো (ঠিক আধুনিক আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো)।

এ দুই সাম্রাজ্যের অধিপতিকে বলা হতো যথাক্রমে কায়সার কিসরা। আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর হাতে এ দুই সম্রাটের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দেন। এ সময় হযরত উমর রাযি. আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রাযি.-কে শামের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। একবার সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে হযরত উমর রাযি. চাইলেন শামে ঘুরে আসবেন। তিনি হযরত আবূ উবায়দা রাযি.-কে জানালেন। ভাইয়ের বাড়িটি দেখার বড় ইচ্ছা জাগছে। তাঁর ভাবনা হয়ে থাকবে যে, আবূ উবায়দা মদীনা থেকে শাম গিয়েছেন। তিনি এখন সেখানকার

গভর্নর। মদীনার ভূমি উষর। পানি ও উদ্ভিদের বড় অভাব। সেখানে তার মামুলি বাড়ি ও বাগান ছিল। শামের ভূমি উর্বর, বেশ ফসল জন্মায়। সে অঞ্চলে রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির জোর প্রভাব। সেখানে যাওয়ার পর তিনিও প্রভাবিত হয়ে পড়েননি তো? দুনিয়ার আসক্তি তাঁকে পেয়ে বসেনি তো? এমন তো নয় যে, তিনি আলিশান ঘর-বাড়ি বানিয়ে সেখানে বিলাসী জীবন-যাপন শুরু করে দিয়েছেন? হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর অন্তরে এ জাতীয় কোনও চিন্তা দেখা দিয়ে থাকবে। কাজেই তিনি জানালেন, ভাই অর্থাৎ আবূ উবায়দার বাড়ি দেখতে চাচ্ছি।

হযরত আবূ উবায়দা রাযি. একদিন তাঁকে সাথে নিয়ে চললেন। তারা চলতে থাকলেন, বহুদূর এগিয়ে গেলেন, কিন্তু আবূ উবায়দার বাড়ি তো আসছে না। যখন নগরের সীমা পার হয়ে যাচ্ছিলেন, উমর ফারূক রাযি. বললেন, ভাই! আমি তো তোমার বাড়িটি দেখতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলছ?

বললেন, আমীরুল-মুমিনীন! আমি তো আপনাকে আমার বাড়িতেই নিয়ে যাচ্ছি! শহর অতিক্রম করে যাওয়ার পর তিনি তাকে একটি ঘাস-পাতার ঝুপড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, আমীরুল-মুমিনীন! এই আমার ঘর। হযরত উমর ফারূক সেই ঝুপড়ির ভেতর প্রবেশ করলেন। ভেতরে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলালেন। কিন্তু কোনও জিনিসই নজরে পড়ল না। কেবল একটা জায়নামায বিছানো ছিল। তাছাড়া আর কোনও জিনিসই সেই ঝুপড়ির ভেতর ছিল না। হযরত উমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আবূ উবায়দা! আপনি কিভাবে বেঁচে আছেন? আপনার ঘরের প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র কোথায়? এর উত্তরে আবূ উবায়দা রাযি. তাকের ভেতর থেকে একটা পেয়ালা বের করে আনলেন। তাতে একটু পানি ছিল এবং শুকনো রুটির কয়েকটি টুকরা তাতে ভেজানো ছিল। তা দেখিয়ে তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন আমার হাতে এতটুকু সময়ও থাকে না যে, খাবার রান্না করে খাব। তাই আমি এক মহিলাকে দিয়ে পূর্ণ এক সপ্তাহের

রুটি একসাথে তৈরি করিয়ে নিই। আমি তা পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিই। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী যে, বেশ ভালোভাবে দিন কেটে যাচ্ছে।

হযরত উমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আপনার অন্য আসবাবপত্র? তিনি বললেন, আমীরুল-মুমিনীন! আর কী আসবাবপত্র? কবর পর্যন্ত পৌছার জন্য এই তো যথেষ্ট! এ অবস্থা দেখে হযরত উমর রাযি.-এর অশ্রু আর বাধ মানল না। বললেন, আবূ উবায়দা! এ দুনিয়া আমাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু প্রতিদান দিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর কসম! আপনি ঠিক তেমনই রয়ে গেছেন, যেমনটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ছিলেন। হযরত আবূ উবায়দা রাযি. বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমি তো আগেই বলেছিলাম, আমার বাড়িতে গেলে আপনার চোখের পানি ফেলা ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না।[৮]

ইনি হলেন হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল-জার্‌রাহ রাযি. যিনি ছিলেন তৎকালীন শামের গভর্নর। আজ সেই শাম স্বতন্ত্র চারটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। তিনি এই সম্মিলিত ও বৃহত্তর শামের গভর্নর। তাঁর পদপ্রান্তে প্রত্যহ বিপুল অর্থ-সম্পদের স্তূপ লেগে যেত। তাঁর নাম শুনে রোম অধিপতিরও গাঁয়ে কাঁটা দিত। তাঁর নামে রোমান রাজন্যবর্গের তাঁতে খিল লেগে যত। সুবিশাল রোম সাম্রাজ্যের একেকটি জনপদ বিজিত হচ্ছিল আর সেখানকার সোনা-রুপা, হিরা-জহরত এনে আবূ উবায়দা রাযি.-এর পায়ের উপর স্তূপীকৃত করা হচ্ছিল। কিন্তু এর কোনও কিছুই ব্যক্তি আবূ উবায়দা রাযি.-কে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি আপন হালে ঘাস-পাতার ঝুপড়িতেই দিন গুজরান করতে থাকেন। তারা তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতেগড়া জামাত। ভূ-পৃষ্ঠে তাদের নজীর পাওয়া সম্ভব নয়। তারা দুনিয়া ও দুনিয়ার অর্থ-বৈভবকে এমনই তুচ্ছ ও হেয় করে রেখেছিলেন যে, তাদের চোখে এর কানাকড়ি মূল্য অবশিষ্ট ছিল না। তাদের অন্তরে তো এই ভাবনা সদা জাগ্রত ছিল যে, একদিন আল্লাহ তা'আলার সমীপে হাজির হতে হবে। বস্তুত সেখানকার জীবনই প্রকৃত

---

৮. হিলয়াতুল আওলিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০১; আল-ইসাবা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫৩; হায়াতুস-সাহাবা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭৯

জীবন। দু'দিনের এ জীবনের কীইবা মূল্য! মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের অন্তরে এই দৃষ্টিভঙ্গি বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন। এরই নাম তাকওয়া। তাঁরা কোথা থেকে এটা অর্জন করলেন? উত্তর এছাড়া আর কী যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য থেকেই অর্জন করেছিলেন। তাঁর সাহচর্যে যে ব্যক্তি কিছুদিন কাটাতে পেরেছে, তার অন্তরে দুনিয়ার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং আখিরাত তাদের সামনে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তো দ্বীন এ ধারাতেই চলে আসছে।

দ্বীন বুযুর্গদের দৃষ্টি দ্বারা জন্ম নেয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবীগণ, সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবিঈগণ, তাদের থেকে তাব্য়ে তাবিঈগণ দ্বীন ও তাকওয়া শিখেছেন। এবং এভাবেই আমাদের পর্যন্ত দ্বীনের প্রচার ও বিস্তার লাভ হয়েছে। যাদের জীবন তাকওয়ার ছাঁচে ঢেলে গড়া, যারা কালিমায়ে তাইয়্যিবার দাবী জানেন ও বোঝেন, তাদের সাহচর্য দ্বারাই এ বস্তু হাসিল হয়। কেবল বই কিতাব পড়ার দ্বারা এটা অর্জিত হয় না। কেবল ওয়াজ ও বয়ান শুনে এটা পাওয়া যায় না। এটা পাওয়া যায় আল্লাহ ওয়ালার সাহচর্যে। তাঁর সঙ্গে কিছুকাল কাটানো, তাঁর আমল পর্যবেক্ষণ, ও তাঁর জীবনাচার পাঠ করার দ্বারাই এটা হাসিল হয়। এভাবেই ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে দ্বীনের রং স্থানান্তরিত হয়। যারা মনে করে, কেবল বই পড়েই দ্বীন পেয়ে যাব, তারা মস্ত বড় ভুলের মধ্যে আছে। সত্য কথা হচ্ছে,

نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

'বই-কিতাব দ্বারা নয়, স্কুল-কলেজে পড়ে নয় এবং নয় টাকা-পয়সা দ্বারাও। বস্তুত দ্বীন জন্ম নেয় কেবল বুযুর্গদের দৃষ্টি দ্বারা।'

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তাক্ওয়া অর্জনের পন্থা হল, তোমরা সাচ্চা লোকদের, আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য গ্রহণ করো। এ সাহচর্যের

ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকেও মুত্তাকী বানিয়ে দেবেন। তোমাদের ভেতরও সেই রং সৃষ্টি হয়ে যাবে।

সত্যিকারের মুত্তাকী কোথায় পাওয়া যাবে?

প্রশ্ন হচ্ছে, সাচ্চা লোক কোথায় পাওয়া যাবে? প্রত্যেকেরই তো দাবী, আমিও সাচ্চা, আমিও সাদিক। বরং লোকে তো বলে, সাহেব আজকাল ধোঁকাবাজীর যুগ। প্রত্যেকে লম্বা জামা ও বড় পাগড়ি লাগিয়ে এবং লম্বা দাড়ি রেখে বলে, আমিও সাদিকীনের একজন।

কবি ইকবাল বলেছিলেন,

خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں

کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

'হে খোদা তোমার এই সরলপ্রাণ বান্দারা কোথায় যাবে।
যখন রবেশীও শঠতা এবং রাজনীতিও শঠতা?'

এই যখন অবস্থা, তখন কোথায় পাওয়া যাবে সেই সাদিকীন, যাদের সাহচর্য মানুষের ভেতর রসায়নের কাজ করবে? কোথায় মিলবে এমন আল্লাহওয়ালা, যার দৃষ্টি দ্বারা মানুষের জীবনে বিপ্লব ঘটে যাবে? জুনায়েদ ও শিবলীর মতো বড়-বড় ওলী আজ কোথায়? যুগটা তো এখন ধোঁকাবাজীর, প্রতারণার।

সবকিছুতেই ভেজাল

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এ কথার বড় চমৎকার উত্তর দিতেন। তিনি বলতেন, ভাই! লোকে বলে, আজকাল সাদিকীন কোথায় মিলবে? সর্বত্র তো শঠতা ও ধূর্ততা। আসল কথা হচ্ছে, এ যুগটাই হল ভেজালের। সবকিছুতে ভেজাল। ঘি কিনবেন, তাতে মিশেল, চিনিতে মিশেল, আটাও মিশেল, দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস এখন ভেজালমিশ্রিত। এমনকি বিষও এখন নির্ভেজাল নয়। গল্প শোনা যায়, এক ব্যক্তি যখন দেখল খাঁটি বলতে কিছু পাওয়া যায় না, সবই

ভেজাল, তখন জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ল। ভাবল এই ভেজালের জগতে বেঁচে থাকা নিরর্থক। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত না। মরে যাওয়াই ভালো। কাজেই সে আত্মহত্যা করবে বলে মনস্থির করল। কালবিলম্ব না করে বাজার থেকে বিষ কিনে আনল এবং তা খেল। বিষ খেয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু দেখা গেল, সময় বয়ে যাচ্ছে অথচ মৃত্যু আসছে না। না, মৃত্যু আর আসলই না, শুধু শুধুই অপেক্ষা। শেষটায় বোঝা গেল বিষে ভেজাল ছিল, তো দুনিয়ায় খাঁটি বলতে কিছু নেই। সব কিছুতেই ভেজাল।

আমার পিতা বলতেন, ভাই ভেজাল তো সবকিছুতেই, কিন্তু বলো তো আটায় ভেজাল বলে কেউ কি আটা কেনা বন্ধ করে দিয়েছে? রুটি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে? কেউ কি বলছে, ভাই আটা যেহেতু আর খাঁটি পাওয়া যাচ্ছে না তাই রুটি আর খাব না, এখন থেকে ভুসি খাব? ঘি তেল যখন আর খাঁটি মিলছে না, এখন থেকে ঘি-তেল খাব না, কেরোসিন খাব? এই ভেজালের যুগে কেউ তো আটা খাওয়া ছাড়ছে না, চিনি খাওয়া ছাড়ছে না, ঘি পরিহার করছে না; বরং সন্ধান করছে কোন্ দোকানে ভালো ঘি পাওয়া যায়, কোন মহল্লায় পাওয়া যায়। নিজে গিয়ে বা লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে তা নিয়ে আসে। কোথায় মিষ্টি ভালো পাওয়া যায়, কোথায় আটা ভালো পাওয়া যায়, সেখান থেকেই তা সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়, তা যত দূরেই হোক না কেন। এ কথা ঠিক যে, চিনি, আটা, ঘি নির্ভেজাল পাওয়া যায় না, কিন্তু তাই বলে সন্ধানকৃত বস্তু দুষ্প্রাপ্য নয়। এখনও মানুষ খাঁটির সন্ধানে ঘুরছে এবং যারা ঘুরছে তারা পাচ্ছেও। এ-রকমই খাঁটি আলেমের ব্যাপারটা। খাঁটি পাওয়া ভার। কিন্তু সন্ধান যে করে, সে ঠিকই পায়। আল্লাহর কোনও বান্দা যদি পেতে চায়, পাওয়ার চেষ্টা করে, খুঁজে বেড়ায়, তবে এ যুগেও সে সাদিকীন পেয়ে যাবে। এ যুগে আর সাদিকীন নেই, এ ভাবনা শয়তানের সৃষ্টি। এই বলে শয়তান ধোঁকা দিচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা যখন বলছেন, তোমরা সাদিকীনের সাহচর্য গ্রহণ করো, তখন কোনও যুগই সাদিকীন-শূন্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার এ হুকুম কি কেবল সাহাবায়ে কেরামের

যুগের জন্যই ছিল যে, কেবল তাদের পক্ষেই এর অনুসরণ সম্ভব ছিল, বিংশ-একবিংশ শতাব্দীতে যারা জন্ম নেবে, তাদের পক্ষে এটা পালন করা সম্ভব হবে না? বলা বাহুল্য কুরআন মাজীদের প্রতিটি হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলিম জন্ম নেবে সকলেরই জন্য প্রযোজ্য। সকলের জন্যই তা পালন করা সম্ভব থাকবে। কাজেই আপনি নিজেই বুঝতে পারেন যে, সাদিকীন আজও আছে। ব্যাপার কেবল সন্ধানের। সন্ধান করলে, ভেতরে তাড়না বোধ করলে ঠিকই পাওয়া যাবে।

যেমন রূহ তেমন ফিরিশতা

আমার সম্মানিত পিতা রহ. বলতেন, ভাই! আজকাল তো মানুষের অবস্থা হল, নিজে যেমনই হোক– সগীরা, কবীরাসহ যত রকম গুনাহেই লিপ্ত থাকুক, নিজের জন্য যখন সাদিকীন তালাশ করবে, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. আব্দুল কাদির জিলানী রহ. বায়যীদ বুস্তামী রহ. প্রমুখের মতো সর্বোচ্চ স্তরের আওলিয়ার নাম নেবে। বলবে, সাহেব আমার তো তাদের মতো পীর চাই। অথচ নিয়ম হল যেমন রূহ, ফিরিশতাও তেমনই হবে। আপনি যেমন, আপনার মুসলিহ (সংশোধনকর্তা)-ও তো সেই অনুসারেই হবে। আপনি যেই স্তরের লোক, আপনার জন্য সেই অনুযায়ী পীরই যথেষ্ট। হযরত জুনায়েদ ও শিবলী রহ.-এর মতো না হোক, আপনাকে ইসলাহ ও সংশোধন করার মতো যোগ্যতা থাকলেই হল।

মসজিদের মুআয্যিনের সাহচর্য অবলম্বন করুন

ওয়ালিদ মাজেদ রহ. বলতেন, আমি তো কসম করে বলতে পারি, কেউ আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার ইচ্ছায় যদি মসজিদের অজ্ঞ মুআয্যিন সাহেবের সাহচর্যে গিয়ে বসে, তবে তার সাহচর্য দ্বারাও সে উপকৃত হতে পারবে। কেননা মুআয্যিন সাহেব অন্ততপক্ষে পাঁচবার তো আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করেন। তাঁর সে সুউচ্চ উচ্চারণ শূন্যমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এভাবে তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নাম ও কালিমার ধ্বনি উচ্চারিত হয়। তাঁর মর্যাদা কম কিসে? কাজেই তার সাহচর্যে গিয়েই বসুন না। তার দ্বারাও আপনার উপকার লাভ হবে।

আমার জন্য এই মাপের বুযুর্গ, ওই মাপের মুসলিহ দরকার—এটা একটি শয়তানী ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে আপনার ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য যেই স্তরের মুসলিহ দরকার, সে রকম লোক অবশ্যই আছে।

কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আমি আরয করতে চাচ্ছিলাম, দ্বীন হাসিল করা ও তার সমঝ অর্জন করার এবং তার উপর আমল করার নিয়ম-নীতি জানার সর্বোত্তম পথ সর্বকালের মতো এটাই যে, কোনও আল্লাহওয়ালার হাতে নিজ হাত ধরিয়ে দেওয়া হোক। কোনও আল্লাহওয়ালার সাহচর্য লাভ হলে তার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনদারী নসীব করবেন।

আমি আপনাদেরকে মুবারকবাদ জানাই। এমন বহু জায়গা আছে, যেখানে এ জাতীয় কথা বলার সুযোগ হলে লোকে জিজ্ঞেস করে, সাহেব! আমরা কোথায় যাব? কার কাছে যাব? উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। আপনাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার যে মেহেরবানী তাঁর শোকর আদায় করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সুদূর পল্লীতে বাস করা সত্ত্বেও আপনারা এক বিরাট নি'আমতের অধিকারী হয়েছেন। কারও মুখের উপর প্রশংসা করা ভালো নয়। তবে আমাদের দ্বীন বড় সরল-সোজা। তাই সোজাসুজিই বলছি, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের ও আমাদের প্রতি মেহেরবানী করেছেন যে, হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুশ শাকূর তিরমিযী দামাত বারাকাতুহুমকে এই গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফলে যে নূরের বিচ্ছুরণ তার থেকে ঘটেছে, তা আপনারা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছেন। এই মাদরাসা, এই বিশাল সমাবেশ, মুসলিমদের ভেতর এই দ্বীনী জযবা, এই আগ্রহ-উদ্দীপনা—এসবই এক আল্লাহওয়ালার দিল থেকে উৎসারিত দীর্ঘশ্বাস ও দু'আর ফল। আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমেই এ নি'আমত লাভ হয়েছে। আমাদের তো অবস্থা হল, নি'আমত যতদিন সামনে থাকে ততদিন তার মূল্য দেওয়া হয় না। চলে যাওয়ার পর কদর বুঝে আসে এবং তখন মাথায় বসানোর জন্য সকলে প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন তার উপলক্ষ্যে ওরশ করা হয়, মাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়, মাজারে চাদর দেওয়া হয়, তাকে আসমানে ওঠানোর চেষ্টা করা হয়। আরও কত কী! কিন্তু যতদিন সে নি'আমত বর্তমান থাকে, তার মূল্য দেওয়া হয় না,

মূল্য বোঝারও চেষ্টা করা হয় না; বরং সর্বদা তার দোষই দেখা হয়। সমালোচনা করা হয়। এটা ঠিক না। কোথাও আল্লাহওয়ালার অবস্থান থাকলে তাকে মূল্যায়ন করা উচিত এবং তার থেকে উপকার লাভের চেষ্টা করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুফতী সাহেবকে এমনই উচ্চ মর্যাদা দান করেছে যে, দূর-দূরান্তের সফর করেই তাঁর কাছে আসা এবং তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করার কথা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে নিজ পল্লীর ভেতরই এই নি'আমত দান করেছেন। আমি বহুদূর থেকে এসেছি। আমার দ্বারা তো কিছুই হয় না। কোনো যোগ্যতাই নেই। আমি আপনাদের সামনে কী আরয করব? তারপরও এই এতটুকু কথাও যদি আপনাদের মনে ধরে এবং এই নি'আমতের মূল্য বুঝতে চেষ্টা করেন ও তার থেকে উপকার লাভে উদ্যোগী হন, তবে আমি মনে করি, বড়-বড় জলসা ও লম্বা-লম্বা বক্তৃতার সারাৎসার হাসিল হয়ে গেছে। জলসা তো অনেকই অনুষ্ঠিত হয়, বক্তৃতা হয় প্রচুর, ভাষণ ও শ্রবণ তো চলছেই, মানুষ দেদার বলছে, বিস্তর শুনছে, কিন্তু অন্তরে যদি অন্ততপক্ষে এতটুকু চেতনা ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আমাকে কোনও আল্লাহওয়ালার সাহচর্য অবলম্বন করতে হবে, তার থেকে উপকৃত হতে হবে, তবে আমি মনে করি, এই জলসা সার্থক হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এবং আপনাদেরকেও দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন, সাদিকীনের সাহচর্য লাভের তাওফীক দিন এবং তাদের খেদমত করার মাধ্যমে দ্বীনের সহীহ মেজায আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বুদ্ধির কর্ম-পরিধি*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

এই একাডেমির প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে এই আমার প্রথম উপস্থিতি নয়। এর আগে যেসব প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতেও আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে। এবার আমাকে 'ইসলামাইজেশন অব ল'য'-সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। বিষয়টা অনেক দীর্ঘ ও ব্যাপক। এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রচুর সময়ের দরকার, কিন্তু এখন আমাকে অন্য এক জায়গায় যেতে হবে। তাই সময় বড় কম। তাই আমি এই সংক্ষিপ্ত সময়ে 'ইসলামাইযেজশন অব ল'য'- এর কেবল একটি দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

'মৌলবাদ' একটি গালি হয়ে গেছে

যখন আওয়াজ তোলা হয়, আমাদের আইন, আমাদের অর্থব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, কিংবা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে গড়া উচিত, তখন প্রশ্ন তোলা হয়, কেন তা করতে হবে? এর স্বপক্ষে প্রমাণ কী? এ প্রশ্ন তোলার কারণ, আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন সেক্যুলার মানসিকতা (Secular ideas) সকলের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলতে গেলে এখন প্রায় সমগ্র বিশ্বে এটা এক স্বীকৃত বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সেক্যুলার

---

* ইসলাহী মাওয়ায়েয, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৭-১৭০

সিস্টেম বা ধর্মনিরপেক্ষ নীতিই সর্বোত্তম নীতি। সেক্যুলারিজমের পরিমণ্ডলে থেকেই রাষ্ট্রকে সফলতার পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। এখন দুনিয়ার ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি রাষ্ট্র যে কেবল ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার দাবী করছে তাই নয়; বরং এ নিয়ে রীতিমতো গৌরববোধ করছে। এহেন বাতাবরণে আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের আইন, আমাদের অর্থনীতি, সমাজনীতি তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে ইসলামাইজ করে নেওয়া উচিত; এ দাবী তোলা বা এই কথা বলা যে, আজকের সমাজকেও চৌদ্দশ' বছরের পুরানো নীতি অনুসারে চালাতে হবে– সকলের কাছে অদ্ভুত কথা মনে হবে। যারা এরূপ বলবে, তাদেরকে নানা রকম নিন্দাবাণে জর্জরিত হতে হবে। বলা হবে, মৌলবাদী, ফান্ডামেন্টালিস্ট। 'মৌলবাদ' ও 'ফান্ডামেন্টালিজম'-কে তো বিশ্বব্যাপী একটা গালি হিসেবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কেউ বলবে, রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বীন-ধর্মের অধীন হওয়া চাই, ইসলাম অনুসারে হওয়া চাই, তাদেরকে মৌলবাদী বা ফান্ডামেন্টালিষ্ট নামে আখ্যায়িত করত সকলের কাছে নিন্দিত করে তোলা হবে। সর্বত্র এরকমই চলছে। অথচ শব্দটির মূলের প্রতি লক্ষ করা হলে দেখা যায়, এটা কোনও খারাপ শব্দ নয়। 'ফান্ডামেন্টালিস্ট'- এর শাব্দিক অর্থ এমন ব্যক্তি, যে মৌলিক নীতিমালা (Fundamebtal Principles) অবলম্বন করে। কিন্তু আজ তারা এটাকে গালি হিসেবে চালু করে দিয়েছে।

ইসলামাইজেশন কেন?

আমরা কেন আমাদের জীবনকে ইসলামাইজ করতে চাই, আজকের এ অধিবেশনে আমি কেবল এ প্রশ্নেরই উত্তর দেব। ইসলামী শিক্ষা তো চৌদ্দশ' বছরের পুরানো। সেই পুরানো শিক্ষা অনুযায়ী আমরা আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কেন ঢেলে সাজাতে চাই, এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানতে হবে।

মানব-বুদ্ধি চূড়ান্ত মাপকাঠি হতে পারে কি?

আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাচ্ছি, একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র (Secular State), প্রকৃতপক্ষে যা ধর্মহীন রাষ্ট্র, নিজ শাসনব্যবস্থা ও

জীবনধারা কী নীতিতে তৈরি করবে? তার কাছে তো এ বিষয়ে কোনও মূলনীতি নেই। বলা হয়ে থাকে, আমাদের বুদ্ধি-বিবেক আছে। আমরা পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারাই নিরূপণ করতে পারি– এ যুগের প্রয়োজন কী ও এ যুগের দাবি কী? অতঃপর সে অনুযায়ী কোন্ জিনিস আমাদের পক্ষে কল্যাণকর—তাও উপলব্ধি করতে পারি। সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে কল্যাণকর আইন-কানুন প্রণয়ন আমাদের পক্ষে সম্ভব বৈ কি! অতঃপর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে আইনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধন করে রাষ্ট্র ও সমাজের ক্রমোন্নতি ঘটানোও বিলক্ষণ সম্ভব। এভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকে চূড়ান্ত মাপকাঠির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এবার লক্ষ করার বিষয় হল, এ মাপকাঠি কতটা পরিপক্ক? এ মাপকাঠি কি কিয়ামত পর্যন্তের জন্য সমগ্র মানবতার পথ-নির্দেশ করার যোগ্যতা রাখে? কেবল বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা নির্ভর এ মাপকাঠি কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট?

এর উত্তরের জন্য আমাদেরকে বিশেষভাবে যে কথাটা স্মরণ রাখতে হবে তা হল, নিজ পৃষ্ঠপোষকতার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান-গরিমার পুঁজি হাতে না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থাই সফলতা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষকে কতগুলো মাধ্যম দিয়েছেন। প্রতিটি মাধ্যমেরই এক নির্দিষ্ট কর্মবলয় আছে। সেই মাধ্যমটি আপন কর্মবলয়ের ভেতরই সক্রিয় থাকতে পারে এবং নির্দিষ্ট সেই বলয়ের ভেতরই তাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সে বলয়ের বাইরে তা সম্পূর্ণ অচল। সেখানে তা দ্বারা কোনও উপকার লাভ হয় না।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্মপরিধি

উদাহরণত মানুষকে সর্বপ্রথম যে জ্ঞান মাধ্যম দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে তার পঞ্চেন্দ্রিয়। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক। চোখের দ্বারা দেখে অনেক কিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। জিহ্বা দ্বারা চেখে জ্ঞান লাভ করা যায়। নাক দ্বারা শুঁকে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং কান দ্বারা শুনে ও হাত দ্বারা ছুঁয়েও জ্ঞান লাভ করা যায়। জ্ঞানের পঞ্চ মাধ্যম ইন্দ্রিয়গোচর সীমানার ভেতরই কাজ করতে পারে। তাও আবার প্রত্যেকটির কর্মপরিধি

সুনির্দিষ্ট। কোনও মাধ্যমই আপন পরিধির বাইরে যেতে পারে না। চোখ কেবল দেখতেই পারে, শুনতে পারে না। কান শুনতে পারে, কিন্তু দেখতে পারে না। নাক ঘ্রাণ নিতে পারে, দেখতে পারে না। কেউ যদি ইচ্ছা করে, চোখ বন্ধ রেখে কান দিয়ে দেখবে, তবে সারা দুনিয়াবাসী তাকে আহাম্মক বলবে। কারণ কানকে তো সেজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। কেউ যদি তাকে বলে, তোমার কানের পক্ষে তো দেখা সম্ভব নয়, কাজেই কান দিয়ে দেখার চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা আর এর উত্তরে সে বলে, দেখতে না পারলে তো কান একটা ফালতু জিনিস, তাহলে সকলেই বলবে, সে চরম নির্বোধ, কারণ সে এতটুকু কথাও জানে না যে, কানের একটা সীমিত কর্মপরিধি আছে। তার ভেতরই সে কাজ করতে পারে, তার বাইরে নয়। তার বাইরে তাকে দিয়ে চোখের কাজ নিতে চাইলে তা কখনও সম্ভব হবে না।

জ্ঞানমাধ্যম হিসেবে বুদ্ধির কর্মপরিধি

জ্ঞানলাভের মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়েছেন তা এক নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতর কাজ করতে পারে। এক পর্যায়ে গিয়ে এ পঞ্চেন্দ্রিয় অচল হয়ে পড়ে। সেখানে না চোখ দেখতে পারে, না কান শুনতে পারে, না জিহ্বা কোনও কাজ করতে পারে, না নাক কৃতিত্ব দেখাতে পারে আর না ত্বক সক্রিয় থাকতে পারে। এটা সেই স্তর, যেখানে কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা দেয় না। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আরেকটি জ্ঞানমাধ্যম দিয়েছেন। তা হচ্ছে 'বুদ্ধি'। পঞ্চেন্দ্রিয় যেখানে পৌছতে ব্যর্থ হয়ে যায়, বুদ্ধি সেখানে আপন করিশমা প্রদর্শন করে। যেমন আমার সামনে এই যে টেবিলটি আছে। আমি চোখে দেখে এর রং বলতে পারি, হাতে ছুঁয়ে বলতে পারি এটি কাঠের তৈরি এবং এর উপর ফরমিকা লাগানো আছে। কিন্তু এ টেবিলটির অস্তিত্ব লাভ হল কী করে, এটা কিন্তু দেখে বলা যাবে না, কান পেতে বা ছুঁয়েও নয়। কারণ এটা আমার সামনে তৈরি করা হয়নি। এ পর্যায়ে আমার বুদ্ধি আমার পথ-নির্দেশ করতে পারে। বুদ্ধি বলে, এমন নিখুঁত ও সুন্দর টেবিল আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। নিশ্চয়ই কোনও দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছুতার এটি তৈরি করেছে। তো এটি যে-

কোনও দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছুতারের তৈরি আমার বুদ্ধিই এ জ্ঞান আমাকে সরবরাহ করেছে। এভাবে যে পর্যায়ে পৌছে আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অপারগতা প্রকাশ করেছিল, সেখানে আমার বুদ্ধি এসে হাজির হয়েছে এবং পথ দেখিয়ে অন্য একটি জ্ঞান পর্যন্ত আমাকে পৌছে দিয়েছে।

কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্মপরিধি যেমন সীমাহীন (Unlimited) ছিল না; বরং নির্দিষ্ট এক সীমার ভেতর তার কার্যকারিতা শেষ হয়ে গিয়েছিল, তেমনই বুদ্ধির কর্মপরিধিও সীমাহীন নয়। বুদ্ধিও একটা নির্দিষ্ট সীমায় মানুষের কাজে আসে। একটা নির্দিষ্ট সীমার ভেতর সে মানুষের পথপ্রদর্শন করে। তার বাইরে যদি বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে চান, তবে অক্ষমতা প্রকাশ করবে, সেখানে সে কোনও পথ দেখাতে পারবে না।

তৃতীয় জ্ঞানমাধ্যম 'ওহী'

বুদ্ধির দৌড় যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তৃতীয় একটি জ্ঞানমাধ্যম দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে 'ওহী'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসমানী শিক্ষা। শিক্ষার এ মাধ্যমটি শুরুই হয় সেখান থেকে যেখানে গিয়ে মানববুদ্ধি অচল হয়ে পড়ে। কাজেই যে স্থলে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ওহী আসে, সেখানে বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা একটা পণ্ডশ্রম; ঠিক চোখের কাজ কান দিয়ে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টারই অনুরূপ। এর মানে এ নয় যে, বুদ্ধি ফালতু জিনিস। বুদ্ধি ঢের কাজের জিনিস, তবে শর্ত হল তাকে তার কর্মপরিধির মধ্যেই ব্যবহার করতে হবে। তার কর্মপরিধির বাইরে ব্যবহার করতে চাইলে সেটা চোখের কাজ কান দিয়ে বা নাকের কাজ চোখ দিয়ে করার মতই পণ্ডশ্রম হবে।

ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের মধ্যে পার্থক্য

ইসলাম ও সেক্যুলার ব্যবস্থার মধ্যে এটাই মৌলিক পার্থক্য যে, সেক্যুলার ব্যবস্থা জ্ঞানের প্রথম দু'টি মাধ্যম ব্যবহার করেই থেমে যায়। তাদের কথা হচ্ছে, মানুষের কাছে তৃতীয় কোনও জ্ঞানমাধ্যম নেই। আমাদের আছে কেবল চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক আর আছে বুদ্ধি।

এর বাইরে জ্ঞানের আর কোনও মাধ্যম নেই। আর ইসলাম বলে, এ দু'টি জ্ঞান মাধ্যমের পর তোমাদের কাছে তৃতীয় আরও একটি মাধ্যম আছে। তার নাম 'ওহী'।

ওহীর প্রয়োজনীয়তা

এবার আসুন আমরা ইসলামের এ দাবির যথার্থতা খতিয়ে দেখি। ইসলাম যে বলছে, বুদ্ধি দ্বারা সবকিছু জানা সম্ভব নয়; বরং এক পর্যায়ে বুদ্ধি অচল হয়ে যায় এবং সেখানে আসমানী নির্দেশনার প্রয়োজন, আসমানী কিতাবের শিক্ষার প্রয়োজন, ইসলামের এ দাবি আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কতটুকু বাস্তবসম্মত?

এখন তো চতুর্দিকে বুদ্ধিপূজা ও যুক্তিবাদ (Rationalism) -এর দুর্দান্ত দাপট। বলা হচ্ছে, আমরা প্রতিটি জিনিস বুদ্ধির তুলাদণ্ডে যাচাই করার পরই গ্রহণ করব। কিন্তু বুদ্ধির কাছে তো এমন কোনও সুনির্দিষ্ট ফর্মুলা ও সুনির্দিষ্ট মূলনীতি (Principle) নেই, যা সার্বজনীন সত্য (Universal Truth) -এর মর্যাদা রাখে এবং যা সারা বিশ্বে এমনভাবে স্বীকৃত যে, তার মাধ্যমে নিজ ভালো-মন্দ ও মঙ্গল-অমঙ্গলের মাপকাঠি নির্ণয় করবে। কোন জিনিস ভালো, কোনটি মন্দ? কোন্‌টি গ্রহণ করা দরকার আর কোন্‌টি গ্রহণ করা উচিত নয়? এসব বিষয়ের উত্তর যদি আপনি বুদ্ধির উপর ছেড়ে দেন, তবে আপনাকে হতাশ হতে হবে। আপনি ইতিহাসের পাতা উল্টাতে থাকুন, দেখতে পাবেন, এ ব্যাপারে বুদ্ধি মানুষকে যে কী পরিমাণ ধোঁকা দিয়েছে, তা গুনে শেষ করা সম্ভব নয়। বুদ্ধিকে লাগামহীন ছেড়ে দিলে, তা মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়, ইতিহাস থেকে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যাক।

যুক্তি-বুদ্ধি ও ভাই-বোনে বিবাহ

(ক) আজ থেকে প্রায় আটশ' বছর আগে মুসলিম বিশ্বে বাতিনী বা কারামিতা নামে একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। এ সম্প্রদায়ের এক প্রসিদ্ধ নেতার নাম উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন হাসান কায়রোয়ানী। তিনি তার অনুসারীদের নামে একটি চিঠি লিখেছিলেন। বড় কৌতূহলোদ্দীপক চিঠি।

তাতে তিনি অনুসারীদেরকে জীবন-যাপনের কিছু নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাতে তিনি এ কথাও লেখেন যে,

এই মূঢ়তার বিষয়টা আমার একদম বুঝে আসে না যে, কারও নিজ ঘরে এক রূপসী, বুদ্ধিমতী বোন আছে, ভাইয়ের মেজায-মর্জি ভালো বোঝে, তার চিন্তা-চেতনাও বেশ জানে, কিন্তু সেই নির্বোধ লোকটা তার বোনটির হাত অচেনা-অজানা এমন একটা লোকের হাতে তুলে দেয়, যার সম্পর্কে এতটুকু জানা নেই যে, তার সাথে বোনটির বনিবনাও হবে কি না, মেজায-মর্জিতে মিলবে কি না। আর নিজের জন্য অনেক সময় এমন কোনও মেয়েকে বেছে নেয়, যে রূপে-গুণে, বুদ্ধিতে সহবতে তার বোনের সমতুল্য হয় না। আমার বুঝে আসে না, এই নির্বুদ্ধিতার কী বৈধতা আছে যে, নিজ ঘরের সম্পদ অন্যের হাতে তুলে দেওয়া হবে আর নিজের জন্য এমন কাউকে আনা হবে, যে পুরোপুরি সুখ ও আনন্দ দিতে পারবে না। এটা একটা মূর্খতা, এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আমি আমার অনুসারীদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন এই মূঢ়তা পরিহার করে এবং ঘরের ধন ঘরেই রেখে দেয়।[৯]

(খ) উবায়দুল্লাহ ইবন হাসান কায়রোয়ানী অন্যত্র তাঁর অনুসারীদেরকে নিজ বুদ্ধিপ্রসূত এই বার্তা দান করেন যে, এক বোন যখন নিজ ভাইয়ের জন্য খাবার তৈরি করতে পারে, তার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে, তার আরামের জন্য কাপড় গুছিয়ে দিতে পারে, তার বিছানা ঠিক করে দিতে পারে, তখন এর কী হেতু যে, তার যৌন চাহিদা নিবারণ করতে পারবে না? এর কী যুক্তি আছে? বরং এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ধারণা।[১০]

আপনি এসব কথার কারণে তাকে যত ইচ্ছা অভিশাপ দিন, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, যে বুদ্ধি ওহীর দিক-নির্দেশনা লাভ করেনি, যা ওহীর আলোয় আলোকিত হতে পারেনি, সেই বুদ্ধির ভিত্তিতে আপনি তার এ

---

৯. বাগদাদী, আল-ফারক বায়নাল-ফিরাক, পৃষ্ঠা ২৯৭; দায়লামী, বায়ানু মাযাহিবিল বাতিনিয়্যা, পৃষ্ঠা ৮১

১০. প্রাগুক্ত।

যুক্তির কী উত্তর দেবেন? নিছক যুক্তি-বুদ্ধির বলে কিয়ামত পর্যন্ত এর জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না।

যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা চরিত্রহীনতা নয়

কেউ যদি বলে, এটা তো মারাত্মক দুশ্চরিত্রতা, চরম ঘৃণ্য কথা, তার উত্তর হবে, এই দুশ্চরিত্রতা ও ঘৃণার ব্যাপারটা পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি। আপনি এমন এক পরিবেশে জন্ম নিয়েছেন, যেখানে এটাকে দূষণীয় মনে করা হয়। তাই আপনিও এটাকে দূষণীয় মনে করে থাকেন। নয়তো যুক্তি-বুদ্ধির নিরিখে এটা কোনও দোষের কথা নয়।

বংশ-রক্ষা কোনও যৌক্তিক মূলনীতি নয়

আপনি বলতে পারেন, এর দ্বারা বংশধারা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এর জবাব হল, বংশধারা নষ্ট হলে হোক না, তাতে সমস্যা কী? বংশ রক্ষা এমন কি যৌক্তিক মূলনীতি, যা কিছুতেই লঙ্ঘন করা যাবে না?

স্বাস্থ্যগত ক্ষতির যুক্তি

আপনি বলতে পারেন, ভাই-বোনে বিবাহ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, কেননা নিকটাত্মীয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক বা অজাচার (Incest) দ্বারা যে নানা রকম স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সাধিত হয়, এ ধারণা সুবিদিত। কিন্তু আপনি কী জানেন, পশ্চিমা জগতে আজকাল কী গবেষণা হচ্ছে? এখন তো বই-পুস্তক লিখে জানানো হচ্ছে, অজাচার (Incest) মানবীয় চাহিদা (Human Urge)-এরই একটা অংশ। এবং এর যে স্বাস্থ্যগত ক্ষতির কথা বলা হচ্ছে তা সঠিক নয়। আটশ' বছর আগে উবায়দুল্লাহ ইবন হাসান কায়রোয়ানী যে কথা বলেছিল, এখন তার কেবল প্রতিধ্বনিই করা হচ্ছে না; বরং পশ্চিমা বিশ্বে আজকাল কোনও না কোনওভাবে এর বাস্তব চর্চাও চলছে।

ওহীর নির্দেশনা থেকে বিমুখ হওয়ার পরিণাম

এসব কেন হচ্ছে? কেবল এ কারণে যে, বুদ্ধিকে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা আদৌ তার কর্মপরিধি (Jurisdiction) -এর

অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যেখানে পথ-নির্দেশ কেবল ওহীই করতে পারে। বুদ্ধিকে ওহীর নির্দেশনা-বিমুখ করারই তো পরিণাম যে, সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেন্ট বিপুল করতালির মাধ্যমে সমকাম (Homo Sexualiy)-কে বৈধ ঘোষণা করেছে। বরং এখন তো এটা যথারীতি একটা শাস্ত্রেই পরিণত হয়েছে। আমি একবার নিউইয়র্কের একটি লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখতে পেলাম 'গে স্টাইল অফ লাইফ' (Gay Style Of Life) শিরোনামে পৃথক একটি সেকশনই রয়েছে। বাজারে এ বিষয়ে বিস্তর বই-পুস্তক এসে গেছে। এমনকি সমকামীদের বিভিন্ন সংগঠনও রয়েছে। তাদের অনেকে তো বড়-বড় পদেও আসীন। নিউইয়র্কের সে সময়ের মেয়রও একজন সমকামী।

বুদ্ধির ধোঁকা

গেল সপ্তাহের আমেরিকান টাইম পত্রিকাটি খুলে দেখুন। তাতে খবর ছাপা হয়েছে, উপসাগরীয় যুদ্ধে যোগদানকারী মার্কিন সৈন্যদের মধ্য থেকে প্রায় হাজার সদস্যকে সমকামী হওয়ার অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু সমকারি এ পদক্ষেপের কারণে সেখানে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। লোকজন বিক্ষোভ করছে। চারদিক থেকে বলা হচ্ছে, সমকামী হওয়ার অভিযোগে সেনাসদস্যদেরকে চাকরিচ্যুত করাটা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিক পদক্ষেপ। তাদেরকে চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে। তাদের যুক্তি হল, এটা তো একটা মানবীয় চাহিদা (Human Urge)। এই হিউম্যান আর্জের বাহানায় আজ দুনিয়ার নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর কাজকেও আইনসম্মত করা হচ্ছে। আর এসবই করা হচ্ছে এই যুক্তিতে যে, বলো এর ভেতর যৌক্তিকভাবে মন্দের কী আছে? এ তো ছিল কেবল মানব-পরিমণ্ডলে। কিন্তু বিষয়টা এখন মানুষের সীমা অতিক্রম করে কুকুর, গাধা, ঘোড়া ইত্যাদি পশুদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর এটাকে যথারীতি গৌরবজনক মনে করা হচ্ছে।

বুদ্ধির আরেকটি ধোঁকা

বিষয়টি পরিষ্কার করার লক্ষ্যে আরও একটি উদাহরণ পেশ করতে চাই। এই যে আনবিক বোমা, যার বিপুল বিধ্বংসী ক্ষমতার কারণে সারা

বিশ্ব উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত। চেষ্টা চলছে কিভাবে আনবিক অস্ত্রের পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় অ্যাটম বোম সম্পর্কে যে নিবন্ধ লেখা হয়েছে তা পড়ে দেখুন। বলা হয়েছে, বিশ্বে এ পর্যন্ত দু'টি স্থানে এ বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। একটি হিরোশিমায়, অন্যটি নাগাসাকিতে। উভয় স্থানে যে ধ্বংসলীলা ঘটেছে তার বিবরণ তো পরে দেওয়া হয়েছে। তার আগে নিবন্ধটির সূচনা করা হয়েছে এই বলে যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা ফেলে এক কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করা হয়েছে এবং তাদেরকে মৃত্যুর মুখ থেকে বের করে আনা হয়েছে। তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ বোমা না ফেলা হলে দীর্ঘদিন যুদ্ধ অব্যাহত থাকত এবং অনুমান করা যাচ্ছিল, তাতে অতিরিক্ত আরও এক কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটত। এভাবে অ্যাটম বোমার পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে, এটা এমন এক জিনিস যা এক কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছে। বস্তুত এভাবে সে বোমা ফেলাকে বৈধতা দানের চেষ্টা করা হয়েছে, যেটাকে সমগ্র বিশ্ব অভিশাপ দিয়েছে। এবং যে বোমার মাধ্যমে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে হাজার-হাজার শিশুর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পর্যন্ত ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ও অগণ্য নিরাপরাধ মানুষকে বিনাশ করা হয়েছে, তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এটা করা হয়েছে মানব-বুদ্ধিরই ছত্রচ্ছায়ায়।

সুতরাং এমন কোনও গুরুতর অপরাধ ও ঘৃণ্যতম কাজ নেই, যার স্বপক্ষে বুদ্ধি কোনও যুক্তি সরবরাহ করতে পারবে না।

আজ সমগ্র বিশ্ব ফ্যাসিজমকে অভিশাপ দিচ্ছে। হিটলার ও মুসোলিনি আজ রাজনীতির জগতে একটি গালিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আপনি তাদের দর্শনের প্রতি লক্ষ করে দেখুন না। তারা ফ্যাসিজমকে কেমন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পেশ করেছে! একজন সাধারণ বোধ-শোধসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি ফ্যাসিবাদের দর্শন পড়ে, তবে সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, কথাটার সারবত্তা তো বুঝে আসছে! এটা তো খুবই যৌক্তিক! কিন্তু তা কেন? এজন্য যে বুদ্ধি তাকে সে দিকে চালিত করছে। এভাবে দুনিয়ার যত নিকৃষ্টতম কাজই হোক, বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণের আলোকে তাকে সঠিক বলে স্বীকার করানো সম্ভব এবং সে চেষ্টা বিভিন্ন

সময়ে হয়েছে, হচ্ছে। এর কারণ কেবল এই যে, বুদ্ধিকে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা মূলত তার বিচরণ ক্ষেত্র নয়, যা তার ব্যবহারের জায়গা নয়।

বুদ্ধির দৃষ্টান্ত

'আল্লামা ইবন খালদূন ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। তিনি লেখেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে বুদ্ধি দিয়েছেন তা বড় উপকারী জিনিস। কিন্তু এটা উপকারী ততক্ষণই যতক্ষণ এটাকে তার নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে ব্যবহার করা হবে। তার বাইরে এটা কোনও কাজের জিনিস নয়। তিনি এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এর দৃষ্টান্ত হল সোনা মাপার নিক্তি। তা দ্বারা কয়েক গ্রাম সোনাই মাপা যায় এবং এ পর্যন্তই তার কাজ শেষ। একে তৈরিই করা হয়েছে সোনা মাপার জন্য। কেউ যদি তা দ্বারা বড় বড় পাথর মাপতে চায়, তবে মাপা তো কিছু হবেই না, উল্টো নিক্তিটি ভেঙে যাবে। এখন পাথর মাথার কারণে নিক্তি ভেঙে যায় দেখে কেউ যদি বলে, নিক্তি কোনও কাজের বস্তু নয়, যেহেতু তা দ্বারা পাথর মাপা যায় না, তবে সকলেই তাকে নির্বোধ ঠাওরাবে।

ব্যাপারটা মূলত এই যে, সে নিক্তিটির ভুল ব্যবহার করেছে আর এ কারণেই সেটি ভেঙে গেছে।[১১]

ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের পার্থক্য

ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল– বুদ্ধির সীমানা নির্ধারণগত। ইসলাম বলে, বুদ্ধিকে অবশ্যই ব্যবহার করো, কিন্তু সেই সীমানার ভেতর যেখানে তা কাজে আসে। এক পর্যায়ে এমন একটা সীমানা এসে যায়, যেখানে বুদ্ধি অচল, যেখানে তাকে ব্যবহার করলে সে ভুল উত্তর দেয়। ঠিক কম্পিউটারের মতো। কম্পিউটারকে যে কাজের জন্য বানানো হয়েছে, সে কাজে ব্যবহার করলে তো তা ঠিক ঠিক উত্তর

১১. ইবন খালদূন, মুকাদ্দিমা, ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ৪৪০

দেয়, কিন্তু যে বিষয় তাতে ফিড (Feed) করা হয়নি, তা জানতে চাওয়া হলে কম্পিউটার যে অক্ষমতা প্রকাশ করবে কেবল তাই নয়, বরং সে ভুল উত্তর দিতে শুরু করবে। ঠিক এ-রকমই বুদ্ধিতে যে বিষয় ফিড করা যায়নি, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তৃতীয় একটি জ্ঞানমাধ্যম তথা 'ওহী' দান করেছেন, বুদ্ধিকে তাতে ব্যবহার করলে বুদ্ধি ভুল উত্তর দিতে শুরু করবে। সেই ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্যই আল্লাহ তা'আলা যুগে-যুগে নবী-রাসূলগণের প্রতি ওহী নাযিল করেছেন। সেই ধারাতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাঁর প্রতি কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

'আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি কিতাব সত্যসহ, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে (সঠিক) ফয়সালা করতে পারেন।'[১২]

এ কুরআন আপনাকে জানাবে কোন্টা সত্য, কোনটা অসত্য, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক এবং কোনটা মঙ্গল, কোনটা অমঙ্গল। কেবল বুদ্ধি মারফত এসব বিষয় আপনার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

স্বাধীন চিন্তার ধ্বজাধারীদের অবস্থা

'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে, প্যারিসে যার সদর দপ্তর। আজ থেকে মাস খানেক আগে তার এক রিসার্স স্কলার সার্ভে করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান এসেছিল। আল্লাহ মালুম কেন জানি সে সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য আমার কাছেও আসল। সে আমার সাথে কথা শুরু করল এই বলে যে, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে আমরা কাজ করছি। বর্তমানে বহু লোক স্বাধীন চিন্তার কারণে জেলবন্দী হয়ে আছে। তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা দরকার। এটা এমনই একটা অবিসংবাদিত বিষয়, যে সম্পর্কে কারও দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

১২. সূরা নিসা, আয়াত ১০৫

এ সম্পর্কে পাকিস্তানের লোকজনের চিন্তা-ভাবনা কী, তা জানার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমি শুনেছি, বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের সাথে আপনার সম্পর্ক আছে। তাই আমি এ বিষয়ে আপনাকেও কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এ জরিপ কী উদ্দেশ্যে করছেন? সে বলল, আমি এ বিষয়ে পাকিস্তানের লোকজনের মতামত জানতে চাই। জিজ্ঞেস করলাম, পাকিস্তানে কবে এসেছেন? বলল, আজ ভোরে। আবার জিজ্ঞেস করলাম, ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা কবে? বলল, কাল ভোরে ইসলামাবাদ যাচ্ছি (তার সাথে কথা হচ্ছিল রাতে)। জিজ্ঞেস করলাম, ইসলামাবাদ কতদিন থাকবেন? বলল, এক দিন। আমি তাকে বললাম, আপনি এ বিষয়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্তরের মানুষ কী চিন্তা-ভাবনা করে তা জরিপ করতে চাচ্ছেন আর এজন্য আপনি পাকিস্তানের দু-তিনটি শহরে দু-তিন দিন অবস্থান করবেন, তারপর রিপোর্ট তৈরি করে জমা দেবেন, বলুন তো আপনার এ জরিপ কতটুকু পূর্ণাঙ্গ হবে? সে বলল, এটা তো পরিষ্কার যে, তিন দিনে সকলের মতামত জানা সম্ভব নয়? কিন্তু আমি বিভিন্ন স্তরের লোকদের সঙ্গে সাক্ষাত করছি। ইতোমধ্যে কারও কারও সাথে দেখাও হয়েছে। এখন আপনার কাছে এসেছি। আপনিও এ কাজে আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন বলে আশা রাখি। জিজ্ঞেস করলাম, আজ করাচিতে আপনি কতজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন? বলল, আমি পাঁচজনের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। ষষ্ঠ নম্বরে আপনার কাছে এসেছি। আমি বললাম, আপনি এই ছয়জনের সাক্ষাতকার নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করবেন যে, করাচিবাসী এই-এই মত পোষণ করে? ক্ষমা করবেন, আপনার এই জরিপের নিরপেক্ষতা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কেননা গবেষণামূলক রিপোর্ট ও জরিপের কাজ এভাবে হয় না। কাজেই আপনার কোনও প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পেক্ষে সম্ভব নয়। তখন সে অজুহাত দেখাতে লাগল যে, আমার হাতে বেশি সময় ছিল না। তাই মাত্র কয়েকজনের সঙ্গেই সাক্ষাত করতে পেরেছি। আমি বললাম, পর্যাপ্ত সময় হাতে না থাকলে এ জরিপের

দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? তথাপি সে এই বলে পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে, আপনার আপত্তি নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তবুও আপনি মেহেরবানী করে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন। অধম পুনরায় ওযর দেখালাম এবং আরয করলাম, আমার পক্ষে এরূপ কাঁচা ও অসম্পূর্ণ জরিপে কোনও রকম সাহায্য করা সম্ভব নয়। তবে আপনি অনুমতি দিলে আমি এ সংস্থা সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন করতে চাই। সে বলল, আমি তো এসেছিলাম আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য, অগত্যা আপনি যদি উত্তর দিতে নাই চান, তবে অবশ্যই আপনি আমাদের সংস্থা সম্পর্কে যা-ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পারেন।

আমি বললাম, আপনি বলেছেন, আপনি যে সংস্থাটির পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন, সেটি চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সার্বজনীন রূপ দিতে চায়। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, আপনাদের দৃষ্টিতে এ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অবাধ ও নিঃশর্ত (Absolute)? না কি এর জন্য কোনও শর্ত ও বন্ধন থাকা চাই? সে বলল, আমি আপনার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আমি বললাম, আমি বোঝাতে চাচ্ছি, চিন্তার স্বাধীনতার এ ধারণাটি কি এতটা অ্যাবসলুট যে, যার মনে যা আসে, তাই সে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে ও মানুষের মাঝে তা প্রচার করতে পারবে? মনে করুন, আমার চিন্তা এই কথা বলছে যে, বিত্তশালীদের কাছে বিপুল সম্পদ জমা হয়ে গেছে। কাজেই তাদের সম্পদ লুট করে নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা গরীবদের থাকা উচিত। তো আমি আমার এই চিন্তার কথা জনসমক্ষে প্রচার শুরু করে দিই এবং গরিবদের আহ্বান জানাই, তারা যেন ডাকাতি করে ধনীদের সম্পদ কেড়ে নেয় আর কেউ যেন তাদেরকে বাধা না দেয় কিংবা সরকার যেন তাদেরকে ধরপাকড় না করে। কেননা ধনীরা গরীবদের রক্ষ চুষেই সম্পদের পাহাড় গড়েছে। বলুন তো আপনি কি মত প্রকাশের এই স্বাধীনতাকে সমর্থন করবেন?

সে বলল, না-না, আমরা এটা সমর্থন করব না।

আমি বললাম, আমি এটাই স্পষ্ট করতে চাচ্ছি যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টা যখন সম্পূর্ণ অবাধ নয়, তখন আপনি কি স্বীকার করেন যে, এর জন্য কিছু বন্ধন ও শর্ত থাকা দরকার?

সে বলল, হ্যাঁ কিছু শর্ত তো থাকাই দরকার। যেমন আমার মত হল, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এতটা অবাধ হবে না, যদ্দরুন অন্যের উপর সহিংসতার সুযোগ তৈরি হয়। অর্থাৎ অন্যের উপর সহিংসতা (Violance) চালানো যাবে না– এই শর্ত অবশ্যই থাকতে হবে।

আমি বললাম, এ শর্ত তো আপনি নিজ চিন্তা মোতাবেক আরোপ করলেন, কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি বিচার-বিবেচনা করে এই রায় দেয় যে, কোনও কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সহিংসতা ছাড়া পূরণ করা যায় না, তাই তা পূরণের লক্ষ্যে সহিংসতার ক্ষয়-ক্ষতি মেনে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবে তার এ মতের স্বাধীনতাকে সম্মান দেখানো উচিত কি না? দ্বিতীয়ত মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আপনি যেমন নিজ চিন্তা অনুযায়ী একটি শর্তের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন, তেমনি অন্য কেউ যদি নিজ চিন্তা মোতাবেক এতে অন্য কোনও শর্ত আরোপ করে, তবে তার সে অধিকার থাকবে কি না। তা না থাকলে এর কী যুক্তি যে, আপনার চিন্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে আর অন্যের চিন্তা উপেক্ষিত হবে? সুতরাং এ স্থলে মূল কথা হল, এ স্বাধীনতাকে কোন্ কোন্ শর্তের সাথে আবদ্ধ করা হবে এবং সে ফয়সালা কে করবে? আপনাদের কাছে এমন কী মাপকাঠি আছে, যার ভিত্তিতে কোন্ শর্ত আরোপ করা যাবে এবং কোন্ শর্ত আরোপ করা যাবে না তা নিরূপণ করা হবে? আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও মাপকাঠি (Yardstick)-এর কথা বলুন, যার মাধ্যমে আপনি এ বিষয়টা নিরূপণ করতে পারবেন।

সে বলল, জনাব! মত প্রকাশের স্বাধীনতার এ দিকটি সম্পর্কে আমরা কখনও যথারীতি চিন্তা করিনি।

আমি বললাম, আপনি এত বড় আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জড়িত এবং এ কাজেরই জরিপ চালানোর জন্য আপনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে যথারীতি কাজে লেগে পড়েছেন, অথচ মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত এই বুনিয়াদী প্রশ্ন যে, এ স্বাধীনতার সীমারেখা কী হবে এবং এর পরিধি কতদূর বিস্তৃত হতে পারে, এ সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা নেই। আপনার কাছে এ বিষয়টা সুস্পষ্ট না থাকলে আমার ধারণা আপনার

এ প্রচেষ্টা সফল হওয়ার নয়। মেহেরবানী পূর্বক আপনি আপনাদের রচনাবলির মাধ্যমে কিংবা আপনাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর জানাবেন।

সে বলল, আমি আপনার এসব ভাবনা আমাদের সংস্থায় পৌছাব এবং এ বিষয়ে আমাদের যেসব লেখাজোখা আছে তা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। এই বলে সে আমাকে শুষ্ক একটু কৃতজ্ঞতা জানাল এবং দ্রুত বিদায় নিল।

আমি অদ্যাবধি তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী লিটারেচার বা নিজ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় আছি। আমি নিশ্চিত তারা কিয়ামত পর্যন্ত না প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, না এমন কোনও মাপকাঠি পেশ করতে পারবে, যার বিশ্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতা (Universally Applicable) থাকবে। কেননা আপনি একটি মাপকাঠি স্থির করলে অন্য কেউ আরেকটি স্থির করবে। আপনার মাপকঠি যেমন আপনার চিন্তা-ভাবনার ফসল, তারটিও তেমনি তার চিন্তা-ভাবনা দ্বারা স্থিরীকৃত। দুনিয়ায় কারও পক্ষেই এমন কোনও মাপকাঠি পেশ করা সম্ভব নয়, যা পূর্ণাঙ্গরূপে সারা বিশ্বের জন্য গ্রহণযোগ্য। আর এ দাবি আমি কোনওরূপ রদ-খরিজের ভয় ব্যতিরেকেই করতে পারি। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের কাছে ওহী ছাড়া এমন কোনও মাপকাঠি নেই, যা মানুষের এসব অমীমাংসিত ধারণা-ভাবনা কোনও সীমা পর্যন্ত তা স্থির করে দিতে পারে। আসলে আল্লাহ তা'আলার ওহী ও নির্দেশনা ছাড়া মানুষের কাছে কিছুই নেই।

কেবল ধর্মই ভালো-মন্দের মাপকাঠি হতে পারে

আপনি দর্শন বিষয়ক বইপত্র পড়ে দেখুন, তাতে 'নৈতিকতার সাথে আইনের কী সম্পর্ক'-এ বিষয়টা আলোচনায় এসেছে। এক শ্রেণির আইনজ্ঞ মনে করেন, নৈতিকতার সাথে আইনের কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের মতে ভালো-মন্দের ধারণাটাই গলত। মূলত কোনও জিনিস ভালোও নয় এবং কোনও জিনিস মন্দও নয়। তাঁরা বলেন, ঔচিত্য (Should), অনৌচিত্য (Should not), কর্তব্য (Ought) প্রভৃতি শব্দ

মূলত মানুষের ইন্দ্রিয়চাহিদা সৃষ্টি। নয়ত বাস্তবে এ জাতীয় ধারণা বলতে কিছু নেই। কাজেই যে সমাজ যখন যে নিয়ম অবলম্বন করে, তার জন্য তাই সঠিক। আমাদের কাছে ভালো-মন্দ নির্ণয়ের এমন কোনও মাপকাঠি নেই, যা বলে দেবে অমুক জিনিস ভালো, অমুকটি মন্দ। আইনের মূলনীতি সম্পর্কিত বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তক (Jurisprudence)-এর এ বিষয়ক আলোচনার শেষে লেখা হয়েছে।

'মানুষের কাছে এসব জিনিস নিরূপণ করার জন্য একটি জিনিস মাপকাঠি হতে পারত, আর তা হচ্ছে ধর্ম (Religion), কিন্তু ধর্মের সম্পর্ক যেহেতু মানুষের বিলিফ (Belif) ও বিশ্বাসের সাথে, অথচ সেক্যুলার জীবনব্যবস্থায় এর কোনও স্থান নেই, তাই আমরা একে একটি ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না।'

আরও একটি উদাহরণ মনে পড়ে গেল। একটু আগেই আমি আরয করেছিলাম, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সমকামিতা (Homo Sexuality)-এর বিল তুমুল করতালিযোগে পাস হয়েছিল। বিলটি পাস হওয়ার আগে প্রচণ্ড বাধাও এসেছিল, যে কারণে এটি পাস করা উচিত কি না সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার লক্ষ্যে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। পরে সে কমিটির মতামত প্রকাশ করা হয়। ফ্রাইডম্যান (Fridman)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি লিগ্যাল থিওরি' (The Legal Theory)-তে সে রিপোর্টের সারমর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এ কমিটি সম্পূর্ণ রিপোর্ট লেখার পর মন্তব্য করেছে,

'যদিও এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এ জিনিসটি ভালো বলে মনে হয় না, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে আইনের কোনও খবরদারি থাকবে না বলে একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেছে, তাই সে মূলনীতির আলোকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ (Sin) ও অপরাধ (Crime)-এর পার্থক্য আছে বলে স্বীকার করব এবং বলব যে, পাপ এক জিনিস, অপরাধ অন্য জিনিস, ততক্ষণ পর্যন্ত এ কাজে বাধা দেওয়ার কোনও প্রমাণ আমরা পেশ করতে পারব না। হ্যাঁ পাপ ও অপরাধকে যদি অভিন্ন

স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে অবশ্যই এ বিলে বিপক্ষে রায় দেওয়া যেতে পারে। এখন আর এ বিল রদ করার কোনও বৈধতা আমাদের কাছে নেই। সুতরাং এটি পাস হয়ে যাওয়াই উচিত।'

আমরা যখন বলি আইনকে ইসলামীকরণ করা হোক, তখন তার অর্থ এটাই যে, সেক্যুলার ব্যবস্থা জ্ঞান-মাধ্যম হিসেবে যে পঞ্চেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকেই অবলম্বন করেছে, তা থেকে সামনে বেড়ে ওহীকেও জ্ঞানমাধ্যম ও পথনির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হোক এবং একে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের মর্যাদা দেওয়া হোক।

ওহীর শুরুই হয় সেখান থেকে যেখানে পৌঁছে বুদ্ধির দৌড় শেষ হয়ে যায়–এ বিষয়টা বুঝে এসে গেলে কুরআন ও হাদীছে প্রদত্ত কোনও বিধানকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করা যে, জনাব এ বিধানের যুক্তি (Reason) তো আমার বুঝে আসছে না, এটা চরম মূঢ়তা ছাড়া আর কী? কারণ ওহীর বিধান এসেছেই তো সেই স্থলে, যেখানে যুক্তি-বুদ্ধি কাজ করছিল না। যুক্তি যদি কাজ দিত, তবে তো ওহী আসার প্রয়োজনই হতো না। কোনও বিধানের অন্তরালে যত রহস্য ও তাৎপর্য নিহিত থাকে, মানববুদ্ধি তা সব উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে ওহীর মাধ্যমে সে বিধান দেওয়ার কোনও দরকারই থাকে না।

কুরআন-হাদীছে সায়েন্স ও টেকনোলোজী

এর দ্বারা আরও একটি প্রশ্নের উত্তর হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষিত মহলে খুব বেশি বলতে শোনা যায়, জনাব! এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। সারা বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ কুরআন ও হাদীছ আমাদেরকে এ সংক্রান্ত কোনও ফর্মুলা জানাচ্ছে না। কিভাবে অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি বানাতে হয় তার কোনও সূত্র না কুরআনে পাওয়া যায়, না হাদীছে। এসব কথা শুনে কিছু লোক হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে পড়ে। তাদের আক্ষেপ, আহা! জগৎ তো চাঁদ ও মঙ্গলে পৌঁছে যাচ্ছে, অথচ আমাদের কুরআন আমাদেরকে জানাচ্ছে না কিভাবে আমরা চাঁদে পৌঁছতে পারি।

এর উত্তর হল, কুরআন তো এ বিষয়ে কিছু বলার কথাই নয়। কারণ এটা বুদ্ধির বলয়ভুক্ত জিনিস। এটা অভিজ্ঞতার জিনিস এবং এটা চেষ্টা ও সাধনার জিনিস। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টাকে ছেড়েই দিয়েছেন মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও প্রচেষ্টার উপর। যে ব্যক্তি যতটা চেষ্টা করবে এবং বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সে ততটাই অগ্রগামী হবে। কুরআন তো এসেছে সেই স্থানের জন্য, যেখানে বুদ্ধির দৌড় শেষ হয়ে যায়। বুদ্ধি দ্বারা যেসব জিনিস উপলব্ধি করা যায় না, কুরআন সেসব বিষয়ে আমাদেরকে সবক দান করেছে এবং সেসব বিষয়ে আমাদেরকে জ্ঞান সরবরাহ করেছে। সুতরাং 'আইনকে ইসলামীকরণ করা'-এর সারকথা এটাই যে, আমাদের সমগ্র জীবনকে ইসলামের অধীন বানিয়ে নিতে হবে।

ইসলামী বিধানাবলিতে যথেষ্ট স্থিতিস্থাপকতা আছে

উপরের কথাগুলো বুঝে এসে থাকলে এবার আরেকটি খটকার জবাব শুনুন। কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমরা চৌদ্দশ' বছরের পুরানো জীবন কিভাবে ফিরিয়ে আনব? এত দিনের প্রাচীন নীতিমালা এই একবিংশ শতাব্দীতে প্রয়োগ করা কি সম্ভব, যখন আমাদের প্রয়োজন নানা কিসিমের এবং তা অবিরাম বদলাচ্ছে। মূলত এ জাতীয় প্রশ্ন দেখা দেয় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক না থাকার কারণে। তাদের জানা নেই যে, ইসলাম তার বিধানাবলিকে তিন ভাগে ভাগ করছে।

(ক) এমন সব বিধান, যা কুরআন-সুন্নাহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে এসব বিধানে কোনও রদবদল করা যাবে না। এগুলো অপরিবর্তীত বিধান। কালের যতই বদল ঘটুক, এগুলো বদলানোর সুযোগ নেই।

(খ) এমন সব বিধান, যাতে ইজতিহাদের অবকাশ আছে। অর্থাৎ যেগুলো সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহে এমন সুস্পষ্ট ও সরাসরি নির্দেশনা নেই, যা সর্বকালে সর্বাবস্থায় প্রয়োগযোগ্য; বরং উম্মতের বিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ কুরআন-সুন্নাহয় প্রদত্ত মূলনীতির আলোকে সে সম্পর্কে

বিধানাবলি উদ্ভাবন করেন। এ জাতীয় ইসলামী বিধানে একরকম স্থিতি-স্থাপকতা (Elastiecty) বিদ্যমান রয়েছে, যদ্দরুন সর্বাবস্থায় এর প্রয়োগ সম্ভব।

(গ) এমন সব বিধান, যে সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছে, কোনও রকম দিক-নির্দেশনা প্রদান করেনি। কুরআন-সুন্নাহ সে সম্পর্কে কোনও রকম বিধান না দিয়ে, বরং বিষয়টাকে মানুষের বুদ্ধির উপর ছেড়ে দিয়েছে। এর পরিমণ্ডল এতটাই বিস্তৃত যে, প্রত্যেক যুগে মানুষ নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই শূন্য এলাকায় (Unoccupied) ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারে এবং পারে প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করতে।

বিধানাবলির দ্বিতীয় প্রকার, অর্থাৎ যাতে ইজতিহাদের ভূমিকা আছে, কালভেদে 'কারণ'-এর পরিবর্তনের ভিত্তিতে এসব বিধানেও পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু তা কখনও বদলাবে না। কেননা সেসব বিধানের ভিত্তি মূলত মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির উপর। যুগের অবস্থা বদলায়, কিন্তু মানব-স্বভাবে কখনও বদল ঘটে না। যেহেতু সেসব বিধানের ভিত্তি মানব-স্বভাবের উপর তাই তাও কখনও বদলানো যেতে পারে না।

মোদ্দাকথা শরী'আত আমাদেরকে যতদূর সুযোগ দিয়েছে, সেই সুযোগের পরিধির মধ্যে থেকে আমরা নিজেদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে পারি।

ইজতিহাদ কোথা থেকে শুরু হয়?

যেখানে কুরআন-সুন্নাহর কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশনা বা নাস্‌স নেই, ইজতিহাদের শুরু হয় সেখান থেকেই। যেখানে নাস্‌স আছে, সেখানে 'বুদ্ধি'-এর ব্যবহার করে নাস্‌স বিপরীত কথা বললে সেটা হবে নিজ কর্মপরিধি (Jurisdction) এর বাইরে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর। এর পরিণামে দ্বীনের ভেতর বিকৃতিসাধনের পথ খুলে যায়। আপনাদের সামনে এর একটি উদাহরণ পেশ করছি।

কুরআন মাজীদ শূকরকে হারাম করেছে। এটা ওহীর বিধান, এ স্থলে যদি বুদ্ধিকে ব্যবহার করা হয় এবং বলা হয়, জনাব, এটা হারাম হবে কেন? তবে এটা হবে বুদ্ধির অপব্যবহার। এই অপব্যবহার করেই কেউ কেউ এমনও বলেছে যে, সেকালে শূকর ছিল বড়ই নোংরা পশু। নোংরা পরিবেশে তা পালন করা হতো এবং মলমূত্র খেত। আধুনিককালে তো শূকরের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খামার (Hygenic) তৈরি করা হয়েছে এবং বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় তা পালন করা হচ্ছে। সুতরাং এখন সে বিধান রহিত হয়ে যাওয়া উচিত। এই হচ্ছে বুদ্ধির অন্যায় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। বুদ্ধি যেখানে কাজ করারই ক্ষমতা রাখে না, সেখানে তাকে এভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আরও একটি উদাহরণ নিন। সুদী লেনদেন হারাম। কুরআন মাজীদই এটা হারাম করেছে। কাজেই এটা চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গেছে। তা কারও বুঝে আসুক বা নাই আসুক। আরব মুশরিকদের এটা বুঝে আসত না। কুরআন মাজীদে তাদের মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে,

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا

'বেচা-কেনাও তো সুদেরই মতো জিনিস।'[১৩]

বেচা-কেনা ও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা মানুষ মুনাফা অর্জন করে। সুদ দ্বারাও মুনাফা অর্জিত হয়। কাজেই একটা হালাল অন্যটা হারাম হবে কেন? কুরআন মাজীদে এর উত্তর দিতে গিয়ে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়নি; বরং সাফ বলা হয়েছে,

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

'আল্লাহ তা'আলা বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।'[১৪]

সুতরাং এটা যখন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং করেছেন, তাই এ বিষয়ে তোমাদের কোনওরূপ ইতিউতি করার অবকাশ নেই। কেননা আল্লাহ

---

১৩. সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫

১৪. সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫

তা'আলা যখন বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন, ব্যস এটা হালাল আর সুদকে যখন তিনি হারাম করেছেন, তখন এটা হারাম। এখন এ বিষয়ে উঁ-আঁ করা বুদ্ধির অপব্যবহার করারই নামান্তর।

একটি মজার ঘটনা

প্রসিদ্ধ আছে। আমাদের হিন্দুস্তানী এক গায়ক একবার হজ্জ করতে গেল। হজ্জ আদায়ের পর মদীনা মুনাওয়ারা যাচ্ছিল। পথে বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতি দিতে হচ্ছিল। একবার এক জায়গায় রাত কাটানোর জন্য যখন যাত্রা বিরতি দেওয়া হল, তখন সেখানে এক আরব গায়ক হাজির হয়ে গেল। একদম বদ্দু কিসিমের আরব। এসেই সে গান গাওয়া শুরু করে দিল। তার সুর ছিল একেবারেই বাজে। আবার সারেঙ্গি ও তবলা বাজানোর নিয়ম-কানুনও জানত না। হিন্দুস্তানী গায়ক তার সে মহা বিরক্তিকর গান গাওয়া দেখে বলে উঠল, আজ আমার বুঝে এসেছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গান-বাদ্য কেন হারাম করেছেন। তিনি তো এই বদ্দুদেরই গান শুনেছিলেন। আমার গাওয়া শুনলে তিনি এটা হারাম করতেন না। বস্তুত এ ধরনের চিন্তা ও থিংকিং (Thinking) দিন দিন ডেভলপ (Develop) করছে। আবার এর নাম দেওয়া হচ্ছে ইজতিহাদ। আসলে এটা হল কুরআন-হাদীছের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিপরীতে নিজ খেয়াল-খুশীর প্রয়োগ।

আধুনিক এক চিন্তাবিদের ইজতিহাদ

আমাদের এ দেশে এক প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ আছে। চিন্তাবিদ বলছি এ কারণে যে, তিনি আপন ফিল্ডে (Field) একজন চিন্তাবিদ (Thinker) হিসেবেই বরিত। কুরআন মাজীদে বিধান দেওয়া হয়েছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا

'পুরুষ চোর ও নারী চোরের হাত কেটে দাও।'[১৫]

---

১৫. সূরা মায়িদা, আয়াত ৩৮

সেই চিন্তাবিদ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন, এখানে চোর দ্বারা পুঁজি মালিকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা বড়-বড় শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে, হাত দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাদের কারখানাসমূহকে (Industries) আর 'কাটা' দ্বারা বোঝানো হয়েছে জাতীয়করণ করা (Nationalization)। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, পুঁজিপতির সমস্ত মিল কারখানা জাতীয়করণ করা হোক এবং এভাবে তাদের চুরির পথ বন্ধ করে দেওয়া হোক।

এ জাতীয় ইজতিহাদ সম্পর্কে মরহুম ইকবাল বলেছিলেন,

ز اجتہادے عالمان کم نظر

اقتدا، با رفتگاں محفوظ تر

'এরকম লঘু দৃষ্টিসম্পন্নদের ইজতিহাদ অপেক্ষা প্রাচীনদের অনুসরণ করাই বেশি নিরাপদ।'

لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ اوازہ تجدید

مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ

'আমার তো ভয়, প্রাচ্যে এই সংস্কারের ধুয়ো ফিরিংগীদের অনুসরণ করারই একটা বাহানা।'

যাহোক, আজকের এ অধিবেশনে আমার এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবত আমি আমার প্রাপ্য এবং ওয়াদা অপেক্ষাও বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি। আমার বক্তব্যের সারমর্ম এটাই যে, ইসলামাইজেশন অব ল'য-'এর দর্শনটা যতক্ষণ পর্যন্ত মাথায় না থাকবে, ততক্ষণ কেবল 'ইসলামাইজেশন অব ল'য-' শব্দমালার আগাপাছতলা সাজানো দ্বারা কোনও কাজ হবে না।

خرد نے کہہ بھی دیالا الہ تو کیا حاصل

دل ونگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں

'অর্বাচীন যদি লা-ইলাহা বলে, লাভ কী তাতে? দিল ও দৃষ্টি মুসলিম না হলে সবই মিছে।'

সুতরাং ইসলামাইজেশনের পয়লা কদম হল পূর্ণ প্রত্যয়ের সাথে, সকল ওযর-অজুহাত ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, বুক উচিয়ে ও বজ্র নির্ঘোষে এই কথা বলতে পারা যে, মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ হল ইসলামাইজেশন। এছাড়া অন্য কোনও পথে মুক্তি নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এটা সত্যিকারভাবে বোঝার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

পূর্ণাঙ্গ ঈমানের চারটি আলামত*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ!

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ وَاَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهٗ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দেয়, আল্লাহরই জন্য কিছু দেওয়া হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহরই জন্য কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করে ফেলল।'[১৬]

যার মধ্যে এ চারটি গুণ আছে, এ হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

---

* ইসলাহী খুতবাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭-৪৮

১৬. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪৪৫; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪০৬১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৫০৬৪ [হযরত মু'আয ইবন জাবাল রাযি. বর্ণিত হাদীছসমষ্টির একটি]

পূর্ণাঙ্গ ঈমানের প্রথম আলামত

পূর্ণাঙ্গ ঈমানের প্রথম আলামত হল দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত থাকা। অর্থাৎ কেউ যদি কোনও ক্ষেত্রে অর্থব্যয় করে, তবে আল্লাহ তা'আলাকে খুশী করার উদ্দেশ্যেই তা করবে। মানুষের অর্থব্যয় বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। নিজের পেছনে ব্যয় করে, পরিবার-পরিজনের পেছনে ব্যয় করে এবং দান-সদাকাও করে। সকল ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য থাকবে কেবল আল্লাহ তা'আলাকে খুশী করা। দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে তো বিষয়টা স্পষ্ট। দাতা যখন দেবে, নিয়ত করবে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে খুশী করার জন্যই এ দান করছি। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাকে যেন এর ছাওয়াব দেন। উদ্দেশ্য অন্যকে খোঁটা দেওয়া হবে না, কিংবা লোক দেখানো ও নাম কুড়ানোও না। এরূপ দানই আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে।

বেচা-কেনার সময় কী নিয়ত থাকবে?

দান-খয়রাত ছাড়াও যে ক্ষেত্রেই অর্থ ব্যয় করা হবে, সেখানেই আল্লাহ তা'আলাকে খুশী করার নিয়ত থাকা চাই। আপনি কোনও দ্রব্য কিনে বিক্রেতাকে দাম পরিশোধ করলেন। বাহ্যত এটা একটা পার্থিব বিষয়। কিন্তু সে দ্রব্য হয়তো কোনও খাদ্যবস্তু, কেনার সময় যদি নিয়ত করা হয়, আল্লাহ তা'আলা পরিবারবর্গের যে হক আমার উপর ধার্য করেছেন, তা আদায়ার্থেই আমি এটা কিনছি, এমনিভাবে যদি নিয়ত করা হয়, আমি বিক্রেতার সাথে বেচা-কেনার যে কারবার করছি, তাতে আমি আল্লাহপ্রদত্ত হালাল পন্থার অনুসরণ করতে চাই এবং যা তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বাঁচতে চাই, তবে এই ক্রয় ও বিক্রেতাকে অর্থদান আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে। যদিও বাহ্যত মনে হচ্ছে, আপনি একটি দুনিয়াবী লেনদেন করেছেন। গোশ্‌ত কিনেছেন কিংবা কাপড়, তরি-তরকারি ইত্যাদি কিনেছেন এবং তা দ্বারা পার্থিব প্রয়োজন সমাধা করেছেন। কিন্তু নিয়তের কারণে পার্থিব এই কাজও আল্লাহ তা'আলার জন্যই হয়েছে বলে গণ্য হবে।

চাই দৃষ্টিকোণের বদল

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু) বলতেন, দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে পার্থক্য হল কেবল দৃষ্টিকোণগত। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলে এই দুনিয়াই তোমার জন্য দ্বীন হয়ে যাবে। এর তরিকা হচ্ছে, তুমি দুনিয়ার ঘুম, জাগরণ, ওঠা-বসা, খাওয়া-পরা ইত্যাদি যা-কিছুই করবে, দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু পাল্টে করো। উদাহরণত খানা খাওয়ার কাজটি একটি পার্থিব কাজ। এই পার্থিব কাজটিই এই চিন্তার সাথে করো যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

'নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার নিজ সত্তারও হক আছে।'[১৭]

অর্থাৎ এই হক আদায়ের জন্য আমি খাচ্ছি। এমনিভাবে চিন্তা করো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খাবার আসলে তিনি আল্লাহ তা'আলার নি'আমত মনে করে তা খেতেন ও আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতেন। আমিও সেই সুন্নাতের অনুসরণার্থে খাবার খাচ্ছি। এর ফলে এই পার্থিব কাজটিই দ্বীনের কাজে পরিণত হবে। সুতরাং আমরা পার্থিব ব্যাপার মনে করি এমন যাবতীয় কাজই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দ্বীনী কাজ হয়ে যেতে পারে। এমন একটি কাজও নেই, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দ্বারা যা দ্বীনী কাজে পরিণত হবে না এবং তা আল্লাহর জন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাপিত জীবনে যত কাজ করা হয়, তার প্রত্যেকটিকেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দ্বারা আমরা দ্বীনী কাজে রূপান্তরিত করতে পারি।

প্রতিটি নেক কাজ সদাকা

মানুষ মনে করে কোনও অভাবগ্রস্তকে টাকা-পয়সা দেওয়া বা কোনও গরীব লোককে অন্নদান করাই সদাকা। এছাড়া আর কোনও কাজ সদাকা নয়। আসল ব্যাপার তা নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১৭. বুখারী, হাদীছ নং ১৭৩২; তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৩৩৭; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১১৬২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৬৫৮৩

ইরশাদ করেছেন, 'ভালো নিয়তে করা প্রতিটি নেক কাজই সদাকা।'[১৮] এমনকি তিনি বলেন, লোকে তার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দেয় সেটাও সদাকা।[১৯] এটা সদাকা হওয়ার কারণ, সে এটা করছে এই নিয়তে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর এ হক আরোপ করেছেন। আমি সেই হক আদায়ের লক্ষ্যেই এটা করছি, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর বিনিময়ে ছাওয়াব দান করেন। এরকম নিয়তের কারণেই এসব কাজ আল্লাহ তা'আলার জন্য করার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পূর্ণাঙ্গ ঈমানের দ্বিতীয় আলামত

দ্বিতীয় আলামত বলা হয়েছে, কাউকে কিছু দেওয়া হতে বিরত থাকলে আল্লাহ তা'আলারই জন্য বিরত থাকা। অর্থাৎ কোনও ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা দিতে না চাইলে সে দিতে না চাওয়াটাও আল্লাহ তা'আলারই জন্য হতে হবে। চিন্তা করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপব্যয় করতে নিষেধ করেছেন। সেই নিষেধ পালনার্থেই আমি টাকা-পয়সা দিচ্ছি না। তো এই না দেওয়াটা আল্লাহ তা'আলারই জন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে কেউ যদি আপনার কাছে এমন কোনও কাজে সহযোগিতার জন্য টাকা-পয়সা চায়, যে কাজ শরী'আতে নিষিদ্ধ, আর আপনি এই চিন্তা করে তা না দেন যে, এটা শরী'আতে নিষিদ্ধ, তবে এই না দেওয়াটা আল্লাহ তা'আলারই জন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে।

রসম-রেওয়াজ পালনের জন্য উপহার দেওয়া

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের রসম ও প্রথা আছে। সেসব রসমে উপহারাদি দেওয়ার নিয়ম এবং সেটাও সেই রসমের অংশ। উপহার না দিলে নাক কাটা যায়। এসব রসম শরী'আতের অংশ নয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এসব ক্ষেত্রে উপহার দেওয়ার আদেশ করেননি।

---

১৮. বুখারী, হাদীছ নং ৫৫৬২; মুসলিম, হাদীছ নং ১৬৭৩; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৮৯৩

১৯. বুখারী, হাদীছ নং ৫৪; দারিমী, হাদীছ নং ৩০৬৫

উদাহরণত বিয়ে-শাদিতে যেসব উপহার দেওয়া হয়, বর্তমানকালে তা এমনই এক অপরিহার্য প্রথায় পরিণত হয়েছে যে, টাকা-পয়সা না থাকলেও তা দিতে হবে। চাই ঋণ করে দাও। হারাম উপার্জন করে দাও, অন্যের থেকে ঘুষ নিয়ে দাও। দিতে মোটকথা হবেই। না দিলে সমাজে মুখ দেখানো দায় হবে। এখন এক ব্যক্তির পকেটে টাকা আছে, সমাজের পক্ষ থেকে প্রথা পালনের চাপও আছে, কিন্তু সেই ব্যক্তি মনে করছে এটা শরী'আতের হুকুম নয়, কাজেই নাক কাটা যায় যাক, আমি এ প্রথা পালন করব না। তাতে আমার আল্লাহ খুশী হবেন। তো এই ব্যক্তির না দেওয়াটা আল্লাহ তা'আলারই জন্য হবে। এটাও কামেল ঈমানের আলামত।

পূর্ণাঙ্গ ঈমানের তৃতীয় আলামত

তৃতীয় আলামত বলা হয়েছে, কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহ তা'আলারই জন্য ভালোবাসা। দেখুন একটা ভালোবাসা তো এমন, যা নিঃসন্দেহে কেবল আল্লাহ তা'আলারই জন্য হয়, যেমন কোনও আল্লাহওয়ালাকে ভালোবাসা। তাকে কেউ ভালো তো এজন্য বাসে না যে, তার ফলে টাকা-পয়সা লাভ হবে। বরং তাকে ভালোবাসা হয় কেবল দ্বীনের খাতিরে। অর্থাৎ তাকে ভালোবাসলে ও তার সাথে সম্পর্ক রাখলে দ্বীনী উপকার হবে এবং আল্লাহ তা'আলা খুশী হবেন। এই ভালোবাসা আল্লাহরই জন্য। এটা খুবই উপকারী কাজ। এর বরকত অশেষ।

পার্থিব স্বার্থে আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক

অনেক সময় শয়তান ও নফস এই ভালোবাসার ক্ষেত্রেও মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে। যেমন আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকালে শয়তান অন্তরে এই বদ নিয়ত উস্‌কে দেয় যে, তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে দুনিয়াদারদের চোখে আমার মান-মর্যাদা বেড়ে যাবে, নাউযুবিল্লাহ। কিংবা লোকে বলবে, এই ব্যক্তি অমুক বুযুর্গের খাস লোক। এর ফলে যে ভালোবাসা কেবল আল্লাহ তা'আলারই জন্য হওয়ার কথা ছিল, তা আর তাঁর জন্য থাকে না; বরং সে ভালোবাসা দুনিয়াদারীর

মাধ্যম বনে যায়। অনেকে কোনও আল্লাহওয়ালার সাথে মহব্বত রাখে তাঁর কাছে বিভিন্ন স্তরের লোকের যাতায়াত দেখে। তারা দেখে, তাঁর কাছে উচ্চপদস্থ লোক আসে, ক্ষমতাবান লোক আসে এবং বড়-বড় ধনীও আসে। ওই বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে তাদের সাথেও আমার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে তাদের দ্বারা আমার বিভিন্ন প্রয়োজন ও স্বার্থ পূরণ করা যাবে। এভাবে যে মহব্বত খালেস আল্লাহ তা'আলার জন্য হওয়া উচিত ছিল, তা পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের মাধ্যম বনে গেল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনও ওলী, উস্তায বা শায়খের কাছে দ্বীন হাসিলের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে, তবে এ মহব্বত খালেস আল্লাহ তা'আলারই জন্য এবং তা اَلْحُبُّ فِي اللهِ 'আল্লাহর জন্য ভালোবাসা'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ভালোবাসার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনেক বড় ছাওয়াব ও পুরস্কারের ওয়াদা রয়েছে।

পার্থিব ভালোবাসাও আল্লাহরই জন্য হওয়া উচিত

কিন্তু এ মহব্বত ছাড়াও পার্থিব যেসব ভালোবাসা আছে, যেমন মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা, ভাই-বোনের প্রতি ভালোবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি, সামান্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দ্বারা এগুলোও আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় পরিণত হতে পারে। উদাহরণত কোনও ব্যক্তি যদি পিতা-মাতাকে এই জন্য ভালোবাসে যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতাকে ভালোবাসতে আদেশ করেছেন, এমনকি বলেছেন, কেউ মহব্বতের সাথে পিতা-মাতার দিকে তাকালে আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি হজ্জ ও একটি উমরার ছাওয়াব দান করেন, তবে আপাতদৃষ্টিতে যদিও সে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে ভালোবাসছে নিজ স্বভাবের চাহিদায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ভালোবাসাও আল্লাহরই জন্য ভালোবাসা বলে গণ্য হবে।

মানুষ নিজ স্ত্রীকে ভালোবাসে। বাহ্যত এ ভালোবাসা স্বভাবজাত। কিন্তু এ ভালোবাসার সাথে বিশুদ্ধ নিয়ত যোগ হলেই এটা আল্লাহর জন্য

ভালোবাসা হয়ে যায়। অর্থাৎ চিন্তা করা হবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীকে ভালোবাসতে হুকুম করেছেন। আমি সেই হুকুম পালন ও সুন্নতের অনুসরণার্থে স্ত্রীকে ভালোবাসছি। এই চিন্তা ও নিয়তের ফলে এ ভালোবাসা আল্লাহর জন্য হয়ে গেল। এখন কোনও ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্য আর অন্য ব্যক্তি ভালোবাসে নিজ স্বভাবের চাহিদায়, তবে আপাতদৃষ্টিতে উভয় ভালোবাসা একই মনে হবে, বিশেষ কোনও পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় ভালোবাসার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বিভিন্ন হাদীছে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পত্নীগণকে গভীর ভালোবাসতেন। সর্বদা তাদের মনোরঞ্জণের প্রতি খেয়াল রাখতেন। তাদের সঙ্গে বিনোদনমূলক এমন আচরণও তিনি করতেন, যা অনেক সময় আমাদের মতো লোকদের কাছে বিস্ময়কর মনে হবে। যেমন হাদীছ শরীফে আছে, তিনি একবার হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে এগারো নারীর গল্প শুনিয়েছিলেন। যে গল্পে এগারোজন নারী এক মজলিসে একত্র হয়ে পরস্পরে কথা দিয়েছিল, প্রত্যেকে আপন-আপন স্বামীর চরিত্র বর্ণনা করবে, কিছু গোপন করবে না। তারপর একেকজন করে তাদের প্রত্যেকে আপন-আপন স্বামীর চরিত্র বর্ণনা করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পূর্ণ গল্পটি প্রিয়তমা স্ত্রীকে শুনিয়েছিলেন। চিন্তা করুন তো। যেই মহান সত্তার উপর ওহী নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে যার সার্বক্ষণিকের সম্পর্ক, তিনি কি না স্ত্রীকে এগারো নারীর গল্প শোনাচ্ছেন! কী অপূর্ব! অভাবনীয়! কেবল কি এতটুকুই? হাদীছ শরীফে আছে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যাচ্ছিলেন। পথে একটি খোলা মাঠ চোখে পড়ল। কোনও লোকজন ছিল না। সেই সুযোগে তিনি উম্মুল-মুমিনীনকে বললেন, এসো দৌড় দিই? উম্মুল-মুমিনীন সম্মতি জানালেন। সুতরাং তাঁরা পরস্পরে সেই মাঠে দৌড় প্রতিযোগিতা করলেন।[২০] এভাবেই তিনি স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফুর্তি করতেন। বাহ্যত এটি এমন

---

২০. সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২২১৪

কাজ, আল্লাহ তা'আলার সাথে বা তাঁর ইবাদতের সাথে যার কোনও সম্পর্ক নজরে আসে না। এমনিভাবে আমাদের মধ্যকার কেউ স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য এ জাতীয় কোনও বিনোদনমূলক কাজ করলে আপাতদৃষ্টে সেটাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই কাজের মতই মনে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় কাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমরা তো এরূপ কাজ করি নিজ মনের চাহিদা ও প্রবৃত্তির তাড়নায়। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সমুচ্চ আসন থেকে নিচে নেমে এ জাতীয় কাজ করতেন 'স্ত্রীর মনোরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য রেখো'– আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম পালনার্থে।

'আরেফ' কে?

'আরেফ' অর্থ পরিচয়লাভকারী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ করেছে এবং শরী'আত ও তরীকত (আল্লাহকে পাওয়ার পথ) সম্পর্কে অবগত হয়েছে। সূফী-সাধকগণ বলেছেন, আরেফের মধ্যে বিপ্রতীপ গুণের সমাবেশ ঘটে। অর্থাৎ তার মধ্যে এমন-এমন কাজ ও আচরণ পরিদৃষ্ট হয়, যা বাহ্য দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী। যেমন একদিকে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তার সম্পর্ক মজবুত থাকে, সর্বদা তাঁর অন্তরে আল্লাহর যিকির ও তাঁর স্মরণ জাগ্রত থাকে, তাঁর ধ্যান ও তাঁর প্রেমে অন্তর পরিপূর্ণ থাকে, অন্যদিকে তিনি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা বজায় রাখেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেন, হাসেন, রসিকতা করেন এবং খাওয়া-দাওয়াও করেন। কাজেই এরূপ ব্যক্তি যতসব বিপ্রতীপের সমষ্টি হয়ে থাকেন।

পথের শুরুতে যে আছে, আর যে গন্তব্যে পৌছে গেছে তাদের মধ্যকার পার্থক্য

এমনিভাবে সূফীগণ বলেন, মুবতাদী অর্থাৎ যে ব্যক্তি তরীকতের পথে চলতে কেবল শুরু করেছে আর মুনতাহী (যে ব্যক্তি পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছে গেছে), এ উভয়ের বাহ্য অবস্থা একই রকম হয়ে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে উভয়কে একই রকম মনে হয়। আর যে ব্যক্তি

মাঝপথে থাকে, তার অবস্থা আলাদা বোঝা যায়। মনে করুন এক ব্যক্তি আমাদেরই মতো মুবতাদী। সে দ্বীনের পথে কেবল চলতে শুরু করেছে। সে দুনিয়ার সব কাজই করে। যথারীতি পানাহর করে, কথা বলে, হাসে, আনন্দ করে, হাট-বাজারে যায় এবং স্ত্রী ও সন্তানের সাথে আমোদ করে। অপরদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখুন। তিনিও বাজারে বেচা-কেনা করেছেন। শ্রমিকের মতো কাজ করেছেন এবং স্ত্রী ও বাচ্চাদের সাথে আমোদ-ফুর্তি করেছেন। তিনি তো ছিলেন মুনতাহী। আপাতদৃষ্টিতে মুবতাদী ও তাঁর অবস্থা একইরকম মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আবার তৃতীয় একজন মাঝপথে আছে। যে মুবাতাদীকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেছে, কিন্তু গন্তব্যে পৌছায়নি। তার অবস্থা হয় অন্যরকম। সে বাজারে যায় না। স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে হাসি-তামাশা করে না। সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার স্মরণে নিমগ্ন ও সমাহিত থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার অন্য কোনও চিন্তা অন্য কোনও কাজ থাকে না। এই হচ্ছে মাঝ-পথিকের অবস্থা।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনও ব্যক্তির অবস্থা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, মনে করুন একটি নদী, যার এপারে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। আরেক ব্যক্তি নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে দাঁড়ানো। আরেকজন আছে মাঝ-নদীতে। সে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করছে আর সেজন্য হাত-পা চালিয়ে কসরত করছে। তো যে ব্যক্তি এপারে আছে আর যে ব্যক্তি পার হয়ে ওপারে চলে গেছে, দৃশ্যত উভয়কে একইরকম মনে হয়। এই জনও তীরে দাঁড়ানো আছে, ওই জনও তীরে দাঁড়ানো। কিন্তু এপারে যে ব্যক্তি দাঁড়ানো, সে এখনও পর্যন্ত নদীতে নামেইনি। নদীর তরঙ্গরাশি কেটে ওপারে যাওয়ার যে ঝুঁকি সে এখনও তার সম্মুখীন হয়নি। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি ওপারে দাঁড়ানো, সেসব ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নদীতে নেমেছে এবং ঢেউ ঠেলে ওপারে গিয়ে পৌছেছে। তৃতীয় ব্যক্তি এখনও নদীতে সাতার কাটছে এবং তরঙ্গমালার সাথে লড়াই করে ওপারে পৌছারও চেষ্টা

করছে। মনে তো হচ্ছে এই তৃতীয়জন অনেক বড় বীরপুরুষ। কিভাবে ঢেউয়ের সাথে খেলছে, ঝড়-বাদলের মুকাবিলা করছে। কিন্তু প্রকৃত বাহাদুর তো সেইজন, যে তরঙ্গমালা ও ঝড়-বাদল মুকাবিলা করে নদীর ওপারে পৌঁছে গেছে এবং পরিশেষে তার অবস্থা ওই ব্যক্তি সদৃশ হয়ে গেছে, যে এখনও নদীতে নামেইনি। এ কারণেই মুবতাদী ও মুনতাহীর অবস্থা একই রকম মনে হয়, যদিও উভয়ের মধ্যে আসমান-যমীন প্রভেদ।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা অনুশীলন দ্বারা অর্জন করতে হয়

পার্থিব ভালোবাসাও যাতে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, এজন্য মানুষের কিছুটা সাধনা ও অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। কেউ যখন বুযুর্গানে দ্বীন ও সূফিয়ায়ে কেরামের কাছে নিজের ইসলাহ করানোর জন্য যায়, তখন তারা এ দিকে নজর দেন। তারা চেষ্টা করেন যাতে সংশোধনকামীর এসব ভালোবাসা আপন স্থানে ঠিক থাকে, কিন্তু দৃষ্টিকোণ বদলে যায়, অর্থাৎ যাদেরকে ভালোবাসছে, ভালো তো তাদের বাসতে থাকবে, কিন্তু সে ভালোবাসা হবে আল্লাহর জন্য।

আমাদের হযরত ডাক্তার 'আব্দুল হাই রহ. বলতেন, আমি এ মহব্বত পরিবর্তনের জন্য বছরের পর বছর সাধনা করেছি। পরিশেষে সফলতা লাভ হয়েছে। চেষ্টা করেছি এভাবে, খাবার সময়ে ঘরে ঢুকেছি, পেটে খিদেও আছে। সামনে খাবার এসে গেছে। মন চাচ্ছে তাড়াতাড়ি খাওয়া শুরু করে দিতে। কিন্তু আমি ক্ষণিকের জন্য ক্ষান্ত হলাম এবং মনে মনে চিন্তা করলাম, মনের চাহিদা হয়েছে বলেই খাব তা নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার হুকুম মনে করে খাব। তিনি আমার উপর আমার নিজেরও হক ধার্য করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যখন সামনে খাবার আসত, তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে এবং খাদ্যের প্রতি নিজের মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে তা খেতেন। আমাকে তাঁর সে সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং আমি তাঁর অনুসরণার্থে খাবার খাব। তারপর খাওয়া শুরু করতাম। এভাবে আমি দৃষ্টিকোণ বদলে ফেলেছিলাম।

সন্তানের প্রতি ভালোবাসাও হতে হবে আল্লাহর জন্য

এমনিভাবে ঘরে ঢুকে হয়তো দেখলাম বাচ্চা খেলছে। বাচ্চার খেলা দেখে ভালো লাগল, নয়ন জুড়াল। তো মন চাইল তাকে কোলে নিয়ে আদর করি। আমিও তার সাথে খেলি। কিন্তু মুহূর্তের জন্য থেমে গেলাম। চিন্তা করলাম, মনের চাহিদা হয়েছে বলেই ওকে আদর করব তা নয়; বরং এটা করব সুন্নাতের অনুসরণার্থে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদেরকে আদর করতেন। এটা তাঁর সুন্নাত।

একবার জুমু'আর দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময় হযরত হাসান রাযি. আছড়ে পিছড়ে এসে মসজিদে পৌছে গেলেন। প্রিয় নাতিকে এভাবে আসতে দেখে তিনি দ্রুত মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন এবং তাকে কোলে তুলে নিলেন।[২১]

একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল পড়ছিলেন। তখন (নাত্নী) উমামা রাযি.[২২] এসে তাঁর কাঁধে চড়লেন। তিনি (এ অবস্থায়ই নামায পড়তে থাকলেন।) যখন রুকূতে যেতেন আস্তে করে তাকে নামিয়ে দিতেন এবং যখন সিজদায় যেতেন ফের এসে সওয়ার হয়ে যেতেন।[২৩]

মোদ্দাকথা, শিশুদের সাথে খেলা করা, তাদেরকে আদর-সোহাগ করা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। সেই সুন্নাতের অনুসরণার্থেই আমি শিশুকে আদর করব, তার সাথে খেলা করব। এভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আমি তাকে কোলে নিলাম ও আদর করলাম। প্রথম দিকে তো এটা করতে বেগ পেতে হবে, কষ্ট হবে। কিন্তু অবিরাম করতে থাকলে, একসময় অভ্যাস হয়ে যাবে এবং স্বভাবে পরিণত হয়ে যাবে। একেক করে এভাবে চেষ্টা করতে থাকলে এক পর্যায়ে সব রকম

---

২১. হায়াতুস-সাহাবা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬১৩

২২. হযরত উমামা ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা হযরত যয়নাব রাযি.-এর মেয়ে।

২৩. বুখারী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৮৭; তাবাকাতে ইবন সা'দ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩৯

ভালোবাসাই আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। তা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হোক কিংবা পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির প্রতি।

প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টিকোণ বদলের এ ব্যবস্থাপত্র খুবই সহজ। যে-কোনও কাজ করবে এভাবে নিয়ত পরিবর্তন করে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে নিয়ে করতে থাকবে। এর চেয়ে সহজ ব্যবস্থা আর কী হতে পারে? তবে এই সহজ ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কাজ করা তখনই সম্ভব হয়ে উঠবে, যখন মানুষ এর জন্য খানিকটা চেষ্টা ও সাধনা করবে এবং প্রতি কদমে এর অনুশীলন করবে। পরিশেষে একটা সময় আসবে, যখন সমস্ত ভালোবাসা আল্লাহরই জন্য হয়ে যাবে।

ভালোবাসা আল্লাহরই জন্য হওয়ার আলামত

এখন দেখার বিষয় হল ভালোবাসা ঠিক আল্লাহরই জন্য হচ্ছে কি না। এজন্য এর আলামত জেনে নেওয়া দরকার। আলামত এই যে, ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার দাবিতে এই পার্থিব ভালোবাসা ত্যাগেরও প্রয়োজন হতে পারে, তখন যদি এই ভালোবাসা ত্যাগে অসহনীয় রকমের কষ্ট না হয়, তবে বোঝা যাবে সে ভালোবাসা আল্লাহর জন্য ছিল।

হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার তিনি মজলিসের লোকদেরকে বললেন, আজ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় নিজের পরীক্ষা নেওয়ার এক দারুণ সুযোগ এসে গেল। ঘরে যাওয়ার পর স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এক পর্যায়ে তিনি রূঢ় ভাষায় আমাকে কিছু বললেন। তখন আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, দেখো, এ জাতীয় উচ্চারণ আমার সহ্য নয়। তুমি বললে আমি আমার চৌকি খানকায় নিয়ে যাব এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব, কিন্তু তোমার এরকম ভাষা আমার পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব নয়। তাকে বলে তো দিলাম এ কথা, কিন্তু পরক্ষণেই আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। নিজেকে সমীক্ষা করলাম। বললাম, এই যে তুমি বললে চৌকি তুলে খানকায় ফেলব এবং বাকি জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেব, তা এটা করার ক্ষমতা আদৌ কি তোমার

আছে? স্ত্রী যদি বলে, ঠিক আছে তাই হোক, তবে কি তুমি করবে? পারবে কি বাকি জীবন খানকার ভেতর কাটিয়ে দিতে? না কি মিথ্যা দাবি করলে? বিচার-বিবেচনা করার পর মনে হল আলহামদুলিল্লাহ আমি এটা করতে সক্ষম। কেননা সব রকম মহব্বত যেহেতু আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়ে গেছে, তাই এখন আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের খাতিরে অন্য কোনও মহব্বত ত্যাগ করতে হলে তা করতে পারব ইনশাআল্লাহ। এবং মনে তাতে অসহ্য রকমের চাপ পড়বে না। কারণ সে মহব্বত তো আল্লাহর মহব্বতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

তবে এ অবস্থা খুব সহজে অর্জিত হয় না। এর জন্য সাধনা ও মেহনত করতে হয়। সাধনা ও অনুশীলন অসম্ভব কোনও ব্যাপার নয়। যে-কোনও ব্যক্তির পক্ষেই তা সম্ভব। এবং তা করতে থাকলে একসময় আল্লাহ তা'আলা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন। বস্তুত এটা বলে বোঝানোর নয়; বরং করে দেখার জিনিস। এ সবগুলো أحب لله 'আল্লাহর জন্য মুহাব্বাত করবে'-এর অন্তর্ভূক্ত।

পূর্ণাঙ্গ ঈমানের চতুর্থ আলামত

চতুর্থ আলামত হল ক্রোধ ও বিদ্বেষ আল্লাহরই জন্য হওয়া। অর্থাৎ কারও উপর রাগ ও বিদ্বেষ দেখা দিলে সেটা তার ব্যক্তিসত্তার উপর না হয়ে তার কোনও মন্দ কাজ ও এমন আচরণের উপর হতে হবে, যা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ। এরূপ ক্রোধ ও বিদ্বেষ আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়েছে বলেই গণ্য হবে।

বুযুর্গানে দ্বীন একটি কথা বলেছেন, যা অতি মূল্যবান এবং চির স্মরণীয়। তারা বলেন, বিদ্বেষ ও ঘৃণা কাফের ব্যক্তির উপর নয়; বরং তার কুফ্‌রীর উপর, ফাসেক ব্যক্তির উপর নয়, তার ফাসেকীর উপর, গুনাহগার ব্যক্তির উপর নয়, তার গুনাহের উপর হওয়া চাই। যে ব্যক্তি কুফ্‌র, ফিস্‌ক ও পাপাচারে লিপ্ত, তার ব্যক্তিসত্তা ক্রোধ ও ঘৃণার পাত্র নয়, ঘৃণার পাত্র হচ্ছে তার কর্ম। তার ব্যক্তিসত্তা তো করুণাযোগ্য। সে বেচারা অসুস্থ। যে কুফ্‌রীর রোগে আক্রান্ত, ফিসকের রোগে আক্রান্ত।

রোগীর প্রতি কেন ঘৃণা হবে? ঘৃণা হতে পারে রোগের প্রতি। রোগীকে ঘৃণা করলে কে তার দেখাশোনা করবে? কে তার পরিচর্যা করবে? কাজেই ঘৃণা হবে ফিস্‌ক ও কুফ্‌রীর প্রতি, তার ব্যক্তিসত্তার উপর নয়। এ কারণেই তো তার ব্যক্তিসত্তা যদি কুফ্‌র ও ফিস্‌ক পরিত্যাগ করে, তবে সে আলিঙ্গন করার, বুকে জড়ানোর উপযুক্ত হয়ে যায়। যেহেতু ব্যক্তিসত্তা হিসেবে তার প্রতি কোনও বিদ্বেষ ও শত্রুতা নেই।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি দেখুন। তাঁর মহান চাচা হযরত হামযা রাযি.-এর কলিজা বের করে যেই নারী চিবিয়েছিল, সেই হিন্‌দা রাযি. ও যেই ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করে কল্‌জে চাবানোর সুযোগ করে দিয়েছিল, সেই ওয়াহশী রাযি. যখন ঈমান আনলেন ও ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করলেন, তখন তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামী বোন ও ইসলামী ভাই হয়ে গেলেন। আজ শ্রদ্ধার সাথে তাদের নাম উচ্চারণ করতে হয়। বলতে হয় হযরত ওয়াহশী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। হযরত হিনদা রাযিয়াল্লাহু আনহা। মূল ব্যাপার তো এই যে, তাদের ব্যক্তিসত্তার প্রতি কোনও ঘৃণা ছিল না; ঘৃণা ছিল তাদের কর্ম ও তাদের বিশ্বাসের প্রতি। যখন তারা তওবা করে নিলেন, নিজের কর্ম ও বিশ্বাসকে শুধরে নিলেন এবং তাদের মন্দ কর্ম ও মন্দ বিশ্বাস দূর হয়ে গেল, তখন আর তাদের সাথে ঘৃণা ও শত্রুতার কোনও প্রশ্নই থাকল না।

খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া রহ.-এর ঘটনা

ওলী-বুযুর্গদের মধ্যে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া রহ.-এর স্থান অনেক উঁচুতে। তার আমলে হাকীম যিয়াউদ্দীন রহ. নামে একজন বড় 'আলেম ও মুফ্‌তী ছিলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন রহ. সূফী-সাধক হিসেবে হাকীম যিয়াউদ্দীন সাহেবেরও বিশেষ নামডাক ছিল। খাজা নিজামুদ্দীন রহ. 'সামা' কে জায়েয বলতেন। সূফী-সাধকদের অনেকের মজলিসেই এর প্রচলন ছিল। সামা বলতে এমন সব হামদ, নাত ও আধ্যাত্মিক কবিতাকে বোঝায়, যা বাদ্যযন্ত্রাদি ছাড়া কোনও ব্যক্তি

সুর দিয়ে গায় বা বিনা সুরে শ্রুতিমধুর আওয়াজে আবৃত্তি করে আর বাকিরা ভক্তি ও মহব্বতের সাথে শোনে। কোনও কোনও সূফী এর অনুমতি দিতেন। কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম ও মুফ্‌তীগণের অনেকেই একে নাজায়েয ও বিদ'আত সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং সে জমানার মুফ্‌তী মাওলানা হাকীম যিয়াউদ্দীন সাহেবও ফাত্ওয়া দিয়েছিলেন যে, সামা নাজায়েয। অপরদিকে হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া রহ. নিজে সামা শুনতেন।

হাকীম যিয়াউদ্দীন রহ. যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, খবর পেয়ে খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া রহ. তাকে দেখতে আসলেন। তিনি ভেতরে সংবাদ পাঠালেন যে, নিজামুদ্দীন আপনাকে দেখতে এসেছেন, প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। ভেতর থেকে হাকীম যিয়াউদ্দীন রহ. উত্তর দিলেন, তাকে বাইরে আটকে দাও, আমি কোনও বিদ'আতীর চেহারা দেখতে চাই না। হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া রহ. প্রতিউত্তর পাঠালেন, তাঁকে গিয়ে বলো, বিদ'আতী বিদ'আত থেকে তওবা করার মানসে হাজির হয়েছে। এ কথা শোনামাত্র হাকীম সাহেব রহ. নিজ পাগড়ি পাঠিয়ে দিলেন এবং হুকুম দিলেন, এটা বিছিয়ে দাও, যেন তিনি জুতা পায়ে এর উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ভেতরে আসেন। খাজা সাহেব রহ. সে পাগড়ি তুলে মাথায় রাখলেন এবং বললেন, এটা আমার জন্য ফযীলত ও মর্যাদার পাগড়ি। তারপর তিনি ভেতরে আসলেন। এসে মুসাফাহা করলেন এবং তার দিকে মুখ করে বসে পড়লেন। আর তাওয়াজ্জুহ দিতে থাকলেন। তার বসে থাকা অবস্থায়ই হাকীম সাহেব রহ. -এর ইন্তিকাল হয়ে গেল। তিনি মন্তব্য করলেন, আলহামদুলিল্লাহ হাকীশ যিয়াউদ্দীন সাহেবকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নিয়েছেন। বেলায়েতের স্তরসমূহ অতিক্রমের সঙ্গেই তাঁর ওফাত হয়েছে।

রাগও আল্লাহর জন্যই হতে হবে

মোটকথা যে রাগ ও বিদ্বেষ আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়, তা কখনও ব্যক্তিগত শত্রুতা সৃষ্টি করে না, তা কখনও ফিতনার কারণ হয় না। কেননা যার প্রতি রাগ করা হচ্ছে, সেও জানে আমার প্রতি তার কোনও

ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, বরং আমার বিশেষ কাজটিই তার পসন্দ নয়। এ কারণেই রাগ ও ঘৃণা সত্ত্বেও সে তাকে খারাপ জানে না। যেহেতু তার বিশ্বাস, তিনি যা বলছেন তা আল্লাহ তা'আলার জন্যই বলছেন। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

أَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ

'কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহরই জন্য ভালোবাসে এবং কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলে তাও আল্লাহরই জন্য করে।' তো এটা হচ্ছে রাগের উৎকৃষ্টতম ক্ষেত্র। এর জন্যও শরী'আতের সীমা রক্ষা করা জরুরি। আল্লাহ তা'আলা এ নি'আমত আমাদেরকেও দান করুন। যেন আমাদের সকল ভালোবাসা আল্লাহরই জন্য হয় এবং কারও প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা দেখা দিলে তাও আল্লাহ তা'আলারই জন্য হয়।

এর জন্য প্রয়োজন ক্রোধকে লাগাম পরিয়ে দেওয়া, যাতে তা এমন স্থানেই ব্যবহৃত হয়, যেখানে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য থাকে আর যেখানে রাগ করা সঠিক নয়, সেখানে তা থামিয়ে দেওয়া যায়।

হযরত আলী রাযি.-এর ঘটনা

হযরত আলী রাযি.-কে দেখুন। এক ইহুদী তার সামনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলল। হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষে তা কী করে বরদাশত করা সম্ভব? তিনি চকিতে তাকে ধরে উপরে তুললেন এবং মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেললেন, তারপর তার বুকের উপর উঠে বসে গেলেন। ইহুদী যখন দেখল এখন আর তার বাঁচার কোনও উপায় নেই, সে একটি চালাকি করল। সে শুয়ে থাকা অবস্থায় হযরত আলী রাযি.-এর মুখের উপর থুথু মেরে দিল। হেরে যাওয়া বিড়াল যেমন খিঁচুনি মারে, ঠিক সেই রকম আচরণ। কিন্তু তাতে কাজ হল। ইহুদী থুথু মারা মাত্র হযরত আলী রাযি. তার বুক থেকে নেমে আসলেন। লোকে বলল, হযরত! সে তো আরও বেশি বেআদবী করল। আপনার মুখে থুথু মেরে দিল! এ অবস্থায় আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন? তিনি বললেন, আসল ব্যাপার হল, প্রথমে যে আমি তার উপর আক্রমণ

করেছিলাম এবং তাকে খতম করে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম, সেটা করেছিলাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে। সে তাঁর শানে গোস্তাখী করেছিল বলে আমার রাগ উঠেছিল। কিন্তু পরে যখন সে আমার মুখে থুথু মারল তখন আমার আরও বেশি রাগ উঠল, আর এটা উঠল আমার ব্যক্তিগত কারণে। এমতাবস্থায় প্রতিশোধ নিলে তা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হতো না; বরং ব্যক্তিগত গোস্‌সার কারণে হতো। সে আমার মুখে থুথু মেরেছে বলে হতো। তার থুথু মারার ঝাল মেটান হতো। তখন আর এ রাগ আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য হতো না। নিজের জন্য হতো। এ কারণেই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

হযরত আলী রাযি. وَاَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ এভাবে এর হাদীছের উপর আমল করে দেখিয়েছেন। যেন তিনি নিজ ক্রোধের মুখে লাগাম পরিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তা শরী'আতের সীমার ভেতরই প্রকাশ পায়। শরী'আতের বৈধ সীমানা যেখানে খতম হয়ে গেছে, সেখানে পৌছে তিনি নিজ ক্রোধকে এভাবে সংযত করেছেন, যেন ক্রোধের সাথে তাঁর কোনও সম্পর্কই নেই। এই মহাত্মাদের সম্পর্কেই বলা হয়। كَانَ وَقَّافًا عَنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমানায় তারা ঠায় দাঁড়িয়ে পড়তেন, কিছুতেই তা লঙ্ঘন করতেন না।

হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর ঘটনা

হযরত উমর ফারূক রাযি. একবার মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত 'আব্বাস রাযি.-এর ঘরের ছাদের নল মসজিদের দিকে লাগানো। বৃষ্টি হলে তার পানি মসজিদের ভেতর পড়বে। যেন মসজিদের সীমানার ভেতরই সেটি লাগানো হয়েছে। তিনি চিন্তা করলেন, মসজিদ আল্লাহর ঘর। কোনও ব্যক্তির ঘরের নল যদি মসজিদের ভেতর এসে যায়, তবে সেটা তো আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘনের শামিল, কাজেই তিনি নলটি ভেঙে ফেলার হুকুম দিলেন। ফলে সেটি ভেঙে ফেলা হল। লক্ষ করুন, তিনি

যে নলটি ভেঙে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন। তা ক্রোধবশতই দিয়েছিলেন, কিন্তু সে ক্রোধ ব্যক্তিগত কারণে নয়; বরং আল্লাহর জন্য, যেহেতু সেটিকে তিনি মসজিদের বিধান ও আদবের পরিপন্থী মনে করেছিলেন। হযরত আব্বাস রাযি. যখন জানতে পারলেন, তার ছাদের নল ভেঙে ফেলা হয়েছে, তিনি হযরত উমর ফারূকের কাছে চলে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এটি ভাঙলেন কেন? হযরত উমর রাযি. বললেন, এটা তো মসজিদের জমি। কারও ব্যক্তিগত জমি নয়। মসজিদের জমিতে কারও নল ঢুকে পড়াটা শরী'আত-বিরোধী ছিল, তাই আমি ভাঙতে বলেছি। হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, আপনি কি জানেন এ নলটি কখন কিভাবে লাগানো হয়েছিল? এটি লাগানো হয়েছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এবং তাঁরই অনুমতিক্রমে। আপনার কী অধিকার এটি ভাঙার? হযরত উমর রাযি. বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এটি লাগানোর অনুমতি দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনিই অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কথা শুনে হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর বুক কেঁপে উঠল। নিজ কৃতকর্মের জন্য তাঁর মনে অনুশোচনা দেখা দিল। তিনি বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সঙ্গে আসুন। তিনি হযরত আব্বাস রাযি.-কে নিয়ে সেই নলের জায়গায় গেলেন। তারপর রূকুর মতো ঝুঁকে হযরত আব্বাস রাযি.-কে বললেন, আপনি আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে নলটি যথাস্থানে লাগিয়ে নিন। হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, অন্য কারও দ্বারা লাগিয়ে নেব। হযরত উমর রাযি. বললেন, উমরের এমন স্পর্ধা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাগানো নল ভেঙে ফেলে! এত বড় অপরাধের শাস্তি অন্ততপক্ষে এতটুকু হওয়া উচিত যে, সে রূকুর মতো নুয়ে থাকবে আর আপনি তার পিঠে দাঁড়িয়ে সেটি পুনঃস্থাপন করবেন। এই বলে তিনি তাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আব্বাস রাযি. বাধ্য হয়ে তাঁর পিঠের উপর উঠলেন এবং নলটি পূর্বস্থানে লাগিয়ে দিলেন।[২৪]

---

২৪. ইবন সা'দ, তাবাকাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২; কানযুল-উম্মাল, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৬৬; মাজমাউয-যাওয়াইদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৬; হায়াতুস-সাহাবা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২৪

মসজিদে নববীতে আজও সেই নল লাগানো আছে। আল্লাহ তা'আলা মসজিদে নববীর নির্মাতাদের জাযায়ে খায়র দান করুন। তারা এটা অনেক ভালো করেছে যে, সেই স্থানে আজও নল লাগিয়ে রেখেছে, যদিও বাহ্যত এখন আর সেটি কোনও কাজে লাগে না। কিন্তু স্মারক হিসেবে সেটি যথাস্থানে রেখে দিয়েছে। বস্তুত হযরত উমর রাযি.-এর এ কর্মও ছিল হাদীছ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ এরই অনুসরণ। প্রথমে যে রাগ উঠেছিল তা যেমন আল্লাহ তা'আলারই জন্য ছিল, তেমনি পরের মহব্বতও আল্লাহ তা'আলারই জন্য দেখিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই নীতি অবলম্বন করতে পারবে, সে নিজ ঈমানকে পরিপূর্ণ করে ফেলবে। এটা ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার আলামত।

কৃত্রিম রাগের ব্যবহার

এই اَلْبُغْضُ فِى اللهِ 'আল্লাহর জন্য ক্রোধ'-এর কারণে অনেক সময় ক্রোধ প্রকাশ করতে হয়। বিশেষত যারা লালন-পালন ও পরিচর্যাধীন থাকে তাদের প্রতি। ছাত্রের প্রতি উস্তাযকে অনেক সময়ই রাগ করতে হয়। সন্তানের উপর বাবাকে অনেক সময় রাগ করতে হয় এবং মুরীদদের উপরও অনেক সময় পীর সাহেবকে রাগ করতে হয়। কিন্তু ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন এ রাগ সেই সীমার মধ্যেই থাকা চাই। তার অতিরিক্ত যেন না হয়, যেমন একটু পূর্বেই আরয করা হয়েছে। এর নিয়ম হল, যখন মন-মেজায ত্যক্ত-বিরক্ত ও উত্তেজিত থাকে, তখন ক্রোধ প্রকাশ না করা। উদাহরণত ছাত্রের উপর ক্রোধে উস্তাযের মনে উত্তেজনা দেখা দিল। এই উত্তেজনার সময় তাকে হুমকি-ধমকি ও মারপিট না করে নীরবতা অবলম্বন করবে। তারপর যখন মেজায ঠাণ্ডা হবে, উত্তেজনা শেষ হয়ে যাবে, তখন কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে তাকে শাসন করবে। এই শাসনে সীমালঙ্ঘন হবে না। তবে কাজটা একটু কঠিন। কারণ রাগের সময় মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তখন সংযত হওয়া মুশকিল। কিন্তু তারপরও সাধনা করতে হবে। কেননা সাধনার মাধ্যমে এ গুণ আয়ত্ত না করলে ক্রোধের অনিষ্ট ও অপকারিতা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

ছোটদের প্রতি সীমালঙ্ঘনের পরিণাম

সন্তান-সন্ততি, ছাত্র ও মুরিদ অর্থাৎ যারা প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যাধীন থাকে, তাদের উপর ক্রোধবশে সীমালঙ্ঘন হয়ে গেলে, অনেক সময় তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। কেননা রাগ যার উপর করা হচ্ছে সে সমবয়সী বা আরও বড় হলে রাগের প্রতিক্রিয়াও সে দেখিয়ে বসতে পারে। সে তার বিরক্তি বা বীতশ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলে দিতে পারে, আপনার এ আচরণ আমার ভালো লাগেনি। কিংবা সে প্রতিশোধও নিয়ে নিতে পারে। আর যদি সে ছোট হয়, তবে সে প্রতিশোধ নিতে তো সক্ষম হবে না এবং ভয়ে ক্ষোভ প্রকাশও করবে না অর্থাৎ তার পিতাকে, ছাত্র তার উস্তাযকে এবং মুরীদ তার শায়খকে এ কথা বলবে না যে, আপনার এ আচরণ আমাকে ক্ষুব্ধ করেছে, ফলে আপনি যে তার মনে কতটা দুঃখ দিয়েছেন, সে খবরও আপনার থাকবে না। আর যখন খবর হবে তখন তার কাছে ক্ষমা পাওয়াও সহজ হবে না। কাজেই বিষয়টা কিন্তু অবহেলা করার মতো নয়। যারা শিশুদেরকে শিক্ষা দান করে, হযরত থানভী রহ. তাদের সম্পর্কে বলেন, তাদের ব্যাপার খুবই জটিল। কারণ শিশুরা নাবালেগ হওয়ার কারণে ক্ষমা করারও যোগ্য নয়। নাবালেগ শিশু ক্ষমা করলে ঠিক ক্ষমা হবে না। কারণ তার ক্ষমা ধর্তব্য নয়। কাজেই তাদের ব্যাপারে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন জরুরি।

নিজ ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে হবে। কারণ ক্রোধ অগণ্য অনিষ্টের মূল। এর ফলে বহু রূহানী রোগ সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে চেষ্টা করবে, যাতে রাগ বিলকুল প্রকাশ না পায়। পরিশেষে রাগ যখন নিজ আয়ত্তাধীন হয়ে যাবে, তখন বিবেচনা করে দেখবে, কোন্টা রাগের ক্ষেত্র, কোন্টা ক্ষেত্র নয়। যেখানে রাগ করা বৈধ মনে হবে কেবল সেখানেই রাগ করবে এবং তাও সীমার ভেতর থেকে। সীমালঙ্ঘন করে কিছুতেই নয়।

রাগের অপব্যবহার

রাগ তো হতে হবে আল্লাহরই জন্য। কিন্তু কোনও কোনও লোক এর চরম অপব্যবহার করে। মুখে তো বলে আমার রাগ আল্লাহরই জন্য,

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে রাগ তার ইন্দ্রিয় পরবশতার কারণে হয়ে থাকে। সে নিজেকে বড় মনে করে, অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং রাগের মাধ্যমে এ চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। যেমন কেউ কেউ এমন আছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিছুটা দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দিলে সেই চলাটা শুরু করতে না করতেই দুনিয়ার সব মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে থাকে। এমনকি নিজ পিতা-মাতা, নিজ ভাই-বোন, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন সবাইকেই ছোট মনে করতে শুরু করে। ভাবনাখানা এমন যে, তারা সব জাহান্নামী আর সে একা জান্নাতী। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে সেই জাহান্নামীদের ইসলাহ করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এখন তাদের ইসলাহ ও সংশোধন করার জন্য তাদের উপর রাগ করা, তাদের সম্পর্কে অশোভন শব্দ ব্যবহার করা, তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, তাদের অধিকার খর্ব করা সবই জায়েয মনে করে। শয়তান তাকে সবক পড়ায়, এরই যা কিছু করা হচ্ছে, সবই আল্লাহর জন্য। এই ক্রোধ اَلْبُغْضُ فِى اللهِ আল্লাহর জন্য ক্রোধের অন্তর্ভুক্ত। অথচ বাস্তবিক পক্ষে এসবই করছে ইন্দ্রিয় পরবশতার কারণে।

যারা দ্বীনের উপর নতুন-নতুন চলতে শুরু করে, শয়তান 'আল্লাহর জন্য ক্রোধ'-এর সবক পড়িয়ে তাদেরকে দিয়ে অন্য মুসলিমের হক নষ্ট করায় ও তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও লাঞ্ছিত করায়। কথায় কথায় সে তাদের উপর রাগ করে, তাদের ভুল-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় এবং এর পরিণামে ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা ফাসাদ দেখা দেয়।

আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর একটি মূল্যবান বাক্য

হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর একটি কথা প্রাতঃস্মরণীয়। তিনি বলতেন, হক কথা, হক নিয়তে হক পন্থায় বলা হলে কখনও তা নিষ্ফল যায় না এবং কখনও তার কারণে অনর্থ সৃষ্টি হয় না। তিনি তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। ক. কথাটি হক ও ন্যায্য হতে হবে; খ. নিয়ত হক ও সহীহ হতে হবে এবং গ. তা বলার তরিকা ও

পন্থা সঠিক হতে হবে। মনে করুন এক ব্যক্তি একটি মন্দ কাজে লিপ্ত। এখন সে যাতে তা থেকে নিবৃত্ত হয় এ নিয়তে দরদ ও মমতার সাথে তাকে বোঝাতে হবে। বোঝানোর সময় নিজের বড়ত্ব প্রকাশ ও তাকে হেয় করা উদ্দেশ্য হবে না। তরিকা সঠিক হওয়ার অর্থ দরদ ও নম্রতার সাথে বোঝানো। এ তিনওটি শর্ত পাওয়া গেলে সত্য বলার কারণে কখনও অনর্থ দেখা দেবে না। কোথাও যদি দেখেন হক কথা বলার পরিণামে ফ্যাসাদ দেখা দিয়েছে, তবে বুঝতে হবে খুব সম্ভব সেখানে এ শর্ত তিনটি রক্ষা করা হয়নি। কোনও না কোনওটি ছুটে গেছে। হয় কথাটিই ন্যায্য ছিল না। অথবা উদ্দেশ্য সৎ ছিল না কিংবা বলার পদ্ধতি সঠিক ছিল না।

মনে রাখতে হবে আমরা আল্লাহর কোতোয়াল হয়ে দুনিয়ায় আসিনি। আমাদের কাজ কেবল হক কথা হক নিয়তে হক পন্থায় অন্যদের কাছে পৌছানো এবং উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে অবিরাম এ চেষ্টা চালু রাখা। কখনও অবসন্ন হওয়া যাবে না। হতাশ হওয়া চলবে না। সাবধান থাকতে হবে, যাতে এমন কোনও কাজ না হয়ে যায়, যা অনর্থ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তা'আলা আপন রহমত ও ফযল-করমে আমাদের সকলকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

ঈমানের দাবি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ। যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত সম্পাদনকারী, যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে। কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।[২৫]

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১৭৭-১৯০

২৫. সূরা মুমিনূন, আয়াত ১-৭

প্রকৃত মুমিন কে?

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমি আপনাদের সামনে সূরা মুমিনূন-এর প্রথম দিকের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেছি। এসব আয়াত অষ্টাদশ পারার বিলকুল শুরুতে আছে। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। সত্যিকার অর্থে মুমিন কারা? কী তাদের গুণাবলি? তারা কী কী কাজ করে? কী কী কাজ থেকে বিরত থাকে? এসব বর্ণনার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা এসব গুণের অধিকারী হবে তারা অবশ্যই সফলতা লাভ করবে।

সফলতার ভিত্তি

এ আয়াতসমূহের শুরুতেই বলা হয়েছে, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ 'নিশ্চয়ই সেই মুমিনগণ সফলতা লাভ করেছে, যাদের মধ্যে এসব গুণ আছে।' এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে, মুমিনগণ সফলতা লাভ করতে চাইলে তাদেরকে এসব গুণ অর্জন করতে হবে। এসব কাজে যত্নবান থাকতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে, এসব আয়াতে যেসব কথা বলা হয়েছে, তা যেন নিজ জীবনে প্রতিফলিত হয়। কেননা এর মধ্যেই মুসলিমদের সফলতা নিহিত। এরই উপর সফলতা নির্ভরশীল।

ফালাহ ও সফলতা কাকে বলে?

أَفْلَحَ শব্দটি فَلَاحٌ হতে নির্গত। আমরা সাধারণত এর অর্থ করি সফলতা, কৃতকার্যতা। কারণ আমাদের ভাষায় فَلَاحٌ -এর অর্থ আদায় করার জন্য এছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই। তাই বাধ্য হয়েই আমাদেরকে এ তরজমা করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে আরবী ভাষা ও কুরআন মাজীদের পরিভাষা অনুযায়ী فَلَاحٌ শব্দটির মর্ম আরও ব্যাপক, গভীর ও বিস্তৃত। শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল, দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমষ্টিকে 'ফালাহ' বলে। সুতরাং আযানে বলা হয় حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 'তোমরা ফালাহ-এর দিকে এসো।' আযানের এ শব্দ দ্বারাও জানান দেওয়া হচ্ছে, তোমরা দুনিয়া ও

আখিরাত উভয় স্থানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেতে চাইলে নামায পড়তে এসো, মসজিদে এসে পৌঁছাও। মোদ্দাকথা 'ফালাহ' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কুরআন মাজীদের সূরা বাকারার শুরুতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে,

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝

অর্থাৎ যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, কুরআন মাজীদ ও তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস রাখে, তারাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলতা লাভকারী।[২৬] সুতরাং ফালাহ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এর অন্তর্ভুক্ত।

সফল মুমিনের গুণাবলি

সূরা মুমিনূন-এ বলা হচ্ছে, সফলতালাভকারী মুমিন তারা, যাদের মধ্যে এসব গুণ থাকবে। অতঃপর এক-একটি করে সেসব গুণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, সেইসব মুমিনই কৃতকার্য হবে, যারা নিজ নামাযে আন্তরিক ও বিনীত, যারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত দেয় ও যাকাতের বিধানাবলি পালন করে, যারা নিজ লজ্জাস্থান হেফাজত করে এবং আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষায় যত্নবান থাকে। সূরাটির শুরুতে এই সব কটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। এর প্রত্যেকটি গুণ ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। আল্লাহ তা'আলা যদি এগুলোর সঠিক বুঝ আমাদের দান করেন এবং এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব আমাদের অন্তরে বসিয়ে দেন, সেই সঙ্গে আমাদেরকে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দেন, তবে আল্লাহ চাহেন তো আমরা কৃতকার্য হয়ে যাব। তাই গুণগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি। এজন্য কয়েক সপ্তাহও লেগে যেতে পারে। একেক জুমু'আয় একেকটি গুণ সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকলে ইনশাআল্লাহ সবগুলো গুণ সম্পর্কে মোটামুটি কথা এসে যাবে।

---

২৬. সূরা বাকারা, আয়াত ৫

প্রথম গুণ 'খুশূ''

প্রথম গুণ বলা হয়েছে খুশূ' । সেই মুমিন কৃতকার্য, যে নিজ নামাযে খুশূ' অবলম্বন করে। যেন খুশূ'ই সফলতা লাভের সর্বপ্রথম শর্ত। সর্বপ্রধান রাস্তা। অর্থাৎ মুমিন কেবল নামায পড়বে এতটুকুই নয়; বরং নামাযে খুশূ' অবলম্বন করবে। নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরআন মাজীদে বাষট্টিরও বেশি স্থানে নামাযের হুকুম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা একবার মাত্র হুকুম দিলেই যথেষ্ট ছিল। কুরআন মাজীদে কোনও কাজ সম্পর্কে একবার হুকুম দেওয়া হলেও সে কাজ করা মানুষের জন্য ফরয হয়ে যায়। অথচ নামায পড়ার হুকুম এক-দু'বার নয়, বাষট্টি বারেরও বেশি দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা জানান দেওয়া হচ্ছে, নামায অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান। একে মামুলি বিষয় গণ্য করো না। মনে করো না দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কাজের মতই এটা একটা সাধারণ কাজ; বরং মুমিনের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের জন্য সর্বাপেক্ষা জরুরি কাজ হল নামায পড়া। সুতরাং নামাযের হেফাজত করতে হবে। যথাযথ বিধানাবলি ও আদব-কায়দা সহকারে নামায আদায় করতে হবে।

হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর খিলাফাতকাল

হযরত উমর ফারূক রাযি. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় খলিফা। তাঁর আমলে ইসলামের ব্যাপক রাজ্য-বিস্তার ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁরই হাতে কায়সার ও কিসরার পতাকা ধূলিসাৎ করেছেন। কায়সার ও কিসরার অট্টালিকাসমূহ মুসলিমদের আয়ত্তাধীন করেছেন। আমি একদিন হিসাব করে দেখলাম হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর শাসনাধীন এলাকা বর্তমানকালের পনেরোটি রাষ্ট্রের সমান। অর্থাৎ তিনি যেসব অঞ্চল শাসন করতেন, তাতে বর্তমানে পনেরোটি রাষ্ট্র রয়েছে। তিনি এমনই খোদাভীরু ও দায়িত্বশীল আমীরুল মুমিনীন ছিলেন যে, তিনি বলেন, ফুরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি অনাহারে মারা যায়, তবে আমার আশঙ্কা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। উমর! তোমার রাষ্ট্রে একটি কুকুর না খেয়ে মরল

কেন?[২৭] এমনই ছিল তাঁর দায়িত্ব সচেতনতা। তাঁর আমলে কেউ অনাহারে থাকত না। ইনসাফ ও ন্যায়বিচার অবারিত ছিল। তাঁর শাসনামল মুসলিম, অমুসলিম, নারী, পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলের সাথে ন্যায়-বিচারের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা পেশ করেছিল।

হযরত উমর রাযি.-এর ফরমান

হযরত উমর রাযি. ইসলামী খিলাফাতের সবগুলো প্রদেশের গভর্নর, নগরকর্তা ও পদস্থ লোকদের কাছে একটি সরকারি ফরমান পাঠিয়েছিলেন। ইমাম মালিক রহ. তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে ফরমানখানি হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। সে ফরমানে হযরত উমর রাযি. বলেন,

إِنَّ اَهَمَّ اَمْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعَ.

'আমার কাছে আপনাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায। যে ব্যক্তি তা হেফাজত করে, তা আদায়ে যত্নবান থাকে, সে তার দ্বীন হেফাজত করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা নষ্ট করল, সে দ্বীনের অন্যান্য বিষয় আরও বেশি নষ্ট করবে।'[২৮]

নামায নষ্ট করার অর্থ তা আদায় না করা কিংবা আদায় করলেও ভুল নিয়মে আদায় করা এবং তা আদায়ে অবহেলা ও গড়িমসি করা।

হযরত উমর রাযি. আঞ্চলিক শাসকবর্গের কাছে এ ফরমান পাঠিয়েছিলেন এ কারণে যে, সাধারণত শাসকবর্গ মনে করে আমার মাথায় তো জাতির অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত। কাজেই এ দায়িত্ব আদায় করতে গিয়ে যদি কোনও ওয়াক্তের নামায কুরবানীও করি তাতে দোষ নেই। যেহেতু আমি অনেক বড় দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছি। হযরত উমর

---

২৭. মুসান্নাফে ইব্ন আবী শায়বা, হাদীছ ৩৫৬২৭; তাবাকাতে ইব্ন সা'দ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮৪; তারীখে দিমাশ্ক, খণ্ড ৩৫, পৃষ্ঠা ২১৫; ইবনুল-জাওযী, তারীখু উমর ইবনিল-খাত্তাব, পৃষ্ঠা ১৪০। উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহে ছাগল উট ইত্যাদির কথা আছে, কুকুর সম্পর্কে কোনও বর্ণনা আমি পাইনি। টীকাকার।

২৮. ইমাম মালিক, মুআত্তা, হাদীছ নং ৫

ফারূক রাযি. তাঁদের এই ভুল ধারণা খণ্ডন করছেন। তিনি তাঁদের সাবধান করে দিচ্ছেন যে, শাসক বনার পর তোমাদের দায়িত্ব নামাযের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে এমন মনে করো না। আমার কাছে তোমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল নামায ঠিক ঠিকভাবে আদায় করা। নামাযের হেফাজত করলে তোমরা আল্লাহ তা'আলার হেফাজতে থাকবে। আর নামায নষ্ট করলে তোমাদের অন্যান্য কাজ আরও বেশি নষ্ট হবে। তখন আর রাষ্ট্রীয় কাজও তোমাদের দ্বারা ভালোভাবে আদায় হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলার বিধান অমান্য করার কারণে যখন তোমাদের অনুকূলে আল্লাহ তা'আলার তাওফীক থাকল না, তখন তোমাদের পক্ষে যথাযথভাবে দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া কিভাবে সম্ভব হবে?

একটি ভ্রান্ত ভাবনা

আজকাল আমাদের সমাজে একটা গোমরাহী বিস্তার লাভ করেছে। মানুষের মন-মস্তিষ্কে কিভাবে যেন এই ধারণা শেকড় গেড়েছে যে, বহু কাজ এমনও আছে, যা নামায অপেক্ষাও বেশি গুরুত্ব রাখে। বিশেষত যারা দ্বীনের কাজে মশগুল, দাওয়াত ও তাবলীগে লিপ্ত, জিহাদ ও রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, তাদের অনেকে মনে করে, আমরা তো অনেক বড় কাজ করছি। কাজেই এ বড় কাজের খাতিরে যদি কখনও নামায ছুটে যায় বা নামাযে কোনও কমতি দেখা দেয়, ঠিকভাবে আদায় না হয়, তাতে কোনও দোষ নেই। কেননা আমরা আরও বড় কাজে ব্যস্ত আছি। আমি দাওয়াতের কাজ করছি। আম্‌র বিল-মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল-মুনকারের দায়িত্ব পালন করছি, জিহাদ ও রাজনীতিতে ব্যতিব্যস্ত আছি। অর্থাৎ পৃথিবীতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার কাজে ব্যস্ত আছি, তাই আমাদের যদি জামাআত ছুটে যায়, তাহলে ঘরে বসেই পড়ে নেব, যদি ওয়াক্ত চলে যায়, পরে কাযা করে নেব। মনে রাখতে হবে, এটা সাংঘাতিক রকমের গোমরাহী ও ভ্রান্ত ধারণা।

হযরত উমর ফারূক রাযি. অপেক্ষা বেশি দ্বীনী কাজ আর কে করতে পারে? রাজনীতি ও জিহাদের পতাকাবাহী তার চেয়ে বড় আর কে হতে

পারে? তার চেয়ে বড় দাওয়াতদাতা ও মুবাল্লিগ কার পক্ষে হওয়া সম্ভব? অথচ তিনি আঞ্চলিক শাসকবর্গের কাছে যথারীতি সরকারি ফরমান পাঠাচ্ছেন নামাযের হুকুম দিয়ে এবং বলছেন, আমার কাছে আপনাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নামায। এটা হেফাজত করলে অন্যান্য কাজও বেশি সঠিক হবে, আর নামায নষ্ট করলে অন্যান্য কাজ আরও বেশি নষ্ট হবে।

নিজেদেরকে কাফেরদের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়

নিজেদেরকে কাফেরদের সাথে তুলনা করা, তাদের দিয়ে নিজেদের বিচার-বিবেচনা করা কিছুতেই সমীচীন নয়। অমুসলিমরা নামায পড়ছে না, অথচ তারা দিন-দিন উন্নতি করছে, বিশ্বব্যাপী তাদের বিজয়ডঙ্কা বাজছে, অর্থ-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাদের মুঠোর ভেতর, সারা জগতে এখন তাদেরই উৎকর্ষ-সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে, কাজেই নামায না পড়লে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব? বস্তুত এ জাতীয় চিন্তা নিতান্তই ভুল। তাদের সাথে নিজেদের তুলনা করার কোনও সুযোগ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের মেজায ও জীবনাচার কাফেরদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে দিয়েছেন। কুরআন মাজীদ ঘোষণা করছে, মুমিনগণ ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতা অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা এ সূরায় বর্ণিত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেবে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম কাজ হল নামায।

নামাযে খুশূ' কাম্য

কাজেই তোমরা যদি সফলতা চাও, প্রথম শর্ত পূরণ করো। নামাযের হেফাজত করো। এখানে বলা হয়নি, সফলকাম তারা, যারা নামায পড়ে। বরং বলা হয়েছে, সফলতা লাভ করবে সেই মুমিন, যে নিজ নামাযে খুশূ' অবলম্বন করে। খুশূ' কাকে বলে তা ভালোভাবে জেনে নেওয়া দরকার। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদের সকলকে খুশূ' দান করুন।

খুশূ' ও খুযূ'-এ দু'টি শব্দ সাধারণত পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে, অমুকে বড় খুশূ'-খুযূ'র সাথে নামায পড়ে।

'খুশূ'' শব্দটি 'শীন'-এর দ্বারা এবং 'খুযূ'' শব্দটি 'যোয়াদ'-এর দ্বারা উচ্চারিত। উভয় শব্দের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। খুযূ' অর্থ শরীরকে আল্লাহ তা'আলার সামনে ঝুঁকিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ নামায পড়ার সময় নিজ দেহ আল্লাহ তা'আলার সামনে নোওয়ানো। দেহ নোওয়ানোর অর্থ, নামাযে দাঁড়ানোর সময় সমস্ত আদব রক্ষা করে দাঁড়াবে, রুকূ' করার সময় রুকূ'র আদবের প্রতি লক্ষ রাখবে, সিজদা করবে তো তাতেও সমস্ত আদব রক্ষায় যত্নবান থাকবে। এভাবে নিজ শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তা'আলার সামনে নমনীয় ও ঝুঁকিয়ে রাখবে। এই হচ্ছে খুযূ' । সুতরাং খুযূ'র দাবি হল নামাযে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির ও শান্ত রাখবে। নড়াচড়া করবে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ 'নামাযে আল্লাহ তা'আলার জন্য দাঁড়াবে তো 'কানিত' হয়ে দাঁড়াবে', কানিত অর্থ শান্ত-স্থির হয়ে দাঁড়ানো। কাজেই নামাযে অকারণে শরীর নাড়ানো, বারবার হাত নাড়ানো, শরীর বা মাথা চুলকানো, কাপড় ঠিক করা, এসবই খুযূ'-এর পরিপন্থী।

ফুকাহায়ে কেরাম তো এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, কেউ নামাযের কোনও রুকনে-কিয়াম, রুকূ' বা সিজদায় অকারণে তিনবার হাত নেড়ে কোনও কাজ করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তিন বারের কম করলে নামায নষ্ট হবে না বটে, কিন্তু নামাযের শান মোতাবেক (যথাযথভাবে) ও সুন্নত অনুযায়ী পড়া হল না। ফলে নামাযের পূর্ণ বরকত লাভ হবে না। আজকাল আমাদের নামাযে এই দোষ হামেশাই পাওয়া যায়। আমরা নামাযে অহেতুক শরীর নাড়াচাড়া করি। অহেতুক শরীর নাড়ানো খুযূ'র পরিপন্থী এবং সুন্নত ও আদবের খেলাফ।

রাজ দরবারে যেভাবে উপস্থিত হতে হয়

আমরা যখন সালাতে দাঁড়াই, তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে দাঁড়াই। কোনও রাষ্ট্রনায়কের দরবারে যখন প্যারেড হয়, তখন যারা সে প্যারেডে শরীক থাকে, তাদেরকে প্যারেডের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী দাঁড়াতে হয়। ইচ্ছে হলে হাত নাড়ল, মাথা চুলকাল বা কাপড় ঠিক করল,

তা চলবে না। কেননা রাজ দরবারে এরকম করার সুযোগ নেই। যখন দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদেরই এই অবস্থা তখন যিনি সকল বাদশাহর বড় বাদশাহ, সকল বিচারকের বড় বিচারক, তার দরবারে দাঁড়িয়ে এ জাতীয় নড়াচড়া কিভাবে সমীচীন হতে পারে? সেখানে তো এসব কিছুতেই করা উচিত নয়; বরং সেখানে দাঁড়াতে হবে সব রকম আদব-লেহাজ রক্ষা করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুবারক রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি গ্রীষ্মকালে রাতের বেলা নিজ ঘরের ছাদে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। প্রতিবেশী দেখে বলত, মনে হয় যেন ছাদের উপর কোনও কাষ্ঠখণ্ড দাঁড় করানো আছে, কোনও রকম নড়াচড়া নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার দরবারে দাঁড়ানোর সময় এভাবে স্থাণুর মতো কানিত হয়ে দাঁড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমার দাঁড়ানো আল্লাহ তা'আলার দরবারে।

মাথা ঝোঁকানোর নাম খুযূ' নয়

নামাযে দাঁড়ানোর যে সুন্নত তরিকা আছে, সে মোতাবেক দাঁড়ানোই হচ্ছে খুযূ'। কোনও কোনও লোক খুযূ' মনে করে দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা ঝুঁকিয়ে রাখে, এমনকি সিনাও ঝুঁকিয়ে রাখে। এটা সুন্নতের খেলাফ। সুন্নত হল, কিয়াম অবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা। মাথা কেবল এতটুকু ঝুঁকবে, যাতে দৃষ্টি সিজদার স্থানে থাকে। এর বেশি ঝোঁকা, যেমন অনেকে থুত্নি বুকের সাথে লাগিয়ে দেয়, এটা সুন্নতের পরিপন্থী। নামাযে অকারণে নড়াচড়া করাও সুন্নতের খেলাফ, হ্যাঁ শরীর খুব বেশি চুলকালে সে ক্ষেত্রে একটু চুলকানো যেতে পারে। কিন্তু অকারণে নড়াচড়া করা ঠিক নয়। তা সুন্নতের পরিপন্থী। যাহোক, খুযূ' অর্থ হল নিজ শরীরকে আল্লাহ তা'আলার জন্য নমনীয় করে রাখা।

খুশূ' অর্থ

দ্বিতীয় শব্দ হল খুশূ'। খুশূ' অর্থ অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার জন্য ঝোঁকানো। অর্থাৎ অন্তরকে তাঁর অভিমুখী রাখা। খুশূ' ও খুযূ' শব্দদু'টি

একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং তা এ কারণে যে, নামাযে খুশূ' ও খুযূ' উভয়ই জরুরি। দেহ ও মন উভয়ই বিনীত ও আল্লাহ-অভিমুখী রাখাই নামাযের প্রাণবস্তু।

আজ আমি সংক্ষেপে খুযূ' সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তার সারমর্ম হচ্ছে, নামাযে সুন্নত তরিকা অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করা চাই। অহেতুক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়ানো ঠিক নয়। প্রশ্ন হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে রাখলে সুন্নত মোতাবেক ব্যবহার হবে? এজন্য আমার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। নাম 'সুন্নত মোতাবেক নামায পড়ুন'। ইংরেজি (ও বাংলায়ও) তার তরজমা হয়েছে। পুস্তিকাটি সামনে রাখুন এবং দেখুন নামাযে কোন অঙ্গ কিভাবে রাখা সুন্নত। সে অনুযায়ী আমল করলে ইনশাআল্লাহ খুযূ' অর্জিত হয়ে যাবে। বাকি খুশূ' অর্জনের কী উপায়, সে সম্পর্কে পরবর্তী জুমু'আয় আরয করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাদের সকলকে এ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

ইসলাম-এর হাকীকত*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۝

অর্থ : হে মুমিনগণ! ইসলামে দাখিল হয়ে যাও পরিপূর্ণভাবে এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[২৯]

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমি সর্বপ্রথম আপনাদের মুবারকবাদ জানাই। আপনারা নিজেদের মূল্যবান সময়ের একটা অংশ দ্বীনের আলোচনা শোনার জন্য বের করে এখানে তাশরীফ এনেছেন। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান ও শিক্ষা

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৯৫-১২৩; ২২ শে নভেম্বর, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ, বাইতুল মুকাররম, করাচী।

২৯. সূরা বাকারা, আয়াত ২০৮

সম্পর্কিত কথা-বার্তা শোনার প্রেরণায় এখানে সমবেত হয়েছেন। খুবই মূল্যবান আপনাদের এ জযবা। আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নিন এবং বক্তা ও শ্রোতা উভয়কে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। আমি আপনাদের সামনে কুরআন মাজীদের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। আমি এ আয়াতের সামান্য কিছু ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামে প্রবেশের হুকুম দিয়েছেন এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

ঈমান ও ইসলাম কি আলাদা জিনিস?

সর্বপ্রথম জানার বিষয় হল যে, ঈমান ও ইসলাম আলাদা জিনিস কি না? এখানে আল্লাহ তা'আলা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো। যে ব্যক্তি কালিমা পাঠ করে, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'-এর ঘোষণা দেয়, অর্থাৎ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সেই ব্যক্তি মুমিন। তাকে ইসলামে প্রবেশ করার হুকুম দেওয়া হচ্ছে। ভাবনার বিষয় হল, যে ব্যক্তি ঈমান এনে ফেলেছে তার ইসলামে প্রবেশ করার অর্থ কী? সাধারণত মনে করা হয়, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে, সে ইসলামেও প্রবেশ করেছে। সে যেমন মুমিন, তেমনি মুসলিমও বটে। অর্থাৎ ঈমান ও ইসলামকে একই বস্তু মনে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো বলছেন, হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো। বোঝা যাচ্ছে ঈমান এক জিনিস, ইসলাম অন্য জিনিস। কাজেই ঈমান আনার পর ইসলামে দাখিল হওয়াও জরুরি।

ইসলাম গ্রহণের অর্থ

প্রথমে বুঝতে হবে ইসলাম কী? মুমিনদেরকে যে ইসলামে দাখিল হতে আহ্বান জানানো হয়েছে তার মানে কী?

ইসলাম আরবী ভাষার একটি শব্দ। এর অর্থ কারও বশ্যতা স্বীকার করা, কোনও বড় শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করা, নিজেকে তার অধীন বানিয়ে দেওয়া এবং তিনি যা বলবেন সে অনুযায়ী কাজ করা। এরই নাম ইসলাম। বোঝা গেল মুখে কালিমা পড়া, আল্লাহ তা'আলার একত্ব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনাই ইসলামে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট নয়। ইসলামে প্রবেশের জন্য আরও কিছু কাজ করতে হয়। নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার সামনে অবনত করে দিলেই ইসলামে প্রবেশ সম্পন্ন হয়। এটা না হওয়া পর্যন্ত কোনও লোকের সত্যিকার অর্থে ইসলামে প্রবেশ হওয়া হয় না।

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও পুত্র কুরবানী

সূরা সাফ্ফাতে আল্লাহ তা'আলা এই ইসলাম শব্দটি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনায়ও ব্যবহার করেছেন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পুত্র যবাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁরই স্মারক হিসেবে আমরা প্রতি বছর ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন করে থাকি। পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল আলাইহি সালাম। তিনি ছিলেন বহু আশার ধন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাকে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে একটি পুত্র দিন। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সেই দু'আর ফসল। এই পুত্র যখন একটু বড় হয়ে উঠলেন, পিতার টুকটাক কাজ করে দেওয়ার মতো বয়সে পৌছলেন, সেই সময় হুকুম আসল, তার গলায় ছুরি চালাও। তাকে যবাহ করে দাও। যুক্তি-বুদ্ধির তুলাদণ্ডে যদি এ হুকুমকে যাচাই করা হয়, এর রহস্য ও তাৎপর্য অনুসন্ধান করা হয়, তবে এর কোনও বৈধতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনও পিতা তার পুত্রের গলায় ছুরি চালাবে এর স্বপক্ষে কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনও পিতার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। দুনিয়ার কোনও মানুষ একে যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত কাজ বলে রায় দেবে না।

পুত্রেরও পরীক্ষা হয়ে গেল

কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হুকুম এসে গেল, 'নিজ পুত্রকে যবাহ করো', তিনি বিনা বাক্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে বললেন,

يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ

'বাছা! আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে যবাহ করছি। বলো, তোমার কী অভিমত?'[৩০] নিজ অন্তরে এ কাজ করার ব্যাপারে কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল বলে যে এ প্রশ্ন করেছিলেন, তা নয়; বরং উদ্দেশ্য ছিল পুত্রেরও পরীক্ষা নেওয়া যে, তিনি এর কী জবাব দেন। পরীক্ষায় তিনি শত ভাগ উত্তীর্ণ হলেন। তিনি তো হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এরই পুত্র ছিলেন! তাঁরই ঔরস ধারায় সর্বশেষ নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম নেওয়ার ছিলেন। কাজেই তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন না, বাবা! আমি এমন কী অপরাধ করেছি, কী এমন ভুল আমার দ্বারা ঘটে গেছে, যার পরিণামে আমার আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই এবং আমাকে হত্যা করার ফয়সালা হয়ে গেল? বরং স্বতঃস্ফূর্ত মনে তিনি বিনীত উত্তর দিচ্ছেন—

يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

'আব্বাজী! আপনাকে যে আদেশ করা হচ্ছে আপনি তা পালন করুন, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের একজন পাবেন।'[৩১] অর্থাৎ আমার কষ্ট হবে ভেবে আপনি একদম চিন্তা করবেন না। একইভাবে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালামও আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেননি যে, হে আল্লাহ! আপনি যে আমাকে আমার একমাত্র প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবানী করার হুকুম দিয়েছেন, এর রহস্য কী? পিতা-পুত্র উভয়েই কেবল এতটুকুই দেখেছেন যে, এ আদেশ আমাদের ওই স্রষ্টা ও মালিকের পক্ষ থেকে এসেছে, যা বিনা

---

৩০. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ১০২

৩১. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ১০২

বাক্যে শিরোধার্য। কাজেই পত্র পাঠ মাত্র তারা তা পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

যেভাবে পিতা-পুত্র হুকুম পালন করলেন

কুরআন মাজীদ এ ঘটনা বড়ই প্রীতিপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেছে। যখন পিতা-পুত্র হুকুম পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, ছুরি হাতে পিতা প্রিয় পুত্রকে শোয়ায় দিলেন এবং আকাশ বাতাস রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে এই বুঝি ছুরি চালান হল, এই তো হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর হাতে প্রিয়পুত্র কুরবানী হয়ে গেল।

কুরআন মাজীদ ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে যে শব্দমালা ব্যবহার করেছে, তা এরকম– فَلَمَّآ اَسۡلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلۡجَبِیۡنِ 'যখন পিতা-পুত্র উভয়ে 'ইসলাম'-এর প্রকাশ ঘটাল, আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেদের পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উল্টো করে শোয়ায় দিল।'[৩২]

উল্টোমুখো করে শোয়ানো হয়েছিল এ কারণে, পাছে পুত্রের চেহারা দেখা এবং সেই চেহারায় যবাই হওয়ার কষ্ট ও বেদনার আভাস দেখার ফলে ছুরি চালনায় মন্থরতা দেখা দেয়, পাছে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে কোনওরূপ অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে যায়। এসব পারিপার্শ্বিকতা থেকে বাঁচার জন্য পুত্রকে উল্টোমুখে শোয়ায় ছিলেন। পিতা-পুত্রের এই চরম বশ্যতাপূর্ণ আচরণ বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদে اَسۡلَمَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা উভয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশের কাছে আত্মসমর্পিত হল।

আল্লাহ তা'আলার আদেশ যথাযথ পালনই আসল কথা

এর দ্বারা বোঝা গেল, কুরআন মাজীদের পরিভাষায় ইসলাম অর্থ, আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন হয়ে যাওয়া, তাঁর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনও আদেশ আসলে পত্র পাঠ মাত্র তা শিরোধার্য করে নেওয়া, তার রহস্য ও তাৎপর্যের

---

৩২. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ১০৩

পেছনে ছুটে কালক্ষেপণ না করা; বরং বিনা বাক্যে তা পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। এরই নাম ইসলাম, এই ইসলামে প্রবেশ করার জন্যই আহ্বান জানানো হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা কালিমায়ে তাইয়্যিবা তো পড়েছ, শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে ফেলেছ, কিন্তু এতেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। এখন প্রয়োজন হল ইসলামে দাখিল হয়ে যাওয়া। তার মানে নিজেকে এখন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাবহ করে ফেলো। তাঁর পক্ষ থেকে যে হুকুমই আসে, তা সর্বান্তকরণে কবুল করে নাও এবং তা পালনে ব্রতী হয়ে যাও।

প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর হুকুম বিনা বাক্যে মানতে হবে কেন? এর উত্তর হল, তোমরা আল্লাহর হুকুম বিনা বাক্যে না মানলে বুদ্ধির দাসে পরিণত হবে। যদি নিজের বুদ্ধি খাটাও, যুক্তির পেছনে পড়ো আর বলো, এ আদেশ তো অযৌক্তিক, নিরর্থক বা এটা অন্যায় আদেশ, ইনসাফ-বিরোধী, তবে এর পরিণামে তোমরা আল্লাহর গোলামী ছেড়ে নিজ বুদ্ধির গোলাম বনে যাবে। আর বুদ্ধির গোলামীতে নয়, মুক্তি ও নাজাত আল্লাহ তা'আলার গোলামীর ভেতরই নিহিত।

জ্ঞানার্জনের মাধ্যম

এ দুনিয়ায় জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কয়েকটি মাধ্যম দিয়েছেন। মানুষ সেগুলো দ্বারা জ্ঞানার্জন করে থাকে। সর্বপ্রথম জ্ঞান-মাধ্যম হল চোখ। মানুষ চোখ দ্বারা দেখে বহু জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। দ্বিতীয় মাধ্যম জিহ্বা। জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ নিয়েও মানুষ অনেক কিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে। তৃতীয় মাধ্যম 'কান', চতুর্থ মাধ্যম 'ত্বক' এবং পঞ্চম মাধ্যম 'নাক'। এর প্রত্যেকটির মাধ্যমে তার সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। এই যে আমার সামনে মাইক্রোফোন আছে। আমি চোখে দেখে জানতে পারছি এটি একটি যন্ত্র, যা গোলাকার। স্পর্শ করে বুঝতে পারছি এটি শক্ত। কানে শুনে জানছি

এটি আমার আওয়াজ বহু দূরে পৌছে দিচ্ছে। দেখুন কিছু জ্ঞান অর্জিত হচ্ছে চোখে দেখে, কিছু অর্জিত হচ্ছে কানে শুনে এবং কিছু হাতে স্পর্শ করে। জ্ঞানার্জনের এ মাধ্যমগুলোকে বলে পঞ্চেন্দ্রিয়।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্ম পরিধি সুনির্দিষ্ট

আল্লাহ তা'আলা এ জ্ঞান মাধ্যমগুলোর কর্মপরিধি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেই পরিধির ভেতরই এগুলো জ্ঞানার্জনের কাজ দেবে। এর বাইরে ব্যবহার করলে এসব মাধ্যম কোনও কাজ দেবে না। উদাহরণত চোখের কাজ হল দেখার মাধ্যমে জ্ঞান সরবরাহ করা। সে শুনে কোনও জ্ঞান দিতে পারে না। তার ভেতর শোনার ক্ষমতাই নেই। শোনার কাজ করে কান। কান শুনতে পারে, কিন্তু দেখতে পারে না। জিহ্বা স্বাদ নিতে পারে, কিন্তু তার ভেতর দেখার বা শোনার ক্ষমতা নেই। কেউ যদি চোখ বন্ধ করে কান দ্বারা দেখে সামনের দৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে চায়, তবে লোকে তাকে পাগল বলবে। কারণ কান তাকে কোনও দৃশ্য দেখাতে সক্ষম নয়। সে কানকে তার কর্ম পরিধির বাইরে ব্যবহার করেছে। কানকে দেখার জন্য সৃষ্টিই করা হয়নি। এমনিভাবে কেউ যদি চায়, আমি কান বন্ধ করে চোখের মাধ্যমে শোনার চেষ্টা করব, সামনের ওই লোকটি কী কথা বলছে, তবে তাকেও লোকে নির্বোধ ও আহাম্মক ঠাওরাবে। কারণ শোনার কাজ চোখ করতেই সক্ষম নয়। তার সে শক্তিই নেই। কিন্তু তাই বলে বলা যাবে না যে, চোখ একটা ফালতু জিনিস। চোখ আদৌ ফালতু নয়, অনেক বড় কাজের জিনিস, তবে সে কাজ তার দ্বারা ততক্ষণই সম্ভব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে তার নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ দেখার কাজে ব্যবহার করলে চোখ যথেষ্ট কাজ দেবে, কিন্তু শোনার কাজ যেহেতু তার কর্মপরিধির বাইরে, তাই সে কাজে ব্যবহার করলে তা অক্ষমতাই প্রকাশ করবে।

জ্ঞানের আরেকটি মাধ্যম হল বুদ্ধি

একটি পর্যায় এমনও আসে, যেখানে পৌছে চোখ, কান, নাক জিহ্বা ও ত্বক-এই পঞ্চেন্দ্রিয় কাজ করা বন্ধ করে দেয়। সেখানে এরা কোনও

জ্ঞান সরবরাহ করতে পারে না। এই পর্যায়ের জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আরেকটি জ্ঞান মাধ্যম দিয়েছেন। তার নাম আকল বা বুদ্ধি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে বিষয়ে কোনও জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। সে বিষয়ে বুদ্ধি মানুষকে জ্ঞান দান করে। এই মাইক্রোফোনের কথাই ধরুন। আমি চোখ দিয়ে দেখে এবং হাত দ্বারা ছুঁয়ে এই জ্ঞান লাভ করতে পেরেছি যে, এটি শক্ত বস্তু। লোহা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এটি তৈরি করেছে কে? কিভাবে এটি অস্তিত্ব লাভ করল? এ জ্ঞান না চোখে দেখে লাভ করা যাবে, না কান দ্বারা শুনে, জিহ্বা দ্বারা চেখে কিংবা ত্বক দ্বারা ছুঁয়ে অর্জন করা যাবে। এ জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বুদ্ধি দান করেছেন। বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, এমন সুদৃশ্য ও জমকালো যন্ত্র, যা আমাদের আওয়াজ দূরে পৌছানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে, এটা আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। অবশ্যই এটা কোনও কারিগরের তৈরি এবং সে কারিগরও হবে অত্যন্ত সুদক্ষ এবং এই বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। সুতরাং যেখানে পৌছে এই পঞ্চেন্দ্রিয় কাজ করতে অক্ষম, সেখানে আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান-মাধ্যম হলো বুদ্ধি।

বুদ্ধির কর্মপরিধি

কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্মপরিধি যেমন অসীম ছিল না; বরং নির্দিষ্ট ও সীমিত পরিধির ভেতরই তা কাজ করত, তেমনি বুদ্ধির কর্ম পরিধিও সীমাহীন নয়; তারও কর্মপরিধি সীমিত। তার বাইরে বুদ্ধি মানুষকে কোনও রকম সাহায্য করতে পারে না। একটা পর্যায় এমন আসে, যখন বুদ্ধিও অপারগ হয়ে যায়, অক্ষমতা প্রকাশ করে। তখন সে মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করার ক্ষমতা রাখে না।

আরেকটি জ্ঞান মাধ্যম হল ওহী

যেখানে পৌছে মানব-বুদ্ধি সঠিক পথপ্রদর্শন করতে অক্ষম হয়ে যায়, সেখানে মানুষকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় একটি জ্ঞান মাধ্যমও দিয়েছেন। সেই জ্ঞান মাধ্যমের নাম হল 'ওহী', যা আল্লাহ

তা'আলার পক্ষ হতে নবী-রাসূলগণের প্রতি নাযিল হয়ে থাকে। যেখানে মানব-বুদ্ধি একা কোনও কাজ করতে পারে না, সেখানে মানুষকে পথ দেখানেই ওহীর কাজ। সুতরাং যে বিষয়ে মানুষের পক্ষে নিজ বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভ সম্ভব ছিল না, সেই বিষয়ে জ্ঞান সরবরাহের জন্যই আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠিয়েছেন। সেই ওহী আমাদেরকে বলে দেয়, এ বিষয়টি এরকম।

উদাহরণত মানুষের মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন আছে, একসময় এই জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর আরেক জগৎ শুরু হবে। তা এক অনিঃশেষ জগৎ। সে জগতে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে। সেখানে জান্নাত ও জাহান্নাম আছে। হিসাব ঠিক হলে জান্নাত লাভ হবে। অন্যথায় জাহান্নামে যেতে হবে। এসব বিষয় এমন, যদি ওহী নাযিল না হতো, ওহীর মাধ্যমে নবীগণকে এ সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া না হতো, তবে নিছক বুদ্ধি দ্বারা আমরা এ সম্পর্কে কোনও কিছু জানতে পারতাম না। আমরা বুঝতে সক্ষম হতাম না মৃত্যুর পর কেমন জীবন আসবে এবং তখন মানুষকে কেমন সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ওহী নামক তৃতীয় জ্ঞান মাধ্যম দিয়েছেন।

ওহীকে বুদ্ধির মানদণ্ডে যাচাই করো না

ওহী তো এসেছেই এমন সব বিষয়ের জন্য, যে সম্পর্কে বুদ্ধি কোনও কাজ করে না, বুদ্ধি কোনও পথ দেখাতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে ওহী আমাদেরকে পথ দেখায়। এখন কেউ যদি বলে, আমি ওহীর কথা ততক্ষণ পর্যন্ত মানব না, যতক্ষণ না আমার বুদ্ধি তা গ্রহণ করে, তবে সে মূঢ়তারই পরিচয় দেবে। সে তো ওই ব্যক্তির মতই কথা বলল, যে বলে আমি ওই জিনিস ততক্ষণ পর্যন্ত মানব না, যতক্ষণ না আমি ওটা আমার কান দ্বারা দেখতে পাব। তাকে তো এ কারণেই বেকুব ঠাওরানো হয় যে, সে তার কান দ্বারা চোখের কাজ নিতে চাচ্ছে। সবাই তাকে বলবে আরে বেকুব, কানকে তো এ কাজের জন্য বানানোই হয়নি। ঠিক এরকমই, যে

ব্যক্তি বলবে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে না পারব, ততক্ষণ ওহীর কোনও কথা মানব না। সেও নিজেকে বেকুবই সাব্যস্ত করবে। কেননা ওহী তো আসেই এমন ক্ষেত্রে যেখানে বুদ্ধির দৌড় খতম হয়ে যায়, যেমন আমি আপনাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের উদাহরণ দিলাম। এক শ্রেণির লোক বলে, জান্নাত ও জাহান্নামের বিষয়টা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না। তাই আমরা মানতে পারছি না। অথচ এটা তো বুদ্ধির এলাকা বহির্ভূত বলেই তো এ সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞান দিতে হয়েছে, নবী-রাসূলগণের প্রতি ওহী নাযিল করতে হয়েছে।

এমনিভাবে কোন্ জিনিস ভালো? কোন্টা মন্দ, কোন্ কাজ উৎকৃষ্ট কোন্টি নিকৃষ্ট? কোন জিনিস হালাল, কোন্ জিনিস হারাম, কোন্ কাজ জায়েয, কোন্ কাজ নাজায়েয? কোন্ কাজ আল্লাহ তা'আলার পসন্দ এবং কোন্ কাজ তাঁর অপসন্দ? এসব ফায়সালা ওহীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল মানববুদ্ধির উপর ছাড়া হয়নি। কেননা একা মানববুদ্ধির পক্ষে এসব বিষয়ে ফয়সালা দেওয়া সম্ভবই নয়।

মানববুদ্ধি অনেক সময়ই ভুল পথ দেখায়

এ দুনিয়ায় যত বড়-বড় অনর্থ ঘটেছে, যত ভ্রান্ত মতবাদ জন্ম নিয়েছে, সবই বুদ্ধি থেকেই উৎপন্ন। উদাহরণত আমরা মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি, শূকরের গোশত হারাম। এ ব্যাপারে ওহীর নির্দেশনা পাশ কাটিয়ে কেবল বুদ্ধির নিরিখে চিন্তা করা হলে বুদ্ধি অবশ্যই ভুল পথ দেখাবে। তাই তো অমুসলিমগণ বুদ্ধির নির্দেশনায় জোর গলায় বলছে, শূকরের মাংস খুবই সুস্বাদু। আমরা দিব্যি খাচ্ছি। সমস্যা কী হচ্ছে? এর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক কী সমস্যা আছে? এমনিভাবে মুসলিম হিসেবে আমরা বলছি মদ পান করা হারাম। মদ খুবই মন্দ জিনিস। কিন্তু যে ব্যক্তি ওহীতে বিশ্বাস করে না, সে বলবে মদ পানে ক্ষতি কী? এতে মন্দের কী আছে? আমরা তো এর মধ্যে খারাপ কিছু দেখছি না। লাখো মানুষ মদ খাচ্ছে, কই তাদের তো বিশেষ কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। তাছাড়া আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিতেও এর কোনও মন্দ দিক ধরা পড়ছে না। এমন কি

কিছু লোক ব্যভিচারের মন্দত্ব অস্বীকার করছে। তারা বলছে, নারী-পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত মিলনে দোষ কী? উভয়ের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যৌন সংশ্রব হলে তাতে অন্যায় কিছু নেই। বুদ্ধির নিরিখে আমরা একে মন্দ বলতে পারি না। কোনও নারী-পুরুষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এ কাজ করলে তৃতীয় ব্যক্তির তাতে নাক গলানো ঠিক নয়। বাধা দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। দেখুন, এভাবে যুক্তি-বুদ্ধির দোহাই দিয়ে ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্যতর কাজকেও বৈধ সাব্যস্ত করা হচ্ছে। এটা বুদ্ধির অনধিকার ব্যবহারের পরিণতি। বুদ্ধিকে যখন তার কর্মপরিধির বাইরে ব্যবহার করা হল, তখন সে এরকম ভ্রান্ত নির্দেশনা দিতে শুরু করল। যে ক্ষেত্রে ওহীর নির্দেশনা পাওয়া গেছে, সেখানে বুদ্ধির স্বাধীন ব্যবহার করলে বুদ্ধি এরকম গলত উত্তরই দেবে, গলত পথেই চালিত করবে।

সাম্যবাদ বুদ্ধিরই উৎপাদন ছিল

দেখুন, রাশিয়ায় চুয়াত্তর বছর পর্যন্ত সাম্যবাদ, সোস্যালিযম ও কম্যুনিযমের বাজার সরগরম ছিল। তখন গরিবের প্রতি সহানুভূতি ও সাম্যের নামে এ মতবাদ সারা বিশ্বকে মাতিয়ে তুলেছিল। সর্বত্র সমাজতন্ত্রের বিজয় ডঙ্কা বাজছিল। বলা হচ্ছিল, অচিরেই এ মতবাদ সমগ্র বিশ্বকে শাসন করবে। এসব হচ্ছিল বুদ্ধিরই ছত্রচ্ছায়ায়। তখন কেউ এ মতবাদের বিরুদ্ধে কথা বললে, এটাকে ভুল চিন্তাধারা আখ্যায়িত করলে, তাকে পুঁজিবাদের এজেন্ট বলা হতো, বুর্জোয়া শ্রেণির দালাল সাব্যস্ত করা হতো এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলে গালি দেওয়া হতো। অথচ আজ চুয়াত্তর বছর পর সারা বিশ্ব কী তামাশাই না দেখছে। একসময় যার পূজা করা হতো, সেই লেনিনের মূর্তি তার আদর্শের সৈনিকেরাই কিভাবে ভেঙে গুড়িয়ে দিল! ওহীর নির্দেশনা উপেক্ষা করে কেবল বুদ্ধির উপর যে মতবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়, তার পরিণাম এমনই হয়ে থাকে।

ওহীর নির্দেশনা শিরোধার্য করে নাও

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, জীবন যদি সঠিকভাবে চালাতে হয়, তবে ওহী নির্দেশিত পথে চলো। যে ক্ষেত্রে আল্লাহ

তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম এসে যায়, ওহীর পয়গাম পৌঁছে যায়, সেখানে নিজেকে তার অধীন বানিয়ে নাও। তার সামনে আত্মসমর্পণ করো। সেখানে নিজ বুদ্ধি-বিবেক খাটাতে যেয়ো না। হোক না আপাতদৃষ্টিতে তা যুক্তি বুদ্ধির পরিপন্থী ও নিজ বুঝ-সমঝের অতীত। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এসে যাওয়ার পর বিনা বাক্যে তার সামনে মাথা নুইয়ে দাও! এরই নাম ইসলামে প্রবেশ করা। যে আয়াত আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি, তার প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর।' তার মানে তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া হুকুম-আহকামের অধীন বানিয়ে ফেলো।

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, 'পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করো' অর্থাৎ ইসলামের কিছু মানলে, কিছু মানলে না, এমন যেন না হয়। উদাহরণত, কালিমা তায়্যিবা পড়লে, নামায পড়লে, রোযা রাখলে, যাকাত দিলে, হজ্জ করলে, ইবাদাতসমূহ আঞ্জাম দিলে, এভাবে আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাতের গণ্ডি পর্যন্ত তো ইসলামে প্রবেশ করলে এবং মসজিদের ভেতর নিজেকে মুসলিমরূপে পেশ করলে, কিন্তু যখন বাজারে গেলে, অফিসে পৌঁছলে, বাড়ি ফিরলে তখন আর মুসলিম নও। এমন হলে চলবে না। আল্লাহ তা'আলা ইসলামের ভেতর কেবল ইবাদতই দেননি যে, ইবাদত করলে আর মুসলিম হয়ে গেলে। বরং ইসলাম তো সম্পূর্ণ জীবনটাকে ইসলামের অধীন বানিয়ে দেওয়ার নাম। পূর্ণাঙ্গ মুসলিম সেই, যে বাজারেও মুসলিম, অফিসেও মুসলিম, নিজ গৃহে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথেও মুসলিম এবং ঘরের বাইরে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ও অন্য সকলের সঙ্গেও মুসলিম।

ইসলামের পাঁচটি অংশ

আল্লাহ তা'আলা ইসলামে পাঁচ রকমের বিধান ও অনুশাসন দিয়েছেন। সবগুলোর সমষ্টির নাম দ্বীন।

এক. 'আকাইদ : তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি আকীদা বিশ্বাসকে বিশুদ্ধভাবে লালন করা।

দুই. 'ইবাদত : নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায়ে যত্নবান থাকা।

তিন. 'মুআমালাত : বেচাকেনা, লেনদেন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আল্লাহ তা'আলার হুকুম মোতাবেক সম্পন্ন করা, হারাম ও নাজায়েয পন্থা পরিহার করে চলা।

চার. 'মুআশারাত : পারস্পরিক মেলামেশা, ওঠাবসা, সহাবস্থান ইত্যাদিতে আল্লাহপ্রদত্ত বিধানাবলি অনুসরণ করা।

পাঁচ. আখলাক : অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও আবেগ-অনুভূতি যাতে পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে সে ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

আজ আমরা মসজিদে তো মুসলিম, কিন্তু যখন বাজারে যাই, সেখানে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছি, আমানতের খেয়ানত করছি, অন্যকে কষ্ট দিচ্ছি এবং তাদের দৈহিক ও মানসিক বেদনার কারণ হচ্ছি। এমন হলে তো ইসলামে পরিপূর্ণরূপে দাখিল হওয়া হল না। কেননা ইসলামের এক চতুর্থাংশ হল ইবাদত আর বাকি তিন ভাগই হুকুকুল ইবাদ (বান্দার হক)। বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত হুকুকুল ইবাদ আদায়ে যত্নবান না হবে, তার ইসলামে প্রবেশ পূর্ণাঙ্গ হবে না।

আল্লাহ তা'আলা তো দেখছেন

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. সফরে ছিলেন। রসদ যা সঙ্গে ছিল সব শেষ হয়ে গেল। এ অবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন মাঠে একপাল ছাগল চরছে। তখন আরব সমাজে রেওয়াজ ছিল, লোকে পথিক ও মুসাফিরদেরকে মেহমানদারি হিসেবে বিনামূল্যে দুধপান করাত। সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. রাখালের কাছে গিয়ে বললেন, আমি একজন মুসাফির। আমার রসদ ফুরিয়ে গেছে। তুমি যদি একটি ছাগল দুইয়ে আমাকে দুধ পান করা করাতে! রাখাল বলল, আপনি যেহেতু মুসাফির, আপনাকে দুধ ঠিকই দিতাম, কিন্তু মুশকিল হল, এ ছাগলগুলো যে আমার নয়। এর মালিক অন্য। আমি রাখাল মাত্র।

এগুলো দেখাশোনা করি। কাজেই এগুলো আমার কাছে আমানত। এদের দুধও আমানত, এর দুধ কাউকে দেওয়া আমার পক্ষে জায়েয নয়।

তারপর হযরত ইবন উমর রাযি. তার কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাইলেন। বললেন, দেখো ভাই, আমি তোমাকে একটা লাভজনক কথা বলি। তাতে তোমারও লাভ, আমারও উপকার। তুমি একটা কাজ কর। এখান থেকে একটা বকরি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। এতে তোমার লাভ তো এই যে, তুমি টাকা পাবে। আর আমার লাভ হল, আমি একটা বকরি পাব, পথে তার দুধ খেতে পারব। বাকি থাকল মালিককে বোঝানোর ব্যাপার, তা তুমি বলে দিয়ো, পালের একটা বকরি বাঘে খেয়ে ফেলেছে। সে তোমার কথা অবিশ্বাস করবে না। কারণ বাঘে এরকম ছাগল ভেড়া খেয়েই থাকে। ব্যস এভাবে তোমার আমার দু'জনেরই গতি হয়ে যাবে। রাখাল তাঁর কথা শুনে বলে উঠল يَا هٰذَا فَأَيْنَ اللهُ 'সাহেব! তাই যদি করা যায়, তবে আল্লাহ কোথায়?' অর্থাৎ এ কাজ না হয় আমি এখানে করে ফেললাম আর মালিককেও উত্তর একটা দিয়ে দিলাম, হয়তো সে আমার উত্তর মেনেও নেবে, কিন্তু সেই মালিকেরও তো এক মালিক আছেন! তাঁর কাছে গিয়ে কী উত্তর দেব? কাজেই আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। বলাই বাহুল্য, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. রাখালকে পরীক্ষাই করতে চেয়েছিলেন, পরীক্ষায় রাখাল শতভাগ উত্তীর্ণ। তিনি মুগ্ধ হয়ে বললেন, তোমার মতো মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠে থাকবে, ততক্ষণ কোনও জালেম কারও উপর জুলুম করতে আগ্রহী হবে না।[৩৩]

কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে, আখিরাতের চিন্তা থাকবে এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে হিসাব দিতে হবে– এই চেতনা জাগ্রত থাকবে, ততক্ষণ কোনও অপরাধ ও জোর-জুলুম করা সম্ভব নয়। এই হচ্ছে ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ। নিভৃত মাঠেও এই সচেতনতা থাকতে হবে যে, আমার কোনও কাজ যেন আল্লাহ তা'আলার মর্জি-বিরোধী না হয়। এটা দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়া সত্যিকারের

৩৩. উসদুল-গাবা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৮

মুসলিম হওয়া যায় না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ

'সেই ব্যক্তির কোনও ঈমান নেই, যার আমানতদারি নেই।'[৩৪]

এক রাখালের বিস্ময়কর ঘটনা

খায়বার যুদ্ধের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক রাখাল এসে উপস্থিত। সে ছিল ইহুদীদের মেষপালক। খায়বার দুর্গের বাইরে মুসলিম বাহিনীর শিবির দেখে তার মনে কৌতূহল জাগল যে, আমি গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং দেখি তারা কী বলে ও কী করে। কাজেই সে মেষপাল চরাতে চরাতে মুসলিম শিবিরের কাছে পৌছল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের নেতা কোথায়? তারা বললেন, আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুর ভেতর আছেন। তাদের কথা রাখালের প্রথমদিকে বিশ্বাস করা কঠিন হল। তার ধারণা ছিল, এত বড় বাদশাহ্ মামুলি একটা তাঁবুর ভেতর থাকতে পারেন না। তিনি যখন এত বড় বাদশাহ্ তখন খুব শান-শওকতে থাকবেন– এটাই তো স্বাভাবিক। অথচ এ তো দেখা যাচ্ছে খেজুর পাতার চাটাই দ্বারা তৈরি অতি সাধারণ তাঁবু। যাহোক, শেষ পর্যন্ত সে তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করল এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করল। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কী পয়গাম নিয়ে এসেছেন? আপনি কিসের দাওয়াত দেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সামনে ঈমান ও ইসলামের ব্যাখ্যা দান করলেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। সে বলল, ইসলাম গ্রহণ করলে তার ফলাফল কী দাঁড়াবে এবং আমার কী অধিকার লাভ হবে? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর তুমি আমাদের ভাই হয়ে যাবে এবং আমরা তোমাকে বুকে জড়িয়ে নেব। রাখাল বলল, আপনি কি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন? কোথায় আমি আর কোথায় আপনি? আমি

---

৩৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১১৯৩৫

এক মামুলি রাখাল, আমি কালো চামড়ার মানুষ। আমার শরীর থেকে বদবু ছড়ায়। এহেন অবস্থায় কী করে আপনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা অবশ্যই তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরব, আর তোমার দেহের যে কালো রং, আল্লাহ তা'আলা এটা শুভ্রোজ্জ্বল করে দেবেন এবং তোমার শরীরের বদবুকে খোশবুতে পরিণত করবেন।

তাঁর এসব কথা শোনার পর রাখাল আর দেরি করল না। তখনই ইসলাম গ্রহণ করল, ঘোষণা করল,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।' তারপর জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি কী করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এমন এক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছ, যখন কোনও নামায নেই যে, তোমাকে নামায পড়তে বলব, এটা রোযার মাসও নয় যে, তোমাকে রোযা রাখতে বলব। তোমার উপর যাকাতও ফরয নয়। এখন কেবল একটি ইবাদাতই আছে, যা তরবারির ছায়াতলে আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ।

রাখাল বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে শরীক হতে যাচ্ছি। বাকি যে ব্যক্তি জিহাদ করে, সে হয়তো গাজী হয়ে ফেরে, নয়তো আল্লাহর পথে প্রাণত্যাগ করে। তা আমি আল্লাহর পথে প্রাণত্যাগ করলে আপনি আমার কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, তুমি জিহাদে শহীদ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাত দান করবেন, তোমার শরীরের দুর্গন্ধকে সুরভিতে পরিণত করবেন এবং তোমার চেহারার কালো রংকে শুভ্রতা দ্বারা বদলে দেবেন।

রাখাল যেহেতু ইহুদীদের মেষপাল চরাতে চরাতে এসেছিল, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, তুমি ইহুদীদের মেষপাল নিয়ে এসেছ। এগুলো ফেরত দিয়ে এসো। কেননা এগুলো তোমার কাছে আমানত।[৩৫]

চিন্তা করুন, যাদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে, যাদেরকে অবরোধ করে রাখা হয়েছে, তাদের মালামাল তো গণীমতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু রাখাল যেহেতু বকরিগুলো চুক্তির ভিত্তিতে এনেছিল, তাই হুকুম দেওয়া হল, প্রথমে এগুলো ফেরত দিয়ে আসো তারপর জিহাদে শরীক হও। এ যুদ্ধেই তাঁর শাহাদাত নসীব হয়। বস্তুত এরই নাম ইসলাম।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি.

হযরত হুযায়ফা রাযি. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুপ্ত কথা জানতেন। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যখন তিনি এবং তাঁর পিতা হযরত ইয়ামান রাযি. ইসলাম গ্রহণ করার পর মদীনা তায়্যিবায় আসছিলেন। পথিমধ্যে আবূ জাহ্‌ল ও তার বাহিনীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়ে গেল। আবূ জাহল তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সসৈন্যে আসছিল। আবূ জাহল তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মুলাকাতের উদ্দেশ্যে মদীনা তায়্যিবায় যাচ্ছি। আবূ জাহল বলল, তাহলে তো আমরা তোমাদেরকে ছাড়ছি না। কারণ মদীনা পৌছে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে। তাঁরা বললেন, আমার উদ্দেশ্য কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করা। আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি না। আবূ জাহল বলল, তাহলে ওয়াদা করো, সেখানে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হবে না। কেবল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতই করবে। তিনি সেই ওয়াদা করলেন। ফলে আবূ জাহল তাকে ছেড়ে দিল। তিনি যখন মদীনা

৩৫. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬০৯

মুনাওয়ারায় পৌছান, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বদর যুদ্ধের জন্য মদীনা থেকে বের হয়ে পড়েছেন। রাস্তায় তাঁর সঙ্গে হযরত ইয়ামান রাযি.-এর সাক্ষাত হল।

এবার চিন্তা করুন। ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ, সত্য-মিথ্যার সর্বপ্রথম লড়াই, কুরআন মাজীদ যার নাম দিয়েছে يَوْمُ الْفُرْقَانِ 'সত্য-মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিক ইসলামের ইতিহাসে 'বদরী যোদ্ধা' নামে খ্যাত। ইসলামে বদরী সাহাবীদের অনেক উঁচু মর্যাদা। তাদের নামের বরকতে আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবুল করে থাকেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে সুসংবাদ শুনিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বদর যোদ্ধাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তো এহেন পরিস্থিতিতে, এমন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হল তখন হযরত হুযায়ফা রাযি. পূর্ণ ঘটনা খুলে বললেন, জানালেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবূ জাহল পথে আমাদেরকে গ্রেফতার করেছিল, আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না– এই মর্মে ওয়াদা দিয়ে কোনও মতে নিজেকে ছাড়িয়ে এনেছি, কিন্তু ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বদরের যুদ্ধে যাচ্ছেন, এটা ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, আমাদের বড় ইচ্ছা আমরাও যুদ্ধে শরীক হব, আমাদের থেকে আবূ জাহল যে ওয়াদা নিয়েছে, তা তো জোরপূর্বক নিয়েছে, গর্দানে তরবারি রেখে তা আদায় করেছে, আমরা ওয়াদা না করলে সে আমাদেরকে ছাড়ত না, তাই আমরা ওয়াদা করতে বাধ্য হয়েছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে এ যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দিন, এই ফযীলত ও মহান সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ দিন।[৩৬] হযরত ইয়ামান রাযি. যখন অনুনয় বিনয় করে এ অনুরোধ করলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, না, তুমি তো তাদেরকে ওয়াদা দিয়ে এসেছ। তোমাকে এই শর্তেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, তুমি এসে কেবল

---

৩৬. আল-ইসাবা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৬

আমার সঙ্গে সাক্ষাত করবে, আমার সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। সুতরাং তোমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতে পারছি না।

এটা এমনই এক পরিস্থিতি, যাতে মানুষের ওয়াদা ও কথা রক্ষার পরীক্ষা হয়ে যায়। আমাদের মতো লোক হলে হাজারও রকমের ব্যাখ্যার আশ্রয় নিত। হয়তো বলত, তারা আমার থেকে যে ওয়াদা নিয়েছিল আমি সে ওয়াদা খাঁটি মনে করিনি, চাপের কারণে মুখে-মুখে করেছি। কিংবা এটা ওযরের অবস্থা। কাজেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে শামিল হয়ে কুফরের মুকাবিলা করা উচিত, বিশেষত যখন এ যুদ্ধে একজন লোকেরও অনেক মূল্য। কেননা মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, তাদের সাথে মাত্র ৭০টি উট, ২টি ঘোড়া ও ৮টি তরবারি ছিল। বাকিরা যুদ্ধ করেছিল লাঠি-সোটা বা পাথর দ্বারা। এই নিরস্ত্র, মুষ্টিমেয় সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছে এক হাজার সংখ্যক সশস্ত্র সৈন্যের বিরুদ্ধে। কাজেই একজন লোকেরও এখানে বড় মূল্য। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যে কথা বলা হয়েছে, যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার বিপরীত করা যাবে না। এরই নাম ইসলাম।

এর কারণ, ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য কেবল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা দখল করা নয়, বরং সত্যকে সমুন্নত করা ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা। যদি সত্যকে পদদলিত করে জিহাদ করা হয়, গুনাহে লিপ্ত হয়ে দ্বীনের কাজ করা হয়, তবে সেটা শরী'আতের দৃষ্টিতে আদৌ জিহাদ বা দ্বীনের কাজ বলে গণ্য হবে না। আজকাল যে আমাদের সমস্ত মেহনত বৃথা যাচ্ছে, প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে না, তার আসল কারণ, আমরা গুনাহের পথে তাবলীগ করতে চাই, গুনাহের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করতে চাই, আমাদের মন-মস্তিষ্কে সর্বক্ষণ ভিত্তিহীন ওযর-অজুহাত, মনগড়া ব্যাখ্যা ও ছল-চাতুরি তৈরি হতে থাকে। কখনও বলা হয়, এখনকার বিচক্ষণতা ও যুক্তি-বুদ্ধির দাবি এই এই পন্থা অবলম্বন করা, কাজেই চলো শরী'আতের এই হুকুমটি কিছুক্ষণের জন্য তুলে রাখি। এভাবে কৌশলের পেছনে পড়ে শরী'আতকে উপেক্ষা করি।

কিন্তু সেখানে তো উদ্দেশ্য ছিল একটিই– আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল। অর্থ-সম্পদ নয়, বিজয় নয় এবং নয় বীরত্বের খ্যাতি অর্জন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। আর তা নিহিত ছিল ওয়াদা রক্ষার ভেতর। আর তা রক্ষার খাতিরে হযরত হুযায়ফা রাযি. ও তাঁর পিতা উভয়কেই এ মহান যুদ্ধের ফযীলত লাভ থেকে বঞ্চিত রাখা হল, কারণ পিতা-পুত্র উভয়েই যুদ্ধ না করার কথা দিয়ে এসেছিলেন। এরই নাম ইসলাম, যার ভেতর সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করতে আদেশ করা হয়েছে।

হযরত মু'আবিয়া রাযি. ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা

হযরত মু'আবিয়া রাযি. এমন এক সাহাবী, যার সম্পর্কে লোকে নানা রকম প্রোপাগাণ্ডা করেছে। আল্লাহর পানাহ! লোকে তাঁর মহিমার প্রতি লক্ষ না করে, বরং তার সাথে গুস্তাখী করারও ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। তাঁর একটি ঘটনা শুনুন।

হযরত মু'আবিয়া রাযি. ছিলেন শামের গভর্নর, যে কারণে রোমান সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। সেকালে রোম বিশাল শক্তির অধিকারী। তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম প্রধান সুপার পাওয়ার হিসেবে গণ্য ছিল। একবার রোমানদের সাথে হযরত মু'আবিয়া রাযি.- এর যুদ্ধবিরতি চুক্তি হল। মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হল যে, অমুক তারিখ পর্যন্ত আমরা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। মেয়াদ তখনও শেষ হয়নি, তবে বেশি দিন বাকিও নেই, এরকম অবস্থায় হযরত মু'আবিয়া রাযি. মনে করলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তো যুদ্ধবিরতি চলবেই, তবে এর মধ্যে আমি সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় সৈন্য জমায়েত করে রাখি, যাতে মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্র আক্রমণ চালাতে পারি। শত্রুরা তো মনে করে থাকবে, যেহেতু যুদ্ধবিরতি চলছে, তাই এখন কি আর সৈন্য পাঠানো হবে? সৈন্য পাঠালেও মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেই পাঠানো হবে আর সে ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত পৌছতে তাদের অনেক সময় লেগে যাবে আর সেই অবকাশে প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাবে। এসব

ভাবনার কারণে শত্রুরা প্রস্তুত থাকবে না। কাজেই সীমানার কাছাকাছি সেনা মোতায়েন করে রাখলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা যাবে। ফলে সহজেই বিজয় অর্জিত হবে।

সুতরাং হযরত মুআবিয়া রাযি. সীমান্ত এলাকায় সৈন্য জমায়েত করে রাখলেন। কিছু সংখ্যক সৈন্য সীমান্তের ওপারে তাদের এলাকার ভেতরও মোতায়েন করলেন এবং এভাবে হামলার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রাখলেন। অবশেষে যেই না যুদ্ধবিরতিকালের সর্বশেষ দিনের সূর্যাস্ত ঘটল, অমনি হযরত মুআবিয়া রাযি. সৈন্যদেরকে মার্চ করার হুকুম দিলেন। সৈন্যগণ রোমান এলাকার ভেতর আক্রমণ শুরু করলে এ কৌশল খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হল। তারা বিনা বাধায় নগরের পর নগর জয় করে চলল। এভাবে মুসলিম বাহিনী প্রবল পরাক্রমে এগিয়ে চলছিল। ঠিক এ সময় পেছন থেকে এক ঘোড় সওয়ারকে ছুটে আসতে দেখা গেল। সেদিকে হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেলেন। হতে পারে ইনি আমীরুল মুমিনীনের কোনও দূত। বিশেষ কোনও বার্তা নিয়ে আসছেন। ঘোড় সওয়ার যখন আরও কাছে এসে পৌছাল, তখন তার আওয়াজ শোনা গেল। চিৎকার করে বলছেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قِفُوْا عِبَادَاللّٰهِ قِفُوْا عِبَادَاللّٰهِ

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা দাঁড়াও, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা দাঁড়াও।' ঘোড় সওয়ার আরও কাছে আসলে হযরত মু'আবিয়া রাযি. লক্ষ করে দেখলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আমর ইবন আবাসা রাযি.। হযরত মু'আবিয়া রাযি. জিজ্ঞেস করলেনে, খবর কী? তিনি বললেন,

وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ

'মুমিনের চরিত্র প্রতিশ্রুতি রক্ষা, বিশ্বাসঘাতকতা নয়, মুমিনের চরিত্র প্রতিশ্রুতি রক্ষা, বিশ্বাসঘাতকতা নয়।' হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন, আমি তো কোনও বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমি আক্রমণ করেছি তো যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর। হযরত আমর ইবন আবাসা রাযি.

বললেন, মেয়াদ শেষ হয়েছিল বটে, কিন্তু তা শেষ হওয়ার আগেই আপনি সীমান্তে সেনা সমাবেশ করেছিলেন এবং সৈন্যদের একটা অংশ সীমান্তের ভেতরেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এটা যুদ্ধবিরতি চুক্তির লঙ্ঘন হয়েছে, আমি নিজ কানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلَّنَّهُ وَلَا يَشُدَّنَّهُ اِلٰى اَنْ يَّمْضِيَ اَجَلٌ لَهُ اَوْ يَنْبِذَ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ.

'কোনও সম্প্রদায়ের সাথে কারও কোনও বিষয়ে চুক্তি থাকলে সে যেন সেই চুক্তিতে কোনও হেরফের না করে, যাবৎ না তার মেয়াদ শেষ হয় বা তাদেরকে খোলাখুলি চুক্তি বাতিল করার কথা জানিয়ে দেয়।'[৩৭] সুতরাং মেয়াদ শেষ হওয়ার বা চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার আগে তাদের এলাকায় সেনা সমাবেশ ঘটানো বৈধ হয়নি। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশের পরিপন্থী।

লক্ষ করুন, একটি যুদ্ধজেতা বাহিনী, শত্রুর এলাকা একের পর এক অধিকার করে যাচ্ছে, ইতোমধ্যে বিস্তৃত অঞ্চল করতলগত হয়ে গেছে, তারা বিজয় নেশায় উদ্দীপিত, এ অবস্থায় তাদের পক্ষে পেছন ফেরা কত কঠিন? কিন্তু তারা তো সত্যিকারের মুসলিম! যেই না মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ শিক্ষা কানে পড়ল যে, নিজ প্রতিশ্রুতি শতভাগ রক্ষা করা ইসলামের অপরিহার্য বিধান, তৎক্ষণাৎ হযরত মুআবিয়া রাযি. হুকুম দিলেন, বিজিত সবটা এলাকা ওয়াপস করে দাও। সুতরাং তারা সবটা অধিকৃত ভূমি ছেড়ে দিলেন এবং পুনরায় সীমান্ত অতিক্রম করে নিজেদের এলাকায় ফিরে আসলেন। বিশ্ব ইতিহাসে কোনও জাতি এমন নজির দেখাতে পারবে না যে, কেবল অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বিজিত ভূমি এভাবে ফেরত দিয়েছে। বস্তুত এখানে তো দেশ জয় লক্ষ্য ছিল না, ক্ষমতা ও রাজত্ব উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল

---

৩৭. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৫০৬; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২৫৭৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৬৪০

কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা, তাই যখনই আল্লাহ তা'আলার হুকুম জানা হয়ে গেল যে, ওয়াদার বিপরীত কাজ করা জায়েয নয়, আর এ স্থলে ওয়াদা ভঙ্গের কিছুটা সন্দেহ পাওয়া যাচ্ছে, তাই পত্রপাঠ সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলেন এবং সবটা বিজিত ভূমি ফেরত দিয়ে দিলেন। এই হচ্ছে ইসলাম, যে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।

হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর প্রতিশ্রুতি রক্ষা

বায়তুল মুকাদ্দাস যখন মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়, তখন সেখানকার খ্রিষ্টান ও ইহুদী বাসিন্দাদের সাথে হযরত উমর রাযি. একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। তাতে বলা হয়েছিল, আমরা তোমাদের জান মাল হেফাজত করব আর তার বিনিময়ে তোমরা আমাদেরকে জিযিয়া দেবে। জিযিয়া হচ্ছে এক রকম কর, যা অমুসলিমদের থেকে তাদের জান-মাল রক্ষার বিনিময়ে গ্রহণ করা হয়। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর তারা প্রতি বছর তা আদায় করে যাচ্ছিল।

একবারের ঘটনা। অন্য শত্রুর সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ দেখা দিল। সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য ছিল না। এদিকে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করা ছিল। কেউ কেউ পরামর্শ দিল, এখানে যেহেতু প্রচুর সংখ্যক সৈন্য রয়েছে, যাদের বিশেষ প্রয়োজন এখানে নেই, তাই ওই রণক্ষেত্রে এখান থেকে সৈন্য প্রেরণ করা হোক। পরামর্শটি হযরত উমর রাযি.-এর পসন্দ হল। তিনি সেমতে সৈন্য প্রেরণের নির্দেশ দিলেন। সেই সঙ্গে হুকুম দিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসে যত খ্রিষ্টান ও ইহুদী আছে, তাদেরকে সমবেত করো এবং তাদেরকে বলো, আমরা তোমাদের জান-মাল রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছিলাম এবং সে কারণেই এখানে সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল, কিন্তু অন্য রণক্ষেত্রে এখন আমাদের সৈন্য দরকার হয়ে পড়েছে। ফলে এখন আর আমাদের পক্ষে তোমাদেরকে হেফাজত করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ বছর তোমরা যে করো প্রদান করেছিলে, আমরা তা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি এবং আমরা

আমাদের সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এখন তোমাদের জান-মালের হেফাজত কিভাবে হবে তার ব্যবস্থা তোমরা নিজেরাই করে নাও।

এই হচ্ছে ইসলাম, কেবল নামায পড়ল, রোযা রাখল আর তাতেই মুসলিম হয়ে গেল এমন ভাবনা ঠিক নয়। বরং যতক্ষণ নিজের পূর্ণ অস্তিত্ব চোখ, কান, মুখ ও সমগ্র জীবনাচার আল্লাহ তা'আলার মর্জি মোতাবেক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়া যাবে না।

অন্যকে কষ্ট দেওয়া ইসলাম-বিরোধী কাজ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুসিলম সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। অন্য মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ। মদ পান করা যেমন গুনাহ, ব্যভিচার করা ও শূকরের গোশত খাওয়া যেমন গুনাহ, অন্যকে কষ্ট দেওয়াও সেই রকম গুনাহ। কষ্ট দেওয়ার যত পন্থা আছে সবই কবীরা গুনাহ। এটা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয যে, সে নিজের পক্ষ হতে কাউকে কোনও রকম কষ্ট দেবে না। মনে করুন, আপনি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, বিশেষ প্রয়োজনে কোথাও পার্কিংয়ের দরকার পড়ল, এখন আপনি যদি এমন জায়গায় গাড়ি দাঁড় করান, যেখান থেকে মানুষের চলাচল কঠিন হয়ে গেল, তবে এই কষ্ট দেওয়ার ফলে আপনি একটি কঠিন গুনাহ করলেন। আপনি তো ভাবছেন, বড় জোর ট্রাফিক আইন অমান্য করা হল, যাকে আপনি দ্বীনের পরিপন্থী ও গুনাহের কাজ গণ্য করছেন না। অথচ এটা কেবল অনৈতিক কাজই নয়, কবীরা গুনাহও বটে, যেমন মদপান করা একটি কবীরা গুনাহ। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুসলিম সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত তথা সব রকম আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং তার দ্বারা কেউ কোনও রকমের কষ্ট পায় না। অথচ আপনি আপনার গাড়িটি ভুল জায়গায় পার্কিং করে অন্যদের কষ্ট দিয়েছেন।

আজ আমরা 'দ্বীনে ইসলাম'-কে নামায, রোযা, মসজিদ, তাসবীহ, ওযীফা ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যে সীমিত করে ফেলেছি। আল্লাহ তা'আলা

বান্দাদের যেসব হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা দ্বীনের অপরিহার্য অংশ, তা বেমালুম ভুলে গিয়েছি, তাকে দ্বীন থেকে খারিজ করে দিয়েছি।

প্রকৃত নিঃস্ব কে?

হাদীছ শরীফে আছে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, জানো, নিঃস্ব কে? তাঁরা আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে নিঃস্ব তো তাকেই মনে করা হয়, যার কোনও টাকা-পয়সা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার টাকা-পয়সা নেই, প্রকৃত নিঃস্ব সে নয়। প্রকৃত নিঃস্ব সেই, যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে যখন উপস্থিত হবে, তার আমলনামায় বিস্তর নামায, রোযা তাসবীহ ইত্যাদি থাকবে, অন্যদিকে এটাও থাকবে যে, সে কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে ধোঁকা দিয়েছে, কারও মনে কষ্ট দিয়েছে, কাউকে গালি দিয়েছে, মোটকথা সে এভাবে বহু লোকের হক নষ্ট করেছে। যাদের হক নষ্ট করেছে, তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি আমাদের হক নষ্ট করেছিল, আপনি তার থেকে তা আদায় করিয়ে দিন। সেখানে তো টাকা-পয়সা চলবে না যে, তা দিয়ে তাদের পাওনা মিটিয়ে দেবে। সেখানকার মুদ্রা হল নেকী। সুতরাং পাওনাদারদেরকে তার নেকী থেকে দেওয়া শুরু হবে। কাউকে তার নামায দিয়ে দেওয়া হবে, কাউকে রোযা দিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে হকদারগণ এক এক করে তার নেকী নিয়ে যেতে থাকবে। এক পর্যায়ে তার সব নেকী শেষ হয়ে যাবে। নামায-রোযার যে সঞ্চয় ছিল সব ফুরিয়ে যাবে। তার হাত খালি হয়ে যাবে। অথচ হকদারদের হক তখনও বাকি থেকে যাবে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা হুকুম করবেন, এখন হকদারদের আমলনামায় যে গুনাহ আছে, তা এই ব্যক্তির আমলনামায় যোগ করে দেওয়া হোক। সুতরাং তাই করা হবে। তাদের হকের বিনিময়ে তাদের গুনাহ কেটে এই ব্যক্তির কাঁধে ফেলা হবে। সে উপস্থিত তো হয়েছিল বিপুল নেকী নিয়ে, কিন্তু হক মেটাতে গিয়ে এক দিকে সব নেকী ফুরিয়ে যাবে, অন্যদিকে হকদারদের গুনাহের বোঝা তার মাথায় চেপে যাবে। এভাবে নিজের

গুনাহের সঙ্গে তাদেরও গুনাহের বোঝা নিয়ে তাকে ফিরতে হবে।[৩৮] এই ব্যক্তিই প্রকৃত নিঃস্ব।

আজ আমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামে নেই

ভেবে দেখুন হুকূকুল-ইবাদের বিষয়টা কত কঠিন। অথচ আমরা একে দ্বীন থেকেই খারিজ করে দিয়েছি। কুরআন মাজীদ বলছে, হে মুমিনগণ! তোমরা আধা-আধি নয়, পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও। তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের জীবন, তোমাদের ইবাদত, লেনদেন, সামাজিকতা, নৈতিকতা সবকিছুই যেন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর তা হলেই তোমরা সত্যিকার অর্থে মুসলিম হতে পারবে। মূলত এরই মাধ্যমে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। কেবল প্রচার দ্বারাই ইসলামের প্রসার হয়নি। বরং মানুষের কর্ম ও কীর্তি দ্বারা, মুসলিমদের আখলাক-চরিত্র দ্বারাই ইসলাম বিশ্বজয় করেছে। মুসলিমগণ যেখানেই গিয়েছে বিশুদ্ধ জীবনাচার ও উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে সেখানেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ফলে ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আজ আমাদের কর্ম ও চরিত্র দেখে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরছে।

সুতরাং আজ আমাদেরকে ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশের সংকল্প করতে হবে। এই মাহফিলে আমরা যে দ্বীনের কথা শুনতে এসেছি, এর দ্বারা যেন উপকৃত হতে পারি সেই লক্ষ্য থাকা চাই। আমরা এই উপকার এভাবে লাভ করতে পারি যে, এখন থেকে আমরা আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে ইসলামের আওতাধীন করতে সচেষ্ট থাকব। ইবাদত, লেনদেন, সামাজিকতা নৈতিকতা সবকিছুই যেন ইসলাম মোতাবেক হয়ে যায় সেই সাধনা চালাতে থাকব।

---

৩৮. মুসলিম, হাদীছ ৪৬৭৮; তিরমিযী, হাদীছ ২৩৪২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ৭৬৮৬

এজন্য প্রথম যা দরকার তা হল, দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর থেকে কিছুটা সময় দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করার জন্য বরাদ্দ করে ফেলুন। নির্ভরযোগ্য বই-কিতাব হাতের নাগালেই পাওয়া যাচ্ছে। নিজ নিজ ঘরে সেগুলো পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আজকের বড় মসিবত হল, আমরা দ্বীনের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত নই। অথচ সহীহ আমলের জন্য সহীহ ইলম জরুরি। আজ যদি আমরা এতটুকু ফায়দাও হাসিল করি এবং এর মাধ্যমে দ্বীনের উপর চলার জন্য অনুপ্রাণিত হতে পারি, তবে ইনশাআল্লাহ এ জলসা সার্থক প্রমাণিত হবে। অন্যথায় কথা বলা ও শোনার মজলিস তো অনেকই হচ্ছে। কেবল অনুষ্ঠান সর্বস্বতা তো কাম্য হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাকেও এবং আপনাদের সকলকেও এসব কথায় আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

'দ্বীন'-এর হাকীকত-১*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র (মনোনীত) দ্বীন।[৩৯]

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! 'দ্বীন' এর হাকীকত' কথাটি বলতে তো খুবই সংক্ষেপ, মাত্র তিনটি শব্দ। কিন্তু আমরা এর ব্যাখ্যায় গেলে কথা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। কারণ তখন দ্বীনের সবগুলো দিক সামনে নিয়ে আসতে হবে। সেজন্য সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। এখন আমি এ সম্পর্কিত একটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকের বাতাবরণে 'দ্বীন'-এর নাম নিলে সাধারণভাবে একে দুনিয়ার বিপরীত ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হয়, যখন কোনও দিক থেকে ডাক দেওয়া

---

* ইসলাহী মাওয়ায়েয। খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৩-১৭৬

৩৯. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯

হয়, 'তোমরা দ্বীনের দিকে এসো', তখন এর অর্থ ধরে নেওয়া হয়, দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করো। অর্থাৎ দ্বীনের দিকে আসলে আমাদেরকে দুনিয়ার সব প্রয়োজন, সকল ইচ্ছা, চাহিদা ও জীবন-যাপনের জন্য আবশ্যকীয় সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে। তা না হলে দ্বীনের বরকত হাসিল করা সম্ভব নয়। এভাবে দ্বীন ও দুনিয়াকে পরস্পরবিরোধী ও বিপ্রতীপ মনে করা হয়, যেন এক পাত্রে দু'টোর ঠাঁই সম্ভব নয়। কাজেই আজকের এ মাহফিলে আমি সংক্ষেপে দ্বীনের হাকীকত তুলে ধরতে চাই এবং কোন্ অর্থে দ্বীন ও দুনিয়া পরস্পরবিরোধী এবং কোন্ অর্থে উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই তা পরিষ্কার করতে চাই।

মানুষকে দ্বীনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে

প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তিরই আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আছে, অর্থাৎ বিশ্বাস রাখে ও স্বীকার করে এ জগৎকে কোনও এক স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির অবশ্যই এক অস্তিত্বদাতা আছেন, তাকে মানতে হবে যে, সৃষ্টির পেছনে অবশ্যই তাঁর বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য থাকবে আর সে উদ্দেশ্য হাসিল করারও বিশেষ কোনও পদ্ধতি থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অহেতুক সৃষ্টি করতে পারেন না। এমনও হতে পারে না যে, যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে কোনও রকম দিক-নির্দেশনা ছাড়া তাকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দেবেন। সারকথা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি যারই ঈমান আছে, সে এটাও মানতে বাধ্য যে, তিনি মানুষকে দুনিয়ায় জীবন-যাপনের পন্থাও শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর হিদায়াতের ব্যবস্থাও করেছেন।

বিষয়টাকে এভাবেও ব্যক্ত করা যেতে পারে– আল্লাহ তা'আলা যেহেতু 'আলেমুল-গায়ব ও পরম প্রজ্ঞাময়, তাই তাঁর জানা আছে, দুনিয়ায় আসার পর মানুষ কিছু বিষয় নিজে-নিজেই বুঝতে পারবে। তাতে বাইরের কোনও সাহায্য দরকার হবে না। সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য তার নিজ জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট হবে। এভাবে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে যেসকল বিষয়ে মানুষ উপযুক্ত কাজ করতে সক্ষম হবে। সেই

সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার এ কথাও জানা ছিল যে, অনেক বিষয় এমনও রয়েছে যে সম্পর্কে বাইরের দিক নির্দেশনা ছাড়া মানুষকে তার নিজ বুদ্ধির উপর ছেড়ে দেওয়া হলে সে ঠিক দিশা পাবে না। তার বুদ্ধি হোঁচট খাবে। ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সেই ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য তিনি মানুষকে বিধানাবলির এমন একটা সমষ্টি দান করেছেন, যার আলোকে সে ভালো-মন্দ চিনতে সক্ষম হবে।

আল্লাহপ্রদত্ত দিক-নির্দেশনার সারমর্ম

মানববুদ্ধি যেসকল ক্ষেত্রে বাইরের নির্দেশনা ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন মনে করুন, একটি জায়গায় ময়লা-আবর্জনা পড়ে আছে, তার বিপরীতে আরেকটি জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এ দুই জায়গার কোনও একটি বেছে নেওয়ার দরকার হলে নিশ্চয়ই যে ব্যক্তির মধ্যে কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব ও রুচিবোধ আছে, সে পরিষ্কার জায়গাটাই বেছে নেবে; নোংরা স্থান সে কখনও পসন্দ করবে না। বোঝা গেল, এরূপ ক্ষেত্রে বাইর থেকে বিধান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিই এখানে ফয়সালা দান করে যে, নোংরা স্থান অপেক্ষা পরিষ্কার জায়গাই উত্তম।

এমনিভাবে সুস্বাদু ও বিস্বাদ, মিঠা ও তিতা ইত্যাদি দ্রব্যসমূহের মধ্যে বাইরের নির্দেশনা প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মানববুদ্ধি ধোঁকা দিতে পারে, তাতে বাইরের নির্দেশনা প্রয়োজন। তাই এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে হিদায়াত ও পথ-নির্দেশের ব্যবস্থা করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। এটাই আল্লাহপ্রদত্ত হিদায়াতের সারমর্ম।

সত্যিকারের দ্বীন কোন্‌টি

এতক্ষণ যা বলা হল তা যদি বুঝে এসে থাকে, তবে পরবর্তী প্রশ্ন দাঁড়ায়, মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা যে ব্যবস্থা করেছেন, যাকে দ্বীন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে, সেই সত্যিকারের

দ্বীন কোন্‌টি? এর উত্তর ওই আয়াতের মধ্যেই রয়েছে, যা আমি শুরুতে আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ

'আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র (মনোনীত) দ্বীন।[৪০] ইসলাম কাকে বলে আলহামদুলিল্লাহ প্রতিটি মুসলিমই তো জানে।

ইসলামের মূল ভিত্তি তো তাওহীদ, রিসালাত আখিরাত ইত্যাদি আকীদা-বিশ্বাসের উপর। কিন্তু আমি এ স্থলে বিশেষভাবে একটা জিনিসের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ইসলামের শাব্দিক অর্থ আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য স্বীকার করা। অর্থাৎ কারও বশ্যতা স্বীকার করে তার প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করে নেওয়া। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً

'হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো পরিপূর্ণরূপে।'

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, একদিকে আল্লাহ তা'আলা সম্বোধন করেছেন এমন সব লোককে যারা ঈমান এনে ফেলেছে, অন্যদিকে তাদেরকেই আদেশ করছেন, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো। এর দ্বারা বোঝা গেল, মুসলিম হওয়ার জন্য কেবল কালিমা পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। কালিমা পড়লেই একজন লোক পূর্ণাঙ্গ মুমিন হয়ে যায় না। কাজ আরও বাকি থাকে। তা আঞ্জাম দেওয়ার দ্বারাই মানুষের ইসলামের প্রবেশ পূর্ণাঙ্গ হয়। সে কাজ হল আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধের তাবেদার বনে যাওয়া, তিনি যখন যা হুকুম করেন, তা বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া, আর এটাই ইসলামের সারকথা।

ইসলামের হাকীকত

সূরা সাফ্‌ফাতে যেখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও হযরত ইসমাঈল যাবীহুল্লাহ আলাইহিমাস সালামের ঘটনা বর্ণনা

৪০. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯

করেছেন, সেখানে ইসলাম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এরকম, একবার হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বপ্নে দেখলেন, কলিজার টুকরা, একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে যবাহ করছেন। নবীদের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। কাজেই সেমতে তিনি পুত্রকে যবাহ করতে তৈরি হলেন। তার আগে পরীক্ষাস্বরূপ পুত্রকে বললেন,

يٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى

'হে বাছা! আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে যবাহ করছি। সুতরাং চিন্তা করে বলো, তোমার অভিমত কী?'[৪১]

ভেবে দেখুন, বিনা অপরাধে কাউকে হত্যা করা তো কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

'নর হত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল।'

এই বিনা অপরাধে যদি হত্যা করা হয় কোনও নাবালেগ শিশুকে, তবে সে গুনাহ আরও গুরুতর। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধাবস্থায়ও নাবালেগ শিশুকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণিত আছে–

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধাবস্থায় নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।'[৪২]

আবার সেই শিশু যদি হয় নিজ সন্তান, আর তাকেই হত্যা করার আদেশ এসে যায়, তবে কারও বুদ্ধি-বিবেক এ হত্যার বৈধতা স্বীকার

---

৪১. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ১০২

৪২. বুখারী, হাদীছ নং ২৭৯২; মুসলিম, হাদীছ নং ৩২৭৯; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৪৯৪

করবে না। কিন্তু এ পুত্র তো যে-সে নয়- হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালামের সন্তান, যিনি নিজেও একসময় নবী হওয়ার রয়েছেন এবং যার উরস ধারায় জন্ম নেওয়ার রয়েছেন আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কাজেই তিনি নিজ শান মোতাবেক উত্তর দিলেন-

يَاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

'আব্বাজী! আপনাকে যে আদেশ করা হচ্ছে, তা পালন করে ফেলুন। নিশ্চয়ই আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের একজন পাবেন।'[৪৩] এই পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করার পর কুরআন মাজীদ এর সমাপ্তি টেনেছে যে শব্দে, তা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। বলা হয়েছে-

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ

'যখন তারা (পিতা-পুত্র) উভয়ে ইসলাম প্রকাশ করল। (আনুগত্য স্বীকার করল ও আত্মসমর্পণ করল) এবং পিতা-পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল।'[৪৪]

এ স্থলে যে ইসলাম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য ইসলামের হাকীকতের প্রতি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কোনও আদেশ এসে গেলে কোনও রকম ইতি-উতি করা ও কারণ জানতে চাওয়া ছাড়াই পত্রপাঠ তা শিরোধার্য করে নেওয়ারই নাম ইসলাম। কেননা 'কারণ' জানতে চাওয়া ও 'কেন' এর পেছনে পড়া বন্দেগীসুলভ আচরণ নয়, উন্নাসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

বর্তমানকালে এক গোমরাহীসুলভ পন্থা চালু হয়ে গেছে। যখনই দ্বীন সম্পর্কিত কোনও বিধান বয়ান করা হয়, এক শ্রেণির লোক বলে ওঠে, এরকম বিধান কেন? ভাবখানা এমন, এ বিধানের কারণ ও তাৎপর্য বুঝে আসলে তো আমরা এটা মানব, তা না হলে নয়। এই ভাবভঙ্গী ইসলামী মেজাযের পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে বিধান পাঠানই

৪৩. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ১০২
৪৪. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ১০৩

তো এমন স্থলে, যেখানে বুদ্ধির হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং বুদ্ধির পক্ষে সঠিক ফয়সালা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের তাৎপর্য সবসময় বুঝে ওঠা সম্ভব নাও হতে পারে। কাজেই কোথাও কোনও বিধানের তাৎপর্য বোঝা না গেলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আপনি পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পড়লে এমন এক শ্রেণির চিন্তাবিদের সম্মুখীন হবেন, যাদের দাবি হল– এ জগতে ভালো-মন্দের সুনির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞা নেই। এটা সম্পূর্ণই আপেক্ষিক জিনিস। যে পরিবেশে যে বস্তুর যে রকম চলে, সেটাই ধর্তব্য। কাজেই একই বস্তু ভিন্ন-ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্ন আখ্যা পেতে পারে– এক পরিবেশে ভালো, অন্য পরিবেশে মন্দ। এই মহল শরী'আতের বিধানকেও এভাবেই বিচার করে। উদাহরণত শরী'আতে শূকরের গোশত হারাম। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর কিছু তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য হলেও প্রকৃত কারণ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কিন্তু ওই মহলটির দাবি, শূকরের গোশত হালাল। তাদের যুক্তি হল, যখন শূকরের গোশত হারাম করা হয়েছিল, তখন আরব দেশে শূকর পালন করা হতো নোংরা স্থানে এবং তারা নাপাকী খেত। ফলে তার গোশত খেলে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি দেখা দিত। বর্তমানকালে তো শূকর পালন করা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। এখন আর অবৈধতার সে কারণ বাকি নেই। কারণ যখন শেষ হয়ে গেছে, বিধানও রহিত হয়ে যাবে বৈকি! ব্যাপারটা এখানেই থেমে নেই। একবার এক ব্যক্তি তো এ বিষয়ে আমার সাথে বাহাস করতেই প্রস্তুত হয়ে গেল। তার কথা হল উলামায়ে কেরামের উচিত শূকরের গোশতের ব্যাপারে নুতনভাবে ইজতিহাদ করা এবং এভাবে চিন্তা করা যে, শূকরের গোশত এই কারণে হারাম করা হয়েছিল। এখন যেহেতু সে কারণ লুপ্ত তাই সে বিধানও খতম হয়ে গেছে। এখন শূকরের গোশত হালাল। এসব বিভ্রান্তি ঘটার কারণ বুদ্ধির অপব্যবহার। বুদ্ধির দৌড় যে পর্যন্ত পৌছায় না, এখন মানুষ সেখানেও বুদ্ধির ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। জনাব, বুদ্ধি সেখানে অচল বলেই তো আল্লাহ তা'আলা

ওহী দ্বারা আমাদের পথ নির্দেশ করেছেন। সুতরাং দ্বীনী বিধানাবলি সম্পর্কে 'কারণ' ও তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা ও তা বোঝার উপর আমলকে স্থগিত রাখা দ্বীনের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রমাণ বহন করে।

আমি এ বিষয়টিকে একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে থাকি। আপনাদের জানা আছে, দুনিয়ায় মানুষের দু'টি স্তর আছে। আলহামদুলিল্লাহ তার মধ্যে একটি স্তর এখন লুপ্ত, অর্থাৎ দাসত্বের স্তর। দাসত্বের স্থলে এখন এসেছে চাকরি, যা দাসত্ব অপেক্ষা অনেক উন্নত। কেননা দাসকে চব্বিশ ঘণ্টা মনিবের কাজ-কর্মের জন্য উপস্থিত থাকতে হতো এবং তার বিনিময়ে সে কোনও বেতনও পেত না। পক্ষান্তরে চাকরিজীবী চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাজ করে থাকে এবং তাকে বেতনও দেওয়া হয়।

আপনার ঘরে একজন চাকর আছে। আপনি তাকে বললেন, আমাকে পাঁচ লিটার দুধ এনে দাও। এখন সে যদি প্রশ্ন তোলে, আপনার জন্য কেন দুধ আনতে হবে, তবে বলুন তো আপনার প্রতিক্রিয়া কী হবে। বলা বাহুল্য আপনি তার প্রতি নাখোশ হবেন, অথচ সেও আপনারই মতো একজন মানুষ। এবার বলুন, আল্লাহ– যিনি আমাদের ও নিখিল বিশ্বের সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক এবং সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, যার জ্ঞানের সামনে আমাদের জ্ঞান কোনও হিসেবেই আসে না, তিনি কোনও বিষয়ে হুকুম করলে বান্দার কি এ অধিকার থাকতে পারে যে, আমাকে প্রথমে এ হুকুমের রহস্য ও তাৎপর্য বুঝতে হবে, তারপর আমি এটা পালন করব? এ সম্পর্কেই কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যখন কোনও হুকুম এসে যায়, তখন নিজেদের কাজে মুমিন নর-নারীর কোনও এখতিয়ার থাকে না।'[৪৫]

৪৫. সূরা আহযাব, আয়াত ৩৬

দৃষ্টিকোণের বদল দ্বারা দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যায়

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহপ্রদত্ত যেসকল বিধান বিনা বাক্যে শিরোধার্য করতে হয়, মানব জীবনে তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তার বাইরে জীবনের সবটা অংশই স্বাধীন। যেমন রান্নাবান্না, খাদ্য তৈরি, জীবিকার ব্যবস্থা জীবন পরিচালনা প্রভৃতির সুবিস্তৃত অঙ্গন।

দ্বীনের হাকীকত হল আল্লাহপ্রদত্ত বিধানাবলির যথাযথ অনুসরণ। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যখন যে বিধান আসে, তা করণীয় বিষয় হোক বা বর্জনীয়, সে বিধান শিরোধার্য করে নেওয়াই হচ্ছে দ্বীনদারী। দুনিয়াবী বিষয়েও যদি মানুষ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেয়, তাও দ্বীনে পরিণত হয়, যেমন শুরুতে আমি আরয করেছি, দ্বীন ও দুনিয়া পরস্পর বিরোধী নয়; বরং একটি অন্যটির সহায়ক ও পরিপূরক।

অর্থাৎ পার্থিব জীবনের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির বদল দরকার। দৃষ্টিভঙ্গি বদলালেই তা দ্বীন হয়ে যায়। যেমন আমরা সকলেই তো খানা খাই। এটা দুনিয়াবী কাজ। কিন্তু এই খানা খাওয়াটাই যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে হয় যে, এটা আমার আল্লাহ তা'আলার দান, এটা তাঁর নি'আমাত, যা আমি হালাল পন্থায় অর্জন করেছি, আমি আমার ব্যক্তিসত্তার হক আদায়ের লক্ষ্যে এটা খাচ্ছি, তবে এটাও দ্বীন হয়ে যাবে। এর উদাহরণ এমন সব ছবি, যা এক দিক থেকে দেখলে একটা জিনিস মনে হয়, অন্যদিক থেকে দেখলে অন্য জিনিস। দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়টাও ঠিক এ-রকমই।

আমি একটা প্রাকটিক্যাল জিনিস আরয করছি। ভোরে ঘুম থেকে জাগার পর সংকল্প করুন– আজ আমি যে কাজই করব, আল্লাহ তা'আলার মর্জি মোতাবেক করব, প্রতিটি কাজ আল্লাহ তা'আলার আরোপিত হকসমূহ আদায়ের জন্য করব, ব্যস এখন আপনি নিজ ডিউটি আদায়ের জন্য গেলেও তা ওই সংকল্পের কারণে দ্বীন হয়ে যাবে। আপনি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে আনন্দ করলে তাও ওই নিয়তের কারণে দ্বীন হয়ে যাবে। শর্ত কেবল একটাই, এসব কাজ নাজায়েয ও হারাম পন্থায়

হতে পারবে না। এ শর্ত রক্ষার সাথে যে কাজই করুন না কেন, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির নিয়ত থাকলে তাই আখিরাতের মুক্তি ও জান্নাত লাভের কারণ হয়ে যাবে। মোটকথা দ্বীন ও দুনিয়া একটি অন্যটির বিরোধী নয়।

এমনিভাবে জীবিকা নির্বাহের যত পন্থা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন, যেমন চাষাবাদ, চাকরি, ব্যবসা, কারিগরি ইত্যাদি এসবই নিয়ত সঠিক থাকলে দ্বীনে পরিণত হয়ে যায়।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসাব শায়বানী (রাহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হযরত, আপনি তো বহু কিতাব লিখলেন, তা তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে কিছু লিখলেন না? তিনি বললেন, আমি মানুষের জীবিকা সম্পর্কে যে কিতাব লিখেছি, তা তো তাসাওউফই। কেননা আমি তাতে লিখেছি, জীবিকা উপার্জনের জন্য মানুষ যে পন্থাই অবলম্বন করুক, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত থাকলে সেটাই দ্বীন হয়ে যায় ও আখিরাতে নাজাতের ওসীলা বনে যায়। আর এটা তো তাসাওউফেরই বিষয়।

মানুষের প্রতিটি মুহূর্তই দ্বীন হয়ে যেতে পারে

মানুষের এমন কোনও মুহূর্ত নেই, যা দ্বীনে পরিণত হতে পারে না। দরকার শুধু নিয়তের বদল। খালিস নিয়ত দ্বারা মানুষ নিজ দুনিয়াকে দ্বীন বানাতে পারে, শর্ত একটাই, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি অনুসরণ করা। সেই সঙ্গে যদি আরেকটা কাজ করা যায়, আল্লাহ তা'আলা যা-কিছু হারাম করেছেন, তা পরিহার করে চলা যায়, তবে তো সারা দুনিয়াই দ্বীন হয়ে যায়।

বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, কোনটা হালাল এবং কোন্‌টা হারাম– এ সম্পর্কে জানার উপায় কী? বিষয়টা খুবই সহজ। আপনি যদি রোজ পাঁচটা মিনিট এর জন্য বরাদ্দ করেন, তবে ধীরে ধীরে আপনার সবকিছুই জেনে নেওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় আরেকটা কাজ সকলের করা উচিত। দিনের যে-কোনও সময়ে মাত্র দশ মিনিট আপন-আপন ঘরে তালিমের ব্যবস্থা করা। ঘরের সকলকে একত্র করে তাদের সামনে এমন একখানি কিতাব পাঠ করা চাই, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ, হালাল, হারাম, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তালিম শেষে সে অনুযায়ী আমলের তাওফীক চেয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে হবে। এ কাজটি খুবই ফলপ্রসূ। ইনশাআল্লাহ, এর ফলে আপনার দুনিয়া দ্বীনে পরিণত হয়ে যাবে।

আমি এজন্য আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব আরেফী রহ.-এর লেখা 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম' গ্রন্থখানির নাম প্রস্তাব করছি। গ্রন্থখানি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও তাঁর সুন্নাত সম্পর্কে রচিত। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাকেও এবং আপনাদের সকলকেও এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

দ্বীনের হাকীকত-২*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِیْ مُوْسٰى الْأَشْعَرِیْ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهٗ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

'হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে বা সফরে যায়, তখন তার জন্য ওই সমস্ত আমলের ছাওয়াব লেখা হয় যা সে বাড়িতে সুস্থ থাকা অবস্থায় করত।'[৪৬]

অসুস্থ অবস্থায় এবং সফরেও নেক আমল লেখা হয়

হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন শীর্ষস্থানীয় ফকীহ সাহাবী। যারা হাবশা ও মদীনা মুনাওয়ারা উভয় হিজরতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনিও তাদের একজন। এ হাদীছটি তাঁর সূত্রে বর্ণিত। এতে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি বাড়িতে থাকা অবস্থায় কিংবা সুস্থ থাকাকালে যেসব নেক কাজ করে, সে যদি

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮১-২০৬

৪৬. বুখারী, হাদীছ নং ২৭৭৪; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২৬৮৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৮৮৪৮

সফরে চলে যায় বা অসুস্থ হয়ে পড়ে, যদ্দরুন সেই আমলগুলো তার পক্ষে করা সম্ভব না হয়, তবে সেইসব আমলের ছাওয়াব থেকে সে বঞ্চিত থাকে না। তখনও তার জন্য যথারীতি সেইসব আমলের ছাওয়াব লেখা হতে থাকে। এ হাদীছ দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তিকে কত বড়ই না নি'আমত ও সান্ত্বনার বাণী শোনালেন! অসুস্থতাবস্থায় ওযর ও অপারগতার কারণে আমল ছুটে গেলে সেজন্য বেশি আক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। এই ভেবে আফসোস করার দরকার নেই যে, আহা, সুস্থ থাকলে তো এসব আমল আমি করতে পারতাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার ছাওয়াব ঠিকই দিচ্ছেন।

নামায কোনও অবস্থায়ই মাফ হয়ে যায় না

তবে এর সম্পর্ক কেবল নফল ইবাদতের সাথে। ফরয ইবাদতসমূহে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা রেখেছেন। সেই অনুযায়ী তা পালন করতেই হবে। উদাহরণত নামাযের কথাই ধরা যাক। যত কঠিন রোগই হোক এমন কি মুমূর্ষ অবস্থাও যদি হয়, তবুও নামাযে কোনও ছাড় নেই। তা আদায় করতেই হবে। তবে আল্লাহ তা'আলা আদায়ের জন্য সুবিধা দান করেছেন। দাঁড়ানোর শক্তি না থাকলে বসেও আদায় করা যাবে। বসারও যদি শক্তি না থাকে তবে শুয়ে পড়াও জায়েয। ওযূ করার ক্ষমতা না থাকলে তায়াম্মুমের বিকল্প আছে। কাপড় যদি পাক-পবিত্র রাখা সম্ভব না হয়, তবে সেই অবস্থায়ই তা আদায় করে নাও। কিন্তু নামায ছাড়া যাবে না কোনও অবস্থায়ই। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে দম আছে, নামায আদায় করতে হবে। হ্যাঁ, কেউ যদি বেহুঁশ হয়, অচেতন হয়ে পড়ে আর এ অবস্থায় ছয় ওয়াক্তের নামায চলে যায়, তবে সেই নামায মাফ হয়ে যায়। কিন্তু যতক্ষণ চেতনা থাকে এবং শরীরে দম থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত নামায ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি নেই।

অনেক সময় অসুস্থতার কারণে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকে না, তখন বসে নামায পড়তে হয়, বসারও শক্তি না থাকলে শুয়ে পড়তে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অনেকে আক্ষেপ করে বলে, আহা! দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারছি না। বসেও পড়ার ক্ষমতা নেই, শুয়ে শুয়ে পড়তে হচ্ছে, জানি না

ওযূ ঠিক থাকে কি না কিংবা তায়াম্মুম সঠিকভাবে হচ্ছে কি না! এসব চিন্তা করে বড় পেরেশান থাকে। অথচ পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সান্ত্বনা-বাণী শুনিয়েই দিয়েছেন, তোমরা অপারগতার কারণে যখন এসব কাজ করতে পারছ না, তখনও তোমাদের সুস্থতাকালীন আমলের অনুরূপ ছাওয়াব লেখা হচ্ছে। ছাওয়াব থেকে তুমি বঞ্চিত হচ্ছ না।

আপন পসন্দ ত্যাগ করো

এক হাদীছে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

'আল্লাহ তা'আলা আযীমত (সর্বোচ্চ স্তর) অনুযায়ী আমল করা যেমন পসন্দ করেন, তেমনি ওযর অবস্থায় তাঁর প্রদত্ত রুখসত (অবকাশ) অনুযায়ী আমল করা হোক–এটাও তার পসন্দ।[৪৭] সুতরাং নিজ পসন্দের চিন্তা না করে আল্লাহ তা'আলার যা পসন্দ সে অনুযায়ী কাজ করাই বাঞ্ছনীয়।

সহজতা অবলম্বন করা সুন্নত

কিছু লোক কঠিনতা প্রিয়। তারা কঠিন থেকে কঠিনতর কাজ করতে পসন্দ করে; বরং তারা কঠিনতার সন্ধানে থাকে। তাদের ধারণা তাতেই ছাওয়াব বেশি। কোনও কোনও বুযুর্গ সম্পর্কেও এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের ব্যাপারে কোনও রকম বেআদবীমূলক মন্তব্য করা উচিত নয়, তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, সে তরীকা সুন্নত নয়। সুন্নত তো সে পন্থাই, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করতেন। হাদীছে বর্ণিত–

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ اِلَّا اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই দু'টি বিষয়ের কোনও একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তিনি অপেক্ষাকৃত

---

৪৭. মাজমাউয-যাওয়াইদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬২

সহজটাই বেছে নিয়েছেন।[৪৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সহজতা পসন্দ করতেন, এটা কি আরামপ্রিয়তার জন্য? তিনি কি কষ্ট-ক্লেশ থেকে বাঁচার জন্য কিংবা পার্থিব আরাম ও সুবিধা হাসিলের জন্যই এরকম করতেন? নাউযুবিল্লাহ, তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা করার কোনও সুযোগ নেই। আরামপ্রিয়তা তাঁর স্বভাব ছিল না। আসল কথা হচ্ছে আবদিয়াত (আল্লাহর সামনে দাসত্বভাব)। সহজ পন্থা অবলম্বনের মধ্যে আবদিয়াত বেশি থাকে। আল্লাহ তা'আলার সামনে বাহাদুরি প্রকাশ কিছু ভালো কথা নয়। এটা তো নিজ দুর্বলতা, ভঙ্গুরতা প্রকাশের জায়গা। দেখানো যে, আমি অতি দুর্বল বান্দা। বড়ই অকর্মণ্য, তাই সহজ পন্থা অবলম্বন করছি। এটা বন্দেগী ও আবদিয়াতের অভিব্যক্তি। কঠিন পন্থা অবলম্বন করলে তা আল্লাহর সামনে বাহাদুরি দেখানোর নামান্তর হয়।

'দ্বীন' তো অনুসরণ ও আনুগত্যের নাম

দ্বীন বিশেষ কোনও আমলের নাম নয়, বিশেষ কোনও প্রবণতার নাম নয়। নিজ অজিফা পূরণ করা বা নিজ অভ্যাস ও নিয়ম পালন করার নামও দ্বীন নয়। দ্বীন তো আনুগত্য ও অনুসরণের নাম। তিনি যেমন বলেন তেমনি করার নাম। তিনি যা পসন্দ করেন তাই পসন্দ করা এবং নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করারই নাম দ্বীন। কাজেই যে কাজ তিনি যেভাবে করাচ্ছেন সেটাই উত্তম। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি বিধায় দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারছি না, বসে বা শুয়ে পড়তে হচ্ছে, এজন্য দুঃখ প্রকাশ ঠিক নয়। এটা আক্ষেপের বিষয় নয়। ভাই আল্লাহ তা'আলার তো এটাই পসন্দ। তাঁর যখন এটা পসন্দ, তখন এ সময়ের দাবি হল, তুমি এটাই করো। এখন এই বসে বা শুয়ে পড়াতেই তোমার আবদিয়াত। এটাই তাঁর পসন্দ, যদিও কষ্ট করে দাঁড়িয়ে পড়া তোমার নিজের পসন্দ। নিজ পসন্দকে ফানা ও বিলীন করে আল্লাহ জাল্লা শানুহু যা স্থির করে দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকারই নাম বন্দেগী ও আবদিয়াত। নিজের পক্ষ থেকে কিছু স্থির করে নেওয়া যে, এরকম হলে বা ও রকম করলে ভালো হতো, এটা কোনও আবদিয়াত নয়।

---

৪৮. বুখারী, হাদীছ নং ৩২৯৬; মুসলিম, হাদীছ নং ৪২৯৪

আল্লাহ তা'আলার সামনে বীরত্ব দেখিও না

আল্লাহ তা'আলা যখন চাচ্ছেন বান্দা একটু উহ্-আহ্ করুক, তখন উহ্-আহ্ করোই না। এক বুযুর্গ অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য এক বুযুর্গ তাকে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখেন তার খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু একটুও কাতরাচ্ছেন না, উহ্-আহ্ করছেন না; বরং আল্লাহ আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যিকির করছেন।

সাক্ষাতকারী বুযুর্গ বললেন, ভাই তোমার এই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যিকির তো খুবই ভালো, মুবারকবাদ দেওয়ার যোগ্য কাজ। কিন্তু এ সময় তো আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা চাই, হে আল্লাহ্! আমাকে সুস্থ করে দিন। এ সময় আলহামদুলিল্লাহ বলার অর্থ তাঁর সামনে এক রকম বাহাদুরি প্রকাশ। ভাবখানা যেন, হে আল্লাহ! আপনি তো আমাকে রোগ দিয়েছেন, কিন্তু আমি বাহাদুর আছি। আমার মুখ থেকে উহ্-আহ্ বের হবে না। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার সামনে বাহাদুরি দেখানো কোনও আবদিয়াত নয়; আবদিয়াত হল তাঁর সামনে নিজ দুর্বলতা ও জীর্ণতা প্রকাশ করা। তিনি যখন চাচ্ছেন বান্দা একটু উহ্-আহ্ করুক, তখন অক্ষম ও কাবু হয়ে আল্লাহকে ডাকো। কিভাবে ডাকবে? হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালাম যেভাবে ডেকেছিলেন–

رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ

'হে আমার প্রতিপালক! আমি পীড়াগ্রস্ত হয়েছি। আর তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'[৪৯] নবীদের চেয়ে বীর ও শক্তিমান আর কে হতে পারে? তা সত্ত্বেও যখন রোগাক্রান্ত হলেন, কষ্টে পড়লেন, তখন আল্লাহ তা'আলাকে ডাকছেন এবং নিজ কষ্ট-বেদনার কথা জানিয়ে তাঁর দয়া ভিক্ষা করছেন। সুতরাং তিনি যখন চাচ্ছেন যে, তাঁকে ডাকা হোক এবং তাঁর সামনে কাতরতা প্রকাশ করা হোক, তখন কাতরতা প্রকাশ ও উহ্-আহ করাতেই তো মজা। তিনি যেমন বলেন তেমনি করাতেই আনন্দ। আল্লাহ তা'আলার সামনে অত বেশি সংযম ফলানোও ঠিক না। এটাও আবদিয়াত ও বন্দেগীর পরিপন্থী।

---

৪৯. সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৩

মানবীয় মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর

মনে রাখতে হবে, মানবীয় মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর হল 'আবদিয়াত', আল্লাহ তা'আলার প্রতি বন্দেগী ও দাসত্ব প্রকাশ। মানুষের জন্য এর উর্ধ্বে কোনও মর্যাদা হতে পারে না। কুরআন মাজীদে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত গুণই না বর্ণিত হয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝ وَّ دَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝

আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর পথে তাঁর ইচ্ছায় আহ্বানকারী ও সমুজ্জ্বল প্রদীপরূপে।'[৫০] দেখুন এ আয়াতদ্বয়ে তার কতগুলি বিশেষণ উল্লেখ করছে; কিন্তু যেখানে মিরাজের আলোচনা এসেছে, নিজের কাছে অতিথি করে নেওয়ার বৃত্তান্ত পেশ করা হয়েছে, সেখানে কিন্তু তাঁকে নিজের আব্‌দ ও বান্দা হিসেবেই পরিচিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا

'পবিত্র ও মহান সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন...।'[৫১]

এখানে অন্য কোনও বিশেষণ না, আবদিয়াত ও বন্দেগীর বিশেষণই উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, মানবীয় মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর হল আবদিয়াতের স্তর, আল্লাহ তা'আলার সামনে বন্দেগী, দাসত্ব ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশের স্তর।

আমার এক বড় ভাই ছিলেন। নাম মুহাম্মাদ যাকী কায়ফী। ওফাত হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। ভালো কবিতা রচনা করতেন। তাঁর কবিতার একটি বয়েত বড় চমৎকার।

---

৫০. সূরা আহযাব, আয়াত ৪৫-৪৬

৫১. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১

লোকে তাঁর ঠিক অর্থ বোঝে না। তিনি এ বিষয়টিকেই বড় সুন্দর বর্ণনাশৈলীতে ব্যক্ত করেছেন, তিনি বলেন,

اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں

توڑنا ہے حسن کا پندار کیا؟

'দুঃখ-কষ্ট এতটা সংযত করাও ভালো নয়। তুমি কি তার রূপের অহংকার চূর্ণ করতে চাও?'

অর্থাৎ এই যে, বেদনা চাপা দিয়ে রাখছ, মুখ থেকে একটু উহ্-আহও বের হতে দিচ্ছ না, তা এর দ্বারা কি যিনি তোমাকে এই বেদনায় আক্রান্ত করেছেন, তার গর্ব চূর্ণ করতে চাচ্ছ? তার সামনে বাহাদুরি দেখাতে চাচ্ছ? এটা তো বান্দার কাজ নয়। বান্দার কাজ হল, যিনি দুঃখ-কষ্টে ফেলেছেন, তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করা, তাঁর কাছেই দু'আ করা, যেন তিনি দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দান করেন। তিনি দুঃখ-কষ্টে ফেললে শরী'আতের সীমার ভেতর থেকে তার প্রকাশ করা মোটেই দূষণীয় নয়। পুত্র ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ইন্তিকাল হয়ে গেলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ

'হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিরহে শোকাহত।'[৫২]

আসল কথা, আল্লাহ তা'আলা যখন যে অবস্থায় রাখেন সে অবস্থাই পসন্দনীয়। তিনি যখন চাচ্ছেন শুয়ে নামায পড়ো, তখন শুয়েই নামায পড়া ভালো। তখন শুয়ে পড়ার দ্বারাই সুস্থকালে দাঁড়িয়ে পড়ার সমপরিমাণ ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

আমাদের হযরত ডাক্তার মুহাম্মাদ আব্দুল হাই রহ. হযরত থানভী রহ.-এর কথা বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রমাযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব হল না। এজন্য তাঁর বড় আফসোস

---

৫২. বুখারী, হাদীছ নং ১২২০; মুসলিম, হাদীছ নং ৪২৭৯

হচ্ছিল। হযরত থানভী রহ. বলেন, আফসোস করার কোনও কারণ নেই। তুমি এ কথা চিন্তা করো যে, রোযা কার জন্য রাখছ। যদি নিজের জন্য রোযা রেখে থাকো, নিজেকে খুশী করা ও রোযা রাখার আগ্রহ পূরণ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই আক্ষেপ করতে পারো যে, আহা! অসুস্থ হওয়ার কারণে রোযা ছুটে গেল! রোযা রাখার আনন্দ উপভোগ করতে পারলাম না! কিন্তু রোযা যদি আল্লাহ তা'আলার জন্য রেখে থাকো, তাঁকে খুশী করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁর হুকুম কী সেটাই লক্ষ্য করো। তিনি অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখতে বারণ করেছেন। কাজেই এ অবস্থায় রোযা না রাখার দ্বারাই উদ্দেশ্য পূরণ হবে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে। হাদীছ শরীফে আছে–

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

'সফর অবস্থায় রোযা রাখা কোনও পুণ্যের কাজ নয়।'[৫৩]

অর্থাৎ সফরকালে কষ্ট বেশি হলে রোযা ছেড়ে দেওয়া চাই। তখন রোযা রাখা পসন্দনীয় নয়। তখন না রেখে সফর থেকে ফিরে আসার পর তার কাযা করলে রমাযান মাসে রাখার দ্বারা যে নূর ও বরকত লাভ হতো, তা সবই লাভ হবে। তখন যেন তার জন্য রমযানের দিন ফিরে আসে। কাজেই রমাযানে রোযা রাখলে যে উপকার পাওয়া যেত, সমান উপকার এ সময়ও পাওয়া যাবে। সুতরাং শরী'আতসম্মত ওযরবশত রমাযানের রোযা রাখতে না পারলে অসুস্থতা, সফর কিংবা মেয়েদের প্রাকৃতিক অপারগতার কারণে রোযা ছুটে গেলে বিষণ্ণ হওয়ার কোনও কারণ নেই। কেননা এ সময় রোযা না রেখে পানাহার করাই আল্লাহ তা'আলার পসন্দ। ফলে অন্যদের রোযা রেখে যে ছাওয়াব লাভ হবে, তুমি রোযা না রেখেও সেই ছাওয়াব পেয়ে যাচ্ছ। অন্যরা ক্ষুধার্ত থেকে যে ছাওয়াব অর্জন করে তুমি পানাহার করা সত্ত্বেও সেই ছাওয়াবের অধিকারী হচ্ছ। রোযা না রাখা সত্ত্বেও তুমি রোযাদারদের মতো একই নূর ও বরকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে লাভ করছ। পরে যখন তুমি

৫৩. বুখারী, হাদীছ নং ১৯৪৬; তিরমিযী, হাদীছ নং ৬৪৪

এ রোযা কাযা করবে, তখন কাযার দিনগুলোতে রমাযানের সমস্ত বরকত ও নূর তোমার হাসিল হয়ে যাবে। কাজেই আক্ষেপ করার তো কোনও কারণ নেই।

আল্লাহ তা'আলা ভগ্ন-হৃদয় লোকদের সঙ্গে থাকেন

যাদের অন্তর ভগ্ন-চূর্ণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরই পাশে থাকেন। অসুস্থতার কারণে রোযা ছুটে যাচ্ছে বলে অন্তরে যে ব্যথা অনুভব হচ্ছে এবং এ কারণে অন্তরে যে ভাঙচুর ঘটছে, তা বৃথা যায় না। সে ভাঙচুরের পর আল্লাহ তা'আলার ভয় ও আখিরাতের চিন্তায় যা ঘটুক, হৃদয় চূর্ণ হওয়ার কারণ যাই হোক না কেন, চূর্ণ যখন হয়েছে, তখন সে হৃদয় আল্লাহ তা'আলার রহমতপ্রাপ্তির আধার বনে গেছে। এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اَنَا عِنْدَ مُنْكَسِرَةِ قُلُوْبِهِمْ مِنْ اَجْلِيْ

'আমার কারণে যাদের অন্তর টুটে ফেটে গেছে, আমি তাদের পাশে থাকি।'[৫৪]

অন্তরে যে বিভিন্ন সময়ে আঘাত লাগে, কখনও দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি লাগে আর এসব দ্বারা হৃদয় চূর্ণ হয়, ভেঙে যায়, এটা কেন করা হয়, এভাবে হৃদয় চূর্ণ করার কারণ কী? এর কারণ কেবল এই যে, এর দ্বারা অন্তরকে রহমত বর্ষণ ও অনুকম্পা প্রদর্শনের পাত্রে পরিণত করা হয়। কী সুন্দর বলা হয়েছে–

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ترا آئنہ ہے وہ آئنہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئنہ ساز میں

'তুমি এটা যত্ন করে রেখো না, পাছে ভেঙে যায়, তাই আগলে সামলে রেখো না। তোমার এ আয়না তো এমনই আয়না, যা ভেঙে

---

৫৪. ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৯০। যদিও মুহাদ্দিছগণ তাদের সমীক্ষানীতি অনুযায়ী এ হাদীছটিকে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু যে কথা এতে বলা হয়েছে, তা সঠিক।

গেলে বেশি দাম পাবে। আয়না নির্মাতার কাছে প্রিয়তর হয়ে উঠবে।' বস্তুত মানব হৃদয় বড় দামী আয়না। এ আয়না যত ভাঙবে, এর কারিগর (আল্লাহ তা'আলা)-এর দৃষ্টিতে তত বেশি প্রিয় হয়ে উঠবে।

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. একটি বয়েত খুব বেশি শোনাতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ যখন কোনও বান্দার অন্তরকে ভাঙেন, তখন তার উদ্দেশ্য হয় তার মর্যাদা উন্নত করা। মানুষ বিভিন্নভাবে যে দুঃখ-বেদনার সম্মুখীন হয়, তাও একরকম মুজাহাদা ও সাধনা, যা তার ইচ্ছার বাইরে তাকে দিয়ে করানো হয় আর এর মাধ্যমে তার মর্যাদার স্তর এত উঁচু করা হয়, যা সাধারণ অবস্থায় তার দ্বারা লাভ করা সম্ভব হতো না। তো তিনি এ প্রসঙ্গে যে বয়েতটি শোনাতেন তা এরকম–

یہ کہہ کے کوزہ گرنے پیالہ پٹک دیا
اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

'কুমার পেয়ালাটি হাত থেকে ফেলে দিল, এই বলে– এটি নষ্ট করে এখন অন্য কিছু বানাব।

মানুষের অন্তর যখন ভেঙে চুরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন তা আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লী ও তার রহমত বর্ষণের উপযুক্ত পাত্র হয়ে ওঠে।' হযরত আরও শোনাতেন–

بتان ماہ وش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں
جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں

'রূপস প্রতিমা আমার বসত করে বিরান ঘরে। বরবাদ সে করে যাকে চিত্তে তারই থাকে।'

আল্লাহ তা'আলা ভাঙা হৃদয়ে তাজাল্লী ফেলেন। কাজেই যত দুঃখ-বেদনা আসে ভয় পেও না। চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরে, হৃদয় যে চূর্ণ হয়, যে উহ্-আহ্ মুখ থেকে বের হয়, এসবই বড় মূল্যবান। যদি আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান থাকে, অন্তরে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে মনে রেখো, এগুলো তোমাকে কোথা থেকে কোথায় পৌছিয়ে দেবে তুমি ভাবতেও পারবে না।

وادی عشق بے دور ودراز است ولے
طے شود جادہ صد سالہ بہ آہے گاہے

'প্রেমের গন্তব্য পথ সন্দেহ নেই বড় দীর্ঘ, কিন্তু কখনও কখনও শত বর্ষের পথ মুহূর্তের ভেতর অতিক্রম হয়ে যায়। কাজেই দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদে ঘাবড়ানো উচিত নয়।'

দ্বীন তো আনুগত্য ও সন্তুষ্টি প্রকাশেরই নাম

আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে এই বুঝ দান করুন যে, দ্বীন নিজের আগ্রহ মেটানো বা নিজ অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করার নাম নয়। দ্বীন তো আনুগত্য ও সন্তোষ প্রকাশের নাম। অর্থাৎ যখন যে কাজ করতে বলা হবে, বিনা বাক্যে, খুশী মনে তা সম্পন্ন করা হবে। আনুগত্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ব্যাপারটাই যদি না থাকে, তবে কোনও আমলই কোনও কাজের নয়। না নামাযের মধ্যে কিছু আছে, না রোযার মধ্যে, কোনও আমলের ভেতরই কিছু নেই যদি না আনুগত্যের প্রকাশ ঘটল, যদি না আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই কাম্য হল। তাঁর সন্তুষ্টি লাভই তো আসল কথা–

عشق تسلیم ورضا کے ما سوا کچھ بھی نہیں
وہ وفا سے خوش نہ ہو تو وفا کچھ بھی نہیں

'যখন যে হালে রাখেন তা মেনে নেওয়া ও তাতে সন্তুষ্ট থাকারই তো নাম প্রেম। আনুগত্যে যদি খুশী না হন তিনি, তবে আনুগত্যেরই বা কী মূল্য?

আল্লাহ তা'আলা যে কাজে খুশী হন, করার কাজ সেটাই। আনন্দ ও মজা সে কাজেই।

نہ تو ہے ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے
یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

'না বিরহ কিছু ভালো জিনিস, না মিলন ভালো, বন্ধু যে হালে রাখেন ভালো সে হালই।' আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাদের অন্তরে এই

বুঝ দান করলে গোটা দ্বীনের বুঝ আমাদের নাগালে এসে যাবে। আমাদের সামনে দ্বীন বোঝার রাস্তা খুলে যাবে।

রোগী-সেবার কারণে নিয়মিত আমল ছুটে গেলে

এই যে বলা হল অসুস্থাবস্থায় আমল ছুটে গেলে সেজন্যও সুস্থাবস্থায় কৃত আমলের অনুরূপ ছাওয়াব লেখা হয়, উলামায়ে কেরাম বলেন, এ কথা যেমন নিজের অসুখ-বিসুখের বেলায় প্রযোজ্য, তেমনি অন্যের অসুখের বেলায়ও। অর্থাৎ যাদের খেদমত ও সেবা করা নিজ কর্তব্য, তারা যদি অসুস্থ হয় এবং সেজন্য তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে গিয়ে আমল ছুটে যায়, তাতে ছাওয়াব লেখা বন্ধ হয় না। যেমন কারও পিতা বা মাতা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এখন রাত-দিন তাদের সেবা করতে হয়, যে কারণে নিয়মিত আমলসমূহ আদায় করা সম্ভব হয় না, না তিলাওয়াত করা যায়, না নফল নামায যিকির তাসবীহ ইত্যাদি আদায় করা সম্ভব হয়, সর্বক্ষণ পিতা-মাতার সেবায়ই লেগে থাকতে হয়, তো এ ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। যদিও নিজে অসুস্থ নয়, কিন্তু তথাপি পিতা-মাতার সেবার দরুন যে আমল ছুটছে, তার ছাওয়াব আল্লাহ তা'আলা ঠিকই লিখছেন। প্রশ্ন হচ্ছে তা কেন?

সময়ের দাবি লক্ষণীয়

এই যে বলা হল অসুস্থাবস্থায় আমল ছুটে গেলে সেজন্যও সুস্থাবস্থায় কৃত আমলের অনুরূপ ছাওয়াব লেখা হয়, উলামায়ে কেরাম বলেন, এ কথা যেমন নিজের অসুখ-বিসুখের বেলায় প্রযোজ্য, তেমনি অন্যের অসুখের বেলায়ও। অর্থাৎ যাদের খেদমত ও সেবা করা নিজ কর্তব্য, তারা যদি অসুস্থ হয় এবং সেজন্য তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে গিয়ে আমল ছুটে যায়, তাতে ছাওয়াব লেখা বন্ধ হয় না। যেমন কারও পিতা বা মাতা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এখন রাত-দিন তাদের সেবা করতে হয়, যে কারণে নিয়মিত আমলসমূহ আদায় করা সম্ভব হয় না, না তিলাওয়াত করা যায়, না নফল নামায যিকির তাসবীহ ইত্যাদি আদায় করা সম্ভব হয়, সর্বক্ষণ পিতা-মাতার সেবায়ই লেগে থাকতে হয়, তো এ ক্ষেত্রেও

সেই একই কথা। যদিও নিজে অসুস্থ নয়, কিন্তু তথাপি পিতা-মাতার সেবার দরুন যে আমল ছুটছে, তার ছাওয়াব আল্লাহ তা'আলা ঠিকই লিখছেন। প্রশ্ন হচ্ছে তা কেন?

এর বড় সুন্দর উত্তর দিয়েছেন আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ.। বস্তুত তিনি খুবই কাজের কথা বলতেন। বুযুর্গানে দ্বীনের ছোট-ছোট কথাও অনেক মূল্যবান হয়ে থাকে, অনেক সময় তা দ্বারাই জীবন শোধরানোর দুয়ার খুলে যায়। তিনি বলতেন, মিয়াঁ, প্রতিটি মুহূর্তের দাবি ও চাহিদা লক্ষ করো। এই মুহূর্তটি আমার কাছে কী চায়? আমার কাছে এই ক্ষণের দাবি কী? এসব ভেবে কাজ কর। এখন আমার মন কী করতে চায় এই চিন্তা করো না। মন কী চায়, বিষয় তা নয়, সময়ের কী চাহিদা সেটাই আসল। সময়ের চাহিদা পূরণ করো। এটাই আল্লাহ তা'আলার মর্জি। তুমি তো নিজ মনে স্থির করে রেখেছ রোজ তাহাজ্জুদ পড়ব, রোজ এই পরিমাণ তিলাওয়াত করব, রোজ এই পরিমাণ তাসবীহ পাঠ করব আর যখন এসব আমলের সময় আসে, মন এগুলোই করতে চায়, মনে এগুলোই করার চাপ। কিন্তু ঘটল এই যে, ঠিক এ আমলের সময় ঘরে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ফলে তার সেবা, ডাক্তার, পথ্য ইত্যাদিতে লেগে যেতে হল। এসবে লাগতে গিয়ে নিজ আমল ছুটতে থাকল। এ ক্ষেত্রে আফসোস হয়, আহা এ কী হল! আজ তো আমার আমল ছুটে যাচ্ছে। এটা তো আমার তিলাওয়াতের সময় ছিল। এখন তো আমি যিকির-আযকারে মশগুল থাকতাম, অথচ এখন দৌড়-ঝাপ করতে হচ্ছে ডাক্তার-কবিরাজের পেছনে, কখনও হাসপাতালে কখনও ডিসপেনসারিতে। আরে ভাই! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে চক্করে ফেলেছেন, এখনকার দাবি তাতেই লেগে থাকা। এখন এ কাজ ছেড়ে দিয়ে তিলাওয়াতে বসলে তা আল্লাহর পসন্দ হবে না। এখনকার সময়ের দাবি এ কাজই করা। এখন ছাওয়াব এতেই। তিলাওয়াত ও তাসবীহতে যে ছাওয়াব হতো এখন এ কাজেই তা পাওয়া যাবে। এটাই দ্বীনের মূল কথা যে, যে সময়ের যে চাহিদা, যে সময়ের যে হুকুম সেটাই পালন করো।

নিজের আগ্রহ অনুযায়ী কাজ করার নাম দ্বীন নয়

আমাদের হযরত মাসীহুল্লাহ খান সাহেব রহ. –আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন– আমীন, সেই বুযুর্গদের একজন ছিলেন, যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা খাঁটি কথা ঢেলে দিতেন। তিনি বলতেন, ভাই, নিজ শখ পূরণের নাম দ্বীন নয়। দ্বীন তো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার নাম। এই কাজের শখ হয়েছে, ওই কাজের আগ্রহ দেখা দিয়েছে, কাজেই আমাকে তাই করতে হবে এটা দ্বীন নয়। উদাহরণত ইলমে দ্বীন শেখা ও আলেম হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, এদিকে তোমার জন্য আলেম হওয়া জায়েয কিনা সে দিকে খেয়াল নেই। ঘরে মা অসুস্থ, বাবা বিছানায়, তাদের সেবা ও দেখাশোনা করার অন্য কেউ নেই, এ অবস্থায় আলেম হওয়ার ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে। ফলে অসুস্থ পিতা-মাতাকে রেখে মাদ্রাসায় চলে গেলে। এটা দ্বীনের কাজ হল না, নিজের শখ পূরণ করা হল। এ ক্ষেত্রে দ্বীনের কাজ হল সবকিছু ছেড়ে পিতা-মাতার সেবায় লেগে যাওয়া।

কারও 'দাওরায়ে হাদীছ' শেষ করার, মুফ্‌তী হওয়ার আগ্রহ। অনেক ছাত্রেরই এ আগ্রহ থাকে। অনেক সময় আমাকেও বলে, ফাত্‌ওয়া লেখা শিখতে চাই। আমি তাদেরকে বলি, তোমার পিতা-মাতার কী ইচ্ছা? উত্তর; পিতা-মাতা তো রাজি নয়। চিন্তা করুন, পিতা-মাতা রাজি নয়, তারপরও মুফ্‌তী হতে চায়। এটা দ্বীন নয়। এটা হল ইচ্ছা পূরণ।

কিংবা তাবলীগ করার ও চিল্লায় যাওয়ার আগ্রহ। এতে কোনও সন্দেহ নেই তাবলীগ করা ভালো কাজ, অনেক ফযীলতের বিষয়, অথচ ঘরে স্ত্রী শয্যাশায়ী, দেখাশোনা করার কেউ নেই। এ অবস্থায় চিল্লা লাগানোর ইচ্ছা দ্বীন নয়, এটা ইচ্ছাপূরণ। এ ক্ষেত্রে দ্বীনের চাহিদা ও সময়ের দাবি হল স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তার দেখাশোনা ও সেবাশুশ্রূষা করা। সেটা দুনিয়া নয়, বরং প্রকৃত দ্বীন।

হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেব রহ. একবার তাঁর মজলিসে এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়েছিলেন যে, এক ব্যক্তি জনহীন স্থানে স্ত্রী নিয়ে থাকত। আশেপাশে কোনও লোকালয় ছিল না। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া তৃতীয়

কোনও লোক সেখানে থাকত না। এ অবস্থায় স্বামীর আগ্রহ দেখা দিল দূরে লোকালয়ের মসজিদে গিয়ে নামায পড়বে। স্ত্রীর কথা হল, এই জনহীন স্থানে তুমি মসজিদে চলে গেলে আমার পক্ষে একাকী থাকা কি সম্ভব? ভয়ে আমার জান চলে যাবে। মসজিদে না গিয়ে বরং তুমি এখানেই নামায পড়ো। কিন্তু স্বামী লোকটি ছিল আবেগপ্রবণ। মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ দমাতে পারল না। সে স্ত্রীকে সেখানেই একা রেখে নামায পড়তে চলে গেল। হযরত বলেন, এই যে সে ইচ্ছাপূরণ করল, এটা আদৌ দ্বীন নয়। কেননা এ সময়ের চাহিদা ছিল ঘরে নামায পড়া, স্ত্রীর সঙ্গে থাকা।

তবে মনে রাখতে হবে এটা সেই স্থানের কথা, যেখানে কোনও লোকজন নেই। সম্পূর্ণ বিরানভূমি। যেখানে লোক বসতি আছে, সেখানে মসজিদে গিয়েই নামায পড়তে হবে।

সুতরাং নিজ ইচ্ছাপূরণ করার নাম দ্বীন নয়। কারও জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা, তাবলীগে যাওয়ার বা আলেম, মুফ্তী হওয়ার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে নিজ দায়িত্ব কর্তব্য উপেক্ষা করা হয়, নিজের উপর অন্যের যে হক আরোপিত আছে, তাতে অবহেলা করা হয়; এ সময়ের কী দাবি তা খেয়াল করা হয় না। এটা কিছুতেই অনুমোদনযোগ্য কাজ নয়।

কোনও শায়খের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করতে বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেটা সময়ের চাহিদা বোঝার জন্য। শায়খ বলে দেন, এ সময়ের দাবি এটা, এখন তোমার এ কাজ করা উচিত। এর ফলে ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা হয়।

এই যে কথাগুলো বললাম, কেউ এটা অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করতে পারে যে, মাওলানা সাহেব বলেছেন মুফতী হওয়া খারাপ, তাবলীগে যাওয়া ভালো নয়। উনি তাবলীগবিরোধী। তাবলীগ ও চিল্লায় যেতে নিষেধ করেন। জিহাদে যেতে বারণ করেন। জনাব, এসবই ভালো কাজ, তবে যথোপযুক্ত সময়ে। আপন-আপন সময়ে এর প্রতিটি ফযীলত ও ছাওয়াবের বিষয়। কিন্তু দেখতে হবে সময়ের চাহিদা কী? সময় তোমার কাছে কী দাবি করে। সেই দাবি ও চাহিদা অনুযায়ী কাজ করো। নিজের

মন-মস্তিষ্ক দ্বারা একটি পথ ঠিক করে নিয়েছ, আর সেই পথে চলতে শুরু করে দিয়েছ। এটা কোনও দ্বীন নয়। দ্বীন হল, যে সময়ে আল্লাহ তা'আলার যা হুকুম সে অনুযায়ী কাজ করা।

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. হিন্দী ভাষার প্রবচন অনেক শোনাতেন–

سہاگن وہ جسے پیا چاہے

"বধূ তো আসলে সে-ই, প্রিয় যাকে চায়।"

গল্পটি এরকম, এক মেয়ের বিয়ে। তাকে বউ সাজানো হচ্ছিল। খুব নিখুঁতভাবেই তাকে সাজানো হল। বড় চমৎকার দেখাচ্ছিল! যে-ই দেখছিল, প্রশংসা করছিল– বড় সুন্দর লাগছে। সখীরা বলছিল তোর চেহারা যেমন সুন্দর দেহ তেমনি কান্তিময়। দেখেছিস অলংকারগুলো কেমন মানিয়েছে? এভাবে তার একেকটি জিনিসের তারিফ করা হচ্ছিল। কিন্তু কনে নির্বিকার। প্রশংসা শুনছিল, কিন্তু কোনও ভাবান্তর দেখাচ্ছিল না। কোনও রকম আনন্দের আভাস তার চেহারায় দেখা যাচ্ছিল না। কেউ জিজ্ঞেস করল কী ব্যাপার তোমার সখীগণ এত প্রশংসা করছে, তুমি কোনও সাড়াই দিচ্ছ না? তা তোমার কি আনন্দ লাগছে না? শেষটায় বলল, তাদের প্রশংসায় কী খুশী হব! এসব তো হাওয়ায় উড়ে যাবে। যার জন্য আমাকে সাজানো হচ্ছে, তার প্রশংসাই আসল কথা। তাঁর চোখে যদি ভালো লাগে আর বলে দেন, হ্যাঁ, তোমাকে সুন্দর লাগছে, তবেই না এ সাজের সার্থকতা। তখন আমার জীবন সত্যিকার অর্থে সেজে উঠবে। পক্ষান্তরে এরা তো প্রশংসা করে চলে গেল আর যার জন্য সাজানো হল, তার পসন্দ হল না, তা হলে এ প্রশংসার কী ফায়দা আর এই সাজেরই বা কী সার্থকতা?

এ গল্প শোনানোর পর হযরত ওয়ালিদ সাহেব রহ. বলতেন, দেখো, তুমি যে কাজ করছ তা যার জন্য করছ, তার পসন্দ কি না। লোকে তারিফ করল যে, খুব বড় আলেম, জ্ঞানের সাগর, অনেক বড় মুফতী-মাওলানা, কিংবা লোকে বলল, ইনি অতি বড় মোবাল্লেগ, তাবলীগে খুব সময় লাগায়, আল্লাহর রাস্তায় খুব কুরবানী করে, কিংবা বলল উনি

অনেক বড় মুজাহিদ। জনাব, লোকের এসব তারিফে কী আসে যায়, যদি মাওলার সন্তুষ্টি হাসিল না হয়? হ্যাঁ তিনি যদি বলেন,

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

'তাওহীদ তো এটাই যে, আল্লাহপাক হাশরের ময়দানে বলে দেবেন, আমারই জন্য এ বান্দা দোজাহানের প্রতি রুষ্ট, তবেই না সার্থকতা!'

সুতরাং প্রতিটি কাজের মূল উদ্দেশ্য যখন আল্লাহ তা'আলাকে খুশী করা, তখন সর্বদা সময়ের চাহিদার প্রতি লক্ষ রাখা চাই। মনে করুন, মন দিয়ে আল্লাহর যিকির করছিলেন, ঠিক এ অবস্থায় আযানের আওয়াজ কানে আসল। এখন হুকুম হল, যিকির ছেড়ে চুপ হয়ে যাওয়া এবং মুআযযিনের আযান শুনতে থাকা ও তার জওয়াব দেওয়া। মনে হতে পারে সময় নষ্ট হচ্ছে। আযান না শুনে যিকির করতে থাকলে কয়েক তাসবীহ আদায় হয়ে যেত। কিন্তু না, এটা সময় নষ্ট নয়। তোমাকে যিকির বন্ধের হুকুম দেওয়া হয়েছে, তো যিকির বন্ধ করে দাও। এখন যিকির করলে ফায়দা নেই। এখন ফায়দা আযান শোনা ও তার জওয়াব দেওয়ার মধ্যে। বরং এখন এটাই প্রকৃত যিকির।

সার্থকতা যদি কিছু থাকে তো তা আল্লাহর হুকুমের মধ্যেই আছে

আল্লাহ তা'আলা হজ্জের যে বিধান দিয়েছেন, এটা বড় আশ্চর্য ও অনন্যসাধারণ ইবাদাত। আপনি হজ্জের এই প্রেমিকসুলভ ইবাদতটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, কদমে-কদমে নিয়মনীতি ভাঙা হচ্ছে। দেখুন, মসজিদুল হারামে এক নামাযে এক লক্ষ নামাযের ছাওয়াব হয়। কিন্তু যুলহিজ্জার আট তারিখে হুকুম দেওয়া হয়েছে, মসজিদুল হারাম ছেড়ে মিনায় চলে যাও। সেখানে না হারাম আছে, না কা'বা, না কোনও কাজ আছে, না উকূফ, না রমী। তা সত্ত্বেও আদেশ করা হয়েছে এক লাখ নামাযের ছাওয়াব ছেড়ে মিনার ময়দানে চলে যাও এবং সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো। কেন এ হুকুম? কেবল এ কথা বোঝানো যে, কা'বা, হারাম, মসজিদুল হারাম, কোনও কিছুরই

নিজস্ব কোনও যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য নেই। যা কিছু আছে আমার হুকুমের মধ্যেই আছে। আমি মসজিদুল হারামে গিয়ে যখন নামায পড়তে বলেছি তখন সেখানে গিয়ে কেউ নামায পড়লে এক লাখ নামাযের ছাওয়াব পাবে। যখন মসজিদুল হারাম ছাড়তে বলেছি, তখন সেখানে গিয়ে নামায পড়লে লাখ নামাযের ছাওয়াব পাবে কি, উল্টো গুনাহ হবে। কারণ সে আমার হুকুম অমান্য করেছে।

নামায আপনভাবে লক্ষ্যবস্তু নয়

কুরআন-হাদীছে ওয়াক্তমতো সালাত আদায়ের জোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا۝

'নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া মুমিনদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।'[৫৫]

অর্থাৎ নামাযকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দিষ্ট সময়েই নামায পড়তে হবে, তার আগে বা পরে নয়। মাগরিব সম্পর্কে বলা হয়েছে, সময় হওয়া মাত্র পড়ো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়ে নাও। দেরি করো না। কিন্তু আরাফাতের মাঠে তাড়াতাড়ি পড়ে নিলে নামাযই হবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের সময়ে আরাফাতের মাঠ ত্যাগ করে আসছিলেন। হযরত বিলাল রাযি. বারবার বলছিলেন اَلصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযের ওয়াক্ত তো হয়ে গেছে। তিনি প্রতিবার উত্তর দিচ্ছিলেন اَلصَّلٰوةُ اَمَامَكَ 'নামায তোমার সামনে।'

শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, মনে করো না মাগরিবের ওয়াক্তের আপন কোনও বিশেষত্ব আছে। আসল ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার হুকুম। আল্লাহ তা'আলা যখন মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়তে বলেছেন, তখন তাড়াতাড়ি পড়ার ভেতর ছাওয়াব ছিল। আর যখন দেরি করতে বলেছেন এবং হুকুম দিয়েছেন, মাগরিবের ওয়াক্ত চলে যেতে দাও,

---

৫৫. নিসা : ১০৩

মুযদালিফায় পৌছে মাগরিবের নামায ইশার নামাযের সাথে মিলিয়ে আদায় করো, তখন এরকম করাই তোমার উপর ফরয হয়ে গেছে। হজ্জে আল্লাহ তা'আলা এভাবে কদমে-কদমে আইন-কানূনের মূর্তি চূর্ণ করেছেন। আসরের নামায আগে এনে জোহরের সাথে পড়তে হুকুম দিয়েছেন এবং মাগরিবের নামায পরে নিয়ে ইশার সাথে আদায় করতে বলেছেন। সবকিছু উল্টো করানো হচ্ছে। এভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যে, কোনও জিনিস সম্পর্কে মনে করো না তা আপনিই মাকসূদ ও লক্ষ্যবস্তু। না নামায আপনিই মাকসূদ, না রোযা, না অন্য কোনও ইবাদত। মাকসূদ তো কেবল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য।

ইফতার তাড়াতাড়ি কেন?

ইফতার সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হয়েছে তাড়াতাড়ি করো। অকারণে দেরিতে ইফতার করা মাকরূহ। কেন? কারণ এই যে, এতক্ষণ পানাহার থেকে বিরত থাকা ছাওয়াবের কাজ চিল, অনেক বড় ফযীলতের কাজ ছিল, কেননা তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছিল পানাহার থেকে বিরত থাকা। কিন্তু তিনি যখন বলে দিলেন, এখন পানাহার করো, তখন দেরি করা গুনাহের কাজ। কেননা এখন দেরি করলে রোযাকে নিজের পক্ষ থেকে দীর্ঘায়িত করা হবে। আর আল্লাহ তা'আলা তো সে হুকুম করেননি।

সাহ্‌রীতে দেরি করার কারণ

সাহ্‌রীতে দেরি করা উত্তম। আগে আগে সাহ্‌রী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তা সুন্নতের ফেলাফ হয়। বরং যখন সাহ্‌রীর সময় শেষ হয়ে যায়, ঠিক তার আগ মুহূর্তেই সাহ্‌রী খাওয়া চাই। এটাই উত্তম। কেননা কেউ আগে সাহ্‌রী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে সে নিজের পক্ষ থেকে রোযার পরিমাণ দীর্ঘ করে ফেলল। সে এটা শরী'আতের অনুসরণে করেনি, নিজের পক্ষ থেকে করেছে। সারকথা, সব কাজে শরী'আতের অনুসরণ জরুরি। আমরা আল্লাহ তা'আলার বান্দা। বান্দা ও গোলাম বলেই তাকে, যে মনিব যখন যা বলে তাই করে। নিজ মর্জিতে কিছু করে না।

নিজ মর্জিতে চললে বান্দা হওয়া যায় না

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ হাসান সাহেব রহ. বলেন, ভাই এক তো হল চাকর বা কর্মচারী, আরেক হচ্ছে গোলাম। চাকর নির্দিষ্ট কাজের জন্য ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়। যেমন এক কর্মচারীর কাজ কেবল ঝাড়ু দেওয়া। সে কেবল এটাই করবে। অন্য কোনও কাজ করা তার দায়িত্ব নয়। এক কর্মচারীর ডিউটি হল আট ঘণ্টা। আট ঘণ্টা পর তার ছুটি হয়ে যায়। পক্ষান্তরে গোলাম হয় সর্বক্ষণের সর্বকাজের। সে বিশেষ কোনও সময়ের ও বিশেষ কাজের জন্য নয়; বরং সে হুকুমের দাস। মনিব যদি বলে, তুমি এখানে জজ ও বিচারক হয়ে যাও, মানুষের মধ্যে বিচার-আচারের দায়িত্ব পালন করো, তবে সে বিচারক হয়ে সেই দায়িত্ব পালন করবে। যদি বলে মলমূত্র সাফ করো, তবে তাই করতে হবে। তার কোনও বাঁধাধরা কাজ ও বাঁধাধরা সময় নেই। মনিব যখন যা বলে সে তাই করবে।

গোলামীর পর আরও একটি স্তর আছে। তা হল বন্দেগীর স্তর। বান্দার স্তর গোলামেরও পরে। কেননা গোলামকে তো অন্তত মনিবের পূজা করতে হয় না। কিন্তু বান্দাকে তার মনিবের ইবাদত-উপাসনাও করতে হয়। বান্দার নিজ মর্জি বলতে কিছু থাকে না; বরং তার কর্তব্য মনিবের মর্জিতে চলা। মনিব যা বলবে তাই করবে। এটাই হচ্ছে দ্বীনের হাকীকত ও প্রাণবস্তু।

আমি সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত সারা দিনের সময়সূচী ঠিক করে রেখেছি। কখন লেকাজোখা করা হবে, কখন পাঠদান করা হবে, কখন অন্য কোনও কাজ করা হবে, সবকিছুর সময় স্থির করা আছে। লেখার সময় যখন লিখতে বসলাম, পড়াশোনা করে লেখার জন্য মন প্রস্তুত করলাম এবং কোনও একটা বিষয় মনে মনে সাজিয়ে তা লেখার জন্য কলম তুললাম, ঠিক এ মুহূর্তে কোনও এক ব্যক্তি এসে 'আস সালামু আলাইকুম' বলল এবং মুসাফাহা করার জন্য হাত বাড়াল। এরূপ ক্ষেত্রে ভীষণ বিরক্তি দেখা দেয়। মনে হয় কী উটকো ঝামেলা! আল্লাহর বান্দা আসার আর সময় পেল না! বই-পুস্তক পড়ে লেখার জন্য মনটা সবে

প্রস্তুত করলাম আর অমনি এসে পড়ল। কী আর করা যাবে, তার সঙ্গে পাঁচ দশ মিনিট কথা বলতে হল। কিন্তু ইত্যবসরে যা-কিছু মাথায় এসেছিল সব হাওয়া। সেই বান্দা বিদায় হওয়ার পর আবার নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বিষয়বস্তু সাজাতে হল। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই কারবার চলতে থাকে। আগে এরূপ ক্ষেত্রে খুবই কষ্ট হতো। দেখা যেত প্রায়ই আমার পরিকল্পনামতো কাজ হয় না। আমি চিন্তা করেছিলাম এই সময়ে এই পরিমাণ কাজ হয়ে যাবে, দু-তিন পৃষ্ঠা লিখে ফেলব, কিন্তু লেখা হল মাত্র কয়েক লাইন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব রহ.-এর মর্যাদা বুলন্দ করুন। তিনি বলতেন, ভাই, আগে বলো, তুমি এ কাজ কেন করছ? রচনা সংকলন, অধ্যাপনা, ফাত্ওয়া ইত্যাদি কার জন্য? এসব কি তোমার কীর্তি রেখে যাওয়ার জন্য? এজন্য যে, তোমার জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করা হবে, তুমি এত হাজার পৃষ্ঠা লিখে গেছ? এতগুলো বই-পুস্তক তুমি রচনা করেছ? কিংবা এত সংখ্যক ছাত্র গড়ে গিয়েছ? এসবই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার আক্ষেপ যথার্থ যে, সেই ব্যক্তির সাক্ষাতের কারণে তোমার কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে। যত পৃষ্ঠা লিখতে চেয়েছিলে তা লিখতে পারোনি, যত সংখ্যক ছাত্র গড়তে চেয়েছিলে, তা গড়া হয়নি, এভাবে কাজের পরিমাণ তোমার কাঙ্ক্ষিত অংকে পৌছায়নি। এজন্য তুমি ঠিকই আক্ষেপ করতে পারো। কিন্তু এটাও চিন্তা করো যে, এসব দ্বারা আসলে কী অর্জন হবে! কেবল মানুষের প্রশংসা ও সুখ্যাতি। এই প্রশংসা ও সুখ্যাতিই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে সবই তো পণ্ডশ্রম। আল্লাহ তা'আলার কাছে এর কানাকড়ি মূল্য নেই। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য যদি হয় তাঁর সন্তুষ্টি লাভ, যদি কলম চালানো হয় তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, নিজ আমল যেন তাঁর কাছে কবুল হয় সেই জন্য, তবে সেটা মাথায় রেখেই কাজ করতে হবে। অর্থাৎ কলম চালালে যদি তিনি খুশী হন, কলম চালাব। আর যদি না চালালে খুশী হন চালাব না। তিনি যে অবস্থায় খুশী হন সেটাই তো করা উত্তম। দেখতে হবে সময়ের চাহিদা কোন্‌টা। এ কথা ঠিক যে, তুমি লক্ষ্য স্থির করেছিলে এত পৃষ্ঠা লিখবে। কিন্তু একজন লোক যখন মাসআলা জিজ্ঞেস করা বা তার অন্য কোনও প্রয়োজনে আসল, তখন তোমার কাছে তার হক

প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন সময়ের দাবি হল তার হক আদায় করা। কাজেই এখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত তার হক আদায় করার মধ্যে, তার সঙ্গে কথা বলা ও তার প্রয়োজন সমাধা করার মধ্যে। কাজেই পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা গেল না এজন্য আক্ষেপ কেন? এখন তো সেই ব্যক্তির প্রয়োজন সমাধা করে দিলে যে পরিমাণ ছাওয়াব পাবে, লেখাজোখার মাধ্যমে তা পাবে না। সুতরাং সময়ের চাহিদার প্রতি নজর দাও। যে সময় যে দাবি জানায় সে অনুযায়ী কাজ করো। এটাই দ্বীনের বুঝ। কোনও কাজ নিজের পক্ষ থেকে চূড়ান্তভাবে স্থির না করে সবকিছু আল্লাহ তা'আলার হাওয়ালা করে দাও। তিনি যেমন করাচ্ছেন, মানুষ তেমনই করছে। এতে খুশী থাকলেই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ হবে। সবকিছুতে এটাই দেখবে যে, আল্লাহ তা'আলা কিসে খুশী! সেই অনুসারে কাজ করবে। সুস্থতা অসুস্থতা, সফরে-বাড়িতে সর্বাবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টিকে সামনে রাখবে। আমি একটা পরিকল্পনা করেছিলাম এবং একটা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, সেটা নস্যাৎ হয়ে গেল– এই চিন্তা করবে না। সাহেব, সে পরিকল্পনা তৈরিই হয়েছিল নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার জন্য। মানুষই বা কী আর তার পরিকল্পনাই বা কী? পরিকল্পনা তো তাঁরটাই চলে, অন্য কারওটা নয়। রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়, সফরে গেলেও যায়। মানুষের কত রকম পারিপার্শ্বিকতা আসে আর তাতে তার সব প্ল্যান চুরমার হয়ে যায়। নিজ পরিকল্পনার পেছনে ছুটো না। মালিকের সন্তুষ্টি লক্ষ করে চলো। ইন্‌শাআল্লাহ লক্ষ অর্জিত হবে।

হযরত উওয়ায়স কারনী রহ.-এর ঘটনা

হযরত উওয়ায়স কারনী রহ. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করতে পারেননি। এমন কোন্ মুসলিম আছে, যার অন্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা পাওয়ার তামান্না থাকবে না? কেবল কি তামান্না থাকবে? থাকবে ব্যাকুলতা, রীতিমতো ছটফটানি যদি থাকে তাঁকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা এবং হয়ে থাকে তাঁর কালে জন্ম। কিন্তু উওয়ায়স কারনী রহ. এর মা অসুস্থ। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি শরী'আতের হুকুম হল, তুমি মায়ের সেবায় থাকো।

সে মতে মায়ের সেবা তো চলছে। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে। তা কেন হচ্ছে? এ কারণে যে, তাঁর কল্যাণ ছিল শরী'আতের হুকুম মানার মধ্যে। হুকুম হয়েছে মায়ের সেবায় থাকার। মদীনা মুনাওয়ারায় না যাওয়ার। হুকুম হয়েছে মাকে অসুস্থাবস্থায় ফেলে রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে যাবে না। কাজেই তিনি সেই নির্দেশ মোতাবেক মায়ের সেবায় থেকে গেলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ থেকে বঞ্চিত থাকলেন। এই যে মহাসৌভাগ্যের সাক্ষাত লাভ থেকে বঞ্চিত থাকলেন, বঞ্চিত থাকার নির্দেশকে শিরোধার্য করে নিলেন, এতে তিনি কী পেলেন? হ্যাঁ, এর ফলে যা পেলেন, হুকুম অমান্য করলে তা পাওয়া সম্ভব হতো না। পেলেন এই যে, যেই সাহাবীগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তাঁরা সুদূর মদীনা থেকে তাঁর সাক্ষাত লাভের জন্য আসতেন, এসে তাঁর কাছে দু'আ চাইতেন। অনুরোধ জানাতেন, আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। বরং এ পর্যন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর ফারূক রাযি.-কে বলেছিলেন, 'কারন-এ আমার এক উম্মত আছে। সে আমার নির্দেশ পালনার্থে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্যকে কুরবানী করেছে। হে উমর! সে কখনও মদীনায় আসলে তার কাছে গিয়ে নিজের জন্য দু'আ চাবে।

এই তো ছিলেন হযরত উওয়ায়স কারনী রহ.। তাঁর জায়গায় আবেগ তাড়িত কেউ হলে বলত, আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীদার চাই। সে চিন্তা করত না তার পিতা-মাতা অসুস্থ, তাদের সার্বক্ষণিক সেবা দরকার এবং আমাকে ছাড়া তাদের চলে না। এভাবে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার লাভের জন্য ছুটে যেত। কেন যেত? কেবল নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য। কিন্তু হযরত উওয়ায়স রহ. তা করেননি। তিনি তো ছিলেন আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত বান্দা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাঁর পরিপক্ক ঈমান ছিল। কাজেই তিনি যা বলতেন, উওয়ায়স রহ. তাই করতেন। নিজ ইচ্ছা ও আবেগের ধার ধারতেন না। নিজ মতো ও

সিদ্ধান্ত বলতে তাঁর কাছে কিছু ছিল না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন সেটাই তার কাছে চূড়ান্ত কথা। কাজেই তাঁর তো সেটাই করতে হবে।[৫৬]

নিজ খুশীর গোলামীই সমস্ত বিদ'আতের মূল

দুনিয়ার যত বিদ'আত চালু আছে, এর দ্বারাই তার উৎপাটন সম্ভব। অন্তরে যদি এই বুঝ এসে যায় যে, আমার খুশী ও আমার আগ্রহ বলে কোনও কথা নয়। তিনি যা হুকুম করেন আমাকে তো তাই করতে হবে, তবে বিদআত আপনা-আপনিই নির্মূল হয়ে যায়। বিদআতের অর্থ কী? বিদ'আত হল আল্লাহ তা'আলাকে রাজি করার পথ কী, তা আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে না জেনে নিজেই তৈরি করে নেওয়া। কাজেই আমার বুঝে যেহেতু আসছে ১২ই রবীউল আউয়াল ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করা ও মীলাদ পড়া সঠিক কাজ, তাই এটা শুরু করে দিলাম। এভাবে নিজ মন-মস্তিষ্ক থেকে এক-একটা পন্থা উদ্ভাবন করছি ও তা চালু করে দিচ্ছি। না নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, না আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন আর না সাহাবায়ে কেরাম তা করেছেন; বরং নিজেদের পক্ষ থেকে একটা ছাওয়াবের কাজ হিসেবে তা তৈরি করে নিয়েছি। এমনিভাবে নিজেদের মন-মস্তিষ্ক থেকে গড়ে নিয়েছি যে, কারও মৃত্যুর পর তার নামে জেয়াফত দেওয়া, চল্লিশা ইত্যাদি করা মৃতের জন্য একটা উপকারী কাজ আর সে অনুযায়ী এ প্রথা চালু করে দিয়েছি। এরই নাম বিদ'আত, এ সম্পর্কেই হাদীছে ইরশাদ হয়েছে—

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'দ্বীনের নামে প্রতিটি নতুন সৃষ্টি বিদ'আত আর বিদ'আত গোমরাহী।'[৫৭]

আপাতদৃষ্টিতে এসব তো ভালো কাজ। কুরআন মাজীদ পড়ছে, খাবার তৈরি করে মানুষকে খাওয়াচ্ছে। এতে দোষের কী আছে? এতে

---

৫৬. হযরত উওয়ায়স রহ.-এর মাহাত্ম্য জানার জন্য দেখুন সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪৬১২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৫৭

৫৭. নাসাঈ, হাদীছ নং ১৫৭৮; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৯৯১; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪৫

গুনাহ হবে কেন? কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ভালো নয়। কেননা দ্বীনের নামে এটা আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর নির্দেশনা ছাড়া নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করে নিয়েছে। আর যে কাজ বাহ্যত নেক, কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা মোতাবেক নয়। সেটাই বিদ'আত, যা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

میرے محبوب مری ایسی وفا سے توبہ
جو ترے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

'প্রিয়তম আমার! এমনধারা প্রণয় থেকে আমি তাওবা করি, যা তোমার মনোকষ্টের কারণ হয়।'

অর্থাৎ যেটা বাহ্যত বন্দেগী মনে হবে, কিন্তু বাস্তবে তোমার মনের ব্যথা হবে, এমন বন্দেগী থেকে আমি তাওবা করি। আল্লাহ তা'আলা যে অবস্থায় রাখেন, ব্যস তাতেই খুশী থাকো এবং সেই অবস্থার যা চাহিদা তা পূরণ করো।

নিজের সব ব্যাপার আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও

মাওলানা রুমী রহ. কী চমৎকার বলেছেন–

چوں بر میخت ببندد بستہ باش
چوں کشاید چابک و بر جستہ باش

'তিনি তোমার হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখলে বাঁধা অবস্থায়ই পড়ে থাকো। আর যখন বাঁধন খুলে দেন উঠে লাফ মারো।'

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, অসুস্থ হয়ে পড়েছ বলে ঘাবড়িও না। আল্লাহ তা'আলা যে অবকাশ ও সুবিধা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করাও তো ছাওয়াবের কাজ। তাঁর প্রদত্ত অবকাশ অনুযায়ী বান্দা আমল করছে, এটা আল্লাহ তা'আলার বড় পসন্দ। সুতরাং তাঁর দেওয়া অবকাশকে কাজে লাগাও। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ বিষয়টা বুঝবার তাওফীক দিন। আমীন।

শোকরের গুরুত্ব ও শোকর আদায়ের পন্থা

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَّأْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدُهٗ عَلَيْهَا اَوْ يَشْرَبَ الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدُهٗ عَلَيْهَا

'আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার প্রতি রাজি হয়ে যান, যে কোনও লোক্মা খেলে সেজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করে কিংবা এক ঢোক পানি পান করলে সেজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করে।'[৫৮]

এর মানে যে বান্দা প্রতিটি নি'আমতের কারণে আল্লাহ তা'আলার শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুশী হয়ে যান।

এ কথা বারবার বলা হয়েছে যে, শোকর একটি উৎকৃষ্ট ইবাদত। আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বলতেন, সুফিয়ায়ে কেরাম যেসব মেহনত-মুজাহাদা ও সাধনা করতেন, তোমাদের পক্ষে তা কত দূর করা সম্ভব; কিন্তু তোমরা চাইলে সস্তায় কিস্তিমাতের ব্যবস্থা করতে পারো। তোমরা প্রতিটি বিষয়ে শোকর আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলো। যখন খানা খাবে শোকর আদায় করবে, পানি পান করবে তো শোকর আদায় করবে, বাতাসে আরাম পাচ্ছ তো শোকর আদায় কর, ঘরের লোকজনকে দেখে মনে আনন্দ লাগছে তো শোকর আদায় কর। এভাবে শোকর আদায়ের অনুশীলন গ্রহণ করো এবং যপতে থাকো– আলহামদুলিল্লাহ; আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শোকর; আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ্-শোকর।

---

৫৮. সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ২৭৩৪

প্রকাশ থাকে যে, এই শোকর আদায়ের অভ্যাস এমনই এক মূল্যবান জিনিস, যা অন্তরের বহু রোগ-ব্যাধির শেকড় কেটে দেয়। যে ব্যক্তি বেশি বেশি শোকর আদায় করে, সে সাধারণত অহংকার-অহমিকার শিকার হয় না। শোকরের অভ্যাস গড়ে তুললে গর্ব-হিংসা-বিদ্বেষ-আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি রোগ নির্মূল হয়ে যায়, এটা বুযুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতা; বরং কুরআন-হাদীছ দ্বারাও এটা প্রমাণিত।

অকৃতজ্ঞতা সৃষ্টি করাই শয়তানের আসল লক্ষ্য

আল্লাহ তা'আলা যখন শয়তানকে বিতাড়িত করলেন, সে কমবখ্‌ত বের হয়ে আসার সময় দাবি জানাল, আমাকে জীবন ভর অবকাশ দিন। আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দিলেন। সে বলল, এখন আমার কাজ হল আপনার বান্দাদেরকে গোমরাহ করা। আমি তাদের ডান দিক থেকে আসব, বাম দিক থেকে আসব, সম্মুখ থেকে আসব, পেছন থেকে আসব এবং এভাবে চতুর্দিক থেকে চেষ্টা চালাতে থাকব। পরিশেষে তাদেরকে আপনার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেব। সবশেষে সে বলল,

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ

'আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না।'[৫৯]

হযরত থানভী রহ. বলতেন, এর দ্বারা বোঝা গেল, শয়তানের আসল লক্ষ্য হল 'না-শোকরী' সৃষ্টি করা। অন্তরে কোনও রকমে না-শোকরী সৃষ্টি করতে পারলে এর পরিণামে আরও যে কত রকম ব্যাধি সৃষ্টি হবে তার ইয়ত্তা নেই। কাজেই এ চালে শয়তানকে সফল হতে দেওয়া উচিত না। তার এ চাল ব্যর্থ করে দেওয়ার মোক্ষম উপায় হল শোকর আদায় করা। যত বেশি শোকর আদায় করবে, ততই শয়তানের হামলা থেকে নিরাপদ থাকবে। সুতরাং আত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচার সর্বাপেক্ষা কার্যকর প্রতিষেধক হল দিন-রাত, উঠতে-বসতে সর্বক্ষণ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ-শোকর বলতে থাকা। ইনশাআল্লাহ এর ফলে শয়তানের হামলা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

---

৫৯. সূরা আরাফ, আয়াত ১৭

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. বলতেন, মিয়াঁ আশরাফ আলী! যখন পানি পান করার দরকার হবে, খুব ঠাণ্ডা পানি পান করবে, যাতে প্রতিটি লোমকূপে তার শীতলতা পৌছে যায় এবং প্রতিটি পশম থেকে আল্লাহ তা'আলার শোকর উৎসারিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তিনটি জিনিস সম্পর্কে বলতেন, এগুলো আমার প্রিয়, তার একটি হল ঠাণ্ডা পানি। অন্য কোনও পানাহার সামগ্রী সম্পর্কে বর্ণিত নেই যে, তার বিশেষ কোনওটি তিনি দূর থেকে আনিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু ঠাণ্ডা পানি ব্যতিক্রম। কেবল এ জিনিসই তিন মাইল দূর থেকে তাঁর জন্য নিয়ে আসা হতো। মদীনা মুনাওয়ারার কুবা এলাকায় এখনও সে কুয়াটি আছে, যা থেকে তাঁর জন্য পানি আনা হতো। কুয়াটির নাম 'বিরু গার্‌স'। তার পানি খুব ঠাণ্ডা হতো।[৬০]

হযরত হাজী সাহেব রহ. বলতেন, এর তাৎপর্য হল, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ঠাণ্ডা পানি পান করলে প্রতিটি লোমকূপ থেকে শোকর বের হয়ে আসবে।

ঘুমানোর আগে নি'আমতরাজির কথা স্মরণ করে শোকর আদায়

রাতে ঘুমানোর আগে একেকটি নি'আমতের উপর নজর রাখো এবং সেজন্য শোকর আদায় করো। যেমন হে আল্লাহ! এই ঘর স্বস্তির জায়গা। এটা তোমারই দান– আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শোকর। আরামের এ বিছানা তুমিই দিয়েছ– আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শোকর। আমাকে সুস্থ ও নিরাপদ রেখেছ– আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শোকর। আমার ছেলে-মেয়েও সুস্থ ও নিরাপদে আছে– আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শোকর। এভাবে একেকটি নি'আমতের উপর দৃষ্টি দাও এবং শোকর আদায় করতে থাকো।

---

৬০. ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন, ১২, ২১২, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়ত করেছিলেন, ওফাতের পর তাঁকে যেন বি'রু গার্‌সের পানি দ্বারা গোসল দেওয়ানো হয়– সুনান ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ১৪৫৭

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বলতেন, আমি এ শিক্ষা পেয়েছি আমার নানার কাছে। একবার আমি সেখানে গেলে রাতে দেখলাম, তিনি শোওয়ার আগে বিছানায় বসে বারবার বলছেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

দেখলাম তিনি গভীর মনোযোগ ও ভক্তির সাথে এ আমলে রত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! আপনি এ কী আমল করছেন? তিনি বললেন, ভাই, খবর তো নেই সারাটা দিন কিভাবে কাটাই। শোকর আদায় হচ্ছে কিনা বলতে পারব না। এ সময় বিছানায় বসে সারা দিনের নি'আমতসমূহ স্মরণ করি এবং প্রত্যেকটির জন্য বলি–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বলেন, আমি তার আমল দেখে শিক্ষা গ্রহণ করি। আলহামদুলিল্লাহ তারপর থেকে এটাকে আমার নিয়মিত আমলের অন্তর্ভুক্ত করে নিই। প্রতি রাতে শোয়ার আগে প্রতিটি নি'আমাতের কথা মাথায় আনি এবং তার জন্য শোকর আদায় করি।

শোকর আদায়ের সহজ পন্থা

আমরা কুরবান যাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি জিনিসের নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। মানুষ শোকর আদায় কতদূর করবে! শেখ সাদী রহ.-এর কথা হল প্রতিটি শ্বাসে দু'বার শোকর আদায় কর্তব্য। শ্বাস ভেতরে টানার পর যদি বাইরে না আসে তাহলেও মরণ, আবার ছাড়ার পর যদি ভেতরে না ঢোকে তাতেও মরণ। কাজেই প্রতিটি শ্বাসে দু'টি নি'আমত আর প্রত্যেক নি'আমতের জন্যই শোকর আদায় অবশ্য কর্তব্য। ফলে প্রতিটি শ্বাসে দু'বার শোকর আদায় ওয়াজিব হয়ে গেল। তো মানুষ যদি কেবল শ্বাসের এ নি'আমতের জন্য শোকর আদায় করে, তবে কতটুকু করতে পারবে? অথচ আল্লাহ তা'আলার নি'আমত অপরিসীম। ইরশাদ হয়েছে–

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

'তোমরা আল্লাহর নি'আমতসমূহ গণনা করতে চাইলে তা করতে পারবে না।'[৬১]

তাহলে এই অসংখ্য নি'আমতের শোকর আদায় কী করে সম্ভব? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি সহজ পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। মাত্র কয়েকটি শব্দ পাঠ। প্রত্যেক মুসলিমের শব্দ ক'টি মুখস্থ করে ফেলা উচিত। ইরশাদ করেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا مَعَ دَوَامِكَ وَخَالِدًا مَعَ خُلُوْدِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهٰى لَهٗ دُوْنَ مَشِيْئَتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيْدُ قَائِلُهٗ اِلَّا رِضَاكَ.

'হে আল্লাহ! আপনার শোকর এমনই শোকর, যা আপনার স্থায়িত্বের সাথে স্থায়ী থাকবে এবং আপনার চিরন্তনতার সাথে চিরন্তন হয়ে থাকবে। আপনার এমনই শোকর, যা আপনার ইচ্ছা না হলে কখনও নিঃশেষ হবে না এবং আপনার এমনই শোকর আদায় করছি, যার আদায়কারী আপনার সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু কামনা করে না।'[৬২]

অপর এক হাদীছে আছে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ زِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَعَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ.

'হে আল্লাহ! আপনার শোকর আদায় করছি আপনার আরশের ওজন পরিমাণ, আপনার কালিমা ও কথামালার কালি পরিমাণ, আপনার সৃষ্টিরাজির সংখ্যা পরিমাণ এবং আপনি নিজের জন্য যেমনটা পসন্দ করেন সেই পরিমাণ।'[৬৩]

বলা হয়েছে আপনার কালিমা ও কথামালার কালি পরিমাণ। অর্থাৎ আপনার কথা লিখতে যে পরিমাণ কালি দরকার সেই পরিমাণ। কী

---

৬১. সূরা নাহল, আয়াত ১৮
৬২. কানযুল উম্মাল, ২য়, ২২৩, হাদীছ নং ৩৮৫৭
৬৩. সুনানে আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১২৮৫

পরিমাণ কালি দরকার আল্লাহর কালাম লিখতে? আল্লাহর বাণীতেই শুনুন–

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا

'বলো, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে– সাহায্যার্থে তার অনুরূপ আরও সাগর আনলেও।'[৬৪]

অন্যত্র ইরশাদ–

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

'পৃথিবীর সমস্ত গাছ যদি কলম হয় এবং এই যে সাগর এর সাথে যদি আরও সাত সাগর যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[৬৫]

আপনার শোকর আদায় করছি আপনার সৃষ্টিরাজির সংখ্যা পরিমাণ, অর্থাৎ মানুষ, জীবজন্তু, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ ইত্যাদি যত মাখলূক আপনি সৃষ্টি করেছেন তার সমসংখ্যক।

শেষে বলা হয়েছে, আপনি নিজের জন্য যেমনটা পসন্দ করেন সেই পরিমাণ, অর্থাৎ যে পরিমাণ শোকর আদায় করলে আপনি খুশী হবেন, আমি সেই পরিমাণ আপনার শোকর আদায় করছি।

চিন্তা করুন তো, এতে যা বলা হয়েছে, মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বেশি আর কী বলা সম্ভব? সুতরাং প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে এসব শব্দে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা চাই। তাঁর শোকর আদায়ের জন্য

---

৬৪. সূরা কাহ্ফ, আয়াত ১০৯
৬৫. সূরা লুকমান, আয়াত ২৭

এর চেয়ে উপযুক্ত ভাষা ও এর চেয়ে সহজ পন্থা আর কিছু হতে পারে না। এর সাথে আরও যোগ করা চাই–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مَلِيًّا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ نَفْسٍ.

'হে আল্লাহ! আপনার ভরপুর শোকর আদায় করছি, চোখের প্রতিটি পলকে এবং প্রতিটি শ্বাস গ্রহণে।'[৬৬]

মোদ্দাকথা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকরের এসব বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো সংক্ষিপ্ত হওয়ায় মুখস্থ করাও সহজ। রাতে ঘুমানোর আগে পড়া চাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

---

৬৬. কানযুল উম্মাল : ২য় খণ্ড, ২২৩; ৩৮৫৭

আল্লাহ তা'আলার হুকুম বিনা বাক্যে শিরোধার্য*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۙ﴿۷﴾ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۸﴾

অর্থ : ভালোভাবে জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল আছেন আর বহু বিষয় এমন আছে, যে সম্পর্কে সে যদি তোমাদের কথা মেনে নেয়, তবে তোমরা নিজেরাই সংকটে পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরের ঈমানের ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন এবং তাকে তোমাদের অন্তরে আকর্ষণীয় করে দিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে কুফর, গুনাহ ও অবাধ্যতাকে ঘৃণ্য বানিয়ে দিয়েছেন। এরূপ লোকেরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও নি'আমতেরই ফল। আল্লাহ জ্ঞানের মালিক, হিকমতেরও মালিক।[৬৭]

---

* ইসলাহী খুতবাত, পৃষ্ঠা ২৯৭-৩০৬

৬৭. সূরা হুজুরাত, আয়াত ৭-৮

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! সূরা হুজুরাতের তাফসীর চলছে। বিগদ দু'তিন জুমু'আয় আপনাদের সামনে এ সূরার ছয় নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছিল। তাতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ছিল, তোমাদের কাছে কখনও কোনও ফাসেক ব্যক্তি কোনও সংবাদ নিয়ে আসলে তোমাদের জন্য ফরয ও অবশ্য কর্তব্য হল, সে বিষয়টি যাচাই করে নেওয়া, পাছে সে সংবাদটি ভুল হয় এবং তার ভিত্তিতে তোমরা কারও ক্ষতি করে বস। এমনটি হলে শেষে তোমাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে। আল হামদুলিল্লাহ, এ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়ে গেছে। আজকের আলোচনা সাত ও আট নম্বর আয়াত সম্পর্কে। এতে আল্লাহ তা'আলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে গোটা উম্মতকে সে সম্পর্কে শিক্ষাদান করেছেন।

তোমাদের মত যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতের বিপরীত হয়

আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলছেন, এ বিষয়ে সচেতন থেকো যে, তোমাদের মধ্যে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমান রয়েছেন। আর তোমাদের বহু কথাই এমন যা তিনি মেনে নিলে এবং তোমরা যেমন বলো তেমনি করলে, তোমরা কঠিন বিপদে পড়ে যাবে, এবং তোমাদের মারাত্মক পেরেশানি দেখা দেবে।

সতর্ক করা হচ্ছে, ক্ষেত্র বিশেষে এমন হতে পারে, যেখানে তোমাদের মত তাঁর মত থেকে ভিন্ন হয়ে যাবে, হয়তো তিনি একটা কাজের হুকুম দেবেন, কিন্তু তোমাদের তা বুঝে আসবে না, ফলে সে ব্যাপারে তোমাদের মত হবে অন্যরকম কিংবা কোনও বিষয় হঠাৎ তোমাদের মনে হবে যে, বিষয়টা এরকম হওয়া দরকার আর তোমরা তোমাদের সে অভিমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। তো এরূপ ক্ষেত্রে তোমাদের মনে হতে পারে যে, তিনি যা বলছেন, যা করতে বলছেন, তা আমাদের বুঝে আসছে না।

বনুল-মুস্তালীকের যে ঘটনা পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছিলাম, তাতে তো এরকমই হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওয়ালীদ ইবন উক্‌বা রাযি.-কে যাকাত উসূলের জন্য বনুল-মুস্তালীকের এলাকায় পাঠালেন। বনুল-মুস্তালীকের মুসলিমগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে তাদের লোকালয়ের বাইরে চলে আসল। কিন্তু তাদের সঙ্গে হযরত ওয়ালীদ রাযি.-এর পূর্বশক্রতা থাকায় তাঁর সন্দেহ হল, তাঁরা বুঝি তাঁকে হত্যা করতে চাচ্ছে। কাজেই তিনি আর সামনে বাড়লেন না, দ্রুত মদীনায় ফিরে আসলেন। ফিরে এসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বৃত্তান্ত জানালেন। শুনে তো সাহাবায়ে কেরামের ঈমানী জোশ উথলে উঠল। কী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে নিজ প্রতিনিধি হিসেবে যাকাত উসূলের জন্য পাঠালেন, তার সঙ্গে এই আচরণ? তারা নিজেরাই তো যাকাত আদায়ের জন্য একজন লোক পাঠানোর অনুরোধ করেছিল। এভাবে ফরমায়েশ করে নেওয়া অতিথির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা? কাসেদকে হত্যা করা তা মহা অপরাধ। তারা কিনা সেই চেষ্টাই করল? মোটকথা সাহাবায়ে কেরাম খুবই আহত হলেন। তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। এই উত্তেজনার ভেতর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলেন, এর একটা প্রতিকার করা উচিত। তারা নম্র-মধুর ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং আপনি হুকুম দিন, আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি। কালবিলম্ব না করে আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালাই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে তখন, তবে তার আগে তদন্ত করে দেখা চাই, আসল ব্যাপারটা কী? সুতরাং ঘটনা তদন্ত করার জন্য তিনি হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযি.-কে পাঠালেন।

সাহাবায়ে কেরামের কারও কারও মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটাতো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিকে অবমাননা করেছে, তাকে হত্যা করার ফন্দী

এঁটেছে। কাজেই এর প্রতিকার হিসেবে এখন সরাসরি তাদের উপর হামলা চালানোই সমীচীন ছিল। অত তত্ত্ব-তালাশ ও খোঁজ-খবর নেওয়ার দরকার ছিল না। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা আমলে নিলেন না; বরং প্রথমে তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন এবং সেজন্য হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রাযি)-কে পাঠিয়ে দিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তোমাদের কথা আমলে নিতেন এবং সে মতে দ্রুত তাদের উপর আক্রমণ করে বসতেন, তবে তাতে নিরপরাধ মানুষ হতাহত হতো। তারা তো বাস্তবে কোনও অপরাধ করেনি। তারা হযরত ওয়ালিদ বিন উক্‌বা রাযি.-কে হত্যা করার অভিপ্রায়ে শহরের বাইরে আসেনি। তারা তো এসেছিল তাকে স্বাগত জানাতে। মাঝখানে কেউ এসে তাঁকে এই ভুল সংবাদ দিয়েছিল যে, তারা তাঁকে হত্যা করার মতলবেই বের হয়েছে।[৬৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আল্লাহর নির্দেশনায় বলেন

আয়াত বলছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের সব কথা মেনে নিলে তোমাদের পক্ষে পরিণাম শুভ হবে না। তাতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তোমরা মহামসিবতে পড়ে যাবে, কঠিন জটিলতার সম্মুখীন হবে। এর দ্বারা ইশারা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে তোমাদের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তাকে তো সব কাজে তিনি নিজেই পথ দেখান। সর্বদা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক থাকে। সকাল-সন্ধ্যা তার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়। তাকে এমন সব কথা জানানো হয়, যে সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত নও। অনেক সময় এমন এমন বিধানও দেওয়া হয়, যা সহজে তোমাদের বোধগম্য হয় না। তোমাদের কাজ সর্বদা তার হুকুম মতো চলা। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করেন

৬৮. ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ৪র্থ, ২৬৫

এবং তোমরা যা বলো তাই মানেন, তবে তো রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্যই ভেস্তে যাবে। তোমরা যা বোঝো তাই যদি করতে হয়, তবে রাসূল পাঠানোর প্রয়োজন কী? রাসূল পাঠানোই হয় তোমরা যেসব বিষয় বুঝে উঠতে পারো না, সে বিষয়ে তোমাদেরকে পথ নির্দেশ করার জন্য। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনও হুকুম তোমাদের বুঝে আসে না আসলে, তার গৃহীত কোনও ব্যবস্থা তোমাদের মনঃপূত না হলে কিংবা তার কোনও কাজ তোমাদের ইচ্ছানুরূপ না হলে তোমরা যেন তাতে আপত্তি করে বসো না এবং তোমরা সে বিষয়ে সন্দেহে পড়ো না। এই চেতনা অন্তরে সদা জাগ্রত রেখো যে, রাসূল পাঠানোই হয় তোমরা যেসব বিষয় বুঝতে পারো না এবং তোমাদের বুদ্ধি যে বিষয়ে তোমাদেরকে কোনও সমাধান দিতে পারে না, সে ক্ষেত্রে তোমাদেরকে পথ দেখানোর জন্য।

বুদ্ধি পথনির্দেশ করতে পারে নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতর

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বুদ্ধিমান জীব বানিয়েছেন। বুদ্ধি মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার অতি বড় নি'আমত। বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করলে মানুষ এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে পারে, কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিকে সবজান্তা ও সর্বদর্শী মনে করা ঠিক নয়। নিশ্চয়ই বুদ্ধি বড় কাজের জিনিস, কিন্তু আপন গণ্ডির ভেতর। তার ক্ষমতা সীমাহীন নয়। একটা পরিমণ্ডলের ভেতর সে কাজ করতে পারে। তার বাইরে সে সম্পূর্ণ অচল। যেমন চোখ খুব কাজের বস্তু, অনেক বড় নি'আমত। কিন্তু তার কাজ আপন গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যেই সে দেখতে পায়, তার বাইরে সে কিছু দেখে না। বুদ্ধিও এরকমই। সে নির্দিষ্ট বলয়ের মধ্যেই কাজ করবে। তার বাইরে সে অচল। বুদ্ধি যেখানে অচল সেখানে মানুষের কী গতি? হ্যাঁ সেখানে মানুষকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা ওহীর ব্যবস্থা করেছেন, ওহীর মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ মানুষকে সে ক্ষেত্রে শিক্ষাদান করেন। মানববুদ্ধি যে ক্ষেত্রে পদস্খলিত হয়, রাসূলই সেখানে মানুষের হাত ধরেন এবং বলে দেন, তোমরা যা বুঝেছ সঠিক পন্থা সেটা নয়।

সঠিক পন্থা তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমাকে তা শিক্ষাদান করেছেন।

রাসূলের নির্দেশ অনুসরণ করো বুঝে আসুক বা নাই আসুক

সুতরাং আল্লাহর রাসূল যখন কিছু বলেন বা কোনও কাজের হুকুম দেন তখন তা বিনা বাক্যে শিরোধার্য করে নেওয়া উচিত। কেন সে হুকুম দেওয়া হল? সে হুকুমের তাৎপর্য কী? এর যুক্তি তো আমার বুঝে আসছে না! তখন এ জাতীয় কথা বলা ও নিজ বুদ্ধির তাবেদারি করা কিছুতেই উচিত নয়। করলে তার অর্থ হবে রাসূলের হুকুম প্রত্যাখ্যান করা। অথচ বুদ্ধির তাবেদারিতে রাসূলের হুকুম মানতে কুণ্ঠাবোধ করাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা রাসূলকে তো পাঠানোই হয়েছে বুদ্ধির অপারগাতর ক্ষেত্রে পথ দেখানোর জন্য। বুদ্ধি যেখানে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না, রাসূল সেখানে ওহীর মাধ্যমে গন্তব্যপথ দেখিয়ে দেন। কাজেই কুরআন বা হাদীছের মাধ্যমে রাসূল যখন কোনও কাজের আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা দান করেন– চাই সে কাজের যুক্তি বুঝে আসুক বা নাই আসুক, তার কারণ বোধগম্য হোক বা নাই হোক– তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ-

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا۝

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা দান করেন, তখন কোনও মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনও এখতিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হল'।[৬৯]

অর্থাৎ নিজেকে মুমিন বলে দাবি করলে সেই ফয়সালা অবশ্যই মানতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে, আমার বুদ্ধি ত্রুটিপূর্ণ এবং

---

৬৯. সূরা আহযাব, আয়াত ৩৬

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হিকমত পরিপূর্ণ, তাঁর সামনে মাথা নোওয়ানোতেই আমার মঙ্গল।

শর'ঈ বিধানের কারণ জিজ্ঞাসা

আমাদের এ যুগে মানুষের চিন্তা ভাবনায় সাংঘাতিক রকমের পরিবর্তন ঘটেছে। যখনই মানুষকে শরী'আতের কোনও বিধান শোনানো হয় কিংবা বলা হয়, কুরআন ও হাদীছে এ কাজ নিষেধ করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, কেন? এটা নিষেধ করার কারণ কী? কী যুক্তি আছে এর পেছনে? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন তারা বলতে চাচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এর দর্শন আমাদের বুঝে না আসবে এবং এর রহস্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারব, ততক্ষণ আমরা এটা মানতে প্রস্তুত নই- নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এই মানসিকতা এখন ব্যাপকাকার ধারণ করেছে, বিশেষত যারা কিছুটা লেখাপড়া করেছে ও অল্প-বিস্তর বিদ্যা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তারা আর কিছু পারুক না পারুক, এই ব্যাপারে বড় অক্লান্ত। শরী'আতের প্রতিটি বিধানের ক্ষেত্রেই প্রশ্ন করে, এটা কেন? এর যুক্তি কী? যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তি বুঝে না আসবে, ততক্ষণ তারা কোনও কিছু মানতে রাজি নয়।

অথচ একটু চিন্তা করলেই বোঝা সম্ভব, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম সম্পর্কে এ জাতীয় প্রশ্ন অনুচিত এবং এটা মূঢ়তাও বটে। আমরা তো আল্লাহ তা'আলার বান্দা। মনিবের সামনে বান্দা কী মর্যাদা রাখে যে, সে তার আদেশের হেতু জানতে চাবে? সে তো সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের। গোলামেরও নিচে। গোলামের উপরে আছে চাকর। চাকর নির্দিষ্ট কাজে, নির্দিষ্ট বেতনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়ে থাকে। সে চব্বিশ ঘণ্টার গোলাম নয়। তো এই চাকরকে যদি আদেশ করেন বাজার থেকে দশ কেজি গোশত নিয়ে এসো, সে বিনা বাক্যে তা মানতে বাধ্য। তার প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আপনার ঘরে মাত্র দু'জন লোক। দশ কেজি গোশত কেন আনব? বেশি হয়ে যাবে তো! আগে বলুন দশ কেজি গোশত দিয়ে কী হবে, তারপর আনব। বলুন তো এ জাতীয় কথাবার্তা

বললে আপনি তা বরদাশত করবেন কি? আপনি কি তাকে চাকরিতে বহাল রাখার উপযুক্ত মনে করবেন, না এই বলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন যে, কেন গোশত আনা হবে সে প্রশ্ন করার কোনও এখতিয়ারই তোর নেই। তোকে রাখা হয়েছে হুকুম মোতাবেক কাজ করার জন্য। কেন করতে হবে এই প্রশ্ন যখন করছিস তখন আর তোর এ চাকরি করার প্রয়োজন নেই। এখনই চলে যা।

চিন্তা করুন তো সে আপনার চাকর মাত্র, গোলাম ও বান্দা তো নয়। আপনি যেমন মাখলুক, সেও মাখলুক। আপনারই মতো মানুষ সে। আপনার যেমন বুদ্ধি আছে, সেও একইরকম বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। এতদসত্ত্বেও তার 'কেন' প্রশ্নটি আপনার বরদাশত নয়।

আমরা আল্লাহর বান্দা মাত্র

আপনি যখন আল্লাহর বান্দা, তাঁর চাকর ও গোলাম নন; আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আপনার খালেক, আপনি তাঁর মাখলূক। আপনার যেটুকু বুদ্ধি তা তাঁরই দান। তাঁর হিকমতের সঙ্গে আপনার বুদ্ধির তুলনা চলে না। আপনার বুদ্ধি অতি সীমিত। তাঁর হিকমত অনন্ত-অসীম। তিনি খালেক ও মালিক হয়ে যখন বলছেন অমুক কাজটি করো, তখন 'কেন করব' বলার কোনও হক কি আপনার থাকতে পারে? আপনি নিজ চাকরের 'কেনটুকু' যখন বরদাশত করতে পারেন না, তখন আল্লাহ তা'আলাকে 'কেন' বলতে কি আপনার লজ্জা করে না? যিনি আপনার খালিক ও মালিক, তাকে কি না জিজ্ঞেস করছেন, আপনি আমাকে এ হুকুম কেন করছেন? এটা চরম লজ্জার কথা! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনও নির্দেশ শোনার পর 'কেন' উচ্চারণ বেহদ্দ নির্লজ্জতা।

'কেন' বলাটা মূঢ়তাও বটে

সত্য বটে আল্লাহ তা'আলার কোনও হুকুম হিকমতশূন্য নয়; তাৎপর্যহীন নয়। কিন্তু সে হিকমত যে আপনার অবশ্যই বুঝে আসবে

এমন কোনও কথা নেই। কাজেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম শিরোধার্য করে নেওয়া ছাড়া কোনও মানুষ মুমিন হতে পারে না। কোনও হুকুম পাওয়ার পর 'কেন' উচ্চারণ করলে সেটা হবে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। প্রতিটি বিষয় যদি আপনার বুঝেই আসবে এবং প্রতিটি ভালো-মন্দ যদি নিজ বুদ্ধি দ্বারাই নিরূপণ করা সম্ভব হবে, তবে নবী-রাসূল পাঠানোর দরকার হতো না এবং আসমান থেকে কিতাব নাযিল করা ও ওহী পাঠানোরও প্রয়োজন পড়ত না। আল্লাহ জানেন মানুষকে যে বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে, তা বড় সীমিত। এ কারণেই তিনি ওহীর ধারা চালু করেছেন। কী আজব জিনিস এই বুদ্ধি। একজনের বুদ্ধি বলছে এটা ভালো, অন্যজনের বুদ্ধি সেটাকেই বলছে মন্দ। একজনের বুদ্ধিতে একটা বিষয় ঠিকই আসছে, কিন্তু অন্যজন সেটা ধরতে পারছে না। এসব তো বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার কারণেই হচ্ছে। তো এই সীমাবদ্ধ বুদ্ধি কোনও না কোনও স্থানে গিয়ে ঠেকে যাবেই। যেখানে গিয়ে তা ঠেকে ও থেমে যাবে সেখানে ঠিক কী করতে হবে তা বাতলে দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠান। কিতাব নাযিল করেন। আর এ কারণেই কুরআন বলছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম এসে যাওয়ার পর 'কেন এটা করতে হবে' 'এটা তো আমাদের বুঝে আসছে না' এ জাতীয় কথা উচ্চারণ করো না এবং এসবের পেছনে পড়ে হুকুম পালন থেকে বিরতও থেকো না। আবার এমনও যেন না হয় যে, তোমরা নিজ বুদ্ধিতে যা বলছ সেটাকেই সঠিক ধরে নেবে আর আশা করবে, রাসূল যেন তা মেনে নেন।

বর্তমানকালের লিডারদের অবস্থা

আজকাল লিডারদের হাল উল্টে গেছে। লিডার বা নেতা তো সেই, যে জাতিকে নিয়ে চলবে ও তাদের পথ দেখাবে, গোটা জাতি যদি ভুল পথে পা বাড়ায় এবং নেতার জানা থাকে সে পথ ভুল, তবে সে তাদেরকে সাবধান করে দেবে যে, তোমরা ভুল পথে চলছ, ওই পথ নয়, সঠিক পথ এই দিকে। কিন্তু আজকাল নেতা জনগণের পেছনে পেছনে চলে। জনগণ যাতে খুশী হয়, যা করলে বেশি ভোট পাওয়া যাবে তারা

সেটাই করছে। অনেক সময় তারা জানে জনগণ যা বলছে তা ঠিক নয়, তাতে মঙ্গল নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা জনগণেরটাই মেনে নেয়। কারণ জনগণকে খুশী করা তাদের দরকার! তা করতে পারলে বেশি ভোট পাওয়া যাবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির শিক্ষা

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রতি লক্ষ করুন। [হুদায়বিয়ায় কাফেরদের সব শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি স্থাপন করা হয়েছিল। সেসব শর্ত আপতদৃষ্টিতে মুসলিমদের পক্ষে অবমাননাকর ছিল এবং ছিল এক ধরনের নতি স্বীকার। সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিল। তারা বিপুল উদ্যম ও উদ্দীপনার সাথে উমরা আদায় করতে এসেছিলেন। কিন্তু মুশরিকগণ তাদেরকে তা তো করতে দিলই না। উল্টো তাদের মাথায় অপমানজনক শর্ত চাপিয়ে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের এ আচরণ সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে তীব্র ক্ষোভ সঞ্চার করেছিল। তাই] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের বিনীত আরয ছিল, আমরা হকের উপর আছি আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা লড়াই করে তাদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম। এমতাবস্থায় এই অবমাননাকর সন্ধির কী দরকার? কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধির পক্ষে বদ্ধ পরিকর। তাঁর এক কথা এটা আল্লাহর হুকুম। আপতদৃষ্টিতে এটা অবমাননাকর হলেও এর মধ্যেই সকলের কল্যাণ। তখন ইচ্ছা করলে তিনি জনগণকে খুশী করার মানসে বলতে পারতেন, চলো যুদ্ধই করি। কিন্তু সন্ধি করাই যেহেতু আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং সেটাই ছিল তাঁর হিকমতের দাবি, তাই সকল সাহাবীর মত তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর মতো ব্যক্তিও তখন রীতিমত ছটফট করছিলেন যে, ইয়া আল্লাহ! এ কী হল? আমরা এতটা নত হয়ে সন্ধি স্থাপন করছি! তিনি একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যান, একবার আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.-এর কাছে। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করেন এ কী হচ্ছে? কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন স্থানে

অবিচল। কেনই বা তা থাকবেন না, এটা যে আল্লাহ তা'আলার হুকুম; ওহীর মাধ্যমে তাকে জানানো হয়েছে।

সারকথা, এ আয়াত আমাদেরকে সবক দিচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনও নির্দেশ বা কোনও ফয়সালা যখন এসে যায়, তখন কেবল বুঝে না আসার অজুহাতে তা মানতে কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয় এবং সে সম্পর্কে অন্তরে কোনও সংশয় সন্দেহকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। সঠিক পথ সেটাই, যা শরী'আত বলে বা রাসূল শিক্ষা দেন। রাসূল যদি তোমাদের প্রতিটি কথা মানতে শুরু করেন, তবে তোমরা নিজেরাই মহা মুশকিলে পড়ে যাবে, তোমরাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের অন্তরে এই বুঝ দান করুন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমই যে সবকিছুর উর্ধ্বে, তাতে তার রহস্য-তাৎপর্য আমাদের বুঝে আসুক বা নাই আসুক, এই ইয়াকীন আমাদের অন্তরে বসিয়ে দেন। এই বুঝ ও ইয়াকীন অন্তরে বদ্ধমূল হলে অনেক প্রশ্ন ও সংশয় আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে। বিভিন্ন সময়ে অন্তরে যেসব খটকা দেখা দেয়, তারও নিরসন হয়ে যাবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু নিজ রহমতে আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْرِصْ عَلٰى ما يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ وَاَنْ اَصَابَكَ شَيْئٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমার যা উপকারে আসবে তার প্রতি লালায়িত হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো, হীনবল হয়ো না। কোনও দুঃখ-কষ্ট দেখা দিলে এমন বলো না যে, আমি যদি এই করতাম এই হতো, ওই করলে ওই হতো। বরং বলো, আল্লাহ তা'আলাই এটা স্থির করেছেন। তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। বস্তুত 'যদি' (-এর ধারণা) শয়তানের কাজ সহজ করে দেয়।[৭০]

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৯১-২২২

৭০. সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪৮১৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪১৫৮

দুনিয়ার লালসা করো না

এ হাদীছে বলা হয়েছে, اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ 'তোমার যা উপকারে আসবে তার প্রতি লালায়িত হও।' অর্থাৎ যেসব কাজ আখিরাতে কাজে আসবে তার প্রতি আগ্রহী হও। হাদীছে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে হির্স, অর্থাৎ লালসা। দেখুন, লোভ-লালসা কোনও ভালো জিনিস নয়। বিভিন্ন হাদীছে হিরসের নিন্দা করা হয়েছে। লোভ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সম্পদের লোভ, ক্ষমতার লোভ, সুনাম-সুখ্যাতির লোভ সবই নিষেধ। এসব জিনিসের লোভ মানুষের জন্য অনেক বড় দোষ। বরং এসব ব্যাপারে পরিতুষ্ট থাকাই ইসলামের শিক্ষা। ইসলাম বলে, বৈধ পন্থায় চেষ্টা করার দ্বারা এসব বস্তুর যতটুকু অর্জিত হয় তাতে খুশী থাকো এবং বিশ্বাস রাখো, যা অর্জিত হয়েছে, তাতেই তোমার কল্যাণ। আরও বেশি কেন হল না– এ জন্য আক্ষেপ করা ও আরও বেশি লোভ করা জায়েজ নয়। এরকম হির্স থেকে বেঁচে থাকো। কেননা দুনিয়ায় কারও পক্ষেই নিজের সকল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। এমন কোনও রাজা-বাদশা বা এমন কোনও অর্থ-বিত্তের মালিককে পাওয়া যাবে না, যে বলবে, আমার সব চাহিদা মিটে গেছে। হাদীছে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

'কোন আদম সন্তান যদি সোনাভরা একটি উপত্যকার মালিক হয়ে যায়, তবে সে ওরকম দু'টি কামনা করবে, যদি সোনাভরা দু'টি উপত্যকার মালিক হয়ে যায়, তবে তৃতীয় আরও একটি কামনা করবে। আদম-সন্তানের উদর মাটি ছাড়া অন্য কিছু ভরে পূর্ণ করতে পারবে না।'[৭১] অর্থাৎ যখন কবরে যাবে, কবরের মাটি দ্বারাই তার পেট ভরবে, দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় কোনও জিনিস দ্বারা তার পেট ভরবে না।

তবে হ্যাঁ, একটি জিনিস আছে যা দ্বারা আদম সন্তানের পেট ভরা সম্ভব। তার নাম কানাআত-পরিতুষ্টি, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জায়েয ও

---

৭১. বুখারী, হাদীছ নং ৫৯৫৬; মুসলিম, হাদীছ নং ১৭৯৩; তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৭২৬

হালাল পন্থায় তাকে যখন যতটুকু দেন, তাতে খুশী থাকা ও তার জন্য শোকর আদায় করা। এর নাম কানাআত। দুনিয়ায় এছাড়া অন্য কিছু দ্বারা মানুষের পেট ভরা সম্ভব নয়।

দ্বীনের ব্যাপারে লালসা পসন্দীয়

দুনিয়ার ব্যাপারে তো লোভ-লালসা দূষণীয়, যা থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু দ্বীনের কাজে লোভ করা ভালো। অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী ও নেক কাজে লালসা করলে তা দোষ তো নয়ই; বরং প্রশংসনীয় কাজ। মনে করুন, এক ব্যক্তি বিপুল উদ্যমে নেক কাজ করে যাচ্ছে। তা দেখে আরেকজনের মনে লোভ দেখা দিল যে, আমিও তার মতো করব। এক ব্যক্তি দ্বীনী নি'আমত ইলম, আমল-আখলাক ইত্যাদির অধিকারী। তা দেখে আরেকজনের মনে লোভ হল, আহা, আমিও যদি তার মতো এই নি'আমত লাভ করতে পারতাম। এরকম লোভ প্রশংসনীয় ও কাম্য। তো এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কথাই বলেছেন যে, আখিরাতে কাজ দেবে– এরকম কাজে লোভ করো। কুরআন মাজীদে ইরশাদ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 'পুণ্যের কাজ-কর্মে একে অন্যের অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো।'[৭২]

নেক কাজের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের লালসা

সাহাবায়ে কেরাম নেক কাজের প্রতি যারপরনাই লালায়িত ছিলেন। কোনওভাবে আমার আমলনামায় পুণ্য বৃদ্ধি পাক এই ফিকিরেই তারা থাকতেন। একবার হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর সাহেবযাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. আবূ হুরায়রা রাযি.-এর কাছে গেলে তিনি তাকে হাদীছ শোনালেন যে,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেউ যদি কারও জানাযার নামাযে শরীক হয়, সে এক কীরাত নেকী লাভ করে। যদি দাফনেও শরীক থাকে, তবে দু'কীরাত লাভ করে। এ কথা শুনে

---

৭২. সূরা মায়িদা, আয়াত ৪৮

হযরত ইবন উমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছেন? আবূ হুরায়রা রাযি. বললেন, হ্যাঁ আমি নিজেই শুনেছি। তখন আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বললেন, আফসোস, এ পর্যন্ত বহু কীরাত (পুণ্য) নষ্ট করে ফেলেছি। আগে থেকে শুনলে এ সুযোগ নষ্ট হতে দিতাম না।[৭৩]

'কীরাত' হচ্ছে সে যুগের একটি পরিমাপ, যা সোনা-রুপার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টা বোঝানোর জন্য এ কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ হাদীছে শব্দটি দ্বারা সোনার মাপ বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। তিনি নিজেই এ হাদীছে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, আখিরাতে এ কীরাত হবে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বিপুলায়তন। আর এটাও সে পুণ্যের যথাযথ বর্ণনা নয়। যথাযথ বর্ণনা তো মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয়। কারণ মানুষের ভাষা তা ব্যক্ত করার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে না। তাই আমাদেরকে মোটামুটি একটা বুঝ দেওয়ার জন্য এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

যা হোক, এটা কেবল হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর কথাই নয়; সমস্ত সাহাবীই নেক কাজের প্রতি এরকম লালায়িত ছিলেন। কিভাবে আমলনামায় পুণ্য বৃদ্ধি করা যায়, তাদের প্রত্যেকে অন্তরে সেই তাড়না বোধ করতেন।

আমরা তো ওয়াজ-নসীহতে হামেশাই শুনি এই আমলের এই ছাওয়াব, ওই আমলের ওই ছাওয়াব, কিন্তু এ ছাওয়াব অর্জনের তাড়া বোধ কতটুকু করি? এগুলো তো বয়ান করাই হয় অন্তরে সেই তাড়না সৃষ্টি করার জন্য, অন্তরকে আমলের প্রতি লালায়িত করে তোলার জন্য। ফযীলতের আমলসমূহ যদিও নফল ও মুস্তাহাব পর্যায়ের হয়, ফরয-ওয়াজিব না হয়, তবুও একজন মুসলিমের অন্তরে তার প্রতি আগ্রহ থাকা চাই। আল্লাহ তা'আলা যাদের অন্তরে দ্বীনের হির্‌স ও লালসা দান করেছেন, তাদের সার্বক্ষণিক চিন্তা একটাই– কী করে আমলনামায় পুণ্য বৃদ্ধি করা যায়।

---

৭৩. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ১২২৯

স্ত্রীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌড় প্রতিযোগিতা

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। সাথে ছিলেন উম্মুল-মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.। তাঁরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথে একটি ময়দান পড়ল। সেখানে পর্দাহীনতার কোনও কারণ ছিল না। কারণ অন্য কোনও লোকজন ছিল না। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে বললেন, 'আয়েশা! আমার সাথে দৌড় দেবে? হযরত আয়েশা রাযি. সম্মতি জানালেন। সুতরাং তাঁরা দৌড় দিলেন। এর দ্বারা এক দিকে যেমন হযরত আয়েশা রাযি.-এর মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য ছিল, অন্যদিকে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার ছিল, এমন বুযুর্গ ও নেককার বনে ঘরের কোণে বসে থাকাও কিছু ভালো কাজ নয়, যদ্দরুন মানষের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হয়ে যাবে, এমনকি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে আনন্দ-ফূর্তিও ছেড়ে দেওয়া হবে। বরং আর সব মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার মধ্যেই প্রকৃত দ্বীনদারী নিহিত। অপর এক হাদীছে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আমার সাথে দু'বার দৌড়িয়েছেন। একবার তিনি আমাকে পেছনে ফেলেন আর দ্বিতীয়বার দৌড়ের সময় যেহেতু তিনি অপেক্ষাকৃত ভারী হয়ে গিয়েছিলেন, তাই তিনি পেছনে পড়ে যান এবং আমি আগে চলে যাই, এ সময় তিনি মন্তব্য করেন, تِلْكَ بِتِلْكَ 'সমান-সমান হয়ে গেল, একবার আমি জিতেছিলাম, এবার তুমি জিতে গেলে।'[৭৪]

এবার দেখুন আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন এ সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য কিভাবে সুযোগের সন্ধানে থাকতেন এবং সুযোগ পেলেই আমল করে ফেলতেন।

---

৭৪. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২২১৪

হযরত থানভী রহ. কর্তৃক এ সুন্নতের অনুসরণ

একবার হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. সপত্নীক থানা ভবন থেকে কিছুটা দূরে এক গ্রামে দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। তাঁরা পায়ে হেঁটে চলছিলেন। সঙ্গে আর কোনও লোক ছিল না। যখন একটা নির্জন স্থানে পৌছলেন, তাঁর খেয়াল হল, আলহামদুলিল্লাহ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু সুন্নতের উপরই তো আমল করার তাওফীক হয়েছে, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে দৌড়ানোর সুন্নতটি এখনও রয়ে গেছে। এর উপর আমল করার কোনও সুযোগ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এটা একটা সুযোগ। কাজে লাগানো চাই। সুতরাং তখনই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে দৌড় পাল্লা দিলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সুন্নতটিও পালন করার সৌভাগ্য অর্জন করে নিলেন। এটা তো স্পষ্ট যে, তাঁর দৌড় দেওয়ার কোনও সখ ছিল না। ছিল কেবল সুন্নতের উপর আমল করার জযবা এবং সেজন্যই দৌড় দিয়েছিলেন। এরই নাম সুন্নতের ইত্তিবা করার হির্স ও নেক কাজের প্রতি লোভ। ছাওয়াব ও পুণ্যার্জনের এই লালসার প্রতিই এ হাদীছে উৎসাহ দান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের অন্তরে এই হিরস সৃষ্টি করে দিন।

হিম্মতের জন্যও আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা চাই

অনেক সময় নেক কাজ করার মতো হিম্মতেরও অভাব দেখা দেয়। অন্তরে আমলের আগ্রহ জাগে ঠিকই। অন্যের ইবাদত দেখে নিজেরও মনে চায় তার মতো করি। কিন্তু সাথে সাথে খেয়াল হয়, এরকম ইবাদত ও এ জাতীয় নেক কাজ আমার সাধ্যাতীত। এসব বড়দের কাজ, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হিম্মতের এ অভাবও অনেকের আমল থেকে দূরে থাকার কারণ। কাজেই এর প্রতিকার দরকার। কিভাবে এর প্রতিকার হতে পারে? অন্তরে এ জাতীয় খেয়াল জাগলে কী করতে হবে? হাদীছের পরবর্তী বাক্যে সে কথাই বলা হয়েছে–

وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ

'আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। হীনবল হয়ো না।'

অর্থাৎ এরূপ ইবাদত আমার পক্ষে সম্ভব নয়– এরকম ধারণার বশবর্তীতে হতাশ হয়ে পড়ো না। হতোদ্যম হয়ে যেও না, বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাও। বলো, হে আল্লাহ! এ কাজ করার সাধ্য তো আমার নেই, কিন্তু আপনার কুদরতের সীমা নেই, আপনি আমাকে তাওফীক দান করুন এবং অন্তরে এ কাজের হিম্মত সৃষ্টি করে দিন।

তাহাজ্জুদের কথাই ধরুন। বুযুর্গানে দ্বীন সম্পর্কে শোনা যায়, তারা রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়েন, যিকির-আযকার করেন এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আয় মশগুল হন। এসব শুনে অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হয় যে, আমাকেও রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই ধারণাও সৃষ্টি হয় যে, কাজটি কঠিন, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যস আর এগুতে পারে না। হতাশ হয়ে ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এরূপ হতোদ্যম হওয়া উচিত নয়। আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া মাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা চাই। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা চাই, হে আল্লাহ! আমার তো চোখ খোলে না। আমার ঘুম শেষ হয় না। হে আল্লাহ! আমাকে তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক দিন। আমাকে এর ফযীলত লাভে সাহায্য করুন।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলে, তাঁর কাছে তাওফীক চাইলে, দু'অবস্থার একটা না একটা হবেই। হয়তো বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলা সে আমলের তাওফীক দিয়ে দেবেন। ফলে তাহাজ্জুদ পড়া সম্ভব হবে। আর যদি তাওফীক লাভ নাও হয়, তবে আগ্রহ ও দু'আর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাহাজ্জুদ পড়ার ছাওয়াব দিয়ে দেবেন। এটা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি খাঁটিমনে আল্লাহ তা'আলার কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করবে। বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শহীদ হওয়ার তাওফীক দাও, আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন– যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।[৭৫]

---

৭৫. সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৩৫৩২

এক কামারের ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. একজন ইতিহাসখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মুজাহিদ। ইন্তিকালের পর তাঁর সাথে স্বপ্নযোগে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হয়। সেই ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কেমন যাচ্ছে? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি বড় মেহেরবানী করেছেন। আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং প্রাপ্যের বেশি মর্যাদা দান করেছেন। তবে আমার বাড়ির সামনে বসবাসকারী কামারকে আল্লাহ তা'আলা যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, আমি তা লাভ করতে পারিনি। এ স্বপ্ন দেখে লোকটি স্তম্ভিত। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের চেয়েও বেশি মর্যাদা লাভ করতে পারে এমন ব্যক্তিটি কে? এবং এমন কী আমল সে করত, যার বদৌলতে এত বড় মর্যাদা সে লাভ করেছে? তার ভীষণ কৌতূহল বোধ হল। কালবিলম্ব না করে লোকটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর মহল্লায় চলে গেল এবং মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করল, এ মহল্লায় কোনও কামার বাস করত কি না, সম্প্রতি যার মৃত্যু হয়েছে? জানা গেল, হ্যাঁ ওই সামনের বাড়িটিতে একজন কামার বাস করত। দিন কতক আগে তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। লোকটি সেই বাড়িতে চলে গেল এবং কামারের স্ত্রীর কাছে নিজ স্বপ্নের কথা বর্ণনা করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, বলুন তো আপনার স্বামী এমন কী আমল করতেন, যার বদৌলতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর মতো ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে গেলেন? কামারের স্ত্রী বললেন, আমার স্বামী উল্লেখযোগ্য কোনও ইবাদত তো করতে পারতেন না। দিনভর পরিশ্রমে ব্যস্ত থাকতে হতো। তাই বিশেষ ইবাদতের সুযোগ হতো না। অবশ্য দু'টি ব্যাপার আমি তার মধ্যে লক্ষ করেছি। এক তো এই যে, যখন লোহা পেটানোর কাজে ব্যস্ত থাকতেন, সেই সময় কানে আযানের আওয়াজ 'আল্লাহু আকবার' পড়লে সঙ্গে সঙ্গে থেমে যেতেন। এরপর লোহায় আর একটাও বাড়ি দিতেন না। এমন কি বাড়ি দেওয়ার জন্য যেই মাত্র হাতুড়ি উপরে তুলেছেন, অমনি যদি আল্লাহু আকবার ধ্বনি এসে যেত, সেই হাতুড়ি আর নিচে নামাতেন না, নামানো পসন্দ করতেন না; বরং হাতুড়ি পেছন দিকে ফেলে দিতেন। তারপর দ্রুত উঠে নামাযের জন্য প্রস্তুত হতেন।

দ্বিতীয় যে জিনিসটি দেখতাম তা হল, আমাদের সামনের বাড়িতে এক বুযুর্গ ব্যক্তি বাস করতেন। নাম হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক'। তিনি রাতভর নিজ বাড়ির ছাদে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। তাকে দেখে আমার স্বামী বলতেন, আল্লাহর এই বান্দা কী সুন্দর রাতভর ইবাদত-বন্দেগী করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যদি একটু অবসর দিতেন, আমিও এরকম ইবাদত করতাম।

মহিলার কথা শুনে লোকটি বলল, ব্যস, বুঝে এসে গেছে। এই আক্ষেপই সেই জিনিস, যা তাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর মতো ব্যক্তিরও উপরে নিয়ে গেছে।

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এ ঘটনা শুনিয়ে বলতেন, এটা এক বিরল আক্ষেপ, যা মানুষকে কোথা হতে যে কোথায় পৌছিয়ে দেয়! কাজেই যখন কারও সম্পর্কে শুনবে খুব নেক কাজ করে, তখন মনে লোভ ও আক্ষেপ সৃষ্টি করবে, আহা, আমিও যদি তার মতো আমলের তাওফীক পেতাম!

সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে চিন্তা করতেন

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, একদল গরীব মুহাজির সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিত্তবান লোকেরা তো উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী নি'আমত জিতে নিল। তারা সালাত আদায় করে, যেমন আমরা সালাত আদায় করি; রোযা রাখে, যেমন আমরা রোযা রাখি। কিন্তু তাদের অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ আছে, যে কারণে তারা হজ্জ ও উমরাহ আদায় করতে পারে, জিহাদ করতে পারে ও দান-সদাকা করতে পারে। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস শেখাব না, যা দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের ধরে ফেলতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে আগে থাকতে পারবে আর কেউ তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে না, কেবল তারা ছাড়া, যারা তোমাদের অনুরূপ করবে? তারা বললেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তোমরা প্রত্যেক

নামাযের পর তেত্রিশ বার করে সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পড়বে। কিছুদিন পর– গরীব মুহাজিরগণ আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসলেন। বললেন, আমাদের বিত্তবান ভাইয়েরা আমরা যা করি তা শুনে ফেলেছে। এখন তারাও আমাদের মতো করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন।[৭৬]

চিন্তা করে দেখুন, আমাদের ভাবনা ও তাদের ভাবনার মধ্যে কত প্রবেদ। আমরা যখন আমাদের অপেক্ষা ধনীদের দেখি, তখন তাদের দান-খয়রাতের কারণে ঈর্ষাবোধ করি না, ঈর্ষান্বিত হই তাদের অর্থ-বিত্ত কেন আমার চেয়ে বেশি সেই কারণে। যখন দেখতে পাই তারা বড় আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসিতার ভেতর দিন যাপন করছে, তখন খেদ করে বলি, আহা আমারও যদি তাদের মতো অর্থ-বিত্ত থাকত, তবে আমিও তাদের মতো আরাম-আয়েশের জীবন ভোগ করতে পারতাম! অথচ তাঁরা কী করেছেন? তাদের মনে কষ্ট হয়েছে দ্বীনের কারণে। হজ্জ, উমরা, দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে বিত্তবানগণ দ্বীন ও ছাওয়াবে তাদেরকে পেছনে ফেলে যাচ্ছে, তাঁরা পেছনে পড়ে রয়েছে, এই ভাবনা তাদের অস্থির করে ফেলেছে। তাই নিজেদের অগ্রগামিতার কোনও পথ আছে কি না, থাকলে তা কী হতে পারে, সেই জিজ্ঞাসা নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে এসেছেন। চিন্তার কত পার্থক্য!

নেকীর লালসাও একটি বড় নি'আমত

প্রশ্ন হতে পারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরীব মুহাজিরগণকে অগ্রগামিতার যে আমল শিক্ষা দিলেন, সেই আমল অর্থাৎ প্রতি নামাযের পর তিন তাসবীহ আদায়, এটা যদি ধনীরাও শুরু করে দেয়, তবে গরীব সাহাবীদের প্রশ্ন তো রয়েই যায়। কেননা ধনীরা তো

---

৭৬. বুখারী হাদীছ নং ৭৯৮; মুসলিম, হাদীছ নং ৯৩৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২০৫০০

সেই অগ্রগামীই থাকবে? এর উত্তর হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত বোঝাতে চাচ্ছিলেন, 'আমরা ধনী হলে ধনীদের মতো দান-খয়রাত করতে পারতাম– তোমাদের এই আক্ষেপ অনেক মূল্যবান। অন্তরে এই আক্ষেপ সৃষ্টি হওয়াটাও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও অনেক বড় নি'আমত। এই আক্ষেপ ও লালসার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান-খয়রাতের ছাওয়াব দান করবেন।

মোটকথা, কোনও নেক কাজের ইচ্ছা ও লালসা এবং তা করতে না পারার আক্ষেপও অনেক বড় নি'আমত। কাজেই যখন কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে শুনতে পাবে সে অনেক ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমল করে, তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! এখন তো তার মতো আমলের ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে সে ক্ষমতা দিয়ে দিতে পারেন। সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমাকেও তার মতো আমলের তাওফীক দিন। এরূপ আগ্রহ প্রকাশ ও দু'আ করলে, হয় আল্লাহ তা'আলা সেই নেক আমলের তাওফীক দিয়ে দেবেন অথবা সেই আমলের ছাওয়াব দান করবেন। আমলের তাওফীক ও ছাওয়াব লাভের অতি উত্তম ব্যবস্থা এটা!

'যদি' শব্দের উচ্চারণ শয়তানের কাজ সহজ করে দেয়

তারপর ইরশাদ হয়েছে–

وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنِّيْ فَعَلْتُ لَكَنَا كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَاللّٰهُ وَمَا شَآءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

"তোমার কোনও দুঃখ-কষ্ট দেখা দিলে, 'আমি যদি এমন এমন করতাম, তবে এমন এমন হতো' এরকম বলো না; বরং বলো– আল্লাহ তা'আলাই এরূপ স্থির করেছিলেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। কেননা 'যদি' বলাটা শয়তানের কাজ করার পথ খুলে দেয়।"

অনেক সময় দেখা যায় কারও কোনও প্রিয়জন মারা গেলে আফসোস করে বলে, আহা, যদি অমুক ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা

করাতাম, তবে এ যাত্রায় বেঁচে যেত। কিংবা কারও কিছু চুরি হলে বা বাড়িতে ডাকাতি হলে বলে থাকে, যদি হেফাজতের জন্য এই এই অবস্থা করতাম, তবে চুরি হতো না বা ডাকাত পড়ত না। হাদীছে এরকম কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে; বরং বলতে হবে, তাকদীরে এমন ঘটবে বলেই স্থির ছিল, তাই হয়ে গেছে। আমি এর বিপরীতে যতই ব্যবস্থা নিতাম কাজ হতো না; ঘটত এরকমই।

দুনিয়ায় সুখ ও দুঃখ উভয়ই থাকবে

এ হাদীছে কী চমৎকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর বুঝ দান করুন– আমীন। বিশ্বাস রাখুন, দুনিয়ায় সুখ-শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভের এই একটাই পথ। অর্থাৎ তাকদীর ও নিয়তির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা। কেননা দুনিয়া তো এমন জায়গা নয়, যেখানে মানুষ কখনও কোনও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে না। এটা সুখ ও দুঃখ উভয়ের স্থান। এখানে আনন্দও আছে, বেদনাও আছে। হাসিও আছে, কান্নাও আছে। এখানে এমন কোনও সুখী মানুষ নেই, যার কোনও দুঃখ নেই এবং এমন কোনও দুঃখী মানুষ নেই, যার সুখ বলতে কিছু নেই; উভয়ের সংমিশ্রণই এ দুনিয়া। কাজেই এখানে দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানি কখনও না কখনও আসবেই। জগতের সমুদয় সম্পদ ব্যয় করেও তা ঠেকানো সম্ভব নয়।

আল্লাহর যারা প্রিয় তাদের দুঃখ-কষ্ট বেশি আসে

আমাদের কী-ই বা মূল্য! আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম তো ছিলেন সর্বাপেক্ষা দামী এবং আল্লাহ তা'আলার সর্বাপেক্ষা প্রিয় মাখলুক। তাদেরও দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয় এবং অন্যদের চেয়ে বেশিই দেখা দেয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

'মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন নবীগণ। তারপর সেইসব লোকেরা, যারা নবীদের অনুসরণে সবচেয়ে বেশি

অগ্রগামী, তারপর যারা তাদের পরবর্তী স্তরের।[৭৭] অর্থাৎ অনুসরণ-অনুকরণে যারা নবীগণের যত বেশি ঘনিষ্ঠ হবে, তাদের দুঃখ-কষ্টও সেই অনুপাতে বেশি হবে। যে জগতে কোনওরকম দুঃখ-কষ্ট নেই, তা হল জান্নাত।

দুনিয়ায় যখন দুঃখ-কষ্ট আসা অনিবার্য, তখন এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা পরিশুদ্ধ থাকা উচিত। কোনও বিপদ দেখা দিলে যদি এভাবে চিন্তা করি যে, আহা আমার ভুল হয়ে গেছে এবং এই বিপদ তারই খেসারত। কাজটা এভাবে করলে এই বিপদ আসত না। অমুক অমুক কারণেই এমন ঘটে গেল। এভাবে চিন্তা করলে প্রতিকার তো কিছু হয়ই না। উল্টো দুঃখের উপর দুঃখ দেখা দেয়, মনস্তাপ বৃদ্ধি পায়। এমন কি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে যায়– নাউযুবিল্লাহ। যেমন বলা হয়, আমার ভাগ্যেই যত দুঃখ লেখা কিংবা এরমক অন্য কিছু। এভাবে বিপদের ফলে দুনিয়ার যে ক্ষতি তা তো স্বীকার করতেই হল, উপরন্তু অভিযোগের পরিণামে সে আখিরাতেও শাস্তিযোগ্য হয়ে গেল। অনেক সময় ঈমানও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়।

এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কোনও দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, তখন মনে করো তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই দেখা দিয়েছে। তিনি এ ইচ্ছা কেন করেছেন, কী এর রহস্য তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলাই তা ভালো জানেন। আমি এক তুচ্ছ সৃষ্টি। কীট-পতঙ্গের মতো হীন। আমার কী সাধ্য তাঁর হিকমত জেনে ফেলব? অবশ্য কষ্টের কারণে যদি কান্না আসে, তাতে কোনও দোষ নেই। দুঃখ-কষ্টের কারণে ক্ষুদ্র ও দুর্বল মাখলুকের কান্না আসাটাই তো স্বাভাবিক। অনেকে এ কান্নাকে দোষের মনে করে থাকে। সেটা ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে যদি কোনও অভিযোগ তোলা না হয়, তবে কান্নায় কোনও দোষ নেই।

---

৭৭. কানযুল উম্মাল, হাদীছ নং ৬৭৮৩

ক্ষুধার কারণে এক বুযুর্গের কান্না

এক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখেন বসে বসে কাঁদছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করল, হযরত বিশেষ কোনও কষ্ট কী, যে কারণে কাঁদছেন? বুযুর্গ বলল, বড় ক্ষুধা লেগেছে। লোকটি বলল, আপনি কি ছোট্ট শিশু যে, ক্ষুধার কষ্টে কাঁদছেন, ক্ষুধার কারণে তো শিশুরাই কাঁদে। আপনি বড় মানুষ। তারপরও কাঁদছেন? বুযুর্গ বললেন, তুমি এর কী বুঝবে? আমার কান্না দেখাই হয়তো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য, যে কারণে তিনি আমাকে ক্ষুধার্ত রাখছেন। তো অনেক সময় বান্দার কান্নাও আল্লাহ তা'আলার পসন্দ। শর্ত একটাই, আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উচ্চারণ করা যাবে না। সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় একেই তাফবীয' (تفويض) বলে, অর্থাৎ বিষয়কে আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত করে দেওয়া। বলা, হে আল্লাহ! বাহ্যিকভাবে তো আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আপনার ফয়সালা নিঃসন্দেহে সঠিক। মানুষের যদি এ কথার ইয়াকীন হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না এবং সবকিছুর ফয়সালা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়, তবে এই ইয়াকীনের ফলে অবশ্যই অন্তরে স্বস্তি ও প্রশান্তি অর্জিত হবে এবং অসুখ-বিসুখ ও পেরেশানির সময় যে অসহনীয় কষ্টবোধ হয় তা আর হবে না।

মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য

কোনও এক কাফের ব্যক্তির এক প্রিয়জন অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে ডাক্তার দিয়ে তার চিকিৎসা করাল। কিন্তু চিকিৎসায় কোনও কাজ হল না। সেই রোগেই তার মৃত্যু ঘটল। প্রিয়জনকে হারানোর বেদনায় লোকটি বেশামাল হয়ে গেল। সে সান্ত্বনা লাভের কোনও পথ খুঁজে পেল না। সে তো মনে করেছিল ডাক্তারের চিকিৎসাই চূড়ান্ত কথা। চিকিৎসা সঠিক হলে রোগী মরবে না। যখন ঠিকই মারা গেল সে ধরে নিল, চিকিৎসা সঠিক হয়নি, ওষুধ ঠিক পড়েনি। ডাক্তার সঠিক ওষুধ নির্ধারণ করতে পারলে তার মৃত্যু হতো না।

অপরদিকে একজন মুসলিমের প্রিয়জনও অসুস্থ হল, সেও ডাক্তার দেখাল ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। পরিশেষে তারও মৃত্যু হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে কিন্তু অবস্থা ভিন্ন। এই মুসলিম ব্যক্তির হাতে সান্ত্বনা ও স্বস্তি লাভের উপায় আছে। কেননা এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের কোনও অবহেলা থাকলেও প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। যা ঘটেছে তা তাঁর ইচ্ছাতেই ঘটেছে। তিনি ইচ্ছা করেছিলেন বলেই তার মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তার সঠিক চিকিৎসা করলেও তাকে বাঁচানো যেত না। মৃত্যুর কোনও না কোনও উপলক্ষ্য তৈরি হয়েই যেত। আমি যদি এই ডাক্তার ছেড়ে অন্য কোনও ডাক্তারের কাছে যেতাম, তবুও ফল একই হতো, মৃত্যু তার হতোই। কেননা হবে তো সেটাই যা তাকদীরে আছে। তাকদীরের লেখা অনুযায়ী তার মৃত্যুর সময় এসে গিয়েছিল। তার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই যেতে তাকে হতোই। নিয়তির লিখন অলংঘনীয়। তাকদীর সত্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযি. একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী। তিনি বলেন, জ্বলন্ত কয়লা মুখে নিয়ে চাটাও আমার কাছে এর চেয়ে বেশি পসন্দ যে, কোনও ঘটে যাওয়া ব্যাপার নিয়ে বলব, 'আহা এমন যদি না ঘটত কিংবা যা ঘটেনি সে সম্পর্কে বলব, আহা এটা যদি ঘটত!'[৭৮]

আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা চাই

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযি. বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনও বিষয়ে ফয়সালা গ্রহণ করেন এবং সে ফয়সালা অনুযায়ী কোনও কিছু সংঘটিত হয়, তখন তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়াই মুমিনের কাজ। এটা না ঘটলে ভালো ছিল বা এরূপ ঘটলে ভালো ছিল এ জাতীয় মন্তব্য করার অর্থ তাকদীরের বিপরীতে অবস্থান নেওয়া। এটা তাকদীরে রাজি থাকার পরিপন্থী, অথচ একজন মুমিনের কাছে দাবি হল, সে আল্লাহর তাকদীরে রাজি থাকবে, তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকবে এবং সে ফয়সালা সম্পর্কে মনে কোনও অভিযোগ-আপত্তি সৃষ্টি হতে দেবে না

৭৮. কিতাবুয-যুহদ, পৃষ্ঠা ৩০, হাদীছ নং ১২২

বা সে ফয়সালাকে খারাপ মনে করবে না; বরং মনেপ্রাণে তাতে খুশী থাকবে। অপর এক হাদীছে হযরত আবু দারদা রাযি. বলেন,

إِذَا قَضَى اللهُ قَضَاءً أَحَبَّ أَنْ يَرْضَى بِقَضَائِهِ

'আল্লাহ তা'আলা যখন কোনও বিষয়ে ফয়সালা গ্রহণ করেন যে, এ বিষয়টি এরকম ঘটবে, তখন আল্লাহ তা'আলার পসন্দ হল সে ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা হোক।'[৭৯] অর্থাৎ বান্দা বিনা বাক্যে সে ফয়সালা মেনে নিক এবং এরকম না হলে ভালো হতো, ওই রকম হলে ভালো হতো-এ জাতীয় মন্তব্য না করুক।

মনে করুন কারও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল, ঘটে যাওয়ার পর সে বলতে লাগল, আহা! আমি যদি ওই কাজটি করতাম, তবে এ ঘটনা ঘটত না। অনেক সময়ই লোকে এরকম বলে থাকে। কিন্তু এরূপ বলা সংগত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কেননা যা ঘটে গেছে তা তো ঘটবারই ছিল, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তার ফয়সালা রেখেছেন এবং তাকদীরে তা লেখা রয়েছে। হাজার কৌশল অবলম্বন করলেও সে নিয়তি খণ্ডানো সম্ভব ছিল না। কাজেই আমি এমন করলে এমন হতো না বা এমন না করলে এমন হতো না-এসব ফযূল বাক্যক্ষয় ছাড়া কিছুই নয়। এমন মন্তব্য আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাজি না থাকার পরিচায়ক, যে কারণে এসব বলা অন্তত মুমিনের কাজ নয়।

তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকার ভেতর সান্ত্বনা নিহিত

চিন্তা করে দেখুন তো, বাস্তবিক পক্ষে তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া মানুষের আর কীইবা উপায় আছে? তাকদীরকে খুশী মনে মেনে না নিলে কি আল্লাহর ফয়সালা বদলে যাবে? কিংবা যে দুঃখ-বেদনা আপনাকে স্পর্শ করেছে তা দূর হয়ে যাবে? দূর যে হবে না তা তো স্পষ্ট। উল্টো দুঃখের আগুনে আরও ঘৃতাহুতি হবে। আহা, আমি এমন যদি না করতাম

---

৭৯. কিতাবুয-যুহ্‌দ, পৃষ্ঠা ৩২, হাদীছ নং ১২৪

বা কেন এমন করলাম না, এ জাতীয় আক্ষেপ কেবল দুঃখবোধকেই উসকে দেয়। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকার দ্বারা যন্ত্রণা লাঘবেরই ব্যবস্থা হয় এবং মনে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। বস্তুত তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকার বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য সান্ত্বনা লাভেরই উপায় বানিয়ে দিয়েছেন।

তদবীর দ্বারা তাকদীর ফেরে না

তাকদীর ইসলামের এক আশ্চর্যজনক আকীদা। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি এ আকীদা ফরয করেছেন। এটাকে সঠিকভাবে না বোঝার কারণে মানুষ নানা রকম ভুল-ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রথম কথা হল, কোনও ঘটনা ঘটার আগে এ আকীদার বাহানায় যেন আমল ছেড়ে দেওয়া না হয়, সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। এটা একটা শয়তানের ধোঁকা যে, মানুষ তাকদীরে বিশ্বাসের অজুহাতে আমল ছেড়ে দেবে আর বলবে, তাকদীরে যা লেখা আছে তা তো ঘটবেই। কাজেই শুধু শুধু চেষ্টা করে কী হবে? এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার পরিপন্থী। তার শিক্ষা হল, যে বস্তু অর্জনের জন্য দুনিয়ার যা স্বাভাবিক নিয়ম, তা অবলম্বন করো। এ ব্যাপারে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করো না।

দ্বিতীয় কথা হল, তাকদীরে বিশ্বাসের প্রমাণ দেওয়ার উপযুক্ত সময় হল কোনও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। অর্থাৎ কোনও কিছু ঘটার পর একজন মুমিনের কাজ হল বিষয়টাকে এভাবে চিন্তা করা যে, এ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে আমার যা করণীয় ছিল তা করেছি। আমার সেই চেষ্টা ও কৌশলের বিপরীতে যা ঘটেছে এটা আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা। আমি আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট। এর বিপরীতে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আক্ষেপ করা, মনের কষ্ট ও খেদ প্রকাশ করা যে, আমি যদি এরকম না করে ওই রকম করতাম, তাহলে আজ এ দশা হতো না, এটা তাকদীরের বিশ্বাসের পরিপন্থী। কোনও চেষ্টাই না করা কিংবা চেষ্টার বিপরীত ফল দেখে আক্ষেপ করা– উভয়টাই বিপরীতমুখী দুই প্রান্তিকতা

ও একদেশদর্শিতা। সত্যিকার পথ এর মাঝখানে, সেটাই ইসলামের শিক্ষা অর্থাৎ তাকদীরে কী লেখা আছে তা তো জানা নেই। কাজেই যতক্ষণ কিছু না ঘটেছে, ততক্ষণ তোমার কর্তব্য চিন্তা-ভাবনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও নিজের চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আর এ ব্যাপারে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা ও সতর্কতাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো। অতঃপর ফলাফল যা ঘটবে, তা অনুকূলে মনে হোক বা প্রতিকূলে, সেটাকে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা জ্ঞান করে তাতে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর ঘটনা

হযরত উমর ফারুক রাযি. একবার শামের সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সংবাদ আসল শামে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ঘরে-ঘরে মানুষ মারা যাচ্ছে। যে ব্যক্তি এতে আক্রান্ত হয়, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটছে। এ মহামারিতে কয়েক হাজার সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছিলেন। হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল-জাররাহ রাযি. তাঁদের অন্যতম। জর্ডানে অদ্যাবধি তাঁর মাজার সংরক্ষিত আছে এবং সে কবরস্থানে আরও বহু সাহাবী সমাহিত আছেন। তাঁরা সকলেই সেই মহামারির শহীদ। যা হোক এ সংবাদ পাওয়ার পর হযরত উমর ফারূক রাযি. সেখানে যাবেন না ফিরে আসবেন এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। সে পরামর্শকালে হযরত আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাযি. একটি হাদীছ শোনালেন। তাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনও এলাকায় মহামারি দেখা দিলে বাইরের কোনও লোক সে এলাকায় প্রবেশ করবে না এবং সে এলাকার লোকও সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র চলে যাবে না। এ হাদীছ শুনে হযরত উমর রাযি. বললেন, এ হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমাদের শামে প্রবেশ করা উচিত নয়। সুতরাং তিনি সেখানকার প্রোগ্রাম মুলতুবি করলেন। এ সময় মজলিসে অপর এক সাহাবী খুব সম্ভব হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.-ও উপস্থিত

ছিলেন। তিনি হযরত উমর রাযি.-কে লক্ষ্য করে বললেন, اَتَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ 'আপনি কি আল্লাহ তা'আলা যে নিয়তি স্থির করেছেন, তা থেকে পালাচ্ছেন।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি তাকদীরে লিখে থাকেন এখানে আপনার মৃত্যু ঘটবে, তবে সে মৃত্যু অবশ্যই ঘটবে। আর যদি তাকদীরে এখানে মৃত্যু লেখা না হয়ে থাকে, তবে যাওয়া-না যাওয়া সমান কথা। এর উত্তরে হযরত উমর রাযি. বললেন, لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا اَبَا عُبَيْدَةَ 'হে আবূ উবায়দা! এ কথা যদি আপনি ছাড়া অন্য কেউ বলত!' অর্থাৎ অন্য কেউ বললে তার জন্য মানা যেত। কিন্তু আপনি তো জ্ঞানী মানুষ। প্রকৃত সত্য আপনার জানা আছে। আপনি কী করে বলেন তাকদীর থেকে পালাচ্ছি? তারপর বললেন, نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ اِلٰى قَدَرِ اللهِ পালাচ্ছি বটে, কিন্তু তা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর থেকে তাঁর তাকদীরের দিকে। অর্থাৎ ঘটনা যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেহেতু আমরা জানি না আসলে কী ঘটবে, তাই আমাদের কর্তব্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সতর্কতামূলক কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ মোটেই তাকদীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। বরং এটা তাকদীরে বিশ্বাসেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন, যেমনটা আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাযি.-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আমরা সেই আদেশ পালনার্থেই ওয়াপস চলে যাচ্ছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের নিয়তিতে যদি প্লেগে মৃত্যু লেখা থাকে, তবে আমরা তা টলাতে পারব না। নিয়তির সে ফয়সালায় আমরা রাজি। তবে এখন কর্তব্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমরা সেটাই করছি।

তাকদীরের প্রকৃত অর্থ

এটাই একজন মুমিনের আকীদা। অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, কিন্তু ব্যবস্থাগ্রহণের পর ফলাফল আল্লাহ তা'আলার হাতে ছেড়ে দেবে এবং বলবে, 'হে আল্লাহ! আমার যে ব্যবস্থা গ্রহণ ও চেষ্টা করার ছিল তা তো করেছি, এখন ফলাফল আপনার এখতিয়ারে। আপনার যা ফয়সালা হবে আমি তাতে রাজি। তাতে আমার কোনও

আপত্তি থাকবে না।' সুতরাং কোনও কিছু ঘটার আগে তাকদীরে বিশ্বাস যেন সেই বিষয়ে কর্মবিমুখ হতে উদ্বুদ্ধ না করে। অনেক লোক এ বিশ্বাসকে বেআমলীর বাহানা বানিয়ে থাকে। তাদের কথা হল, নিয়তিতে যা লেখা আছে, ঘটবে তো তাই। খামাখা কাজ করব কেন। ব্যস হাতগুটিয়ে বসে থাকে। এটা ইসলামের শিক্ষাবিরোধী। ইসলামের শিক্ষা হল, কাজ করো, হাত-পা চালাও, প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নাও, কিন্তু ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। ফলাফল যদি নিজ ইচ্ছানুযায়ী না হয়, তবে আক্ষেপ করো না। তাতেই খুশী থাকো। যদি খুশী না থাকো, আক্ষেপ করো আর বলো এ ফলাফল আমার মনঃপূত নয়, এটা ঠিক হয়নি, কী করলাম আর কী হল, তবে তাতে শুধু বেদনাই বাড়বে। ফায়দা কিছু হবে না। ঘটে যা গেছে তা বদলানো তো যাবে না। শেষ পর্যন্ত তা মেনে নিতে একসময় হবেই। তাহলে প্রথম যাত্রায়ই কেন মেনে নেই না? প্রথমেই স্বীকার করে নেই যে, এটা আল্লাহর ফয়সালা আর আমি তার ফয়সলায় রাজি।

মনে দুঃখ-কষ্ট আসা তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকার পরিপন্থী নয়

এখানে আরও একটা বিষয় বুঝে নেওয়ার আছে। আমি শুরুতেই আরয করেছিলাম, বেদনাদায়ক কোনও ঘটনা ঘটলে বা অন্য কোনও কারণে মনে আঘাত ও কষ্ট পেলে সে কারণে কান্না আসা স্বাভাবিক। সে কান্না অধৈর্যের পরিচায়ক নয়, সবরের পরিপন্থী নয় এবং সেটা গুনাহও নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে একদিকে আপনি বলছেন, দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করা জায়েয এবং সে কারণে কান্নাকাটি করতেও দোষ নেই, অন্যদিকে বলছেন, আল্লাহর ফয়সালায় রাজি থাকা চাই, এ দুটো কি সাংঘর্ষিক নয়? এটা কেমন কথা হল যে, একদিকে আল্লাহর ফয়সালায় রাজিও থাকব আবার মনের কষ্টও প্রকাশ করতে পারব, এমন কি কাঁদতেও পারব? আসলে এ দুয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। দুঃখ-বেদনার প্রকাশ এক জিনিস আর আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাজি থাকা অন্য জিনিস। আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাজি থাকার অর্থ এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা অবশ্যই হিকমতপূর্ণ, যদিও

আমরা তাঁর হিকমত জানি না। আর হিকমত জানা না থাকার কারণেই মনে কষ্ট লাগছে। তো মনে কষ্ট পাচ্ছি এবং সেই কষ্ট চোখে পানি আসছে ও কাঁদছি– এটা ওই হিকমত না জানারই কারণে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ বিশ্বাস অবশ্যই আছে যে, তিনি যে ফয়সালা করেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক ও হিকমতপূর্ণ। কাজেই তাকদীরে সন্তুষ্টির বিষয়টা বুদ্ধি ও বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ এই বোধ ও বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহর ফয়সালা সঠিক।

মনে করুন এক ব্যক্তি অসুস্থ। তার অপারেশন দরকার। সে হাসপাতালে গেল এবং ডাক্তারকে অনুরোধ ও খোশামোদ করে বলল, আমার অপারেশন করে দিন। ডাক্তার দেখল বাস্তবিকই তার অপারেশন দরকার। সুতরাং অপারেশন শুরু করে দিল। যেই না কাটাছেঁড়া শুরু হল, অমনি সে চিৎকার করে উঠল, কান্নাকাটি করতে লাগল, উহ্-আহ্ করতে লাগল। কারণ সে ভীষণ ব্যথা পাচ্ছে, কাটাছেঁড়ায় কষ্ট লাগছে। একদিকে তো এই কান্নাকটি, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, সে ডাক্তারের সম্মানী আদায় করছে এবং তাকে কৃতজ্ঞতাও জান্নাচ্ছে। কেন? আপাতদৃষ্টিতে তার আচরণ কী সাংঘর্ষিক নয়? না, বিষয়টা একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় সাংঘর্ষিক নয় কেননা সে তার জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা জানে ডাক্তার যা করছে তা ঠিক করছে, তার কল্যাণার্থে করছে। আর কান্নাকাটি যা করেছে তা শারীরিক কষ্টের কারণে। তার সম্পর্ক জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে নয়। শরীরের সাথে। অপারেশনে শরীরে কষ্ট লেগেছে, তাই কান্না এসেছে। কিন্তু ডাক্তার অপারেশন করেছে তার কল্যাণার্থে, তাই অপারশনকে সে খুশী মনে মেনে নিয়েছে এবং সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

মুমিনের এ দুনিয়ায় যে দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, তাও ঠিক এ-রকমই। তা সব আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে ঘটে, যেন আল্লাহ তা'আলা তার অপারেশন করছেন। বান্দা এ দুঃখ-কষ্টের ভেতর যদি আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হয় ও তার ফয়সালায় সন্তোষ প্রকাশ করে, তবে তার পক্ষে এর পরিণাম শুভ ও কল্যাণকর হয়। কাজেই বৌদ্ধিকভাবে আল্লাহর ফয়সালায়

সন্তুষ্ট থেকে যদি বাহ্যিকভাবে কষ্ট প্রকাশ করে ও কান্নাকাটি করে, তবে তা দোষের নয়, সেজন্য তার গোনাহ হবে না।

কর্ম ও পরিকল্পনা ব্যর্থ যাওয়াটাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বলেন, অনেক সময় ব্যবসায়ী বিশেষ কোনও পণ্যের ব্যাপারে আশাবাদী থাকে, এটি চালানো গেলে তার অনেক লাভ হবে এবং সে অনুযায়ী চেষ্টাও চালায়, কিংবা কোনও ব্যক্তি বিশেষ কোনও পদের জন্য চেষ্টা চালায় এবং চিন্তা করে সেটি পেলে তার খুব ভালো হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা দু'জনেই দৌড়-ঝাঁপ করতে থাকে, দু'আয় রত থাকে, অন্যের কাছেও দু'আ চায় আর এভাবে তারা আপন-আপন লক্ষ্যের দিকে এগুতে থাকে। একপর্যায়ে তারা লক্ষার্জনের দোড়গোড়ায় পৌছে যায় এবং পণ্য বিক্রি হয়ে যাওয়া বা চাকরি মিলে যাওয়া কেবল সময়ের ব্যাপারে হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক এই মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের বলেন, দেখো, আমার এই বেকুব বান্দা ব্যবসা বা চাকরির পেছনে কিভাবে দৌড়াচ্ছে, কি প্রাণান্ত চেষ্টা করছে, অথচ আমি জানি তারা তাদের এই লক্ষ্যে কৃতকার্য হলে, ওই ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে বা এই চাকরি মিলে গেলে তাদেরকে আমার জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে হবে। কেননা এর কারণে তারা নানা রকমের গুনাহে লিপ্ত হবে, যেজন্য তাদের জাহান্নামবাস অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবসা ও চাকরি তাদের জন্য কল্যাণকর নয়। তাদেরকে এর থেকে বাঁচানো উচিত। তোমরা এজন্য এই-এই ব্যবস্থা নাও এবং তাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে দাও। সুতরাং দেখা যায় ব্যবসাটি নাগালে আসা বা চাকরিটি মিলে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে এমন কোনও বাধা সৃষ্টি হয়ে যায়, যদ্দরুন এতদিনের সব চেষ্টা পণ্ড যায়, ফলে ব্যবসাটি আর ধরা সম্ভব হয় না এবং চাকরিটিও হস্তগত হয় না। এভাবে নাগালে আসা ফল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তাদের দুঃখের সীমা থাকে না। তারা কেঁদেকেঁটে একশা। যাকে পায় তার কাছে দুঃখের কথা প্রকাশ করে। যাকে তাকে দোষারোপ করে আর বলে, অমুকে মাঝখানে এসে আমার সব নষ্ট করে দিল। সে জানে না আসলে কোথা থেকে কী

হয়েছে। হয়েছে তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। তার খালিক ও মালিকের পক্ষ থেকে। তিনি তার কল্যাণার্থেই এরকম করেছেন। তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর দরকার ছিল। সেজন্যই করছেন। সে এ চাকরি পেলে বা তার এ ব্যবসা দাঁড়ালে যে গুনাহ করত তাতে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যেত। কাজেই এ ফয়সালা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য কল্যাণকর হয়েছে। এই হচ্ছে তাকদীর ও আল্লাহর ফয়সালা। এর উপর বৌদ্ধিকভাবে মানুষের খুশী থাকা উচিত।

জীবনযাত্রায় তাকদীরে বিশ্বাসের প্রতিফলন হওয়া চাই

আকীদা-বিশ্বাস হিসেবে প্রত্যেক মুমিনেরই তাকদীরের প্রতি ঈমান থাকে। কেউ যখন ঈমান আনে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তাকদীরের উপরও ঈমান এনে থাকে, সে বলে–

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

'আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং তাকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে হয়– এ কথার প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।'

কিন্তু এই ঈমানের প্রতিফলন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাপিত জীবনে নজরে আসে না। এই বিশ্বাসের ধ্যান ও খেয়াল জীবনের কর্মকাণ্ডে হাজির থাকে না। আর এ কারণেই দুনিয়ায় মানুষ বড় পেরেশান। সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, তুমি যখন এ আকীদার প্রতি ঈমান এনেছ তখন একে জীবনের অংশ বানিয়ে ফেলো। অন্তরে এ আকীদার ধ্যান সৃষ্টি করো এবং একে সর্বদা স্মরণ রাখো। যখনই যে ঘটনা ঘটে তাতে এই বিশ্বাসকে তাজা করে তোলো। মনে মনে বলো, আমি তাকদীরের প্রতি ঈমান এনেছিলাম। তার দাবিতে এ ঘটনা ও অবস্থার উপর আমার রাজি থাকা চাই। যে ব্যক্তি সুফিয়ায়ে কেরামের পরিচর্যাধীন থেকে আত্মশুদ্ধির

অনুশীলন গ্রহণ করে, তার ও একজন সাধারণ লোকের মধ্যে এটাই পার্থক্য। সুতরাং এ আকীদাকে এভাবে জীবনাচারের অনুষঙ্গ বানিয়ে নিতে হবে যে, যখনই কোনও অপ্রীতিকর অবস্থা দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন পড়বে এবং বিষয়টাকে আল্লাহ তা'আলার হাওয়ালা করে দেবে। চিন্তা করবে, এটা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা তাই এতে আপত্তি তোলার কোনও অবকাশ নেই। আমি এতে সন্তুষ্ট। এভাবে নিয়মিত চর্চা করলেই এ বিশ্বাস সার্বক্ষণিক অনুষঙ্গ হয়ে উঠবে, চরিত্রের অংশ হয়ে যাবে। পরিভাষায় একে 'হাল' বলে। এ বিশ্বাস যখন 'হাল'-এ পরিণত হয়, তখন আর দুনিয়ায় কোনও কারণে কোনও পেরেশানি দেখা দেয় না। আল্লাহ তা'আলা এ আকীদাকে আমাদের 'হাল' বানিয়ে দিন। –আমীন।

পেরেশানি কেন?

দেখুন, দুঃখ-কষ্ট এমন এক জিনিস, যা দুনিয়ায় প্রত্যেকেরই জীবনে আসে। আরেকটা হচ্ছে পেরেশানি, অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের কারণে অস্থির-উতলা হয়ে পড়া, ছটফট করতে থাকা। কোনওভাবেই নিজেকে শান্ত করতে না পারা, এই পেরেশানি কেন দেখা দেয়? দেখা দেয় এ কারণে যে, মানুষ বুদ্ধিগতভাবে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। বলাই বাহুল্য যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হতে পারে না, সে কিভাবে স্থৈর্য ও স্বস্তিবোধ করবে? পক্ষান্তরে যার বিশ্বাস, আমার হাতে যা ছিল তা তো আমি করেছি, কিন্তু ফয়সালা আল্লাহর হাতে আর সেখানে আমার কোনও এখতিয়ার নেই। তাই সেখানে আমার কিছু করারও ছিল না। সেখানে আল্লাহর যা ইচ্ছা হয়েছে তাই করেছেন। তার ফয়সালা যথার্থ, আমি তাতে রাজি। এরূপ ব্যক্তির কখনও কিছুতে পেরেশানি হবে না। তার মনে কষ্ট লাগবে, সে ব্যথ্যা পাবে, কিন্তু পেরেশান সে হবে না।

স্বর্ণাক্ষরে লেখার মতো বাক্য

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. -এর ইন্তিকাল হলে আমার যে কী কষ্ট ও বেদনা হয়েছিল তা বলার নয়।

জীবনে এতটা কষ্ট আর কোনও কিছুতে পাইনি। সে কষ্ট ও বেদনা অস্থিরতার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। কোনওভাবেই নিজেকে শান্ত করতে পারছিলাম না। সে শোক আমাকে পাথর করে ফেলেছিল। একদম কান্না পাচ্ছিল না। অনেক সময় কান্নার সাথে মনের বাষ্প বের হয়ে যায়। ফলে দুঃখ প্রশমিত হয়। কিন্তু আমার তো কান্না আসছিল না। আমি এ অবস্থার কথা আমার শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব রহ.-কে লিখে জানালাম। তিনি উত্তরে মাত্র একটি বাক্য লিখেছিলেন। আল-হামদুলিল্লাহ সেই একটি বাক্য আমার যে উপকার করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। বাক্যটি আমার অন্তরে আজও পর্যন্ত অঙ্কিত হয়ে আছে; তিনি লিখেছেন–

'মনের বেদনা তো স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু যেসব বিষয়ে নিজের কোনও এখতিয়ার নেই, তাতে এত বেশি পেরেশানি ঠিক নয়। এর সংশোধন দরকার।'

অর্থাৎ প্রিয়জনের বিরহে শোক-সন্তাপ তো স্বাভাবিক জিনিস। তা দেখা দেবেই। আবার তাও এমন মহান পিতার বিচ্ছেদ! কিন্তু এ বিচ্ছেদে তো কারও হাত নেই। তোমার পক্ষে তো তার মৃত্যু টলানো সম্ভব ছিল না। কাজেই এই এখতিয়ার বহির্ভূত ঘটনায় এতটা পেরেশানি ঠিক হচ্ছে না। এর সংশোধন দরকার। অর্থাৎ তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকার যে নির্দেশ, তা পুরোপুরি মানা হচ্ছে না। তা পুরোপুরি না মানার কারণেই এমন পেরেশানি হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, তার এই একটি মাত্র কথা পড়ার পর অনুভব হল, কেউ যেন বুকের উপর বরফ খণ্ড রেখে দিল। মুহূর্তে আমার শোকের আগুন নিভে গেল এবং চোখ খুলে গেল।

হৃদয়পটে লিখে রাখার মতো বাক্য

আরেকবার আমি আমার দ্বিতীয় শায়খ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেব রহ.-কে চিঠি লিখেছিলাম যে, হযরত! অমুক ঘটনায় বড় পেরেশানি লাগছে। উত্তরে হযরত রহ. লিখলেন–

'আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সাথে যার সম্পর্ক আছে, পেরেশানির সাথে তার কিসের সম্পর্ক?

অর্থাৎ পেরেশানি প্রমাণ করে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক শক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলার সাথে যখন সম্পর্ক মজবুত থাকবে, তখন পেরেশানির কী ক্ষমতা তোমাকে স্পর্শ করবে? দুঃখ-বেদনা যদি স্পর্শ করে, তবে আল্লাহ তো তোমার আছেন, তাকে বলো, হে আল্লাহ! আমার এ দুঃখ মোচন করো। তারপর আল্লাহর যা ফয়সালা হয়, তাতে রাজি থাকো। ব্যস আর পেরেশানি কিসের? সুতরাং তাকদীরে সন্তুষ্টি যদি নিজ হাল বা চরিত্রে পরিণত হয়ে যায় এবং দেহ মনে তা মিশে যায়, তবে পেরেশানি আসবারই পথ পাবে না।

হযরত যুন-নূন মিসরী রহ.-এর স্বস্তির রহস্য

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত যুন-নূন মিসরী রহ.-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, হযরত কেমন আছেন? তিনি বললেন, বড় মৌজে আছি। আর সেই ব্যক্তির মৌজের তুমি কী বুঝবে, যার মরজির বাইরে জগতের কিছুই ঘটে না, যা কিছু হয় তার খুশী মতোই হয়? জানো, জগতের সবকিছু আমার মরজি মোতাবেক হচ্ছে? প্রশ্নকর্তা বলল, হযরত! দুনিয়ার সব কাজ নিজ মরজি মোতাবেক হবে এমন হাল তো নবী-রাসূলগণেরও ছিল না। তা আপনি কিভাবে এই স্তরে পৌছে গেলেন? বললেন, ভাই! আমি আমার মরজিকে তো আল্লাহ তা'আলার মরজির ভেতর লীন করে দিয়েছি। আল্লাহর যা মরজি আমারও তাই মরজি। জানা কথা, দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহ তা'আলার মরজি মোতাবেক হয়। আমার মরজি যখন তারই মরজি তখন সবকিছু আমার মরজি মতই হচ্ছে। সুতরাং বুঝে দেখো কী মৌজে আছি। পেরেশানি তো আমার কাছেই ঘেঁষতে পারে না। পেরেশানি হয় কেবল তার, সবকিছু যার মরজির বিপরীত হয়।

দুঃখ-কষ্টও রহমতই বটে

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা যাকে তাকদীরে খুশী থাকার মতো নি'আমত দান করেছেন, পেরেশানি তার নাগালেই পৌছতে পারে না। দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করে বটে, কিন্তু পেরেশানি নয় কিছুতেই। কারণ সে জানে, যে দুঃখ-কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে, তা আমার মালিকের পক্ষ

থেকেই এসেছে এবং আমার মালিকের হিকমত মোতাবেকই এসেছে। আমার মালিক আমার যে তাকদীর ও নিয়তি স্থির করেছেন, সে অনুসারে এতেই আমার কল্যাণে। জনৈক বুযুর্গ তো এ পর্যন্ত বলেছেন যে,

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت
سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

'তোমার তরবারিতে খুন হওয়ার সৌভাগ্য শত্রুর যেন না হয়। তোমার খঞ্জর পরখ করার জন্য তোলা রয়েছে বন্ধুদের মাথা।'

বোঝানো উদ্দেশ্য, এই যে দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, আসলে তো এটা তাঁর রহমত। আর এটা যখন তাঁর রহমত, তখন অন্যদের কেন লাভ হবে, আমাদের জন্য নিরঙ্কুশ থাকুক।

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বিষয়টার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, মনে করুন, এক ব্যক্তি আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বেজায় ভালোবাসেন তাকে। কিন্তু থাকে অনেক দূরে, যে কারণে বহুকাল যাবৎ তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাত নেই। হঠাৎ একদিন সে আসল। আপনি বিশেষ কাজে মশগুল ছিলেন। সে চুপিসারে এসে পেছন থেকে আপনাকে জড়িয়ে ধরল এবং উদ্বেলিত মহব্বতে এমন জোড়ে চাপ দিল যে, আপনার পাঁজর ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল। নিশ্চয়ই এ অবস্থায় আপনি তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠবেন এবং চিৎকার করতে থাকবেন, যাতে সে আপনাকে ছেড়ে দেয়। সেই সঙ্গে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে থাকবেন। আর জিজ্ঞেস তো করবেনই, তুমি কে? এখন সে যদি বলে, আমি তোমার অমুক বন্ধু। আমার এভাবে চেপে ধরা তোমর পসন্দ না হলে ঠিক আছে আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি এবং তোমার বদলে তোমার অমুক প্রতিদ্বন্দ্বীকে জড়িয়ে ধরছি, তবে তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কী হবে? নিশ্চয়ই আপনি তাকে সত্যিকারের ভালোবেসে থাকলে বলবেন, না-না তাকে নয়, আমাকেই জড়িয়ে ধরে রাখো এবং জোরসে চাপ দিতে থাকো। সেই সঙ্গে আবৃত্তি করতে থাকবেন–

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت
سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

'তোমার তরবারিতে খুন হওয়ার সৌভাগ্য শত্রুর যেন না হয়, বন্ধুদের মাথাই তোলা থাকল তোমার খঞ্জর পরীক্ষার জন্য।'

আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাদেরকে এই উপলব্ধি দান করুন যে, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট তাঁর রহমতের ভূমিকাস্বরূপ। কিন্তু আমরা যেহেতু দুর্বল, তাই দুঃখ-কষ্ট আমরা প্রার্থনা করি না এবং আসুক তা চাই না। কিন্তু তারপরও আসলে মনে করব আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও ফয়সালাক্রমে এসেছে। আর সে কারণে তা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর।

দুঃখ-কষ্ট চাবে না, কিন্তু আসলে সবর করবে

আমরা যেহেতু দুর্বল তাই আমাদের মতো সাধারণের কিছুতেই দুঃখ-কষ্ট চাওয়া উচিত নয়। অবশ্য এর হাকীকত ও রহস্য যাদের জানা আছে সেই বিশিষ্টজনদের অনেকে ক্ষেত্রবিশেষে তা চেয়েও নেন। সুফিয়ায়ে কেরামের কারও কারও সম্পর্কে এরকম বর্ণিত আছে। বিশেষত আল্লাহর পথে যে কষ্ট-ক্লেশ দেখা দেয় সত্যিকারের আল্লাহ-প্রেমিকগণ তাকে অন্যান্য ক্ষেত্রের হাজারও কষ্ট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গণ্য করেন। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে–

بجرم عشق تو کشد عجب غوغا نیست
تو نیز رب سر آکہ خوش تماشا ایست

'তোমার ভালোবাসার অপরাধে লোকে আমাকে মারছে, টানাহ্যাঁচড়া করছে এবং হইচই করছে। তুমি এসে দেখে যাও, কী চমৎকার তামাশা জমে উঠেছে।'

এটা তো বড়দের ব্যাপার। আমরা দুর্বল মানুষ। শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতার বড় কমতি। তাই আমরা এমন কষ্ট-ক্লেশ চাইব না; বরং শান্তি ও নিরাপত্তা চাইব। বলব, হে আল্লাহ! আমাকে নিরুপদ্রব জীবন দিন। তারপরও দুঃখ-কষ্ট দেখা দিলে তার অবসানের জন্য দু'আ করব। বলব

হে আল্লাহ! যদিও এ কষ্ট আপনার নি'আমত, কিন্তু আমরা যেহেতু দুর্বল, তাই এ নি'আমতকে শান্তি ও নিরাপত্তার নি'আমত দ্বারা বদলে দিন। এসব করব, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই পেরেশান হব না। এর নাম 'রিযা বিল-কাযা' বা 'তাকদীরে সন্তুষ্টি'। তাকদীরে ঈমান তো সব মুসলিমেরই থাকে। সকলকেই বিশ্বাস করে, তাকদীরে যা লেখা থাকে তাই হয়, কিন্তু এ বিশ্বাসকে জীবনঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। সার্বক্ষণিক চরিত্র বানাতে হবে, যাকে 'হাল' বলা হয়। 'হাল' বানাতে পারলে ইনশাআল্লাহ কখনও পেরেশানি দেখা দেবে না।

আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা

আপনারা আল্লাহওয়ালাদেরকে দেখে থাকবেন, তারা কখনও কোনও অবস্থায়ই অস্থির ও পেরেশান হন না। যত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটুক, যত দুঃখ-দুর্দশা দেখা দিক, অস্থিরতা কখনও তাদের কাছেও ঘেঁষতে পারে না। কারণ তারা জানেন, যা হচ্ছে তা আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা। তাতে সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। তাদের জীবন থেকেও আমরা এ শিক্ষা পাই যে, জীবনে যে-কোনও পরিস্থিতি আসুক, যত অপ্রীতিকর ঘটনাই ঘটুক, তাকে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা মনে করে রাজি থাকার চেষ্টা করতে হবে। দুঃখ-কষ্টের এই একটাই চিকিৎসা। এরকম করলে উচ্চ পর্যায়ের সবর অর্জিত হয়ে যাবে। সবর একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। সব ইবাদতের উপর এর মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۝

'সবর অবলম্বনকারীদেরকে তো বিনা হিসাবে প্রতিদান দেওয়া হবে।'[৮০]

দুঃখ-কষ্ট কে না পোহায়?

যখনই কোনও কষ্ট দেখা দেয়, চিন্তা করা চাই, দুনিয়ায় এমন কোনও লোক নেই, যার কষ্ট নেই। বিগত দিনেও এমন কোনও লোক যায়নি, যার কোনও রকম কষ্ট পোহাতে হয়নি। যত বড় বাদশাহ হোক

---

৮০. সূরা যুমার, আয়াত ১০

বা বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক হোক কিংবা হোক উচ্চ পদস্থ ও অমিত ক্ষমতাবান ব্যক্তি, এমনিভাবে নবী, ওলী, নেককার, পরহেযগার যেই হোক না কেন, দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই নেই কারও। একভাবে না একভাবে কষ্ট আসবেই। চাইলেও আসবে, না চাইলেও আসবে। কারণ দুনিয়া জায়গাটাই এমন, যেখানে সুখ-দুঃখ পাশাপাশি থাকে। আনন্দ আছে তো সাথে বিষাদও আছে। স্বস্তি আছে তো পেরেশানিও আছে। কারও কেবল সুখই থাকবে কোনও দুঃখ নয়, কিংবা শুধু দুঃখই পোহাবে সুখের লেশমাত্র নেই– এটা হতেই পারে না। এটা স্থিরীকৃত বিষয়। এমন কি যারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব অস্বীকার করে (নাউযুবিল্লাহ), তাঁরা সকল সত্যের সেরা সত্যকে অস্বীকার করছে, কিন্তু দুনিয়ায় কখনও কষ্টবিহীন জীবন লাভ হতে পারে না, এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারেনি। তো কষ্ট আসবেই– এটা যখন স্থিরীকৃত বিষয়, আর কষ্টও বহু রকমের, বিশেষ কোনও কিসিমের নয়, তখন তোমার জীবনে কোনটা আসবে আর কোনটা আসবে না—এটা কী করে স্থির করা যাবে? এক তো হতে পারে এই যে, তুমি নিজেই ফয়সালা করে নিলে কোন কষ্ট তোমার জীবনে আসতে পারে আর কোনটা নয়। কিন্তু সে ক্ষমতা কি তোমার আছে? কারও পক্ষেই কি এটা সম্ভব যে, কোন কষ্ট তার জন্য ভালো আর কোনটা মন্দ, কোনটার পরিণাম শুভ আর কোনটার অশুভ তা নিরূপণ করবে? বলা বাহুল্য কারও তা জানা নেই এবং কারও পক্ষে তা বেছে নেওয়া সম্ভবও নয়। অগত্যা বিষয়টাকে আল্লাহ তা'আলারই হাতে ছেড়ে দিতে হয়। এছাড়া দোসরা কোনও পথ নেই। সুতরাং আল্লাহকেই বলো, হে আল্লাহ! আপনি নিজ ফয়সালা মোতাবেক আমার পক্ষে যে কষ্ট কল্যাণকর, কেবল সেটাই দিন এবং সেই সঙ্গে তা সইবার ক্ষমতাও দিন, সাথে সবরও দান করুন।

ছোট বিপদের কারণে বড় বিপদ কেটে যায়

মানুষ তার বুদ্ধির স্বল্পতায়ন বৃত্তে বন্দী। তার খবর নেই, যে বিপদ তার দেখা দিয়েছে, তার কারণে সে বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। যার জ্বর হয়েছে, সে কেবল জ্বরের কষ্টটাই দেখে। যে ব্যক্তি চাকরির

জন্য দৌড়ঝাঁপ করছে, কিন্তু চাকরির সোনার হরিণ ধরতে পারছে না, সে কেবল সেই কষ্ট নিয়েই ভাবে। যার ঘরে চুরি হয়ে যায়, সে তার এই কষ্ট নিয়েই পেরেশান। এদের কেউ চিন্তা করে না, যদি এ কষ্ট না হতো, তাহলে অন্য কোনও কষ্ট দেখা দিত কি না আর দেখা দিলে সেই কষ্ট বড় হতো, না এই কষ্ট? যেহেতু সেই খবর তার নেই, তাই বর্তমানে যে কষ্ট সে ভুগছে, তার চিন্তা সেই গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। সে এরই জন্য আক্ষেপ করতে থাকে, হায়, আমার এত কষ্ট, আমার এই হয়ে গেল সেই হয়ে গেল! তার উচিত ছিল বিষয়টাকে এভাবে চিন্তা করা যে, ভালো হল– ব্যাপারটা এই ছোট কষ্টের ভেতর দিয়েই গেল। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলাই জানেন আরও কত বড় বিপদ হতে পারত। আরও কত কঠিন মসিবতে পড়তে হতো। এভাবে চিন্তা করলে কিন্তু সান্ত্বনাও পাওয়া যায়। অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা দেখিয়েও দেন যে, তুমি যে মসিবতের শিকার হয়েছ, যাকে তুমি অনেক বড় কষ্ট গণ্য করছ, দেখো সেটা তোমার জন্য কত বড় রহমত প্রমাণিত হয়েছে। তার পরিণাম কত শুভ হয়েছে।

বিপদাপদে আল্লাহ তা'আলারই শরণাপন্ন হওয়া চাই

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সান্ত্বনার জন্য দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন–

لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللهِ اِلَّا اِلَيْهِ.

'আল্লাহ তা'আলার (দেওয়া বিপদ ও আযাব) থেকে বাঁচার জন্য তাঁর ছাড়া আর কোনও আশ্রয়স্থল ও আর কোনও নাজাতের জায়গা নেই।'[৮১]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ধরা থেকে বাঁচার পথ একটাই। তা হল তাঁর রহমতের কোলে আশ্রয় নেওয়া। আর তার পন্থা হচ্ছে, তাঁর ফয়সালায় রাজি থাকা এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া– হে আল্লাহ! আপনি এ মসিবত দূর করে দিন। মাওলানা রূমী রহ. বিষয়টাকে একটা

৮১. বুখারী, হাদীছ নং ৫৮৩৬

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, মনে করো এক তীরন্দাজ, যার হাতে জগৎ জোড়া একটি ধনুক। ধনুকের সারা গায়ে তীর যোজিত আছে। দুনিয়ার এমন কোনও স্থান নেই, যেখানে সে তীর পৌছতে পারে না। সারা জাহানের প্রতি স্থান তার রেঞ্জের ভেতরে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এরকম তীরন্দাজ থেকে বাঁচার কী উপায় হতে পারে? এমন কোনও জায়গা আছে, যেখানে গিয়ে তার থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে? জবাব একটাই তুমি যদি তার থেকে বাঁচতে চাও, তবে আর কোথাও নয়, স্বয়ং ওই তীরন্দাজেরই আশ্রয়প্রার্থী হও, তার কোমর জড়িয়ে ধরো। এছাড়া বাঁচার আর কোনও জায়গা নেই। বালা-মসিবত, দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা-পেরেশানির বিষয়টাও এরকমই। এসব হল আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার তীর। এসব তীর থেকে বাঁচার জায়গা একটাই আছে– আল্লাহ তা'আলার রহমতের কোল। এছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা চাই– হে আল্লাহ! আপনি আমাকে অসহনীয় পর্যায়ের কোনো কষ্ট দিয়েন না। আর যেটুকু কষ্ট দেন, তাতে সবর করার তাওফীক দিয়ে দিন। আর কষ্টকে আমার মাগফিরাত ও মর্যাদা বৃদ্ধির অছিলা বানিয়ে দিন।

অবুঝ শিশুর থেকে সবক নিন

আপনি অবুঝ শিশুদের দেখে থাকবেন– মা যখন তাকে মারে, তখন সে মাকেই ঝাপটে ধরে এবং তার কোলের ভেতরই লুকানোর চেষ্টা করে, অথচ সে জানে তার মা'ই তাকে মারছে। কেন সে তা করে? কারণ সে জানে মা তাকে মারছে বটে, কিন্তু এ মারধর থেকে বাঁচার দাওয়াইও তারই কাছে আছে। আবার যত আদর-স্নেহ তাও তারই কোলে। কাজেই যখনই অনাকাঙ্ক্ষিত কোনও পরিস্থিতি দেখা দেয়, দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তখন যেহেতু তা আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে আসে, তাই চিন্তা করতে হবে এর থেকে বাঁচার জায়গাও তাঁরই কাছে। তাঁর রহমতের কোলে আশ্রয় নিলেই এর থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সুতরাং তাঁরই কাছে দু'আ করতে হবে তিনি যেন এ বিপত্তি দূর করে দেন এবং সবর করার

তাওফীক দান করেন। এরই নাম 'রিযা বিল-কাযা' বা 'তাকদীরে সন্তুষ্টি'। আল্লাহ তা'আলা নিজ করুণায় আমাদের সকলকে এ গুণের অধিকারী করুন। আমীন।

অপর এক হাদীছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا أَرْضَاهُ بِمَا قَسَّمَ لَهُ وَبَارَكَ لَهُ فِيْهِ وَإِذَا لَمْ يُرِدْ بِهٖ خَيْرًا لَمْ يُرْضِهٖ بِمَا قَسَّمَ لَهُ وَلَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيْهِ.

'আল্লাহ তা'আলা যখন কোনও বান্দার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে তার কিসমতের উপর সন্তুষ্ট করে দেন এবং তার কিসমতে বরকত দান করেন। পক্ষান্তরে যখন তার জন্য কল্যাণের ইচ্ছা করেন না, তখন তাকে তার কিসমতের উপর সন্তুষ্টি দান করেন না এবং তার কিসমতে বরকতও দেন না।'[৮২]

অর্থাৎ নিজ কিসমতের উপর তার মনে প্রশান্তি ও পরিতুষ্টি আসে না। ফলে তার যা কিছু অর্জিত হয় তাতে বরকতও হয় না। এ হাদীছ দ্বারা জানা গেল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনও বান্দার কল্যাণ চাইলে তাকে নিজ কিসমত ও ভাগ্যে সন্তুষ্ট রাখেন। আর এই সন্তুষ্টির ফলে তার অর্থ-সম্পদ কম হলেও আল্লাহ তা'আলা তাতে বরকত দান করেন।

বরকত কাকে বলে?

আজকের জগৎ হল অংক ও সংখ্যার জগৎ, সবকিছু গাণিতিক দৃষ্টিতে দেখা হয়। একজন এক হাজার টাকা আয় করে তো দ্বিতীয়জন বলে, আমার আয় দু'হাজার টাকা, তৃতীয়জন বলে, আমার তিন হাজার। কেউ চিন্তা করে না এই সংখ্যার বিপরীতে তার শান্তি লাভ হচ্ছে কতটুকু? কতটুকু স্বস্তি ও নিরাপত্তা সে পাচ্ছে? মনে করুন, এক ব্যক্তির মাসিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা, কিন্তু সেই সঙ্গে তার পেরেশানিও বিস্তর; ঘরে পরস্পরে বনিবনাও নেই, অসুখ-বিসুখ লেগে আছে, নানা রকমের ঝক্কি-

৮২. কানযুল উম্মাল, হাদীছ নং ৭১১৭; জামিউল আহাদীছ, হাদীছ নং ১২৪৮

ঝামেলার ভেতর দিন যাচ্ছে। এবার বলুন তার সেই পঞ্চাশ হাজার কোন কাজের? বোঝা যাচ্ছে তার পঞ্চাশ হাজারে বরকত নেই। অপরদিকে এক ব্যক্তি রোজগার করে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা, কিন্তু তার ঘরে সুখ-শান্তি আছে, কোনও রকম পেরেশানি নেই। নিরুপদ্রব জীবনযাপন করছে। তো এ ব্যক্তি টাকার অংকে নিচে থাকলেও প্রকৃত অর্জন ও পরিণামের দিক থেকে প্রথম ব্যক্তির চেয়ে উপরে নয় কি? এই হচ্ছে বরকত। তার এক হাজার টাকায় বরকত আছে। সংখ্যায় কম হলেও তা কাজে লাগছে বেশ।

জনৈক নবাব সাহেবের ঘটনা

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর মাওয়ায়েযে আছে, লক্ষৌতে এক নবাব ছিল, যার ছিল বিপুল জমি-জায়েদাদ। চাকর-নকরে তার বাড়ি সর্বদা সরগরম থাকত। হযরত থানভী রহ. বলেন, একবার তার সাথে আমার সাক্ষাত হল। তখন নবাব সাহেব আমাকে বললেন, হযরত! আমি নিজের অবস্থা আপনাকে কী বলব! আপনি দেখছেন আমার কী বিস্তর অর্থ-সম্পদ। অথচ আমি শান্তিতে নেই। আমার একটা কঠিন রোগ আছে, যে কারণে আমি কিছুই খেতে পারি না। আমার চিকিৎসকের মতে আমার জন্য মাত্র একটা খাবারই উপযোগী। আর তা হচ্ছে পেষাই গোশত একটা কাপড়ে বেঁধে নিংড়াতে হবে এবং তা থেকে যে রস বের হবে চামচ দিয়ে তা পান করতে হবে। ব্যস এছাড়া আর কোনও খাবার নয়। চিন্তা করুন, যার দস্তরখানে দুনিয়ার হরেক রকমের সেরা-সেরা খাবার হাজির, সব রকম নি'আমত যার সামনে নিয়মিত পরিবেশন করা হচ্ছে, অথচ তার নিজের একটু চেখে দেখার সুযোগ নেই। ডাক্তার নিষেধ করে দিয়েছে। কারণ তিনি যে রোগে আক্রান্ত, তাতে ওসব খাওয়া চলবে না। বলো, সেই সম্পদের কী মূল্য, যা মানুষ ইচ্ছা মাফিক ব্যবহার করতে পারে না? এর মানে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদে বরকত রাখেননি। তাই তার জীবনে সম্পদের সে পাহাড় বৃথা প্রমাণ হয়েছে। অপরদিকে একজন দিনমজুর, অতি সামান্য তার রোজগার। শাক-ভাত খায়। পেট ভরে খায়, বড় মজা

নিয়ে খায়, সে খাবার যথারীতি হজম হয়, শরীর তা থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। বেশ তার স্বাস্থ্য। বলুন, কার জীবন সুখের? নবাব সাহেবের, না দিনমজুরের? কিন্তু গননায় আসুন, হিসাব মিলবে না। তার কি বিপুল সম্পদ আর এর কত সামান্য! অথচ এই সামান্যের ভেতর তার বিস্তর সুখ, যা নবাব সাহেবের বিপুল বিত্তের ভেতর নেই। এর নাম বরকত।

কিসমতের উপর সন্তুষ্ট থাকুন

যা হোক আল্লাহর যে বান্দা নিজ কিসমতের উপর সন্তুষ্ট আল্লাহ তা'আলা তার কিসমতে বকরত দান করেন। নিজ কিসমতে খুশী থাকার অর্থ এ নয় যে, কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকো। বরং কাজ যথারীতি করে যাবে, কিন্তু সেই সাথে তাতে যা অর্জন হয় তাতে খুশী থাকবে এবং চিন্তা করবে যে, এটাই আমার কিসমতে ছিল। তাই এতে আমার কল্যাণ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রোজগারে বরকত দান করেন এবং তার ভেতর সুখ-শান্তি নিহিত রাখেন। পক্ষান্তরে নিজ কিসমতে খুশী না থেকে যদি সর্বক্ষণ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং এই বলে আক্ষেপ করা হয় যে, আহা, আমি কীইবা পেলাম, আমার তো কিছুই হল না, আমি পেছনে রয়ে গেলাম, তবে অর্জিত সম্পদে কোনও বরকত থাকে না এবং এরূপ ব্যক্তি নি'আমতের স্বাদ ও আনন্দ থেকেও বঞ্চিত থাকে। তুমি আক্ষেপ করো আর যাই করো, পাবে তো ততটুকুই, যতটুকু তোমার কিসমতে আছে। তোমার হা-হুতাশ ও অকৃতজ্ঞতা দ্বারা তোমার ভাগ্য তো বদলাবে না এবং অবস্থার কোনও উন্নতি হবে না, উল্টো বর্তমান নি'আমত দ্বারা তোমার যে উপকার হতে পারত অকৃতজ্ঞতার পরিণামে তা থেকেও বঞ্চিত হলে।

সুতরাং আল্লাহপ্রদত্ত নি'আমতে খুশী থাকো, তা সে নি'আমত অর্থ-সম্পদের হোক, পেশা ও কাজের হোক কিংবা হোক স্বাস্থ্য ও রূপ-লাবণ্যের। দুনিয়ার যে নি'আমতই হোক না কেন, তাতে সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট থাকতে চেষ্টা করো। চিন্তা করবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে নি'আমত যে পরিমাণে দিয়েছেন, আমার পক্ষে সেটাই কল্যাণকর।

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ.-এর একটি বয়েত স্মরণ রাখার মতো। তিনি বলেন,

مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی ہے
میرے پیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

'কার পেয়ালায় কতটুকু শরাব আছে তা দেখে আমার কাজ কী? আমার পেয়ালায় শরাবখানার সারবস্তু আছে (আমার জন্য তাই যথেষ্ট)।'

সুতরাং কার রোযগার কত হাজার, কত লাখ বা কত কোটি আমি তা দেখতে চাই না। দেখার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি যা পেয়েছি তা আমার মহান আল্লাহর দান। তাঁর দান আমার কাছে অমূল্য। পরিমাণ এখানে বড় কথা নয়। বড় কথা এটা আমার মনিবের দান। কাজেই আমি এতেই মগ্ন থাকতে চাই। এতেই পরিতৃপ্ত থাকতে চাই। এই চিন্তা সর্বদা মাথায় রাখা উচিত এবং ভাবনার এই দৃষ্টিকোণ অর্জন করা উচিত। এভাবেই কানা'আত বা পরিতুষ্টি হাসিল করা যায় এবং এই পন্থায় 'রিযা বিল-কাযা' বা নিয়তিতে সন্তুষ্টির গুণ অর্জিত হয়, আর এ ধারাতেই দুঃখ-কষ্ট লাঘব ও পেরেশানি দূর হয়। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে এই চিন্তা চেতনাকে আমাদের হাল তথা স্থায়ী চরিত্র বানিয়ে দিন। আমীন।

ফিতনার যুগ ও তার আলামতসমূহ*

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًا مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَأْيٍ بِرَأْيِهٖ فَعَلَيْكَ يَعْنِىْ بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ.

আয়াতের অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা সঠিক পথে থাকলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকল প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।[৮৩]

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬

৮৩. সূরা মায়িদা, আয়াত ১০৫

হাদীছের অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন দেখবে কৃপণ ব্যক্তির আনুগত্য করা হচ্ছে, মনের খেয়াল-খুশী অনুসৃত হচ্ছে, দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকে আপন-আপন মত নিয়ে শ্লাঘাবোধ করছে, তখন তুমি নিজের চিন্তা করো এবং সর্বসাধারণ থেকে দূরে থাকো।[৮৪]

হযরত মুহাম্মাদ সা. কিয়ামত পর্যন্ত সকলের নবী

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য যে শিক্ষা রেখে গেছেন তা অতি বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ। আজ তার মধ্য হতে সংক্ষেপে এমন একটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে চাচ্ছি, যার প্রয়োজন সাম্প্রতিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বড় বেশি, অথচ তাঁর শিক্ষার এ দিকটি সম্পর্কে আলোচনা হয় কদাচ।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাঁর পর্যন্ত এসে নবুওয়াত– ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল সার্বজনীনতা। তার আগে যত নবী রাসূলের শুভাগমন হয়েছে, তারা বিশেষ কোনও সম্প্রদায়, বিশেষ কোনও অঞ্চল ও বিশেষ কালের জন্য এসেছেন। তাঁদের শিক্ষা ও দাওয়াত নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতো এবং নির্দিষ্ট কালের জন্য হতো। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কথাই ধরুন। তিনি মিসরে বনী ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত সেই অঞ্চল ও সেই জাতির মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনও বিশেষ জাতি ও বিশেষ অঞ্চলের জন্য নবী করে পাঠাননি। বরং তাঁকে পাঠানো হয়েছে

---

৮৪. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৭৭৮; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৯৮৪; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪০০৪

সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে এবং তাঁর নবুওয়াত কিয়ামতকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

'হে নবী, আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি'।[৮৫]

সমস্ত মানুষের জন্য বলতে সারা বিশ্বের যে-কোনও স্থানের বাসিন্দাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের মানুষকে বোঝানো হয়েছে। তাঁকে এদের সকলের কাছেই পাঠানো হয়েছে। বোঝা গেল, তাঁর নবুওয়াত শুধু 'আরববাসীর' জন্য নয় এবং নয় তা 'কালবিশেষের' জন্য। তিনি স্থান-কালের বৃত্তমুক্ত সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন নবী।

ভবিষ্যতের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দান

তিনি যখন সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন নবী, তখন সহজেই বোঝা যায়, তাঁর শিক্ষা ও তাঁর প্রদত্ত বিধানাবলি কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। এ কারণেই তিনি আমাদের সামনে যে শিক্ষা রেখে গেছেন, তা জীবনের সর্বক্ষেত্র জুড়ে ব্যাপ্ত।

তাঁর শিক্ষামালা দুই শাখায় বিভক্ত। (এক) শরী'আত ও বিধানাবলি সংক্রান্ত, অর্থাৎ কোনটা হালাল, কোনটা হারাম, কোন কাজ জায়েয, কোন কাজ নাজায়েয, কোনটা ওয়াজিব কোনটা সুন্নত ও কোনটা মুস্তাহাব ইত্যাদি।

(দুই) ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ দান এবং আগামীতে উম্মতকে কী কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং তখন তাদের করণীয় কী, সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা।

এই দ্বিতীয় দিকটিও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি তাঁর নবুওয়াতী দৃষ্টি দ্বারা আগামীতে

---

৮৫. সূরা সাবা, আয়াত ২৮

ঘটবে এমন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ও ঘটনাবলি দেখতে পেয়েছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে তাদের করণীয় কী তাও তিনি ওহী মারফত জানতে পেরেছিলেন। সুতরাং তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে এই-এই ঘটনা ঘটবে, তোমাদেরকে এই এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। যখন তা ঘটবে ও দেখা দেবে তখন যে ব্যক্তি মুমিন এবং যে সরল পথে চলতে ইচ্ছুক তার কর্তব্য হবে, এই এই কাজ করা ও এই পন্থা অবলম্বন করা।

আজকের আলোচনায় আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার এই দ্বিতীয় দিকটি সম্পর্কেই সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই।

উম্মতের মুক্তি চিন্তা

উম্মত কী করে নাজাত পেতে পারে এটা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক চিন্তা। এই চিন্তার ছাপ সর্বদা তাঁর চেহারায় পরিলক্ষিত হতো। এক হাদীছে আছে,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمُ الْفِكْرَةِ مُتَوَاصِلُ الْأَحْزَانِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকতেন সদা চিন্তাযুক্ত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিষাদগ্রস্ত।'[৮৬] অর্থাৎ তাঁর চেহারায় সর্বাদা বিষন্নতার ছাপ লক্ষ করা যেত। তা তাঁর কিসের দুঃখ ছিল? কী কারণে তিনি এতটা চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন? জানা কথা, তাঁর অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ের কোনও লক্ষ্য ছিল না। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা বা প্রভাব বিস্তারেরও ফিকির ছিল না। বস্তুত তাঁর যত চিন্তা ও পেরেশানি তা উম্মতকে ঘিরেই। যাদের কাছে তাঁকে পাঠানো হয়েছে কীভাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো যায়, এই একই তাড়নায় তিনি অস্থির থাকতেন। কীভাবে তাদের বিপথগামিতা থেকে ফিরিয়ে সরল-সঠিক পথে আনা যায় এটাই ছিল তার সার্বক্ষণিক ভাবনা। এই চিন্তা ও পেরেশানি তাঁকে এত বেশি অস্থির করে রাখত, যে কারণে বারবার তার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে এবং একাধিক আয়াত

---

৮৬. আশ শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ, হাদীছ নং ২২৬

নাযিলের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে আর বারণ করা হয়েছে, যেন এত বেশি পেরেশানি বোধ না করেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ۝

'(হে রাসূল!) তারা ঈমান কেন আনছে না, এই দুঃখে হয়তো তুমি আত্মবিনাশী হয়ে যাবে'।[৮৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

'হে নবী! অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তারা কুরআনের এ বাণীর প্রতি ঈমান না আনলে তুমি আক্ষেপ করে করে তাদের পেছনে নিজের প্রাণনাশ করে বসবে।'[৮৮]

এক হাদীছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার দৃষ্টান্ত হল সেই ব্যক্তির মতো, যে ব্যক্তি আগুন জ্বালাল, যা দেখে পঙ্গপাল ছুটে আসল এবং তাতে পড়তে লাগল। লোকটি পঙ্গপালকে ফেরানোর চেষ্টা করছে, যাতে আগুন পড়ে ভস্মীভূত না হয়। ঠিক তেমনি আমিও তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। আমি তোমাদের কোমর ধরে বাধা দিচ্ছি, যাতে তোমরা তাতে না পড়, কিন্তু তোমরা তা সত্ত্বেও জাহান্নামের আগুনে পতিত হচ্ছ।[৮৯]

এর দ্বারা অনুমান করা যায়, উম্মতের জন্য তাঁর দরদ ও চিন্তা কী পরিমাণ ছিল। তাঁর এ চিন্তা কেবল তার সমকালীন লোকদের জন্যই ছিল না; বরং কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় যত লোক আসার, তাদের সকলের প্রতিই তিনি সমান দরদী ছিলেন, একই চিন্তা ছিল সকলের জন্য।

---

৮৭. শু'আরা : ৩

৮৮. সূরা কাহ্ফ, আয়াত ৬

৮৯. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬০০২; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪২৩৪; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২৭৯৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৭০১৯

ভবিষ্যৎ ফিতনা সম্পর্কে সতর্কীকরণ

সুতরাং ভবিষ্যৎ লোকদেরকে তিনি তাদের সময়ে কী কী ফিতনা দেখা দেবে সে সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং সে সম্পর্কে তাদের করণীয় কাজ সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনা এত বিপুল যে, হাদীছ গ্রন্থসমূহে এজন্য এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ই বরাদ্দ করতে হয়েছে। হাদীছের পাঠকমাত্রই 'আবওয়াবুল ফিতান' নামে সে অধ্যায় সম্পর্কে অবগত। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎ ফিত্না ও সে ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

تَقَعُ الْفِتَنُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ

'ভবিষ্যতে তোমাদের ঘর-বাড়িতে ফিত্না পতিত হবে, ঠিক বৃষ্টি পড়ার মতো।[৯০]

এ হাদীছে ফিতনাকে বৃষ্টির ফোঁটার সাথে তুলনা করা হয়েছে। বোঝানো উদ্দেশ্য যে, বৃষ্টির ফোঁটা যেমন অসংখ্য এবং তা ক্রমাগত পড়তে থাকে, ভবিষ্যৎকালে ফিতনাও এরকম বিপুল ও নিরবচ্ছিন্ন হবে। একটি ফিতনা দেখা দিতে না দিতে তার পেছনে আরেকটি এসে পড়বে এবং তার পেছনেও আরেকটি, যেমন বৃষ্টির ফোঁটা একের পর এক পড়তে থাকে। আর সে ফিতনার সম্মুখীন যে ঘর থেকে বের হলেই হতে হবে তা নয়, ঘরের ভেতরও তা ঢুকে পড়বে। ঘরে বসেও তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

অপর এক হাদীছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

سَتَكُوْنُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

'অচিরেই ফিতনারাজি দেখা দেবে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের খণ্ডসমূহের মতো।'[৯১]

---

৯০. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৩৭২২; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৫১৩৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২০৮০৭

৯১. কানযুল উম্মাল, হাদীছ নং ২১৯৯

অর্থাৎ অন্ধকার রাতে মানুষ যেমন– কিছুই দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না, কোনদিকে যাবে, রাস্তা কোথায়? ঠিক সে রকমই ফিতনার জমানায়ও মানুষ বুঝতে পারবে না, সে কোথায় যাবে, কী করবে? সে ফিতনা তোমাদের গোটা সমাজ ও পরিবেশ পরিমণ্ডল ছেয়ে ফেলবে। বাহ্যত তা থেকে মুক্তির কোনও জায়গা তোমাদের চোখে পড়বে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহর কাছে বল–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

'হে আল্লাহ! আমি প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকল ফিতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।'[৯২] এভাবে তিনি প্রকাশ্য ও গোপন উভয় প্রকার ফিতনা থেকে পানাহ চাইতে বলেছেন। তিনি নিজেও এ দু'আ নিয়মিত পড়তেন।

ফিতনা কাকে বলে?

প্রশ্ন হচ্ছে ফিত্না কী জিনিস? ফিতনা কাকে বলে? ফিতনার যুগে আমাদের জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনা কী?

ফিতনা শব্দটি তো আমরা রোজই হরদম ব্যবহার করে থাকি। আমরা বলি, এ যুগটা বড় ফিতনার যুগ। কুরআন মাজীদেও এ শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন ইরশাদ–

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

'ফিতনা হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর জিনিস।'[৯৩]

এটি আরবী ভাষার একটি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ, সোনা-রুপা আগুনে গলিয়ে খাঁটি-ভেজাল যাচাই করা। আগুনে গলালে ধরা পড়ে– তার কতটুকু খাঁটি এবং কতটুকু ভেজাল। এ কারণেই এ শব্দটিকে পরীক্ষা অর্থেও ব্যবহার করা হয়, যেহেতু পরীক্ষা দ্বারাও খাঁটি-ভেজাল

---

৯২. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৬৪২
৯৩. সূরা বাকারা, আয়াত ১৯১

প্রমাণিত হয়। সুতরাং পরীক্ষা এ শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ। মানুষের উপর যখন কোনও বালা-মসিবত দেখা দেয়, সে যখন কোনও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন এর দ্বারা তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা যাচাই হয়ে যায়। সে কী পন্থা অবলম্বন করে? ধৈর্যধারণ করে, না অবাধ্যতা প্রকাশ করে, বিপদাপদ দ্বারাই এর উত্তম পরীক্ষা হয়। এ কারণেই এরকম পরীক্ষাকেও ফিতনা বলা হয়।

হাদীছ শরীফে ফিতনা শব্দটির ব্যবহার হয়েছে এ অর্থে যে, কখনও এমন কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, যখন হক (সত্য) ও বাতিল (মিথ্যা)-এর মধ্যে বিভ্রম দেখা দেয়। কোনটি হক ও কোনটি বাতিল তা চিনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কোনটি সঠিক ও কোনটি ভ্রান্ত তার পার্থক্য বোঝা যায় না। যখন এরূপ অবস্থা দেখা দেবে, বলা হবে এটা ফিতনার যুগ। এমনিভাবে সমাজে পাপাচার ও নাফরমানী ব্যাপক আকার ধারণ করলে তাকেও ফিতনা বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া অসত্যকে সত্য মনে করা এবং যার পক্ষে দলীল-প্রমাণ নেই, তাকে প্রমাণিত মনে করাও ফিতনা। আজকাল সে রকম অবস্থাই বিরাজ করছে। কাউকে যদি বলেন, ওই কাজটি তো গুনাহ, ওইটি নাজায়েয ও বিদ'আত, জওয়াব দেওয়া হবে- আরে ভাই, এটা তো সকলেই করছে। এটা গুনাহ ও বিদ'আত হলে সারা দুনিয়ার মানুষ করছে কেন? এ কাজ তো সৌদী আরবেও হচ্ছে। সম্প্রতি এটা একটা নতুন দলীল খাড়া হয়ে গেছে। সৌদী আরবে হচ্ছে, ব্যস আর কোনও কথা নেই এটাই শরী'আত। ডাঁট নিয়ে বলে, এটা তো আমি সৌদী আরবেও করতে দেখেছি। যেন সৌদী আরবে কোনও কাজ হলে তা আর ভুল হতে পারে না- তা অবশ্যই সঠিক, অভ্রান্ত। এটাও একটা ফিতনা। যে জিনিস সত্যের কোনও দলীল ছিল না, তাকে দলীলের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। এমনিভাবে বিভিন্ন স্থানে নতুন-নতুন দল সৃষ্টি হয়ে গেছে। খবর নেই কোনটি হক, কোনটি বাতিল। কোন দল সত্য বলছে, কোন দলের কথা ভুল। এভাবে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদ করা কঠিন হয়ে গেছে।

দুই দলের লড়াইও ফিতনা

মুসলিমদের মধ্যে যদি দু'টি দল সৃষ্টি হয় এবং তারা পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়, কিন্তু কোন দল হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর কোন দল বাতিল ও মিথ্যার উপর, তা নিরূপণ করা কঠিন হয়, তবে এটাও একটা ফিতনা। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِذَا الْتَقَا الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ كِلَاهُمَا فِى النَّارِ.

যখন দুই মুসলিম তরবারি নিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হয়ে যায়।[৯৪] এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হত্যাকারী যে জাহান্নামে যাবে এটা তো স্পষ্ট, যেহেতু সে একজন মুসলিমকে হত্যা করেছে, কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী? সে কেন জাহান্নামে যাবে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেও তো তার ভাইকে হত্যা করার জন্যই তরবারি নিয়ে নেমেছিল। তার দান পড়েনি বলে হত্যা করতে পারেনি। দান পড়লে তো তার হাতেই অপরজন নিহত হতো। এ কারণেই সেও জাহান্নামে যাবে। এদের একজনও আল্লাহ তা'আলার জন্য লড়েনি, লড়েছে দুনিয়ার জন্য, অর্থ-সম্পদের জন্য কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। তারা এসব হীন পার্থিব স্বার্থে একে অন্যের রক্তপিপাসু হয়ে গিয়েছিল। তাই উভয়েরই পরিণাম হবে জাহান্নাম।

খুনখারাবীও ফিতনা

অপর এক হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ وَرَائكُمْ اَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرَجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْهَرَجُ قَالَ الْقَتْلُ.

---

৯৪. সুহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৩০; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৫১৩৯; সুনানে নাসাঈ, হাদীছ নং ৪০৪৮; সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৭২৩

'তোমাদের পরে এমন একটা কাল আসবে, যখন 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'হারজ' কী? তিনি বললেন, খুনখারাবী।[৯৫] অর্থাৎ সে কালে খুনখারাবী খুব বেড়ে যাবে। মানুষের প্রাণ মশা-মাছির প্রাণের মতো মূল্যহীন হয়ে যাবে। অপর এক হাদীছে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِى الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُوْلُ فِيمَ قُتِلَ فَقِيْلَ كَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ ؟ قَالَ الْهَرْجُ اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ.

মানুষের সামনে এমন একটা কাল আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না সে কেন হত্যা করল আর নিহত ব্যক্তিও জানবে না তাকে কেন হত্যা করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হল, তা কিভাবে হবে? তিনি বললেন, নির্বিচার হানাহানির কারণে। তখন ঘাতক ও নিহত উভয়েই জাহান্নামী হবে।[৯৬]

সাম্প্রতিককালে চারদিকে যেসব ঘটনা ঘটছে, তার দিকে নজর দিন এবং সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণীটি পড়ুন। মনে হবে, তিনি যেন এ কালটি স্বচক্ষে দেখেই এ কথা বলেছিলেন। আগে তো অনেক সময় কে মেরেছে তা জানা যেত না, কিন্তু কেন মারা হয়েছে তা ঠিক জানা যেত, যেমন তাকে শত্রুতাবশত মারা হয়েছে, তার অর্থ-সম্পদ গ্রাস করার জন্য মারা হয়েছে কিংবা এরকম অন্য কিছু। মোটকথা, খুন কেন করা হল, তা উদঘাটিত হতো। কিন্তু এখন তো অবস্থা এমন যে, একজন লোক একান্ত নিরিহ। কারও আগেও নেই পিছেও নেই, কারও সঙ্গে কোনও লেনদেন নেই, সে কোনও দলও করে না, কারও সঙ্গে ঝগড়া-ফাসাদেও লিপ্ত হয় না। তা সত্ত্বেও নিজ ঘরে লোকটি খুন হয়ে গেল। এ কথাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্ট করে গেছেন।

---

৯৫. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬৫৩৮; মুসলিম, হাদীছ নং ৪৮২৬; সুনানে তিরমিযী, হাদীছ নং ২১২৬

৯৬. সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৫১৭৮

মক্কা মুকাররমা সম্পর্কে একটি হাদীছ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমা সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

إِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ كَظَائِمُ وَسَاوٰى بِنَاؤُهَا رُؤُوْسَ الْجِبَالِ فَاعْلَمْ اَنَّ الْاَمْرَ قَدْ اَظَلَّتْ.

'যখন মক্কার ভূমি খনন করা হবে এবং তাতে খালের মতো রাস্তাঘাট তৈরি করা হবে আর তার ইমারতসমূহ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে যাবে, তখন বুঝবে ফিতনা এসে পড়ল বলে।'[৯৭]

আজ থেকে ক'বছর আগেও এ হাদীছের মর্ম বোঝা কঠিন ছিল, কিন্তু এখন তো বিষয়টা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

চৌদ্দশ' বছর যাবৎ এ হাদীছটি চর্চা করা হচ্ছে, হাদীছের কিতাবে সংকলিত হয়ে আসছে এবং এর ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যাখ্যাতাগণ নানা রকম মত প্রকাশ করে আসছেন। খালের মতো রাস্তাঘাট হওয়ার মানে কী, এটা বোঝা তো সহজ কথা ছিল না। তাই এর ব্যাখ্যা নিয়ে বড় পেরেশানি ছিল। কিন্তু আজকের মক্কা নগরকে দেখুন। মনে হবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নগরটির বর্তমান চেহারা দেখেই এ কথা বলেছিলেন। ভূগর্ভ খনন করে কত যে সুরঙ্গ পথ তৈরি করা হয়েছে তা বিস্ময়ের ব্যাপার। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ বলতেন, এখন তো মক্কা মুকাররমা একটি পর্বতসঙ্কুল অঞ্চল। হতে পারে ভবিষ্যতকালে কখনও আল্লাহ তা'আলা এখানে নদী-নালা সৃষ্টি করে দেবেন। কিন্তু এখন ওই সুড়ঙ্গ পথগুলো দেখে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ পুণ্যভূমির উদর খনন কী জিনিস।

হাদীছটির দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, এর ইমারতসমূহ পাহাড় সমান উঁচু হয়ে যাবে। কয়েক বছর আগেও কারও পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিল

---

৯৭. মুসান্নাফে ইবন আবী শায়বা, হাদীছ নং ৪৬১/৭ (অথবা ১৪৩০৬)

না যে মক্কা মুকাররমার স্থাপনাসমূহ পাহাড়ের মতো উঁচু হতে পারে। কেননা সমস্ত মক্কাই তো পর্বতবেষ্টিত। এখন কেউ সেখানে গিয়ে দেখুক কেমন পাহাড় সমান উঁচু ইমারতের সারি সেখানে বিরাজ করছে।

এ হাদীছ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই চৌদ্দশ' বছর আগে আজকের অবস্থা যেন নিজ চোখে দেখছিলেন এবং দেখে দেখে তা বর্ণনা করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে এসব জিনিস তাঁর সামনে দিবালোকের মতো পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। সেই মতো তিনি এক এক করে বলে দিয়েছেন, ভবিষ্যতে কী কী ঘটবে। আর তখন মুসলিমদেরকে কী কী সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হবে, তাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তখনকার গ্রহণীয় কর্মপন্থা সম্পর্কেও দিকনির্দেশ করে গেছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ সংক্রান্ত হাদীছসমূহ এ উম্মতের জন্য আলোকবর্তিকার মর্যাদা রাখে।

হাদীছের আলোকে বর্তমান যুগ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব হাদীসে ভবিষ্যৎ ফিতনাসমূহ নিশানদিহি করে গিয়েছেন, প্রত্যেক মুসলিমের সেগুলি বারবার পড়া ও স্মরণ রাখা উচিত। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধয়ানবী (মুদ্দা যিল্লুহুল আলী) "আসরে হাজের হাদীছকে আয়েনে মে" নামে একখানি পুস্তিকা লিখেছেন, তাতে তিনি ফিতনা-সংক্রান্ত হাদীছসমূহ একত্রে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। তাতে তিনি এমন একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন, যাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনা কবলিত যুগের বাহাত্তরটি আলামত বর্ণনা করেছেন। সেগুলো শুনুন এবং আশেপাশের পরিবেশ নিরিক্ষণ করুন। আপনি দেখতে পাবেন সাম্প্রতিক বিশ্বে সেসব আলামত কত প্রকটরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত।[৯৮]

---

৯৮. হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধয়ানবী রহ. এখন আর জীবিত নেই। তিনি ১৮ই মে, ২০০০ ঈসায়ী সালে আততায়ীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন, আমীন। -অনুবাদক।

ফিতনার বাহাত্তরটি আলামত

হযরত হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের আগে আগে বাহাত্তরটি জিনিস প্রকাশ পাবে।

১. মানুষ নামায ধ্বংস করবে, অর্থাৎ নামাযের প্রতি মানুষ কোনও গুরুত্ব দেবে না। এ কথাটি এ যুগের উপর আরোপ করলে সেটা বিশেষ তাজ্জবের ব্যাপার হবে না। কেননা আজ তো সিংহভাগ মুসলিমই (আল্লাহর পানাহ) নামায পড়ার কোনও গরজ বোধ করে না। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা এমন এক পরিবেশে বলেছিলেন, যখন নামাযকে ঈমান ও কুফরের মধ্যসীমানা মনে করা হতো। তখন একজন মুমিন যত সাধারণ স্তরেরই হোক না কেন, এমন কি মুনাফিকরা পর্যন্ত নামায ছাড়ত না। সেই কালে তিনি ইরশাদ করেছেন, লোকে নামায ধ্বংস করবে।

২. আমানতের খেয়ানত করবে।

৩. সুদী লেনদেন করবে।

৪. মিথ্যাকে হালাল মনে করবে, অর্থাৎ মিথ্যাচার একটা শিল্পের রূপ ধারণ করবে। মিথ্যা বলতে পারাকে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ মনে করা হবে।

৫. তুচ্ছ-তুচ্ছ বিষয়ে খুন-খারাবী করা হবে। অতি সামান্য কারণে একে অন্যকে হত্যা করে ফেলবে।

৬. উঁচু-উঁচু ইমারত তৈরি করা হবে।

৭. দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া অর্জন করা হবে।

৮. আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হবে।

৯. ন্যায় ও ইনসাফের বিলুপ্তি ঘটবে।

১০. মিথ্যাই সত্য হয়ে যাবে।

১১. রেশমি কাপড় পরিধান করা হবে।

১২. জুলুম ও অবিচার ব্যাপক হয়ে যাবে।

১৩. ব্যাপকভাবে তালাক ও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটবে।

১৪. আকস্মিক মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে। অর্থাৎ ব্যাপকভাবেই মানুষ এমনভাবে মারা যাবে যে, আগে থেকে কেউ কিছু আঁচ করতে পারবে না। হঠাৎ করেই মানুষ জানতে পারবে– অমুকের মৃত্যু হয়ে গেছে। অথচ এর আগেই তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও ঠিকঠাক দেখা গেছে।

১৫. খেয়ানতকারীকে বিশ্বস্ত মনে করা হবে।

১৬. আমানতদার ব্যক্তিকে খেয়ানতকারী মনে করা হবে। অর্থাৎ আমানতদার ব্যক্তিকে অপবাদ দেওয়া হবে যে, সে একজন খেয়ানতকারী।

১৭. মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী মনে করা হবে।

১৮. সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে।

১৯. অপবাদ দেওয়ার প্রবণতা ব্যাপক হয়ে যাবে। অর্থাৎ একে অন্যের প্রতি ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলবে ও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বেড়াবে।

২০. বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও খুব গরম পড়বে।

২১. মানুষ সন্তান-সন্ততি লাভের আগ্রহ হারাবে; বরং সন্তান-সন্ততি অপসন্দ করবে। অর্থাৎ মানুষের স্বভাব তো হল সন্তান চেয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা। কিন্তু তখন মানুষ সন্তান না হওয়ার জন্য দু'আ করবে। সুতরাং দেখুন আজকাল মানুষ কী ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচার ও গ্রহণ করছে এবং স্লোগান দিচ্ছে এক-দু'টি সন্তানই ভালো।

২২. নীচ লোকদের ঠাটবাট বেশি হবে। অর্থাৎ নিম্নস্তরের লোক খুব জাঁকজমকের সাথে জীবন-যাপন করবে।

২৩. শরীফ ও ভদ্র লোক নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। অর্থাৎ ভদ্রলোকেরা তাদের ভদ্রতা ও ইজ্জত রক্ষার্থে নিজ ঘরে বসে যাবে। ফলে মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

২৪. দেশের আমীর ও উজির মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হবে, অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান, তার মন্ত্রিপরষদ ও তার সহযোগী-সাহায্যকারীগণ এমনভাবে মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হবে যে, হরদম তা অবলীলায় বলে যাবে।

২৫. বিশ্বস্ত ব্যক্তি খিয়ানত করতে শুরু করে দেবে।

২৬. সরদার ও নেতৃবৃন্দ অত্যাচারী হবে।

২৭. আলেম ও কারী বদআমল হবে, অর্থাৎ ইলমের অধিকারী হবে, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতও করবে, অথচ সে অনুযায়ী আমল থাকবে না; বরং বদ কাজ করে বেড়াবে।

২৮. মানুষ পশুর চামড়ার তৈরি পোশাক পরবে।

২৯. কিন্তু তাদের অন্তর মরা পশুর চেয়েও বেশি দুর্গন্ধযুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষ পশুর চামড়া দ্বারা তৈরি মূল্যবান পোশাক পড়বে, কিন্তু স্বভাব-প্রকৃতি হবে পশুরও অধম, যা পশুর পঁচা লাশের চেয়েও বেশি দুর্গন্ধ ছড়াবে।

৩০. এবং তা মুসব্বর (তিক্ত ঔষধ বিশেষ) অপেক্ষাও বেশি তিক্ত হবে।

৩১. সোনা ব্যাপক হয়ে যাবে।

৩২. রুপার অভাব দেখা দেবে।

৩৩. পাপাচার বিস্তার লাভ করবে।

৩৪. নিরাপত্তা হ্রাস পাবে।

৩৫. কুরআন মাজীদের কপিসমূহকে অলংকৃত করা হবে।

৩৬. মসজিদসমূহকে কারুকার্য করা হবে।

৩৭. উঁচু-উঁচু মিনার তৈরি করা হবে।

৩৮. কিন্তু অন্তর থাকবে বিরান। অর্থাৎ ঈমান ও আমল দ্বারা তা আবাদ করা হবে না।

৩৯. ব্যাপকভাবে মদপান করা হবে।

৪০. শরী'আতী শাস্তি বর্জন করা হবে।

৪১. বাঁদি তার মনিবকে জন্ম দেবে। অর্থাৎ মেয়ে তার মায়ের উপর কর্তৃত্ব করবে এবং তার সাথে এমন ব্যবহার করবে, যেমন বাঁদির সাথে তার মনিব করে থাকে।

৪২. নগ্ন পা ও নগ্ন শরীর বিশিষ্ট অসভ্য প্রকৃতির লোক রাজা-বাদশা হয়ে যাবে। নীচ ও হীনস্তরের লোক, বংশ ও চরিত্রের দিক থেকে যাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করা হয়, তারা ক্ষমতার মালিক হয়ে দেশ শাসন করবে।

৪৩. নারী ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরুষের অংশীদার হবে। আজকাল তো তাই হচ্ছে। জীবনের সব ক্ষেত্রেই নারীসমাজ পুরুষের পাশাপাশি চলার চেষ্টা করছে।

৪৪. পুরুষ নারীর অনুকরণ করবে।

৪৫. নারী করবে পুরুষের অনুকরণ। অর্থাৎ আচার আচরণ ও বেশ-ভূষায় তারা একে অন্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে। এখন তো চারদিকে তাই চলছে। আধুনিক ফ্যাশন নারী-পুরুষের পোশাক-আশাক এমনভাবে উল্টে দিয়েছে যে, দেখলে ধরা মুশকিল নারী না পুরুষ।

৪৬. গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা হবে। অর্থাৎ শপথ তো কেবল আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণাবলি ও কুরআন মাজীদের নামে করা জায়েয। অন্য কিছুর নামে কসম করা জায়েয নয়। কিন্তু ফিতনার যুগে অন্য জিনিসের নামেও কসম করা হবে, যেমন 'তোমার মাথার দিব্যি করে বলছি'।

৪৭. মুসলিম ব্যক্তি পর্যন্ত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। অর্থাৎ অমুসলিম তো এ কাজ সাধারণত করেই থাকে, কিন্তু তখন মুসলিম ব্যক্তিও এরকম করবে।

৪৮. কেবল পরিচিত লোককেই সালাম দেওয়া হবে, অর্থাৎ রাস্তায় চলাচলকালে যেসব লোকের সাথে পরিচয় নেই তাদেরকে সালাম

দেওয়া হবে না; সালাম দেওয়া হবে কেবল জানাশোনা লোককেই। অথচ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা হল–

وَتُقْرِأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

'যাকে তুমি চেন আর যাকে চেন না, সকলকেই সালাম দেবে।'[৯৯]

বর্তমানকালে রাস্তাঘাটে যখন দু'একজন মানুষ আসা-যাওয়া করে, তখন সকলকেই সালাম দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, যাতায়াতকারীদের সংখ্যা বেশি হলে এবং সবাইকে সালাম দিতে গেলে নিজের কাজে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা থাকলে আলাদা কথা, তখন সালাম না দেওয়ারও অবকাশ আছে। কিন্তু একটা সময় এমনও আসবে, যখন পথচারি দু'একজন হলেও কেউ কাউকে সালাম দেবে না। সালামের প্রচলনই উঠে যাবে।

৪৯. দ্বীনী ইলম শেখানো হবে দ্বীন বহির্ভূত উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে। ডিগ্রি লাভ হবে, চাকরি পাওয়া যাবে, টাকা-পয়সা রোজগার হবে, ইজ্জত-সম্মান ও খ্যাতি লাভ হবে এবং এ জাতীয় আরও যত দুনিয়াবী উদ্দেশ্য আছে তারই জন্য দ্বীনী ইলমের পঠন-পাঠন চলবে।

৫০. আখিরাতের কাজ দ্বারা দুনিয়া কামানো হবে।

৫১. গনীমতের মালকে, সরকারি কোষাগারকে ব্যক্তিগত সম্পদের মতো ব্যবহার করা হবে, ব্যক্তিগত কাজে তা খরচ করা হবে।

৫২. আমানতকে লুটের মাল গণ্য করা হবে। অর্থাৎ কেউ আমানত রাখলে মনে করা হবে লুটের মাল পেয়ে গেলাম। ব্যস, এর জন্য কোনও জবাবদিহিতা নেই, ইচ্ছামতো ভোগ করো।

৫৩. যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে। অর্থাৎ যাকাত আদায়কে জরিমানার মতো উপরি চাপ ও বাড়তি ব্যয় মনে করা হবে। ইবাদত মনে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা আদায় করা হবে না।

---

৯৯. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ১১; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৫৬; সুনানে নাসাঈ, হাদীছ নং ৪৯১৪; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৩২৪৪

৫৪. সর্বাপেক্ষা হীন ব্যক্তি জাতির নেতা হবে। অর্থাৎ জাতির মধ্যে আখলাক-চরিত্রে ও আচার-আচরণে যে ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ ও নীচ তাকেই জাতির নেতা, হিরো ও সর্বাধিনায়ক বানানো হবে।

৫৫. মানুষ নিজ পিতার অবাধ্যতা করবে।

৫৬. সন্তান মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করবে।

৫৭. বন্ধুর ক্ষতিসাধনে কুণ্ঠাবোধ করা হবে না।

৫৮. স্বামী তার স্ত্রীর অনুগত হয়ে চলবে।

৫৯. মসজিদে পাপিষ্ঠদের আওয়াজই সবচেয়ে উঁচু হবে।

৬০. গায়িকাদেরকে সম্মান দেখানো হবে। অর্থাৎ গান-বাজনা করাই যে নারীদের পেশা, সমাজে তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। (বর্তমানকালে তো এটা সুস্পষ্ট)।

৬১. গান-বাজনার উপকরণ ও বাদ্যযন্ত্র খুব যত্নসহকারে রাখা হবে।

৬২. উন্মুক্ত পথে মদ পান করা হবে।

৬৩. জুলুম করতে পারাকে গৌরবজনক মনে করা হবে।

৬৪. ন্যায় ও ইনসাফ বেচাকেনা হবে। অর্থাৎ আদালতে টাকা-পয়সা ছাড়লেই রায় নিজের পক্ষে নেওয়া যাবে।

৬৫. পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

৬৬. কুরআন মাজীদকে সুরচর্চার মাধ্যম বানানো হবে। অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াতকে সংগীতের স্থান দেওয়া হবে, যাতে এর মাধ্যমে গান শোনার মজা ও সুর-মূর্ছনার স্বাদ উপভোগ করা যায়। কুরআনী দাওয়াত প্রচার ও গ্রহণ, কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি এবং কুরআন তিলাওয়াতের ছাওয়াব ও পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে কুরআন পড়া হবে না।

৬৭. হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করা হবে।

৬৮. উম্মতের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের নিন্দা সমালোচনা করবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের উপর কোনও ভক্তি-বিশ্বাস থাকবে না; বরং তাদের কথা ও কাজের ত্রুটি খোঁজা হবে। বলা হবে, তারা এ কথা সঠিক বলেননি। তাদের এই কর্মপন্থা যুক্তিসংগত ছিল না। তাই তো দেখছি, আজ বহু লোক সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের শানে গুস্তাখী করছে, তাদের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করছে, এবং ইমামগণের সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলছে, অথচ তাদের মাধ্যমে দ্বীন আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। সেই মহাত্মাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তারা কুরআন ও হাদীছ বুঝতেন না এবং দ্বীন সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান ও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আজ চৌদ্দশ' বছর পর আমরাই দ্বীন ভালো বুঝছি। (লাহাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি)।

তারপর ইরশাদ হয়েছে, এসব আলামত যখন প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন অপেক্ষা করবে যে–

৬৯. হয়তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর লোহিত ঝঞ্ঝা ছেড়ে দেওয়া হবে।

৭০. অথবা ভূমিকম্প এসে পড়বে।

৭১. অথবা মানুষের আকৃতি বিকৃত করে দেওয়া হবে।

৭২. অথবা আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি পড়বে কিংবা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অন্য কোনও আযাব আসবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের রক্ষা করুন।[১০০]

আপনি এসব আলামতের প্রতি লক্ষ করুন এবং পাশাপাশি আমাদের সমাজের প্রতিও দৃষ্টিপাত করুন। পরিষ্কার দেখতে পাবেন এক-এক করে এর প্রত্যেকটি আলামত সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। আর বলতে দ্বিধা নেই, সাম্প্রতিক বিশ্বে আমাদের উপর যে আযাব চেপে বসেছে, প্রকৃতপক্ষে তা আমাদের বদআমলেরই পরিণতি, আমাদের নিজেদেরই কর্মফল।

---

১০০. আদ-দুররুল মানছুর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫২

বিপদাপদের পাহাড় ভেঙে পড়বে

অপর এক হাদীছে হযরত আলী রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

আমার উম্মতের মধ্যে যখন পনেরোটি কাজ ব্যাপক হয়ে যাবে তখন তাদের উপর বালা-মসিবতের পাহাড় ভেঙে পড়বে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে পনেরোটি কাজ কী কী? তিনি উত্তরে বললেন,

১. যখন সরকারি সম্পদকে লুটের মাল মনে করা হবে। দেখুন বর্তমানকালে কিভাবে সরকারি সম্পত্তি লুট করা হচ্ছে, জাতীয় সম্পদ অবাধে তসরূপ করা হচ্ছে। এটা কি কেবল সরকারি লোকজনই করছে? সরকারি লোকেরা যখন তা আত্মসাৎ করে তখন জনগণও যে যেভাবে পারে তাতে ভাগ বসায়। লক্ষ করলে এমন বহু ক্ষেত্রই পাওয়া যাবে যেখানে আমরা বেপরোয়া আচরণ করি, ফলে আমাদের দ্বারা জাতীয় সম্পদ লুট হয়ে যায়। এই বিদ্যুতের ব্যাপারটাই ধরুন! দেখা যাচ্ছে সুযোগমতো আমরা বেআইনী কানেকশন দিয়ে দিই আর এভাবে চোরাই পথে বিদ্যুত ব্যবহার করি। এটা জাতীয় সম্পদ লুট করা নয় তো কী? কেউ কেউ টেলিফোন একচেঞ্জের লোকদের সাথে খাতির লাগিয়ে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করি, যেমন মুফতে লম্বা লম্বা কল করা বা ন্যায্য বিল কেটে-ছেটে হ্রাস করিয়ে নেওয়া। এটাও জাতীয় সম্পদ চুরির শামিল। অনেকে বিনা টিকেটে রেল ভ্রমণ করে বা সাধারণ টিকেটে প্রথম শ্রেণিতে যাতায়াত করে। এসবই জাতীয় সম্পদ তসরূপ করার এককেটি রূপ।

জাতীয় সম্পদ চুরি করার এ ব্যাপারটা সাধারণ চুরি অপেক্ষা অনেক বেশি খতরনাক। কেননা কেউ যদি কারও ঘরে সিঁদ কেটে চুরি করে, তবে পরবর্তীতে প্রতিকারের পথ খোলা থাকে। অর্থাৎ চোরের যদি অনুশোচনা জাগে এবং সে চোরাইমাল ফিরিয়ে দিতে চায়, তবে সেটা খুবই সহজ। সে যে পরিমাণ টাকার মালামাল চুরি করেছে সেই পরিমাণ টাকা মালিককে দিয়ে দিলেই হল। কিংবা তা সম্ভব

না হলে তার কাছে গিয়ে বলতে পারে, ভাই, আমি বড় অপরাধ করে ফেলেছি, তওবা করছি এমন আর করব না, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। এখন সেই ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলে, ইনশাআল্লাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। কিন্তু জাতীয় সম্পদে তো কোটি-কোটি লোকের হক রয়েছে, জনগণের প্রত্যেকেরই তাতে মালিকানা আছে। এ সম্পদ চুরি বা তসরূপ করলে কার-কার কাছে গিয়ে দাবি ছাড়াবে? যতক্ষণ পর্যন্ত কোটি-কোটি মানুষের প্রত্যেকে ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ তো তা ক্ষমা হবে না। সুতরাং বিষয়টা স্পষ্ট যে, সাধারণ চুরি অপেক্ষা এ চুরি বেশি বিপজ্জনক। সাধারণটার দাবি ছাড়ানো সহজ, কিন্তু জাতীয় সম্পদ চুরি করলে তার দায়মুক্তি সহজ নয়, ঢের-ঢের কঠিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর থেকে হেফাজত করুন।

২. যখন আমানতকে লুটের মাল মনে করা হবে এবং তাতে খেয়ানত হতে থাকবে।

৩. যখন মানুষ যাকাতকে অর্থদণ্ড ও জরিমানা মনে করবে। অর্থাৎ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে পুণ্যার্জনের অনুপ্রেরণায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা আদায় করতে চাবে না।

৪. লোকে স্ত্রীর কথায় চলবে এবং মায়ের অবাধ্যতা করবে। অর্থাৎ স্ত্রীকে খুশী করার জন্য মায়ের কথা অগ্রাহ্য করবে। মনে করুন, স্ত্রী এমন একটা গলত কাজ করতে বলছে, যা করলে মায়ের অবাধ্যতা হয়, মায়ের ইচ্ছা ছেলে যেন সেটা না করে; এমন ক্ষেত্রে তার তো উচিত সে কাজ থেকে বিরত থাকা, কিন্তু সে মায়ের মর্যাদা অবজ্ঞা করে স্ত্রীকেই খুশী রাখতে সচেষ্ট থাকে। সুতরাং কাজটি সে করেই ফেলে।

৫. যখন মানুষ বন্ধুর সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং পিতার সাথে করবে দুর্ব্যবহার। অর্থাৎ বন্ধুর সাথে আচরণ তো বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করবে, কিন্তু পিতার ক্ষেত্রে পিতৃত্বের মর্যাদাকে মূল্য দেবে না। ফলে তার সাথে যাচ্ছে তাই আচরণ করবে।

৬. মসজিদসমূহে উঁচু আওয়াজে কথা বলা হবে। মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও যিকির করা। কাজেই মসজিদের পরিবেশ এমন থাকা চাই, যাতে যিকির ও ইবাদতকারীগণ নির্বিঘ্নে তাতে মশগুল থাকতে পারে, কারও দ্বারা তাতে কোনওরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এক জমানায় লোকে মসজিদের ভেতর এত জোরে কথা বলবে, যদ্দরুন যিকির ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। এখন তো দেখা যাচ্ছে সেটাই শুরু হয়ে গেছে। মসজিদের ভেতর যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ! এটা একটা ভালো রেওয়াজ, কিন্তু বিবাহানুষ্ঠানকালে মসজিদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ করা হয় না, তখন হইচই করা হয় ও বড়-বড় আওয়াজে কথা বলা হয়, যা একটি অহেতুক গুনাহ। কিছু গুনাহ তো এমন যা করার ভেতর কিছুটা আনন্দ ও মজা অনুভূত হয়, কিন্তু এটা একটা বিস্বাদ গুনাহ। আওয়াজ বড় করার ভেতর কিছু মজা আছে কি? খামাখাই বড় আওয়াজে কথা বলে মাথায় গুনাহের বোঝা চাপানো হয়।

৭. যখন জাতির নেতা হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

৮. মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার ভয়ে সম্মান করা হবে। কেননা ভয় থাকবে, তাকে সম্মান করা না হলে সে কোনও না কোনওভাবে বিপদে ফেলার চেষ্ট করবে।

৯. মদপান ব্যাপক হযে যাবে।

১০. ব্যাপকভাবে রেশমী কাপড় পরিধান করা হবে।

১১. ঘরে ঘরে গায়িকা রাখা হবে।

১২. যত্নসহকারে বাদ্যযন্ত্র রাখা হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ কথা বলেছেন, ঘরে-ঘরে গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র রাখা হবে, তখন এটা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। কেননা প্রত্যেকের পক্ষে গায়িকা পোষণ করা তো সহজ কথা নয়। এজন্য তো প্রচুর টাকা-পয়সা দরকার। যার অজস্র

টাকা-পয়সা আছে তার পক্ষেই ঘরে একজন গায়িকা রাখা এবং যখনই ইচ্ছা হয় তার কণ্ঠে গান শোনা সম্ভব। সকলের দ্বারা তো এটা সম্ভব নয়। কিন্তু রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, ভি. সি. আর. ইত্যাদি এ বিষয়টা সহজ করে দিয়েছে। এখন প্রত্যেকের ঘরেই এসব আছে। যখন ইচ্ছা ছেড়ে দিয়ে গায়িকা দেখতে পায় ও তার গান শুনে মজা নেয়।

এমনিভাবে বাদ্যযন্ত্রও আলাদাভাবে প্রত্যেকের ঘরে রাখার দরকার হয় না। এগুলোও এখন টি. ভি., ভি. সি. আরের সুবাদে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। এখন এগুলো কেনার দরকার পড়ে না। বাদ্যযন্ত্রের সুর ও তার শুনতে চাও তো টি. ভি. ভি. সি. আর ছেড়ে দাও। সব রকম বাদ্যযন্ত্রেরই সুর-তাল এর মাধ্যমে উপভোগ করতে পারবে।

১৩. এবং যখন এ উম্মতের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের নিন্দা সমালোচনা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন আমার উম্মতের মধ্যে এসব জিনিস দেখা দেবে, তখন তাদের উপর মসিবতের পাহাড় ভেঙে পড়বে। আল্লাহর পানাহ, এ হাদীছেও যেসব বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, সবই আমাদের বর্তমান সমাজে পাওয়া যাচ্ছে।

শবরতের নামের শরাব পান করা হবে

অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন আমার উম্মত শরাবকে শরবত বলে হালাল বানাবে, সুদকে ব্যবসা বলে হালাল বানাবে, ঘুষকে হাদিয়া বলে হালাল করবে এবং যাকাতের মালকে ব্যবসার মালে পরিণত করবে, তখন তাদের ধ্বংসের সময় কাছে এসে যাবে।[১০১]

'শরাবকে শরবত বলে হালাল বানাবে', অর্থাৎ যুক্তি দেবে, মদ তো এক প্রকার শরবত, এটা হারাম হবে কেন? সুতরাং বর্তমানে এক শ্রেণির

---

১০১. কানযুল উম্মাল, হাদীছ নং ৩৮৪৯৭

লোক মদের স্বপক্ষে বই-পুস্তক লিখছে। তাদের দাবি, আধুনিক মদ হারাম নয়। তাদের আরও কথা হল, কুরআন মাজীদে মদের জন্য কোথাও হারাম শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই মদ হারাম নয়। আর বিয়ার তো জবের নির্যাস। অন্যান্য শরবত ও জুসের মতো এটাও এক রকম জুস। কাজেই এটা হারাম হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এভাবে আজকাল মদের হালাল হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। এ কথাই চৌদ্দশ' বছর আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন।

সুদকে ব্যবসা নাম দেওয়া হবে

'যখন সুদকে ব্যবসা নাম দিয়ে হালাল করবে', অর্থাৎ তারা যুক্তি দেবে এটা এক রকম ব্যবসা। কাজেই হারাম হওয়ার কোনও কারণ নেই। আজকাল তো এক শ্রেণির লোক এরকমই বলছে। তাদের দাবি ব্যাংকসমূহে যে সুদী লেনদেন হয়, তা ব্যবসায়েরই একটি ধরন। এটা বন্ধ করলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ঘুসকে হাদিয়া নামে অভিহিত করা হবে

'ঘুসকে হাদিয়া নাম দিয়ে হালাল করবে', অর্থাৎ ঘুসদাতা ঘুস দিয়ে বলবে, আপনাকে হাদিয়া বা গিফ্‌ট দিলাম। আর ঘুসগ্রহীতাও সেটাকে গিফ্‌ট মনে করে গ্রহণ করে নেবে। অথচ তা মোটেই হাদিয়া নয়; বরং ঘুসই। আজকাল তো এরকমই হচ্ছে।

এমনিভাবে হাদীছে যে বলা হয়েছে, 'যাকাতের মালকে ব্যবসার মালে পরিণত করা হবে' এটাও বর্তমানে নানা পন্থায় চলছে। মোটকথা এ হাদীছে বর্ণিত চারওটি বিষয় আমাদের সমাজে পাওয়া যাচ্ছে।

কুশনে বসে মসজিদে আসা

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শেষ জমানায় (ফিতনার যুগে) লোকে মায়াসিরে চড়ে আসবে এবং মসজিদের দরজায় নামবে। মায়াসির (مَيَاسِرُ) একটি আরবী শব্দ। অর্থ– বহুমূল্য রেশমী কাপড়, সে কালে বিত্তবান বিলাসী লোকে ঘোড়ার

জিনে বিছাত এবং কুশন হিসেবে ব্যবহার করত। যেন হাদীছে বলা হয়েছে, লোকে কুশনে চড়ে আসবে এবং মসজিদের দরজায় নামবে। সে কালে তো বিষয়টা বোঝা কঠিন ছিল। কিভাবে লোকে কুশনে চড়ে মসজিদের দরজায় এসে নামবে এটা কল্পনা করাও যেত না। কিন্তু এখন তো সকলেই এটা বাস্তবে দেখছে। গাড়ি আবিষ্কার হওয়ার পর লোকে এখন তার মূল্যবান গদিতে বসে মসজিদে আসছে এবং দরজায় নামছে।

নারীরা পোশাক পরেও নগ্ন থাকবে

এ হাদীছে পরে বলা হয়েছে, তাদের নারীরা পোশাক পরা সত্ত্বেও নগ্ন থাকবে। সেকালে এ বিষয়টা বোঝা কঠিন ছিল যে, পোশাক পরা সত্ত্বেও উলঙ্গ থাকে কী করে? কিন্তু এখন তো বিষয়টা চোখেই দেখা যাচ্ছে। সকলেই দেখছে, পোশাক পরে থাকা সত্ত্বেও নারী কেমন বিবস্ত্র। তারা এমন পাতলা-ফিনফিনে কাপড় পরছে, যা শরীরকে মোটেই আড়াল করছে না। পোশাকের উপর দিয়েই শরীর দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে তা এতই সংক্ষিপ্ত ও ছোট যে, পোশাক থাকা সত্ত্বেও শরীর পুরোপুরি ঢাকছে না। আবার তা অত্যধিক আঁটোসাঁটোও বটে, যদ্দরুন গোটা দেহই প্রকাশমান।

নারীদের চুল উটের কুঁজের মতো

তারপর বলা হয়েছে, 'নারীদের মাথায় উটের কুঁজের মতো চুল থাকবে'। পূর্বের আলেমগণ এর ব্যাখ্যায়ও হয়রান ছিলেন। কেননা চুল উটের কুঁজের মতো হয় কী করে এটা বোঝা মুশকিল ছিল। কুঁজ থাকে উঁচু। স্বাভাবিকভাবে চুল এরকম হওয়া কঠিন। কিন্তু অকল্পনীয় জিনিসকেই আধুনিক ফ্যাশন বাস্তবে পরিণত করে দিয়েছে। সকলেই দেখতে পাচ্ছে নারীর কেশ বিন্যাস কী বিচিত্র ঢঙে চলছে এবং তার মধ্যে উঁচু করে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে রাখার ব্যাপারটা তো আছেই। এ হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আধুনিক নারীদের যে উপমা দিয়েছেন, তার চেয়ে বাস্তবসম্মত উপমা আর হতে পারে না।

এরকম নারী অভিশপ্ত

তারপর বলা হয়েছে, 'এরকম নারীদের উপর লা'নত করো, কেননা তারা মাল'উন (অভিশপ্ত) বটে।'

আল্লাহ তা'আলা নারীকে বানিয়েছেনই এক নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে থাকার জন্য। নারী যখন সে বৃত্তের বাইরে চলে আসে– হাদীছ শরীফে আছে– তখন শয়তান তাকে নিশানা বানিয়ে এগোতে থাকে।[১০২]

তারপর আছে, নারী যখন সুগন্ধি মেখে বাজারে (মার্কেটে) যায়, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার উপর লা'নত বর্ষিত হয় এবং ফিরিশতাগণও এরূপ নারীকে অভিশাপ দেয়।

পোশাকের মূল উদ্দেশ্য

পোশাকের আসল উদ্দেশ্যই হল দেহ আবৃত করা ও সতর ঢাকা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ

'হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে দিয়েছি পোশাক, যা তোমাদের সতর ঢেকে দেয় এবং তা তোমাদের শোভাস্বরূপ।'[১০৩]

সুতরাং যে পোশাক দ্বারা সতর ঢাকা যায় না, তা পোশাক হওয়ারই উপযুক্ত নয়, যেহেতু পোশাকের মূল উদ্দেশ্যই তা দ্বারা অর্জিত হল না। এমন পোশাক যে পরে– উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়ার কারণে, সে তো উলঙ্গই বটে। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের পোশাক-আশাক ঠিক করে নিন। আজকাল বেশ দ্বীনদার, নামাযী, পরহেযগার লোক পর্যন্ত এ ব্যাপারে অবহেলা করছে। পোশাকের ক্ষেত্রে যে বেপরোয়াভাব নিজ ঘরে চলছে, সে দিকে নজর দিচ্ছে না। পর্দা হচ্ছে কি হচ্ছে না তা খেয়ালই করে না। এরই পরিণাম আজ আমাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে। সুতরাং নিজ পরিবার ও খানদানে যাতে শরী'আতসম্মত পোশাক ব্যবহার করা

---

১০২. সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ১০৯৩

১০৩. সূরা আ'রাফ, আয়াত ২৬

হয় এবং পর্দা-পুশিদা রক্ষা করা হয়, সে দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে লা'নতের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা থেকে বাঁচা যাবে।

অমুসলিম জাতি মুসলিমদের গ্রাস করবে

এক হাদীছে হযরত ছাওবান রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমাদের উপর এমন একটা সময় আসবে, যখন অন্যান্য জাতি তোমাদেরকে গ্রাস করার জন্য একে অন্যকে এমনভাবে ডাকবে, যেমন দস্তরখানে বসে খাদ্যগ্রহণের জন্য একে অন্যকে ডেকে থাকে।'[১০৪]

এ হাদীছে অমুসলিম জাতিসমূহ মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর জন্য যে একাট্টা হবে এবং তাদের দেশ ও সম্পদ গ্রাস করার জন্য বিপুল উৎসাহে একে অপরকে ডাকাডাকি করবে, তার কী বাস্তবসম্মত উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দস্তরখান বিছানো আছে, তাতে নানা রকম খাদ্য পরিবেশিত রয়েছে, সেখানে একজন লোক এসে বসে গেছে। এরই মধ্যে আরেকজন এসে হাজির। তাকে দেখে প্রথমজন ডাকছে, এসো ভাই খানায় শরীক হয়ে যাও, ঠিক এরকমই অবস্থা একদিন মুসলিমদের উপর দিয়ে যাবে। অন্যান্য জাতির দৃষ্টিতে তাদের অবস্থা হবে বিছানো দস্তরখানের মতো, যার উপর নানা রকম খাদ্য পরিবেশিত হচ্ছে। বড়-বড় শক্তি তাদের উপর হামলে পড়বে, সাথে অন্যদেরও ডাকবে– এসো মুসলিমদের গ্রাস করো।

যারা পেছনের একশ' বছরের ইতিহাস জানে, তাদের কাছে এ উদাহরণের ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার পড়ে না। তারা চাক্ষুস দেখেছে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত অমুসলিম জাতিসমূহ মুসলিম জাতির সাথে কী আচরণ করেছে, কিভাবে মুসলিম জাহানকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করেছে। ঠিক লুটের মালের মতো, নাও মিসর তোমার, শাম আমার, তুমি আল-জাযায়ের নাও, মরক্কো আমার থাকুক

---

১০৪. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৭৪৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২১৩৬৩

আর হিন্দুস্তান তোমাদের, আর বারমা আমাদের ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন একে অন্যকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, এসো এদের ভোগ করো।

মুসলিমদের ওজন হবে খড়কুটোর মতো

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সামনে ভবিষ্যৎ মুসলিমদের এ অবস্থা তুলে ধরলে কোনও এক সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন অন্যান্য জাতি আমাদেরকে গ্রাস করতে শুরু করবে, অন্যদেরকেও আমাদের গ্রাস করার জন্য ডাকবে, তখন কি আমাদের লোকসংখ্যা খুব কমে যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তখন তোমাদের লোকসংখ্যা অনেক বেশি থাকবে, কিন্তু তখন তোমরা হয়ে যাবে ঢল বাহিত খড়কুটোর মতো। অর্থাৎ ঢলের তোড়ে যেমন খড়কুটো ভেসে যায়, সংখ্যায় যত বেশিই হোক না কেন, সেই স্রোতের সামনে নিজেদের ধরে রাখার মতো কোনও শক্তি খড়কুটোর থাকে না, নিজের কোনও ইচ্ছা প্রকাশ, কোনও সিদ্ধান্ত দান কিংবা অন্য কোনও কিছুই তার করার থাকে না। স্রোত যেথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেথায় চলে যেতে হয়। বলাবাহুল্য আজ তো সেই অবস্থাই বিরাজ করছে। মুসলিম জাতি দুনিয়ার কোণে কোণে ছড়িয়ে রয়েছে, বিপুল তাদের সংখ্যা। বিশ্বের একতৃতীয়াংশ এলাকা জুড়ে তাদের বসবাস। কিন্তু তাদের ওজন কতটুকু। অমুসলিমদের প্রবল প্রতিপত্তির সামনে তারা কতটুকু দাঁড়াতে পারছে? দাঁড়াতে তো পারছেই না; বরং হাদীছে যেমন বলা হয়েছে, খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে।

মুসলিমগণ ভীরু হয়ে যাবে

তারপর ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব লোপ করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে ভীরুতা ও কমজোরী দেখা দেবে। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভীরুতা ও কমজোরী কী জিনিস? যেন সাহাবায়ে কেরামের বুঝে আসছিল না– মুসলিম আবার ভীরুও, মুসলিম আবার কমজোরও! এটা কী করে হয়? উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, ভীরুতার ব্যাপারটা হল– তাদের অন্তরে দুনিয়ার আসক্তি সৃষ্টি হবে এবং তারা মৃত্যু পসন্দ করবে না।' মৃত্যু তো মূলত আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা। কাজেই মৃত্যুকে অপসন্দ করা মানে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতকে অপসন্দ করা। এর কারণ, তখন ধান্দা থাকবে কেবল দুনিয়া অর্জনের। কিভাবে আরও বেশি টাকা কামানো যাবে, কিভাবে আরও খ্যাতি অর্জন করা যাবে এবং কী করলে আরও সম্মান ও আরও ক্ষমতা লাভ হবে কেবল তারই ফিকির থাকবে– তা হালাল পথেই হোক আর হারাম পথেই হোক।

সাহাবায়ে কেরামের বীরত্ব

সাহাবায়ে কেরাম তো আমাদের মতো ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সত্যিকারের বীর। হাদীছ, সীরাত ও ইসলামী ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থরাজিতে তাদের যে বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে, তা যে-কোনও পাঠককে শিহরিত করে, রক্তে তোলে কলরোল।

এক যুদ্ধের কথা, এক সাহাবী কিভাবে যেন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে তিন চারজন সশস্ত্র শত্রু তার কাছে পৌছে গেল। তিনি একা, নিঃসঙ্গ, তাই বলে পিছপা হলেন না। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে চললেন, ইত্যবসরে আরও কয়েকজন সাহাবী সেখানে এসে পৌছলেন, তাঁরা তাকে এই বলে বারণ করলেন যে, একটু অপেক্ষা করো। আমাদের সৈন্যগণ পৌছে যাবে। এরা সব পালোয়ান কিসিমের লোক। একাকী তাদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু সেই সাহাবী বললেন, কসম করে বলছি, তোমরা আমরা ও জান্নাতের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্টা করো না। এই পালোয়ানের দল তো আমার জান্নাতে পৌছার রাস্তা। তোমরা আমাকে তাদের সঙ্গে লড়তে দাও। আমার জান্নাতে পৌছার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করো না।

এরকমই ছিল সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা, যে কারণে কাপুরুষতা কী জিনিস তা তারা বুঝতে পারছিলেন না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাদের

অন্তর থেকে দুনিয়ার আসক্তি মুছে দিয়েছিলেন। সর্বদা তারা জান্নাত যেন দেখতে পাচ্ছিলেন। জান্নাত ও জাহান্নামের পরিস্থিতি যেন তাদের চোখের সামনে ছিল। এ কারণে তাদের মৃত্যুভয় ছিল না; বরং কিভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে পৌছা যায়, সর্বক্ষণ তাঁরা তারই সুযোগ সন্ধান করতেন।

এক সাহাবীর শহীদ হওয়ার উদ্দীপনা

এক সাহাবীর ঘটনা। রণক্ষেত্রে পৌছে যখন দেখলেন শত্রুসৈন্য যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছে, অমনি তার শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বলে উঠলেন–

غَدًا نَلْقِى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ.

'ওহে! কী মজা! কাল আমরা মিলিত হচ্ছি প্রিয় বন্ধুদের সাথে-মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে। (ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এ কথাটি কয়েকবার কয়েক সাহাবীর মুখে উচ্চারিত হয়েছে। এক তো উল্লিখিত ঘটনা। আরেকবার উচ্চারণ করেছিল ইয়ামানের প্রতিনিধি দল, যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিল)।[১০৫]

এমনিভাবে হযরত বিলাল হাবশী রাযি.-ও ওফাতের একদিন আগে এ কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন।[১০৬]

একবার এক সাহাবী রণক্ষেত্রে তীরবিদ্ধ হলে তার বুক থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটল। অমনি তিনি বলে উঠলেন, فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ কা'বার রবের কসম, আমি কৃতকার্য হয়ে গেলাম। (এ কথাটি বলেছিলেন হযরত আমের ইবন ফুহায়রা রাযি., বি'রে মা'উনার যুদ্ধে যখন শাহাদত লাভ করেছিলেন।[১০৭]

---

১০৫. যাদুল মা'আদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২

১০৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫৯; উসদুল গাবা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৯

১০৭. হায়াতুস সাহাবা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৫০

তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত ঈমান ও ইয়াকীনের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলার উপর ছিল তাদের পূর্ণ আস্থা, পরম নির্ভরতা। দুনিয়ার আসক্তি কখনও তাদেরকে ছুঁতে পারেনি।

ফিত্‌নার যুগের জন্য প্রথম হুকুম

এহেন অবস্থায় একজন মুসলিম কী কর্মপন্থা অবলম্বন করবে, সে ব্যাপারেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তাঁর প্রথম নির্দেশ হল–

تَلْزِمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ.

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও তাদের ইমাম (নেতা)-এর সঙ্গে থাকো, যারা বিদ্রোহ করে, তাদের পরিত্যাগ করো, তাদের থেকে পৃথক থাকো। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুসলিমদের যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনও দল না থাকে এবং না থাকে কোনও ইমাম, তখন কী করতে হবে? অর্থাৎ আপনি যে হুকুম দিয়েছেন তা তো সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন মুসলিমগণ সংঘবদ্ধ থাকবে এবং তাদের এমন কোনও ইমাম ও নেতা থাকবে, যার নেতৃত্বের উপর সকলের ঐকমত্য থাকবে এবং দ্বীনদারী ও তাকওয়া-পরহেযগারীর কারণে তার প্রতি সকলে আস্থাশীল থাকবে। কিন্তু তাদের যদি কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল না থাকে এবং সকলের আস্থাভাজন কোনও নেতাও না থাকে, তখন কী করতে হবে?

এর উত্তরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এরূপ ক্ষেত্রে বিভক্ত সকল দল থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং নিভৃতচারী হয়ে নিজ গৃহের চট হয়ে যাবে। সেকালে চটই হতো মানুষের ঘরের বিছানা। বর্তমানকালে তার স্থান দখল করেছে কার্পেট। বোঝানো উদ্দেশ্য, কার্পেট বেশি নাড়াচাড়া করা হয় না। একবার বিছানোর পর সে অবস্থায়ই পড়ে থাকে, তেমনি তোমরা নিজ ঘরে কার্পেটের মতো পড়ে থাকবে। বিনা প্রয়োজনে নড়াচড়া করবে না, ঘর থেকে বের হবে না।

কোনও দলের সাথে ভিড়বে না; কোনও পক্ষ অবলম্বন করবে না; বরং একাকী থাকবে, নিজ গৃহে পড়ে থাকবে।[১০৮]

কী সুস্পষ্ট নির্দেশনা! এর চেয়ে পরিষ্কার কথা আর কী হতে পারে?

ফিত্‌নার যুগের জন্য দ্বিতীয় হুকুম

এক হাদীছে ইরশাদ, তোমরা যখন মানুষের থেকে আলাদা হয়ে নিভৃত জীবন-যাপন করবে, তখন যদি মুসলিমদের মধ্যে আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়, তখন তামাশা দেখার জন্যও তাদের দিকে ফিরে তাকাবে না। কেননা যে ব্যক্তি তামাশা দেখার জন্য সেই ফিতনার দিকে উঁকিঝুঁকি মারবে, ফিতনা তাকেও নিজের দিকে আকর্ষণ করবে এবং তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। কাজেই এরকম পরিস্থিতিতে তামাশা দেখার জন্যও ঘর থেকে বের হবে না। চুপটি মেরে ঘরে বসে থাকবে।

তৃতীয় হুকুম

অপর এক হাদীছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَشِيِّ وَالْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ.

'সেই ফিতনা তো এরকম হবে যে, তখন চলন্ত ব্যক্তি অপেক্ষা দণ্ডায়মান ব্যক্তি উত্তম হবে এবং দণ্ডায়মান অপেক্ষা উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হবে।'[১০৯]

অর্থাৎ তোমরা সেই ফিত্‌নায় কোনওভাবেই অংশগ্রহণ করবে না। সেই ফিতনার দিকে হাঁটাও বিপজ্জনক হবে। তার থেকে বরং দাঁড়িয়ে থাকা ভালো হবে। এমনকি দাঁড়িয়ে থাকাও বিপজ্জনক হবে, এমনকি দাঁড়ানোর ভেতরও ঝুঁকি থাকবে। তার চেয়ে বসে থাকা ভালো হবে।

---

১০৮. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৩৩৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৩৪৩৪

১০৯. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৩৩৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৫১৩৬; সুনানুত তিরমিযী, হাদীছ নং ২১২০

সবচেয়ে ভালো হবে শুয়ে পড়া। যেন বলা হচ্ছে, সবদিক থেকে চোখ বন্ধ করে নিজ ঘরে বসে যাবে এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন শোধরানোর কাজে আত্মনিয়োগ করবে। বাইরে গিয়ে সামষ্টিক ও সামাজিক ফিত্‌নায় ইন্ধন জোগাবে না, ফিতনার অনুকূলে কোনওরূপ ভূমিকা রাখবে না।

ফিত্‌নার যুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

অপর এক হাদীছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন এক জমানা আসবে, যখন মানুষের সর্বাপেক্ষা উত্তম সম্পদ হবে ছাগলের পাল। সে তা নিয়ে পাহাড় চূড়ায় চলে যাবে এবং নগর-জীবন ত্যাগ করবে।[১১০]

অর্থাৎ আয় রোজগারের অন্যসব পন্থা ছেড়ে দিয়ে ছাগল পালনকেই বেছে নেবে। তার দুধ খেয়ে পাহাড়ের নিভৃত পরিবেশে জীবন কাটিয়ে দেবে। এটাই হবে তার জন্য নিরাপদ। নগরে গেলে প্রকাশ্য ও গুপ্ত ফিত্‌না তাকে গ্রাস করে নেবে।

ফিত্‌নার যুগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

এসব হাদীছের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে চাচ্ছেন, সে যুগটা সামষ্টিক ও সামাজিক কাজের উপযোগী থাকবে না। কেননা এমন কোনও জামাত ও দল পাওয়া যাবে না, যার উপর কিছু আস্থা রাখা যায়। কে হক ও সত্যের উপর আছে আর কে বাতিল ও মিথ্যার উপর তা নির্ণয় করাই কঠিন হয়ে যাবে। এহেন অবস্থায় নিজেকে ফিত্‌না থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত-বন্দেগীতে লেগে থাকা এবং কোনওক্রমে ঈমান নিয়ে কবরে পৌছতে পারাই বড় কথা। আর এর জন্য পথ একটাই। সেটাই আমি শুরুতে যে আয়াত পড়েছি তাতে বলা হয়েছে। (পরবর্তীতে যা কিছু বলা হয়েছে, তা সে আয়াতেরই

---

১১০. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬৫৫৯; সুনান নাসাঈ, হাদীছ নং ৪৯৫০; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৭২২; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৩৯৭০

ব্যাখ্যাস্বরূপ।) আয়াতে বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের নিয়ে চিন্তা করো। আত্মসংশোধনের ফিকির করো। তোমরা হিদায়াতের উপর এসে গেলে, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তারা তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আয়াত তো বলছে, মানুষ কেবল নিজেরই চিন্তা করুক, অন্যকে নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। অন্য কেউ ভ্রান্ত পথে চললে তাকে চলতে দাও, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তাকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অন্যায় কাজ থেকে ফেরানোর বা তাকে তাবলীগ করার কোনও প্রয়োজন তোমার নেই, অথচ অন্যান্য আয়াতে আম্‌র বিল-মা'রূফ ও নাহী আনিল-মুনকারের হুকুম দেওয়া হয়েছে। তা দ্বারা তো বোঝা যায়, অন্যকে তাবলীগ করতে হবে, অন্যে ভুল পথে চললে তাকে তা থেকে ফেরানোর চেষ্টা করতে হবে। বিষয়টা তো সাংঘর্ষিক হয়ে গেল। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় কী?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে উত্তর দিলেন, তার সারমর্ম হল, উভয় রকম আয়াতই আপন-আপন স্থানে ঠিক আছে। অর্থাৎ আম্‌র বিল-মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল-মুন্‌কার তথা দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করতে হবে এটা ঠিকই, তবে একটা সময় এমন আসবে যখন কেবল নিজেকে সঠিক পথে রাখার ফিকিরে লিপ্ত থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সে জমানা কোনটা তা বোঝার জন্য চারটি আলামত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(এক) সে আমলে মানুষ অর্থ-সম্পদের আসক্তিতে নিমজ্জিত থাকবে। তখন মানুষ থাকবে কার্পণ্যপরবশ। সর্বক্ষণ একই ধান্দা থাকবে– কিভাবে আরও সম্পদ সঞ্চয় করা যায়। কিভাবে বিত্তের পাহাড় গড়ে তোলা যায়। কিভাবে দুনিয়াদারি ষোলোকলায় পূর্ণ হয়ে যায়। দিবারাত্র এই একই চিন্তা, এই একই উদ্দেশ্যে দৌড়ঝাঁপ।

(দুই) মানুষ সর্বক্ষণ নিজ খেয়াল-খুশী ও ইন্দ্রিয় চাহিদার আনুগত্য করবে। খেয়াল-খুশী যেদিকে টানবে, সেদিকেই ছুটবে। চিন্তা করবে না,

তা হালাল না হারাম। ভেবে দেখবে না, তা জান্নাতের পথ না জাহান্নামের, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের পথ না তাঁর গজব কুড়ানোর, মন যেদিকে চালাবে নির্বিচারে অন্ধের মতো সেদিকেই চালিত হবে।

(তিন) দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। আখিরাতের ফিকির বলতে থাকবে না; বরং দুনিয়ার জন্য এমন মত্ত-মাতোয়ারা থাকবে যে, একদিন মরতে হবে, কবরে যেতে হবে, আখিরাত আছে, হাশরের ময়দানে উঠতে হবে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে– এসব যতই বোঝানো হোক, তাতে মন গলবে না। বাহানা দেখাবে, কী করা যাবে জমানা তো এরকমই, আমাকে তো সকলের সাথে মিলে থাকতে হবে। সকলকে বাদ দিয়ে তো চলা যাবে না। সুতরাং তাল মিলিয়েই চলতে হবে। এভাবে সব নসীহত ও উপদেশ হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে। কোনও কথাই আমলে নেবে না।

(চার) প্রত্যেকে আপন মতকে বড় মনে করবে। অন্যের কথা পাত্তা দিতে চাবে না। প্রত্যেকে নিজে একটা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে নেবে এবং সেই আলোকে সবকিছু বিচার করবে আর সেটাকে এমন অকাট্য সত্য জ্ঞান করবে যে, তার বিপরীত সবকিছুকে ভুল ও ভ্রান্ত ঠাওরাবে।

আজকাল তো সর্বত্র এই দৃশ্যই চোখে পড়ছে। প্রত্যেকে এমনকি দ্বীনের ব্যাপারেও নিজ মতামতকেই মাপকাঠি বানাচ্ছে। নিজে যেটাকে হালাল মনে করে, ব্যস সেটাই হালাল আর নিজে যেটাকে হারাম মনে করে সেটাই হারাম। জায়েয নাজায়েযের ব্যাপারে নিজের কথাই চূড়ান্ত। অথচ সারা জীবনে কখনও কুরআন ও হাদীছ বোঝার জন্য একটা দিনও ব্যয় করেনি। না আরবী জানে, না কুরআনের তরজমা বোঝে। এর পরে যে ইলমের বিশাল সমুদ্র রয়েছে, তা তো তার কল্পনায়ই নেই। অথচ তার সামনে যখন শরী'আতের কোনও হুকুম বর্ণনা করা হয়, পত্রপাঠ জবাব দেয়, আমি মনে করি এটা সঠিক নয়। নিজের মত পেশ করতে তার এক মুহূর্ত সময় লাগে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেকে আপন মত নিয়ে গর্বিত থাকবে।

মোটকথা, যে যুগে এ চারটি আলামত প্রকাশ পাবে—মানুষ অর্থ-বিত্তের আসক্তিতে নিমজ্জিত থাকবে– নিজ খেয়াল-খুশীর আনুগত্য করবে– আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধ্যান্য দেবে– প্রত্যেকে আপন মত নিয়ে গর্বিত থাকবে– তখন বুঝে নেবে সেটা ফিতনার যুগ। তখন অন্যদের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর ফিকির করবে। তখন অন্যকে বাঁচানোর চিন্তায় বের হলে উল্টো তারা তোমাকে ধরে ফেলবে। তারা যে ফিতনার শিকার তোমাকে তাতে জড়িয়ে ফেলবে। কাজেই তখন নিজেকে বাঁচানোর চিন্তা করবে এবং আমল কী করে সংশোধন করা যায়, নিজেকে কিভাবে গুনাহ থেকে হেফাজত করা যায় সেই চেষ্টা করবে। বাইরে একদম বের হবে না। ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে। ঘরের বিছানো চট হয়ে যাবে। কী হচ্ছে সেই তামাশা দেখার ছলেও বাইরে উঁকিঝুঁকি মারবে না। ফিত্‌নার আমলের জন্য এটাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা।

মতবিরোধের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সাহাবায়ে কেরামের আমল আসল। চলতে থাকল খিলাফতে রাশেদার যুগ। এ যুগেরই শেষ দিকে হযরত আলী রাযি. ও হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর মধ্যে কঠিন বিরোধ দেখা দেয়। সে বিরোধ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে গড়ায়। হযরত আলী রাযি. ও হযরত আয়েশা রাযি.-এর মধ্যেও মতভেদ দেখা দেয় এবং তাও যুদ্ধের রূপ নেয়। তাদের সে বিরোধের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যৎ উম্মতকে পথের দিশা দিয়ে দেন। শিক্ষাদান করেন যে, মতবিরোধ ভবিষ্যতেও দেখা দেবে, দেখা দেওয়া অনিবার্য, তখন তারা কী কর্মপন্থা অবলম্বন করবে তার জন্য সাহাবায়ে কেরামে বিরোধ থেকে আলো নিতে পারে। তাদের সে বিরোধ ভবিষ্যৎ উম্মতের জন্য পথের মশাল হতে পারে।

দেখুন, হযরত আলী রাযি. ও হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সে আমলে যেসকল সাহাবী ও তাবেঈ মনে

করেছিলেন হযরত আলী রাযি. ন্যায়ের উপর আছেন, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ অনুসরণ করেন যে, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ও তাদের নেতার সাথে মজবুত হয়ে থাকবে। এ হাদীছের অনুসরণার্থে তারা হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষে থাকলেন। তারা বললেন, হযরত আলী রাযি.-ই এ সময়ের ইমাম (মুসলিম উম্মাহ্‌র নেতা)। কাজেই আমরা তাঁর সঙ্গে থাকব। তিনি যেমন করবেন, তেমনই করব।

অপরদিকে একদল সাহাবী ও তাবেঈ হযরত মু'আবিয়া রাযি.-কে সঠিক মনে করে তাঁকে ইমাম মেনে নিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তৃতীয় একটি দলও ছিলেন, যারা বললেন, কে সঠিক, কে বেঠিক তা আমাদের বুঝে আসছে না। আর এরূপ ক্ষেত্রে সকল দল থেকে আলাদা থাকাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ। সুতরাং তাঁরা হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষেও গেলেন না এবং হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর পক্ষেও না। তাঁরা সবার থেকে আলাদা হয়ে ঘরে বসে থাকলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর কর্মপন্থা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. খলিফা উমর রাযি.-এর সুযোগ্য পুত্র, উচ্চস্তরের সাহাবী ও একজন বড় ফকীহ ছিলেন। এই বিরোধকালে তিনি উভয় দল থেকে আলাদা হয়ে নিজ ঘরে বসে থাকলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, এটা কী, বাইরে হক-বাতিলের লড়াই হচ্ছে, আর আপনি ঘরে বসে আছেন? হযরত আলী রাযি. ও হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর মধ্যকার এ বিরোধে হযরত আলীই সঠিক পথে আছেন। কাজেই তাঁর পক্ষে কাজ করা উচিত। আপনি ঘরে বসে আছেন কেন? বের হয়ে আসুন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন মুসলিমদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দেবে এবং তাতে হক-বাতিলের পার্থক্য করা সম্ভব না হবে, তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, ঘরের বিছানো চটের মতো হয়ে যাবে এবং তীর-ধনুক সব ভেঙে

ফেলবে, অর্থাৎ কোনও পক্ষে লড়াই করবে না। সুতরাং আমি যেহেতু এ লড়াইতে হক-বাতিলের পার্থক্য করতে পারছি না, তাই অস্ত্র ভেঙে ফেলেছি এবং ঘরে বসে আল্লাহকে স্মরণ করছি।

সেই ব্যক্তি বলল, আপনি এটা ঠিক করছেন না। কেননা কুরআন মাজীদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যাবৎ না ফিতনা খতম হয়ে যায় (ফিতনা যখন নির্মূল হবে তখন যুদ্ধ বন্ধ করবে, তার আগে নয়।)[১১১]

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. তার এ কথার কী চমৎকার উত্তর দিলেন, তিনি বললেন,

قَاتَلْنَا حَتّٰى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَقَاتَلْتُمْ حَتّٰى كَانَتِ الْفِتْنَةُ.

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলে যুদ্ধ করতে থেকেছি, পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা ফিত্না খতম করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন যে তোমরা যুদ্ধ করছ, এতে ফিত্না নির্মূল হবে কি আরও উস্কানি পেয়েছে, আরও তেজী হয়ে উঠেছে। এ কারণেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক ঘরে বসে গেছি।[১১২]

এ প্রসঙ্গেই এক মুহাদ্দিছের একটি উক্তি আমার নজরে এসেছে। সেটি যখন পড়ি আকস্মিক আনন্দে আমি যেন নৃত্য করে উঠি। তিনি বলেন,

اِقْتَدُوْا بِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْأَمْنِ وَبِابْنِهٖ فِي الْفِتْنَةِ.

'শান্তির অবস্থায় হযরত উমর রাযি.-এর অনুসরণ করো আর ফিত্নার সময় তাঁর পুত্রের অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর।'

---

১১১. সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৩
১১২. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৪৫১৩

অর্থাৎ সমাজে যখন শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে, তখন দেখো হযরত উমর রাযি.-এর কর্মপন্থা কী ছিল। তা দেখে সেই অনুযায়ী কাজ করবে। আর ফিতনা-ফাসাদের সময় দেখো তাঁর পুত্র কী নীতি অবলম্বন করতেন। তিনি তো এই করেছিলেন যে, তরবারি ও তির ধনুক ভেঙে ঘরের মধ্যে বসে থাকলেন। কোনও দলের পক্ষ নিলেন না। কাজেই ফিতনা-ফাসাদের সময় তোমরাও তাই করবে।

মতভেদ সত্ত্বেও পারস্পরিক সুসম্পর্ক

আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে আমাদেরকে সবকিছুই শিক্ষা দিয়েছেন। দেখুন, এক দিকে তো যেসকল সাহাবী হযরত আলী রাযি.-কে সঠিক মনে করেছেন তাঁরা তাঁর পক্ষাবলম্বন করেছেন। আর যারা মনে করেছেন হযরত মু'আবিয়া রাযি.-ই ঠিক, তাঁরা তাঁর পক্ষে গিয়েছেন, অন্যদিকে মানবিকতা ও নীতি-নৈতিকতার সকল ক্ষেত্রে সর্বদা একাত্ম হয়ে থেকেছেন। সে ক্ষেত্রে তাঁরা এমন এমন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, এ জগৎ তার আগে-পরে সে রকম দৃশ্য কখনও দেখেনি। হযরত আলী রাযি. ও মু'আবিয়া রাযি.-এর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। তাতে উভয় পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু দেখুন, যখন হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষের কোনও সৈন্য মারা যেতেন, তখন তার জানাযায় হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর সৈন্যরাও শরীক হতেন। আবার হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর সৈন্যদের মধ্যে কেউ নিহত হলে, তার জানাযায়ও হযরত আলী রাযি.-এর সৈন্যগণ অংশগ্রহণ করতেন।

কী করে এটা সম্ভব হতো? আসলে তাদের সে যুদ্ধ তো ইন্দ্রিয়পরবশতার উৎপাদন ছিল না। অর্থ-বিত্ত ও সুনাম-সুখ্যাতি লাভের প্রেরণা সে যুদ্ধে উৎসাহ জোগায়নি। ছিল না তা ক্ষমতার লড়াই। সে যুদ্ধের পেছনেও ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত কার্যকর ছিল। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ছিল উভয়েরই সামনে, তবে তার নির্ণয়ে দেখা দিয়েছিল বৈপরীত্য। হযরত আলী রাযি. এক অর্থ বুঝে সেই অনুযায়ী কাজ করছিলেন আর হযরত মু'আবিয়া রাযি. বুঝেছিলেন তার বিপরীত অর্থ

এবং তিনিও সেটাই কার্যকর করতে সচেষ্ট ছিলেন। উভয়েই আপন-আপন অবস্থান থেকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে ব্রতী ছিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি.-এর কর্মপন্থা

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. ছিলেন একজন জ্ঞানচর্চার মানুষ। আমার সম্মানিত আব্বাজান রহ. বলতেন, তিনি ছিলেন একজন মাওলানা-মওলবী কিসিমের সাহাবী। সর্বদা পঠন-পাঠনের কাজে মশগুল থাকতেন। তার নীতি ছিল বড় আশ্চর্য। তিনি উভয় বাহিনীর কাছেই আসা-যাওয়া করতেন, কিন্তু কোনও পক্ষে অংশগ্রহণ করতেন না। যখন নামাযের সময় হতো, হযরত আলী রাযি.-এর শিবিরে চলে যেতেন এবং তাঁর পেছনে নামায পড়তেন। আর খানার সময় হলে হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর শিবিরে গিয়ে তাঁর দস্তরখানে অংশগ্রহণ করতেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, হযরত বিষয়টা বুঝলাম না, আপনি নামায তো পড়েন হযরত আলী রাযি.-এর পেছনে আবার খাবার সময়ে দেখা যায় হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর দস্তরখানে। এর কী রহস্য? তিনি উত্তর দিলেন, নামায ওখানে সুন্দর হয় আর খাবার এখানে ভালো। এ কারণেই নামাযের সময় ওখানে চলে যাই, আর খাওয়ার সময় এখানে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আমাদেরকে পরস্পরে মতভেদকালীন আদবকেতাও শিখিয়ে দিয়েছেন।

রোম সম্রাটের চিঠির জবাবে হযরত মু'আবিয়া রাযি.

এ যুদ্ধের সময়ই যখন উভয় পক্ষের সৈন্য মুখোমুখি দণ্ডায়মান, হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর কাছে রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে চিঠি আসল। তাতে লেখা ছিল, আমরা শুনতে পেলাম, আপনার ভাই আলী রাযি. আপনার প্রতি অবিচার করছেন। তিনি হযরত উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীদের বিচারও করছেন না। আপনি চাইলে আমরা আপনাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে পারি। এর উত্তরে হযরত মু'আবিয়া রাযি. যা লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ,

হে খ্রিষ্টান রাজা! আপনি হয়তো আমাদের ভ্রাতৃকলহের সুযোগ নিতে চাচ্ছেন। মনে করেছেন এটা হযরত আলী রাযি.-এর উপর হামলা চালানোর মোক্ষম সময়। মনে রাখবেন, আপনি হযরত আলী রাযি.-এর উপর কুদৃষ্টি দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখালে হযরত আলী রাযি.-এর সৈন্যদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আপনার গর্দানে তরবারী বসাবে, সে এই মু'আবিয়া।

সমস্ত সাহাবী আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র

আজকাল এক শ্রেণির লোক সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মাত্রাজ্ঞান ঠিক রাখে না। তাঁদের সম্পর্কে নানারকম অশোভন উক্তি করে থাকে। অথচ তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা উপলব্ধি করাও কিছু সহজ কথা নয়। তাঁদের আবেগ-অনুভূতি ও চেতনা-জযবার নাগালে পৌছাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা তাঁদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদকে নিজেদের ঝগড়া-ফাসাদের মতো মনে করি। আমরা যেসব ক্ষুদ্র স্বার্থে একে অন্যের বিরুদ্ধে লেগে পড়ি, ধরে নেই তাঁদের পারস্পরিক বিরোধও সেই রকম। অথচ তাঁদের সমস্ত বিরোধ ও লড়াইয়ের মধ্যে মূলত আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে তাদের ভবিষ্যৎ কলহের ব্যাপারে নির্দেশনা দান করছিলেন যে, সে ক্ষেত্রে তাদেরকে কী নীতি অবলম্বন করতে হবে। হযরত আলী রাযি. হন বা হযরত মু'আবিয়া রাযি. কিংবা তাঁদের উভয় থেকে নিরপেক্ষ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. হন, প্রত্যেকেই উম্মতের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। কাজেই যারা কোনও সাহাবী সম্পর্কে কটুক্তি করে বা একজনের পক্ষাবলম্বন করত অন্যজনের সমালোচনা করে, সাবধান থাকতে হবে— আমরা যেন সেইসব লোকের কথার মারপ্যাঁচে পড়ে নিজেদের ঈমান-আমল ক্ষতিগ্রস্ত না করি। সমস্ত সাহাবীরই মর্যাদা অনেক উঁচুতে। যেখানে পৌছা আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়।

হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর নিষ্ঠা ও আল্লাহ ভীরুতা

হযরত মু'আবিয়া রাযি. যেহেতু পুত্র ইয়াযীদকে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, সেহেতু লোকে তাঁর সম্পর্কে নানারকম

মন্তব্য করে থাকে, অথচ ইতিহাসে এ কথাও লেখা আছে, একদা জুমু'আর খুতবা দেওয়ার সময় তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার পুত্রকে যে শাসনকার্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছি, আমি কসম করে বলি, তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার সময় আমার মনে উম্মতের কল্যাণ কামনা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা কাজ করছিল না। তারপর দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আমার যদি এছাড়া অন্য কোনও চিন্তা থেকে থাকে, তবে আমার এ মনোনয়ন কার্যকর হওয়ার আগে আপনি তাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিন।[১১৩]

চিন্তা করে দেখুন তো, মনের ভেতর দুর্বলতা থাকলে কোনও পিতা কি নিজ পুত্রের জন্য কখনও এরকম দু'আ করতে পারে? কিন্তু হযরত মু'আবিয়া রাযি. তো করলেন এবং তাও জুমু'আর দিন, খুতবা দেওয়ার সময়, যখন দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এর দ্বারাই বোঝা যায়, তিনি যা করেছিলেন ইখলাসের সাথেই করেছিলেন। কোনও পার্থিব স্বার্থ দ্বারা তিনি তাড়িত ছিলেন না। হ্যাঁ, মানুষের দ্বারা ভুল তো হতেই পারে। নবী-রাসূল ছাড়া অন্য যেকোনও লোকেরই ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব। কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, তাঁর মনে ইখলাস ছিল। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ চিন্তাই তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল নিয়ামক ছিল।

যা হোক, মহান সাহাবীগণ ফিত্‌না সংক্রান্ত হাদীছসমূহের অনুসরণ করে আমাদের জন্য ফিত্‌নাকালীন সময়ের কর্মপন্থা সম্পর্কে আদর্শ রেখে গেছেন। একটা আদর্শ এরকমও যে, সেই পবিত্র যুগে হযরত আলী রাযি. ও হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে একদল সাহাবী নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা কোনও পক্ষে যোগদান না করে বরং নিজ-নিজ ঘরে বসে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবীও ছিলেন। সুতরাং এ যুগেও যখন হক-বাতিল ও সত্য-মিথ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা

---

১১৩. সুয়ূতী, তারীখুল-খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৮

দেবে, নিশ্চিতভাবে বোঝা সম্ভব হবে না কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। তখন সকলের থেকে আলাদা হয়ে নিভৃত জীবন-যাপন ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

বস্তুত প্রাকৃতিভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল একদল সাহাবীকে দলনিরপেক্ষ নিভৃতাচারী করে রেখে তাদের মাধ্যমে দ্বীন ও ইসলামের মস্ত বড় খেদমত আঞ্জাম দেওয়াবেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। নচেৎ সকল সাহাবী যদি যুদ্ধে শামিল হতেন, তবে তাদের মধ্য হতে হয়তো বহু সংখ্যকের শাহাদত নসীব হতো। ফলে দ্বীনের যে খেদমত তারা করে গেছেন, তা সম্ভব হতো না। নিভৃতচারী সেই সকল সাহাবী আমরণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ চর্চায় ব্যাপৃত থেকেছেন এবং হাদীছ সংকলনের মতো মহিমান্বিত কাজের সূচনা করে গেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীমালা ও তাঁর আনীত দ্বীন পূর্ণাঙ্গরূপে সংকলিত ও বিন্যস্ত করতে সক্ষম হন। আর এভাবে তাঁরা আমাদের জন্য রেখে যান সংকলন-সংগ্রহের এক বিপুল ভাণ্ডার।

নিজের আমল সংশোধনের চিন্তা করুন

যা হোক ফিত্‌নার যুগে দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে আল্লাহ-আল্লাহ করতে থাকাই হল নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়। অন্যের চিন্তা বাদ দিয়ে এ সময় নিজের ঈমান-আমল বাঁচানোর ফিকিরেই মগ্ন থাকা উচিত। কিভাবে গুনাহ থেকে বাঁচা যাবে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও ফরমাবরদার বান্দা হওয়া যাবে, কিভাবে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি শরী'আতের অনুগত হয়ে যাবে, সেই চিন্তা ও চেষ্টার ভেতরই দিনাতিপাত করা উচিত। এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র। এরকম ব্যবস্থাপত্র একজন নবীর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। যে-কোনও মানুষের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থাপত্র দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই নিজের ও সমাজের মুক্তির জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনও ব্যবস্থা হতে পারে না। সমাজ তো ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিরই নাম।

একজন লোক যদি ভালো হয়ে যায়, তবে সমাজেরই একটা অংশ ভালো হয়ে গেল, সমাজেরই একটা খুঁত সেরে গেল। যদি দু'জন লোকের সংশোধন হয়ে যায়, তবে সমাজের দু'টি অংশ শুধরে গেল। এভাবে প্রদীপ থেকেই তো প্রদীপ জ্বলে এবং ব্যক্তি থেকে সমাজ গড়ে। কাজেই এক একজন করে যদি আত্মসংশোধনে মনোনিবেশ করে, তবে এক পর্যায়ে গোটা সমাজ সংশোধন হয়ে যাবে।

আপন দোষ-ত্রুটিতে নজর দিন

আজ আমরা যে যুগ অতিক্রম করছি, এটা কঠিন ফিত্‌নার যুগ। এরকম সময়ের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ' বছর আগেই ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছেন, এখন তার অনুসরণই বেশি জরুরি। কাজেই কোনও পার্টি বা সংগঠনে যোগ না দিয়ে যতদূর সম্ভব ঘরে বসে থাকাই শ্রেয়। এমনকি তামাশা দেখার জন্যও ঘরে থেকে বের হওয়া উচিত নয়। এখন একমাত্র কাজ নিজের ইসলাহের ফিকির করা এবং নিজের মধ্যে কী কী দোষ আছে তা খুঁজে বের করে সংশোধনের চেষ্টা করা। হতে পারে সমাজে যে ফিত্‌না-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে তা আমারই গুনাহের অশুভ ফল। প্রত্যেকের উচিত নিজেকে অপরাধী মনে করা এবং সমাজের অশান্তির জন্য নিজ গুনাহকে দায়ী করা। হযরত যুন-নূন মিসরী রহ.-এর সময়ে প্রচণ্ড খরা দেখা দিলে লোকে তার কাছে দু'আর জন্য গেল। তিনি বললেন, এসব আমার গুনাহের জন্যই হচ্ছে, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আশা করি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রহমত করবেন। আজকাল অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা অন্যদের দোষের খতিয়ান নিতে বড় পসন্দ করি। অমুকে এই করছে, তমুকের মধ্যে এই-এই দোষ আছে এবং সে কারণেই ফিত্‌না-ফাসাদ হচ্ছে। প্রতিদিন এটাই আমাদের ওজীফা হয়ে গেছে। এমন লোক কদাচ মিলবে, যে নিজের দোষ হিসাব করে। না, অন্যদের দোষ দেখায় নয়; বরং নিজের সংশোধনই হোক একমাত্র লক্ষ্য।

গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা

আত্মসংশোধনের সর্বনিম্ন স্তর হল গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের দ্বারা যেসব গুনাহের কাজ হয়, সেগুলোকে একটি করে নিশানা বানিয়ে নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রতিদিন আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা ও ইসতিগফার করা চাই এবং দু'আ করা চাই। হে আল্লাহ! এটা ফিত্‌নার যুগ। আমাকে ও আমার পরিবারের লোকদেরকে এ ফিত্‌না থেকে রক্ষা করো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

'হে আল্লাহ! প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকল ফিতনা থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই।'[১১৪]

দু'আ করার সাথে সাথে গীবত, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, অন্যকে কষ্ট দেওয়া, সুদ-ঘুসের লেনদেন, চোখ-কানের অন্যায় ব্যবহার ইত্যাদি যত রকমের গুনাহ আছে, তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় গাফলতির ভেতর জীবন-যাপন করলে তার পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন এবং যেসব বিষয় আলোচনা হল তার উপর আমল করার তাওফীক দিন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

---

১১৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৬৪২

বিদ'আত কেন হারাম?*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

অর্থ : হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের থেকে আগে বাড়ার চেষ্টা করো না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।[১১৫]

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! সূরা হুজুরাতের প্রথম আয়াত সম্পর্কে গত জুমু'আ থেকে আলোচনা শুরু হয়েছিল। এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি বিধান জানা যায়। তিনটি বিধান গত জুমু'আয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আজ আমরা চতুর্থ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ২২৩-২৩৮

১১৫. সূরা হুজুরাত, আয়াত ১

বিদ'আত নিজের পক্ষ থেকে দ্বীনের ভেতর সংযোজন করার নামান্তর

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন, তা এক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ দ্বীন। কুরআন মাজীদের এক আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'আমত পরিপূর্ণ করলাম এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।'[১১৬]

সুতরাং দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন যেকোনও কর্ম, অর্থাৎ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে ছিল না, তিনি যার শিক্ষা দিয়ে যাননি, কুরআন মাজীদে যে সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়নি, বরং সাহাবায়ে কেরামও যা করে যাননি, এমন কাজকে যদি দ্বীনের অংশ মনে করে পালন করতে থাকি, তাকে সুন্নত-ওয়াজিব সাব্যস্ত করি কিংবা যে ব্যক্তি তা না করে তার নিন্দা-সমালোচনা করি, তবে তাই বিদ'আত এবং এরূপ করার অর্থ হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিঙিয়ে যাওয়া, যা আয়াতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

আধুনিক দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার বৈধ

দেখুন, বহু জিনিস এমন আছে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল না। কিন্তু কাল পরিক্রমায় ও যুগ বদলের ধারায় তা তৈরি হয়ে গেছে এবং মানুষ তার ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। উদাহরণ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যুত ছিল না, কিন্তু আজ বিদ্যুত ছাড়া আমাদের চলে না। সে কালে বৈদ্যুতিক

---

১১৬. সূরা মায়েদা, আয়াত ৩

পাখা ছিল না। আজ এসব পাখা না হলে আমরা বিপদে পড়ে যাই। সেকালে সফর হতো উট-ঘোড়ায় চড়ে। আজ মোটর গাড়ি, বাস, রেল ও উড়োজাহাজের ছড়াছড়ি। এছাড়া এখন সফর কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এসবকে বিদ'আত বলা যায় না। কেননা কেউ এগুলোকে দ্বীনের অংশ মনে করে না। কেউ বলে না বৈদ্যুতিক পাখা চালানো সুন্নত বা বিজলী বাতি জ্বালানো ওয়াজিব, রেলে সফর করা সুন্নত বা ওয়াজিব ইত্যাদি। এগুলো প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ তৈরি করে নিয়েছে এবং প্রয়োজনের কারণে এভাবে নিত্য নতুন বস্তু উদ্ভাবিত হয়। এ কারণে শরী'আতও এ ব্যাপারে কোনও রকম বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। সুতরাং শরী'আতের দৃষ্টিতে এসব বস্তু ব্যবহার করা জায়েজ।

প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্টতা

কিন্তু নতুন কোনও কাজ যদি দ্বীনের অংশ মনে করে পালন করা হয়, অর্থাৎ ধারণা করা হয় যে, তা করা ওয়াজিব, সুন্নত বা মুস্তাহাব কিংবা একটা ছাওয়াবের কাজ, অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সে কাজ করেননি, করার হুকুম দেননি এবং সাহাবায়ে কেরামও তা করেননি, তবে এ ধরনের কাজ করার অর্থ হবে দ্বীনের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিঙিয়ে যাওয়া। শরী'আতে এরই নাম বিদ'আত। বিদ'আতের শাব্দিক অর্থ 'নতুন জিনিস'। কাজেই শাব্দিক অর্থ হিসেবে বিদ্যুত, বৈদ্যুতিক পাখা, টাইল্‌স, মার্বেল, বাস, রেল, উড়োজাহাজ সবই বিদ'আত, কিন্তু শরী'আতের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয় এমন নতুন কাজকে, কুরআন-হাদীছ দ্বারা যা প্রমাণিত নয় এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্ম দ্বারাও সমর্থিত নয়। এরূপ কাজ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত কাজ (যা আগে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু মানুষ তাকে দ্বীনের অংশ বানিয়ে নিয়েছে, তা) বিদ'আত, এবং

প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা (মানুষকে) জাহান্নামে নিয়ে যাবে।[১১৭]

বিদ'আত কেন পথভ্রষ্টতা?

প্রশ্ন আসে বিদ'আত পথভ্রষ্টতা কেন? সংক্ষেপে এর উত্তর হল, বিদ'আতকারী কার্যত বলতে চায়, দ্বীন অসম্পূর্ণ ছিল, আমি এই নতুন সংযোজন দ্বারা তা পরিপূর্ণ করছি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন, তা পূর্ণাঙ্গ নয়, তাতে এই-এই জিনিস থাকা দরকার ছিল, অথচ তা নেই। আমি সেই শূন্যতা পূরণ করছি। এভাবে সে দ্বীনের ব্যাপারে কার্যত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিঙিয়ে যেতে চায়। চিন্তা করে দেখুন বিষয়টা কত গুরুতর। এমনিভাবে বিদ'আত তথা যেসব নতুন জিনিস ইসলামে দাখিল করা হয়, আপত দৃষ্টিতে তা ছাওয়াবের কাজ বলেই মনে হয়, যেন তা সুন্দর এক ইবাদত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছাওয়াবের কাজ নয়। কেননা তা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক নয়, তাই তা বিদ'আত আর বিদ'আত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা ও গুনাহের কাজ। সত্য বটে তা সরাসরি গুনাহের কাজ নয়; কিন্তু যেহেতু কোনও অথরিটি ছাড়া দ্বীনের মধ্যে তার অনুপ্রবেশ ঘটনা হয়েছে তাই তা শক্ত গুনাহ। অথরিটি ছাড়া তো বটেই যেহেতু তার পক্ষে কুরআন ও হাদীছের কোনও প্রমাণ নেই; বরং নিজের পক্ষ থেকে তা দ্বীনের মধ্যে দাখিল করে নিয়েছি। এই অনধিকার চর্চার কারণেই তা বিদ'আত ও কঠিন গুনাহ হয়ে গেছে।

শবে বরাতে একশ' রাক'আত নফল পড়া

কোনও কোনও লোক ১৫ই শা'বানের রাতে অর্থাৎ শবে বরাতে পড়ার জন্য নামাযের একটা বিশেষ পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছে। পদ্ধতিটি এরকম, এক তাকবীরে তাহরীমা ও এক সালামে একশ' রাক'আত

---

১১৭. সুনানুন নাসাঈ, হাদীছ নং ১৫৬০; সুনানু আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৯৯১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪৫

নামায পড়তে হবে। তার প্রথম রাক'আতে অমুক সূরা, দ্বিতীয় রাক'আতে অমুক সূরা, তৃতীয় রাক'আতে অমুক সূরা ইত্যাদি। এককালে তো এ নিয়মে নামায পড়ার ব্যাপারটা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। মসজিদে-মসজিদে যথারীতি জামাআতের সাথে এ নামায পড়া হতো। কোনও ব্যক্তি এ নামায না পড়লে তার নিন্দা করা হতো এবং বলা হতো, সে শবে বরাত উদ্‌যাপন করেনি।

এবার দেখুন, যে ব্যক্তি শবে বরাতে এভাবে একশ রাক'আত নামায পড়ে, আপাতদৃষ্টিতে সে তো কোনও মন্দ কাজ করছে না; সে চুরি-ডাকাতি বা অন্য কোনও দুষ্কর্ম করছে না। বরং আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর যিকির করছে, তাঁর কালাম পড়ছে ও রুকু'-সিজদা করছে। অথচ উলামায়ে কেরাম বলেন, এটি একটি বিদ'আত, নাজায়েয ও গুনাহের কাজ। কেন এটা গুনাহের কাজ? এ কারণে যে, সে নিজের পক্ষ থেকে দ্বীনের মধ্যে একটি জিনিস যোগ করে দিয়েছে, অথচ সেটা দ্বীনের অংশ নয়। এ কারণেই এটা বিদ'আত ও গুনাহের কাজ হয়ে গেছে।

তাকে যদি বলা হয় ভাই, তুমি যে এ কাজ করছ, এটা তো বিদ'আত। এটা কুরআন মাজীদের কোথাও নেই এবং হাদীছেও এর উল্লেখ পাওয়া যায় না! সুতরাং এটা তো জায়েয হতে পারে না। সে উত্তর দেবে, কেন এটা কি কোনও গুনাহের কাজ না কি? আমরা কি চুরি-ডাকাতি করছি না-কি? আমরা তো কুরআন মাজীদ পড়ছি, আল্লাহ তা'আলার সামনে রুকু-সিজদা করছি, যিকির করছি ও তাসবীহ পড়ছি। কিছু গুনাহের কাজ তো করছি না।

মাগরিবের ফরয চার রাক'আত পড়লে ক্ষতি কী?

বিষয়টা আসলে ভালোভাবে বুঝতে না পারার কারণেই এরকম কথা বলা হচ্ছে। সে কেবল এতটুকুই দেখছে যে, আমি কুরআন পড়ছি, রুকূ-সিজদা করছি ও তাসবীহ পড়ছি। কিন্তু এটা লক্ষ করছে না যে, সে এসব করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করছে তা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। মনে রাখতে হবে, কোনও কাজই ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত নামে অভিহিত

হতে পারে না, যতক্ষণ না তা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সনদপ্রাপ্ত হবে। সনদবিহীন কাজকে ইবাদত মনে করলে সেটা ইবাদত তো নয়ই; বরং বিদ'আত সাব্যস্ত হবে। নামাযের দ্বারাই এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন এবং এটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোন ওয়াকতে কত রাক'আত পড়তে হবে। সুতরাং ফজরে দু'রাক'আত ফরয, জুহ্র আছর ও ইশায় চার চার রাক'আত ফরয এবং মাগরিবে তিন রাক'আত ফরয। কেউ যদি মনে করে মাগরিবে তিন রাক'আত ফরয ভালো লাগছে না; আমি বরং মাগরিবেও ফরয চার রাকা'আতই পড়ব, আর এই বলে সে চার রাক'আত পড়া শুরুও করে দেয়, তবে বলুন তো তার সম্পর্কে আপনি কী ফয়সালা দেবেন? সে তো কোনও চুরি-ডাকাতি করেনি, ব্যভিচার, মদপান ইত্যাদি কোনও দুষ্কর্মও করেনি। সে তো নামাযই পড়েছে। তিন রাক'আতের স্থলে চার রাক'আত পড়েছে, তাতে কী? এক রাক'আত বেশি পড়ার ফলে তার যিকির ও তাসবীহও বেশি হয়েছে, একটা রুকু ও দু'টা সিজদা বেশি দিয়েছে। তা ভালোই তো ইবাদত বেশি করা হল। কিন্তু আপনি এই যুক্তির দিকে যাবেন না। বরং বলবেন, সে যে চতুর্থ রাক'আত বৃদ্ধি করেছে এ কারণে মোটেই সে বেশি ছাওয়াব পাবে না; বরং এই অতিরিক্ত রাক'আত আগের তিন রাক'আতকেও ডোবাবে। তার নামাযই হবে না; যদ্দরুন সে কঠিন গুনাহগার হবে। কারণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে মাগরিবের নামায পড়ার যে পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে তা লঙ্ঘন করেছে এবং নিজের মনগড়া পদ্ধতির অনুসরণ করেছে। এভাবে সে দ্বীনের ভেতর একটা নতুন নিয়ম ঢুকিয়ে দিয়েছে। এরই নাম বিদ'আত।

ইফতার কেন সময় হওয়া মাত্রই করতে হয়?

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজকে যেই স্তরে করার হুকুম দিয়েছেন, সে কাজকে

সেই স্তরে রেখে অনুসরণ করারই নাম দ্বীন। সেই স্তর থেকে উপরে উঠালে বা নিচে নামালে সেটা দ্বীন হয় না। কিংবা বলুন, প্রত্যেক কাজের একটা সীমারেখা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কাজটিকে সেই সীমারেখা মেনে করলে তবেই তা দ্বীন হয়। তা না করে যদি সীমারেখা লঙ্ঘন করা হয়, অর্থাৎ কোনও কাজে যদি তার নির্দিষ্ট সীমার আগেই শেষ করে দেওয়া হয় বা সীমারেখায় ক্ষান্ত না হয়ে আরও পরে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তা দ্বীন হবে না; বরং দ্বীন মনে করে তা অবলম্বন করলে বিদ'আত হয়ে যাবে।

রমাযানের রোযাকেই ধরুন। আমরা শেষ রাতে সাহ্‌রী খাই। সারা দিন ক্ষুধার্ত থাকি। তারপর যখন সূর্যাস্ত হয়ে ইফতার করি, শরী'আতের নির্দেশ হল সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে-সাথে ইফতার করো, দেরি করো না। প্রশ্ন হচ্ছে ইফতার কেন তাড়াতাড়ি করতে হবে? দিনভর আল্লাহ তা'আলার জন্য পানাহার বর্জনের পর যদি আরও একটা ঘণ্টা বেশি পানাহার বর্জিত থাকা হয়, তাতে দোষ কী? এমনটা করলে তাতে এমন কী ক্ষতি হবে? আপত দৃষ্টিতে এতে কোনও দোষ বা ক্ষতি নজরে আসে না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্র শীঘ্র ইফতার করে নাও, কিছু পানাহার করে নাও।[১১৮]

কেননা আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছিল সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকো, সূর্যাস্ত হল রোযার শেষ সীমা। সূর্য যখন অস্ত হয়ে গেছে, তখন রোযা তার শেষ সীমায় পৌছে গেছে। এরপর আর রোযা নেই। তুমি যদি রোযাকে এ সীমার পরেও নিয়ে যাও এবং এক ঘণ্টা পর ইফতার করতে মনস্থ কর, তবে তার অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযার যে সীমানা নির্ধারণ করেছেন, তুমি সে সীমানা ঠেলে আরও সরিয়ে দিলে এবং রোযার সময় আরও বাড়িয়ে নিলে। এটা শরী'আতের অনুসরণ হল না। আল্লাহর আনুগত্য হল না। আনুগত্য হবে তখনই, যখন বলা হবে খেয়ো না,

---

১১৮. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ১৮২২; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ১৮৪২; সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২০০৫

তখন খাবে না। সেই না খাওয়া হবে ইবাদত। আবার যখন বলা হবে খাও, সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেবে, এই খাওয়াও হবে ইবাদত। পক্ষান্তরে তখন যদি না খাও, তবে সেটা হবে অবাধ্যতা, ইবাদত নয়। তখন গুনাহগার হবে।

ঈদের দিন রোযা রাখলে গুনাহ হয় কেন?

এমনিভাবে রমাযানের পূর্ণ মাস রোযা রাখা হল। রোযা রাখার ফযীলত অনেক। এক হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার আগে-পিছের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।[১১৯]

অন্য হাদীছে আছে, রোযা রাখার কারণে মুখে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা'আলার কাছে তা মিশকের চেয়েও বেশি প্রিয়।[১২০]

আল্লাহ তা'আলা এ রোযা রমাযান মাসেই ফরয করেছেন। ঈদের দিন আসলে তার সীমা শেষ হয়ে যায়। এ দিন রোযা না রাখাই আল্লাহ তা'আলার হুকুম। কাজেই কেউ যদি এ দিন রোযা রাখে, তবে যে রোযা এত ফযীলত ও ছাওয়াবের কাজ ছিল, সেটাই উল্টো গুনাহে পরিণত হবে ও আযাবের কারণ হয়ে যাবে, অথচ আপাতদৃষ্টিতে সে কোনও পাপকার্য করেনি। সে তো রোযাই রেখেছে, যা একটি ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ। এখানেও কথা সেটাই যে, এটা ইবাদত ততক্ষণই, যতক্ষণ শরী'আতের সীমারেখার ভেতর করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক করা হবে। সে তা করেনি। কাজেই তার কাজ ইবাদতরূপে গণ্য হবে না; তা গুনাহের কাজ হয়েছে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়েছে।

সুতরাং দ্বীন হচ্ছে শরী'আতের অনুসরণ করার নাম। কেউ নতুন কোনও পন্থা ও নিয়ম উদ্ভাবন করে তার নাম যদি ইবাদত রেখে দেয়, তাকে দ্বীনের অংশ বানিয়ে ফেলে ও সুন্নত হিসেবে তা প্রচার করে এবং

---

১১৯. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৩৭
১২০. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ১৭৬

কেউ তা গ্রহণ না করলে তাকে গালমন্দ করে আর বলে, সে একজন বেদ্বীন, তবে তার উদ্ভাবিত নিয়মটি বিদ'আত হয়ে যাবে এবং বিদ'আত হওয়ার কারণে তা ছাওয়াবের নয়; বরং গুনাহের কাজ হয়ে যাবে। কেননা দ্বীনের মধ্যে নিজের থেকে একটা কাজ যোগ করে দিয়েছে আর এভাবে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, অথচ কুরআন মাজীদের স্পষ্ট নির্দেশ,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ①

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করো না। আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।'[১২১]

কাজেই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সীমারেখা স্থির করে দিয়েছেন, সেই সীমারেখার মধ্যেই থাকো, তা ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না। ডিঙিয়ে গেলে বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে।

সফরে চার রাক'আত পড়া গুনাহ কেন?

সফর অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নামাযের রাক'আত সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন। শর'ঈ সফর হলে চার রাক'আত ফরযকে দু'রাক'আত পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ যদি মনে করে, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য রাক'আত সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন ঠিক, কিন্তু আমার মনে তাতে পরিতৃপ্তি আসে না। কাজেই আমি পূর্ণ চার রাক'আতই পড়ব। এরূপ চিন্তায় সে ব্যক্তি যদি চার রাক'আত পড়ে তা কি জায়েয হবে? প্রশ্ন করা যেতে পারে কেন জায়েয হবে না; সে তো কোনও গুনাহের কাজ করছে না, নামাযই তো পড়েছে, দু'রাক'আত বেশি পড়ছে, তা ভালোই তো করেছে, ইবাদত বেশি করা হয়েছে। এখানেও ওই একই

১২১. সূরা হুজুরাত, আয়াত ১

কথা। সে যা বেশি করেছে, দেখতে ইবাদত হলেও বাস্তবে তা ইবাদত হয়নি। বরং যেহেতু সে আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা লঙ্ঘন করেছে, তাই সেটা একটা গুনাহের কাজ হয়েছে, নাজায়েয কাজ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহী করতে হবে, তোমার প্রতি দু'রাকাত আদায়ের হুকুম ছিল, চার রাক'আত কেন পড়লে? বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলার হুকুম মানা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় চলারই নাম দ্বীন। নির্দেশ যদি কম পড়ার হয় কমই পড়বে, আবার যখন বেশি পড়ার হয় বেশি পড়বে। এ কম বেশিটা নিজের পক্ষ থেকে করা জায়েয নয়। শরী'আত কী বলে সেটাই দেখতে হবে।

বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা আরও বেশি জরুরি। কেননা দ্বীনের নামে বর্তমান সমাজে অসংখ্য তরীকা ও নিয়ম চালু করে দেওয়া হয়েছে; এমনই গুরুত্বের সাথে চালু করা হয়েছে, যেন দ্বীনের অপরিহার্য অংশ। কোনও ব্যক্তি তা পালন না করলে সে নিন্দাযোগ্য হয়ে যায়। তার উপর লা'নত করা হয়। তাকে ঘৃণা করা হয়, এমনকি তাকে ইসলাম থেকেই খারিজ করে দেওয়া হয়। যেসব নিয়ম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে প্রমাণিত নয়; সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারাও সমর্থিত নয়, তা সত্ত্বেও তাকে দ্বীনের অংশ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা সবই বিদ'আত এবং আপনাদের সামনে আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করলাম, তা এ জাতীয় কাজ করতে নিষেধ করছে। এতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের থেকে সামনে বেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না। এ জাতীয় কাজ করলে তা দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিঙিয়ে যাওয়া হয়। তাই নিষিদ্ধ।

শবে বরাতে হালুয়া-রুটি গুনাহ কেন?

বহু জায়গায় শবে বরাতে হালুয়া-রুটি তৈরি করার রেওয়াজ আছে এবং এমন গুরুত্বের সাথে তা করা হয়, যেন এটা দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য

অংশ। এছাড়া শবে বরাতই হয় না। অনেক জায়গায় রজব মাসে শিরনি বিতরণ করা হয়। কোনও ব্যক্তি তা না করলে সে ধিকৃত হয়, ওহাবী বলা হয় এবং এ জাতীয় নানা কটুবাক্যে জর্জরিত করা হয়। যদি জিজ্ঞেস করা হয় শিরনি বিতরণের নির্দেশ কি কুরআন মাজীদে দেওয়া হয়েছে, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছে? না কি সাহাবায়ে কেরাম এটা করেছিলেন? তবে এর কোনও জবাব নেই। দলীল নেই তো জবাব দেবে কী? ব্যস মনগড়া একটা নিয়ম চালু করে দেওয়া হয়েছে আর এটাই দ্বীন হয়ে গেছে। তুমি এটা মানতে বাধ্য। না মানলে গালমন্দ শুনতে প্রস্তুত থাকো। এটাই তো বিদ'আত। যদি তাদেরকে বলা হয়, এটা বিদ'আত, জবাব দেবে আমরা কি কোনও গুনাহের কাজ করছি? আমরা কি চুরি-ডাকাতি করছি? আমরা তো ভালো কাজই করছি। ঘরের আটা দিয়ে রুটি বানাচ্ছি, হালুয়া তৈরি করছি আর তা মহল্লার লোকদেরকে খাওয়াচ্ছি। এতে গুনাহের কী আছে? আসলে তারা বিষয়টা গভীরভাবে চিন্তা করছে না। ব্যাপারটা তো কেবল হালুয়া রুটির না। কেউ যদি রোজ এরকম হালুয়া-রুটি তৈরি করে আর মহল্লার মানুষকে তা খাওয়ায়, কে তাতে আপত্তি করবে? কে বলবে সেটা গুনাহের কাজ? মূল ব্যাপার হল এটাকে দ্বীনের অংশ বানানো এবং এটাকে এমনই জরুরি কাজ মনে করা যে, কোনও ব্যক্তি এটা না করলে সে যেন মহা অপরাধ করে ফেলল, যদ্দরুন তাকে নিন্দা-সমালোচনার যোগ্য মনে করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও এই কর্মপন্থাই হালুয়া-রুটি বিতরণকে বিদ'আত বানিয়ে দেয়, যে সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

'প্রতিটি নতুন উদ্ভাবন বিদ'আত আর প্রতিটি বিদ'আত গোমরাহী।'[১২২]

আর যে ব্যক্তি এভাবে কোনও অথরিটি ছাড়া, শরঈ কোনও প্রমাণ ছাড়া নব সৃষ্ট বিষয়কে দ্বীনের অংশ বানায়, সে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে,

---

১২২. সুনানুন-নাসাঈ, হাদীছ নং ১৫৬০; সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৯৯১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪৫

যা করতে আয়াতে বারণ করা হয়েছে– 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করো না।'

ঈসালে ছাওয়াবের সঠিক পদ্ধতি

কারও আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে শরী'আত তার জন্য ঈসালে ছাওয়াব করার অনুমতি দিয়েছে। যে-কোনও নেক কাজ করে তার ছাওয়াব মৃতব্যক্তির জন্য পৌছানো যেতে পারে। এতটুকু বিষয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং চাইলে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে তার ছাওয়াব মৃতব্যক্তিকে হাদিয়া করা যেতে পারে। নফল নামায পড়ে, তাসবীহ আদায় করে বা রোযা রেখে তার ছাওয়াবও পৌছানো যেতে পারে। মৃতব্যক্তিকে ছাওয়াব দেওয়ার নিয়তে হজ্জ বা উমরাহ করা যেতে পারে, তাওয়াফ করা যেতে পারে এবং এমনিভাবে যেকোনও নেক কাজই করার অবকাশ আছে। এভাবে ঈসালে ছাওয়াব করা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। কিন্তু শরী'আত বিশেষ কোনও নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেয়নি যে, ঈসালে ছাওয়াবের জন্য কেবল সেটাই করতে হবে; বরং যার পক্ষে যে নেক কাজ সহজ, সে তাই করতে পারে। তার দ্বারাই সে ঈসালে ছাওয়াব করতে পারে। একজন কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত করতে পারে, সে তা দ্বারাই ঈসালে ছাওয়াব করুক। আরেকজনের ইচ্ছা নফল নামায পড়ে ঈসালে ছাওয়াব করবে, ব্যস তো তাই করুক। মোটকথা, ইখলাসের সাথে যে-কোনও নেক কাজ করেই এটা করার অবকাশ আছে। শরী'আত এ ব্যাপারে কোনও ধরাবাধা নিয়ম করে দেয়নি যে, অমুক দিন, অমুক সময়ে কাজ করতে হবে এবং এই পদ্ধতিতে এই পরিমাণ করতে হবে।

তীজা করা গুনাহ কেন?

তা সত্ত্বেও লোকে মনগড়াভাবে নানা রকম নিয়ম-পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিয়েছে, যেমন মৃত্যুর তৃতীয় দিনে সকলে একত্র হয়ে কুরআনখানী করতে হবে, যাকে 'তীজা' (কুলখানী) বলা হয়ে থাকে। এ দিন বেশ

খানাপিনারও আয়োজন করা হয় আর মনে করা হয়, মৃতব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য এটা একটা অবশ্য করণীয় কাজ। যদি এমনিই প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন নিজে-নিজে কুরআন শরীফ পড়ত, তারপর আবার লোক সমাগম হওয়ার পর এই ভেবে সকলে পড়ত যে, আচ্ছা সবাই যখন আছি, কিছুক্ষণ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে নিই, তাও মূলত জায়েয হতো, কিন্তু একেবারে তৃতীয় দিনকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যে, এ দিনই কুরআনখানী হবে, সকলে মিলে করতে হবে, সঙ্গে খানাপিনার আয়োজন থাকতে হবে, মানুষকে দাওয়াত করতে হবে আর যারা এরূপ করবে না, তারা 'ওহাবী' হয়ে যাবে, এটা দ্বীনের মধ্যে মনগড়া সংযোজনের নামান্তর। এভাবে মনগড়া কোনও নিয়ম-পদ্ধতিতে দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বানিয়ে নেওয়া, যা ছাড়া যেন দ্বীন পূর্ণাঙ্গ নয় এবং যা পালন না করলে মানুষ নিন্দাযোগ্য ও গুনাহগার হয়ে যাবে, এটাই সেই জিনিস যা একটা বৈধ কাজকেও বিদ'আত বানিয়ে দেয়। আজকাল তো অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোনও মৃত ব্যক্তির জন্য তীজা করা না হলে সেই ব্যক্তিই নিন্দিত হয়। বলা হয়,

'মরে গেল মরদূদ,
না ফাতেহা, না দরূদ।'

এভাবে যে বেচারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, 'তীজা' না হওয়ায় সেও নিন্দাযোগ্য হয়ে গেল। এই অবশ্যপালনীয় মনে করা এবং পালন না করাকে নিন্দাযোগ্য অপরাধ মনে করাটাই এ কাজকে বিদ'আত বানিয়ে দিয়েছে। যদি জরুরি ও অবশ্যপালনীয় কাজ মনে করা না হয় এবং যে-কোনও দিন ঈসালে ছাওয়াব করা হয়, তা প্রথম দিনই হোক বা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ যে-কোনও দিনই হোক না কেন তা দোষের নয়। কিন্তু দিন-তারিখ ও নিয়ম নির্দিষ্ট করে নেওয়ার কারণে তীজা, (কুলখানী) চল্লিশা এবং এ জাতীয় আরও যা করা হয়, সবই বিদ'আত।

ঈদের দিন কোলাকুলি

সারা দেশে দস্তুর হয়ে গেছে ঈদের দিন ঈদের নামায আদায়ের পর একে অন্যের সাথে কোলাকুলি করতে হয়। এমনিতে মু'আনাকা করাটা

কোনও গুনাহের কাজ নয়; বরং জায়েয। কিন্তু এই গলাগলি করাটা তো সুন্নত কেবল প্রথম সাক্ষাতকালে। কোনও ব্যক্তি সফর থেকে এসেছে এবং তার সাথে এই প্রথম সাক্ষাত হচ্ছে, এরূপ ক্ষেত্রে তার মুআনাকা ও গলাগলি করা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। সাধারণ অবস্থায় মু'আনাকা করা যেমন সুন্নত নয়, তেমনি গুনাহও নয়। কোনও এক মুসলিম ভাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসল। আপনার ইচ্ছা হল তার সাথে মু'আনাকা করবেন। তা করুন। এতে দোষের কিছু নেই। এটা গুনাহও নয়, সুন্নতও নয়। কিন্তু কেউ যদি মনে করে ঈদের দিন ঈদের নামায আদায়ের পর মু'আনাকা ও গলাগলি করা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বা দ্বীনের অংশ আর কেউ এটা না করলে তার ঈদই পূর্ণ হয় না বা তার দ্বীন ত্রুটিপূর্ণ হয় ও সে গুনাহগার হয়ে যায়, তবে এটা ভুল। এরকম ধারণা নিয়ে ঈদের দিন গলাগলি করা জায়েয নয়। করলে তা বিদ'আত হয়ে যাবে। এরকম ধ্যান-ধারণা ছাড়া কেবল নিজ মনের আনন্দ প্রকাশের জন্য গলাগলি করলে ঠিক আছে। সেটা দোষের নয়। কিন্তু এটাকে সুন্নত মনে করা ও দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করার কারণেই এ কাজ বিদ'আতে পরিণত হয়ে যায়।

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযের পর দু'আ করতেন বলে প্রমাণিত। কিন্তু তা সম্মিলিতভাবে হতো না। তিনি নিজের ভাবে দু'আ করতেন আর সাহাবায়ে কেরামও যে যার মতো দু'আ করতেন। বর্তমানে দু'আর যে নিয়ম চালু হয়ে গেছে, অর্থাৎ ইমাম দু'আ করে আর মুসল্লীগণ আমীন-আমীন বলতে থাকে, হাদীছের কোনও বর্ণনা দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এ পদ্ধতি নাজায়েযও নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে নাজায়েয বলেননি। কাজেই দু'আর এ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। কেউ এটা অবলম্বন করলে গুনাহ হবে না। কিন্তু কেউ যদি এ পদ্ধতিতে দু'আ করাকে জরুরি মনে করে এবং এটাকে নামাযের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে

করে আর যারা এভাবে দু'আ করে না তাদের নিন্দা-সমালোচন করে, তবে তখন এ পদ্ধতি বিদ'আত ও নাজায়েয হয়ে যাবে। এ কারণেই আপনারা লক্ষ করে থাকবেন, জুমু'আর নামাযের পর আমি কখনও সম্মিলিত দু'আ করি আবার কখনও ছেড়েও দিই। প্রথমবার যখন আমি দু'আ ছেড়ে দিই, তখন বহু লোক প্রশ্ন করেছিল দু'আ করলাম না কেন? আমি উত্তর দিয়েছিলাম, অনেকের ধারণা সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছিল এভাবে দু'আ করাটা নামাযের অংশ আর এখনই তো তার প্রমাণ মিলে গেল যে, আমি দু'আ না করায় অনেকের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে দু'আ না করলে তাদের দৃষ্টিতে নামায অসম্পূর্ণ থেকে যায় আর এরকম ধারণাই একটা বৈধ কাজকেও বিদ'আত বানিয়ে দেয়। ব্যস এ কারণেই আমি দু'আ করিনি। এখন থেকে এরকমই করা উচিত। কখনও দু'আ করা এবং কখনও না করা।

মানুষকে যখন বলা হয় 'তীজা', চল্লিশা ইত্যাদি বিদ'আত, তখন সাধারণত জওয়াব দেওয়া হয় আমরা তো কোনও গুনাহের কাজ করছি না। আমরা তো কুরআন পড়ছি, মানুষকে খানা খাওয়াচ্ছি। তা কুরআন পড়া ও খানা খাওয়ানো কি গুনাহের কাজ? সত্য বটে এ দু'টি কাজের কোনওটিই গুনাহ নয়, কিন্তু গুনাহ নয় তখনই, যখন একে শরী'আতের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা না হবে এবং কেউ না করলে তার নিন্দা-সমালোচনা করা না হবে। এরকম মনে না করলে অবশ্যই এ কাজ জায়েয। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার তো তা নয়। বাস্তবে তো মৃত ব্যক্তির ঈসালে ছাওয়াবের জন্য এ কাজ করাকে দ্বীনের অংশ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে, যে কারণে কেউ না করলে তাকে গালমন্দ করা হচ্ছে। এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিঙিয়ে যাওয়ার শামিল। আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি, তাতে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সমস্ত বিদ'আতই এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। কেননা নিজের পক্ষ থেকে কোনও নিয়ম তৈরি করে তাকে জরুরি বানিয়ে নেওয়া এবং কেউ তা পালন না করলে তার নিন্দা-সমালোচনা করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিঙিয়ে যাওয়ারই নামান্তর।

কবরের উপর ফুলের চাদর দেওয়া

আর এ কারণেই কবরের উপর চাদর দেওয়া বিদ'আত। এমনিতে আপনার মনের আবেগে যদি আপনার পিতার কবরের উপর চাদর দিতে চান আর তাকে দ্বীনের অংশ ও ছাওয়াবের কাজ মনে না করেন, তবে দিন না; কে আপনাকে বারণ করছে! কিন্তু যখন আপনি মনে করবেন এটা দ্বীনের অংশ ও সওয়াবের কাজ আর কোনও ব্যক্তি তার পিতার কবরে চাদর না দিলে তাকে দোষ দেবেন আর বলবেন, সে তার পিতাকে যথাযথ সম্মান করল না, এটা চরম সীমালঙ্ঘন এবং এ কারণেই চাদর দেওয়ার কাজটি বিদ'আত হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজের জন্য যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই সীমা থেকে কাজটিকে আরও সামনে নিয়ে যাওয়া যেমন মুস্তাহাব কাজকে সুন্নতের স্তরে নিয়ে যাওয়া বা সুন্নত কাজকে ওয়াজিবের স্তরে নিয়ে যাওয়া, সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা এবং এর ফলে সে কাজ বিদ'আত হয়ে যায়। আর এ জাতীয় তৎপরতা لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ -এর নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা

এই হচ্ছে বিদ'আত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা। কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াত থেকেই এ সম্পর্কিত বিধান বের হয়ে আসে। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাদের অন্তরে সঠিক কথা বসিয়ে দিন, আমাদেরকে দ্বীনের প্রকৃত বুঝ দান করুন, দ্বীনের মর্মকথা ও দ্বীনের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা বোঝার তাওফীক দিন এবং তাঁর মরজি মোতাবেক আমাদের গোটা জীবন পরিচালিত করুন ও কবুল করে নিন, আমীন।

প্রকাশ থাকে যে, এ বয়ান দ্বারা কাউকে কটাক্ষ করা বা কাউকে নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়। আমাদের সকলকেই আল্লাহ তা'আলার কাছে যেতে হবে। নিজ-নিজ কবরে প্রত্যেককেই শুইতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে এক-একটি করে সমস্ত কাজের জন্য জবাবদিহী করতে হবে। কাজেই কোনও কাজ ও কোনও মতের উপর জিদ ধরে বসে থাকা

ঠিক নয়। এ কাজ আমাদের বাপদাদার আমল থেকে চলে আসছে বলে এটা ছাড়া যাবে না– এটা কোনও কথা নয়। দ্বীনের অনুসরণই আসল কথা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেটাই দ্বীন। তাঁর শিক্ষার বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করলে সেটা আর যাই হোক দ্বীন হবে না কিছুতেই, তাতে সে কাজ যত প্রাচীন প্রথাই হোক না কেন, শত-শত বছর যাবতই তা প্রচলিত থাকুক না কেন। কুরআন-হাদীছে যে কাজের কোনও ভিত্তি নেই, সে কাজ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। দ্বীন হিসেবে তা করার কোনও সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের অন্তরে এই বুঝ দান করুন এবং আমাদেরকে এ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

তাবিজ-কবয ও ঝাড়-ফুঁক*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهٗ اَحَدٌ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّالْأُفُقَ فَرَجَوْتُ اَنْ تَكُوْنَ أُمَّتِيْ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهٗ ثُمَّ قِيْلَ لِيْ اُنْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيْلَ لِيْ اُنْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اَمَا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ وَلٰكِنَّا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَلٰكِنْ هٰؤُلَاءِ هُمْ اَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ أَمِنْهُمْ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ اَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ.

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৩১-৬২

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে বের হয়ে আসলেন। তারপর বললেন, (হজ্জের মওসুমে কাশ্‌ফের মাধ্যমে) আমার সামনে সমস্ত উম্মতকে পেশ করা হল। দেখতে পেলাম কোনও নবী যাচ্ছেন আর তাঁর সঙ্গে আছে একজন লোক, কোনও নবী যাচ্ছেন আর তাঁর সঙ্গে দু'জন লোক, কোনও নবী যাচ্ছেন আর তাঁর সঙ্গে জনাকয়েক লোক। কোনও নবী যাচ্ছেন একা, তাঁর সঙ্গে একজনও নেই। তারপর দেখলাম বিপুল সংখ্যক লোকের একটি দল, যারা ছিল দিগন্ত জোড়া। আশা করছিলাম তারা হবে আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল, এই হল মূসা ও তার সম্প্রদায়। তারপর আমাকে বলা হল তাকাও। দেখলাম দিগন্ত ছাওয়া বিপুল সংখ্যক লোকের এক একটি দল। বলা হল, ওই দিকে তাকাও, ওই দিকে তাকাও, দখেলাম দিগন্ত ছাওয়া বিপুল সংখ্যক লোকের এক একটি দল। বলা হল, এরা সব তোমার উম্মত। তাদের সঙ্গে আছে এমন সত্তর হাজার লোক, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। এতটুকু শোনার পর লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তিনি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন না (যে, সেই সত্তর হাজার কারা?)। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। তারা বললেন, আমাদের তো অবস্থা হল, আমাদের জন্ম হয়েছে শিরকের ভেতর, তারপর আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। আসলে তারা হবে আমাদের সন্তানেরা (যাদের জন্মই হয়েছে ইসলামের উপর।) তাদের এসব কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে গেল, তিনি বললেন, তারা ওইসব লোক, যারা কোনওকিছুকে অলক্ষণে মনে করে না, ঝাড়ফুঁক করে না, দাগিয়ে চিকিৎসা করে না এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। অমনি উক্কাশা ইবন মিহ্‌সান রাযি. উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাদের একজন হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আরেকজন উঠে বলল, আমি কি তাদের একজন হব? তিনি বললেন, উক্কাশা তোমাকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।[১২৩]

---

১২৩. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৫৩১১; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৩২৩; সুনান

মুহাম্মাদী উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং যে কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনন্দ

এ হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সমস্ত নবী রাসূলকে তাদের আপন-আপন উম্মতসহ পেশ করা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজ উম্মতকেও। তাতে তিনি দেখতে পান, তাঁর উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা অনেক বেশি আর সে কারণে তিনি অত্যন্ত খুশী হন।

অন্য বর্ণনায় বিষয়টা আরও বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। তাতে আছে, তাঁর সামনে যখন অন্যান্য নবীগণের উম্মতকে পেশ করা হয়েছে, তখন দেখা যাচ্ছিল কোনও কোনও নবীর উম্মত মাত্র দু'তিনজন। কোনও নবীর সঙ্গে দশ-বারোজন। কেননা বহু নবী এমন ছিলেন যার প্রতি কম লোকই ঈমান এনেছিল। কারও প্রতি ঈমান এনেছে দশ-বারোজন, কারও প্রতি এক-দু'শজন, কারও প্রতি হাজারজন। এক নবীর উম্মত-সংখ্যা বেশ ভালোই দেখা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবছিলেন তারা বুঝি তাঁর নিজের উম্মত। আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? বলা হল, এরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উম্মত। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি যারা ঈমান এনেছিল, তাদের সংখ্যা অন্যান্য নবীর উম্মত অপেক্ষা বেশিই ছিল। তারপর তাঁর সামনে এক বিশাল জমায়েত পেশ করা হল। তারা এত বেশি ছিল যে, একটা দিগন্ত ছেয়ে গেল এবং পাহাড়-পর্বত ঢেকে গেল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা? বলা হল, এরা আপনার উম্মত। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি খুশী? অর্থাৎ অন্য সব নবীর উম্মত অপেক্ষা আপনার উম্মত সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় আপনি খুশী কি-না? তিনি জানালেন, হ্যাঁ, ইয়া রব! আমি খুশী যে, আমার উম্মতের সংখ্যা অনেক বেশি।

তিরমিযী, হাদীছ নং ২৩৭

সত্তর হাজার লোকের বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদ শোনালেন,

إِنَّ مَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعِيْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'তাদের সাথে সত্তর হাজার এমন আছে, যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে।'

তারপর এ সত্তর হাজার লোক কী কারণে বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ করবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষ চারটি গুণ আছে এবং সেটাই তাদের এই মহামর্যাদার কারণ। গুণ চারটি নিম্নরূপ।

(এক) তারা কোনও কিছুকে অলক্ষণে মনে করে না। অনেকের মধ্যে কুসংস্কার আছে যে, বিভিন্ন জিনিসকে তারা অশুভতার লক্ষণ বানিয়ে নিয়েছে। তার কোনও একটা দেখলেই বিশেষ-বিশেষ কাজ অশুভ হবে বলে মনে করে।

(দুই) তারা তাবিজ-কবজ করে না।

(তিন) দাগিয়ে চিকিৎসা করে না। এটা চিকিৎসার একটা প্রাচীন পদ্ধতি। কোনও কোনও রোগীর ক্ষেত্রে যখন অন্য কোনও ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হতো না, তখন লোহা গরম করে তা দ্বারা রোগীর শরীর দাগানো হতো।

(চার) তারা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখে। যাদের মধ্যে এ গুণ চারটি পাওয়া যাবে, তারা সেই সত্তর হাজারের দলে থাকবে, যারা বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ করবে।

সত্তর হাজারের সংখ্যাটি কেন?

হাদীছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে তাদের জন্য ব্যবহৃত 'সত্তর হাজার' এর অংকটি সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। কেউ বলেন, বাস্তবিকই তাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার। কারও মতে

এ অংকটি তাদের প্রকৃত সংখ্যা বোঝানোর জন্য নয়; বরং তাদের আধিক্য বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আধিক্য বোঝানোর জন্য অংকবিশেষের ব্যবহার একটা বহুল প্রচলিত রীতি। সব ভাষাতেই আছে। আরবীতে সত্তর হাজার এর অংকটি এ-রকমই। বহু ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহার হয় আর এর দ্বারা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নয়; বরং সংখ্যাধিক্য বোঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানেও ব্যাপারটা তাই। সে হিসেবে এর অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে এ উম্মতের বিপুল সংখ্যক লোককে বিনা হিসেবে জান্নাতে দাখিল করবেন।

আবার কারও মতে হাদীছে যে সত্তর হাজারের কথা বলা হয়েছে, তারা দল নেতা স্বরূপ। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আরও সত্তর হাজার করে লোক থাকবে, যারা বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাদের সকলকেও তাদের মধ্যে শামিল করে নিন, আমীন।

সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত থাকার দু'আ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিনা হিসাবে সত্তর হাজার লোকের জান্নাতপ্রাপ্তির কথা জানালেন, তখন উক্কাশা রাযি. নামক এক সাহাবী দাঁড়িয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! فَادْعُ اللهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ 'আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই তাঁর জন্য দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, আপনি উক্কাশাকেও তাদের একজন বানিয়ে দিন।' ব্যস আর কী কথা, প্রথম যাত্রাতেই উক্কাশা রাযি.-এর কাজ হয়ে গেল। সেই সত্তর হাজারের মধ্যে তারও জায়গা হয়ে গেল। অন্য সাহাবীগণ দেখলেন এ তো বড় সুযোগ, সঙ্গে সঙ্গে আরও এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্যও দু'আ করুন, যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বললেন, سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ 'উক্কাশা সে সুযোগ তোমার আগে নিয়ে ফেলেছে।'

অর্থাৎ সবার আগে যেহেতু সে আবেদন করেছে, আমি তার আবেদন রক্ষা করেছি। এখন আর এ সিলসিলা দীর্ঘ হবে না। এখন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। তিনি যাকে চান এ দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন।

এ হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য সুসংবাদ রয়েছে, বিশেষত সেই সকল লোকের জন্য, যারা বিনা হিসাবে জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে। আমরা কোন্ মুখে নিজেদেরকে সেই দলে শামিল করে নেওয়ার জন্য দু'আ করব? কিন্তু ব্যাপারটা তো আল্লাহ তা'আলার রহমতের, তার অপার রহমতের দিকে লক্ষ করে একজন সর্বনিম্ন স্তরের মুসলিমও এই দু'আ করতে পারে যে, হে আল্লাহ! আমি ওই দলে শামিল থাকার যোগ্য তো নই, কিন্তু আপনার রহমতের দিকে তাকালে যে আশাবাদী হই! আপনার যা রহমত, তাতে আমার মতো গুনাহগারকেও বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করাটা অসম্ভব কোনও ব্যাপার নয়। আপনার রহমত সর্বব্যাপী। সেই ব্যাপকতার ভেতর আমার মতো ব্যক্তিও শামিল থাকার জন্য আশান্বিত হয় বৈকি! এভাবে প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উচিত বিনা হিসাবে জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে থাকা।

বিনা হিসাবে জান্নাত লাভকারীর প্রথম গুণ

যা হোক, এ হাদীছে বিশেষভাবে চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে, যার অধিকারীগণ বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ করবে। তার মধ্যে প্রথম গুণ হল কোনও অসুখ-বিসুখে দাগানোর চিকিৎসা গ্রহণ না করা। সেকালে আরবদের মধ্যে এ চিকিৎসার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কোনও রোগীর ক্ষেত্রে যখন অন্য কোনও ব্যবস্থা কার্যকর হতো না, তখন গরম লোহা দ্বারা রোগীর শরীরে দাগ দেওয়া হতো। এতে বলাই বাহুল্য রোগীর ভীষণ কষ্ট হতো। তপ্ত লোহা দিয়ে শরীর স্যাকা দিলে রোগীর উপর দিয়ে কী কিয়ামত যাবে তা কি ভাবা যায়? কিন্তু তারা এ চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিল। মনে করত এতে রোগ ভালো হয়ে যায়। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসার এ ব্যবস্থা পসন্দ করেননি। কেননা এ

ব্যবস্থায় কষ্ট তো নগদ ভুগতেই হয়, অথচ আরোগ্য লাভ মোটেই নিশ্চিত নয়। যে চিকিৎসায় নগদ কষ্ট ভুগতে হয়, অথচ আরোগ্য লাভ আদৌ হবে কি হবে না তার ঠিকানা নেই, এরূপ চিকিৎসা পদ্ধতি পসন্দনীয় নয়। সুতরাং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাগিয়ে চিকিৎসা করার পদ্ধতিটি পসন্দ করেননি, যা হাদীছে স্পষ্ট।

চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় রাখা চাই

দ্বিতীয়ত দাগিয়ে চিকিৎসা করার ব্যাপারটা চিকিৎসার নামে একটা বাড়াবাড়িও বটে। আরবের প্রসিদ্ধ প্রবচন اٰخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ 'দাগানো হল শেষ চিকিৎসা।'

এ কথা তো ঠিক, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসা করা সুন্নত, কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থাটা হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ। বাড়াবাড়ি করা চলবে না, চরম পন্থা অবলম্বন করা যাবে না। বাড়াবাড়ি করলে তা আল্লাহর প্রতি ভরসার কমতি প্রমাণ করবে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতা না থাকলেই মানুষ মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং বেসামালভাবে চিকিৎসা নির্ভর হয়ে পড়ে। কাজেই চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কোনও ভালো লক্ষণ নয়। তাই এটা পসন্দনীয় নয়। মানুষকে অছিলা ও আসবাব-উপকরণ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু সেটা পরিমিতি রক্ষা করে। এক হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, اَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ 'তোমরা জীবিকা সন্ধানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।'[১২৪]

কাজেই আসবাব-উপকরণ অবলম্বন করা দোষের নয়; বরং তা করাই নিয়ম। দোষ হল তাতে বাড়াবাড়ি করা। বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন না করে উপায় অবলম্বন করা সুন্নাত। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া ও বাড়াবাড়ি করা পসন্দনীয় নয়।

---

১২৪. সুনানে ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ২১৩৫; মুয়াত্তা মালেক, কানযুল উম্মাল, হাদীছ নং ৯২৯১

দ্বিতীয় গুণ

'দ্বিতীয় গুণ বলা হয়েছে, তারা কোনও কিছুকে অলক্ষণে মনে করে না।' সমাজে বিভিন্ন জিনিসকে অমঙ্গল চিহ্ন মনে করা হয়ে থাকে। এটা একটা কুসংস্কার। যেমন মনে করা হয় বিড়াল আড়াআড়ি রাস্তা পার হলে সফর অশুভ হয়। কাজেই সফরকালে এরূপ ঘটলে সে সফর মুলতবি করা হয়। জাহিলী যুগে এ জাতীয় কুসংস্কার অতি ব্যাপক ছিল, যার মূল কারণ ছিল আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরতার অভাব। যারা বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ করবে, তারা এ কুসংস্কারে বিশ্বাসী হবে না। তারা কোনও কিছুকে অমঙ্গল চিহ্ন মনে করবে না।

তৃতীয় গুণ

'তারা তাবিজ ও ঝাড়ফুঁক করে না।'

অর্থ্যাৎ যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা তাবিজ ও ঝাড়ফুঁক করে চিকিৎসা গ্রহণ করে না। বিষয়টা একটু ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। বর্তমানে এ ব্যাপারে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় রকম বাড়াবাড়ি আছে। একদল লোক তো তাবিজ ও ঝাড়ফুঁককে সমর্থন করে না। তাদের মধ্যে অনেকে তো কেবল নাজায়েয বলেই ক্ষান্ত হতে রাজি না। তারা এটাকে যথারীতি একটা শিরক কাজ মনে করে এবং জোরেশোরে সে কথা প্রচারও করে। অপরদিকে কিছু লোক তাবিজ-কবযের উপর অতি মাত্রায় বিশ্বাসী। তারা এ জিনিসের এত বেশি ভক্ত-অনুরক্ত যে, সব কাজেই তাদের একটা তাবিজ চাই। সবকিছুতে ওজীফা খোঁজে। আমার কাছে প্রতিদিনই অসংখ্য লোক আসে কেবল ওজীফার জন্য। জনাব, আমার মেয়ের বিবাহ আসছে না, একটা ওজীফা বলে দিন, যা আমল করলে প্রস্তাব আসবে। আমার অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেছে, একটা আমল শিখিয়ে দিন, যাতে ঋণ শোধ হয়ে যায়। আমার চাকরি হচ্ছে না, একটা আমল বলে দিন, যা করলে চাকরি লাভ হবে। ব্যস, দিন-রাত কেবল এই আমল-ওজীফার জন্য ছোটাছুটি, তাবিজ কবযের জন্য দৌড়ঝাঁপ, যেন এসব দ্বারাই মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়ে যাবে। আর কোনও চেষ্টা-চরিত্র করতে হবে না।

বস্তুত উভয়টাই বিপরীতধর্মী দুই প্রান্তিকতা। শরী'আত এ ব্যাপারে যে শিক্ষা দান করেছে সেটাই মধ্যপন্থা। কুরআন হাদীছ দ্বারা আমরা যে নির্দেশনা পাই তা সব রকম একদেশদর্শিতা থেকে মুক্ত একটা ভারসাম্যমান পন্থা। কাজেই ঝাড়ফুঁক কোনও কাজেরই নয় বা তা সম্পূর্ণ অবৈধ, এ ধারণা যেমন গলত, তেমনি সবকিছু ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ-কবয দ্বারাই হয়ে যাবে। এটাও একটা অলস ও ভ্রান্ত চিন্তা।

যারা ঝাড়ফুঁক থেকে বিরত থাকে আলোচ্য হাদীছে তাদের প্রশংসা করার অর্থ এ নয় যে সর্ব প্রকার ঝাড়ফুঁকই এর অন্তর্ভুক্ত। বরং এর দ্বারা বিশেষ ধরনের ঝাড়ফুঁক বোঝানো উদ্দেশ্য অর্থাৎ জাহিলী যুগে যার প্রচলন ছিল। ইসলাম-পূর্ব যুগে অদ্ভুত-অদ্ভুত কিসিমের ঝাড়ফুঁক প্রচলিত ছিল। মানুষ নানা রকম আজগুবি মন্ত্র মুখস্থ করে রাখত। কোনওটা রোগ-ব্যাধির জন্য, কোনওটা বালা-মসিবতের জন্য এবং কোনওটা আরও সব উদ্দেশ্যে। বিশ্বাস ছিল মন্ত্র দ্বারাই কিল্লা ফতে হয়ে যাবে, অধিকাংশ মন্ত্রই পড়া হতো জিন শয়তানদের লক্ষ্য করে। তাতে তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হতো, অনেক সময় সাহায্য চাওয়া হতো দেব-দেবী ও প্রতিমার কাছে।

যা হোক তাদের সেসব মন্ত্রের একটা মন্দ দিক তো স্পষ্ট যে, তা দ্বারা গায়রুল্লাহর কাছে, জিন-শয়তান ও প্রতিমাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হতো। কাজেই সেসব মন্ত্র পাঠ ছিল একটা শিরকী কাজ।

দ্বিতীয় মন্দ দিকটা একটু সূক্ষ্ম। আরবগণ সেসব মন্ত্রকে আপন শক্তিতে ক্রিয়াশীল মনে করত। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস ছিল– এসব মন্ত্রের নিজস্ব এমন শক্তি আছে, যার বলে এগুলো স্বয়ং কার্য সম্পাদন করতে পারে। যেমন কোনও রোগী তা পড়লে সে সুস্থ হয়ে যাবে। এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাছির দিলেই তার তাছির হবে আর তিনি তাছির না দিলে এগুলোর কোনও ফলাফল পাওয়া যাবে না। আর যেহেতু এরকম বিশ্বাস ছিল না, বরং বিশ্বাস ছিল তা আপন শক্তিতেই কাজ করে, তাই তাদের সে মন্ত্র এই দ্বিবিধ দোষে দুষ্ট ছিল। তাছাড়া আরও একটি ব্যাপার ছিল এই যে, অনেক মন্ত্র ছিল সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। কী যে তার অর্থ

তা বোঝা যেত না। বরং তার অধিকাংশই ছিল বিলকুল অর্থহীন। তা যেমন উচ্চারণ করা হতো, তেমনি তাবিজে লেখাও হতো। আর সেসব শব্দের মাধ্যমেও আল্লাহ ছাড়া অন্যের তথা জিন ও শয়তানদের কাছে সাহায্য চাওয়া হতো! বলা বাহুল্য এটা ছিল এক ধরনের শিরক। এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলী যুগের ঝাড়ফুঁককে নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং ইরশাদ করেছিলেন, যারা এ জাতীয় ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ-কবয থেকে বিরত থাকে, তারা সেইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করবেন। সুতরাং এ হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে কেবল জাহিলী যুগের প্রচলিত ঝাড়ফুঁককে, সাধারণভাবে সর্বপ্রকার ঝাড়ফুঁককে নয়।

প্রত্যেক সৃষ্টিরই স্বতন্ত্র গুণাগুণ ও শক্তি আছে

বিষয়টা একটু ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। এটা তো সকলেরই জানা যে, এই বিশ্ব-জগত আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি এবং তিনিই সুশৃঙ্খল এক ব্যবস্থাপনার অধীনে সবকিছু পরিচালনা করছেন। তিনি প্রতিটি সৃষ্টির ভেতর এক-এক ধরনের গুণ ও তাছির রেখেছেন। যেমন পানির গুণ হল পিপাসা নিবারণ করা আর আগুনের বৈশিষ্ট্য দহন করা। তিনি যদি আগুনের দহনক্রিয়া লোপ করে দেন, তবে তা কোনও কিছু জ্বালাতে পারবে না। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তো আগুন এ কারণেই জ্বালাতে পারেনি। বরং তার জন্য তা পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়েছিল। এমনিভাবে বাতাসের এক রকম তাছির এবং মাটির অন্যরকম। বিশ্ব-জগতে আল্লাহ তা'আলার অগণ্য সৃষ্টি আছে। মানুষ, জিন, শয়তান, জীব-জন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ কত কিছু। এদের প্রত্যেকের ভেতরই তিনি কোনও না কোনও শক্তি ও তাছির নিহিত রেখেছেন। মানুষের যেমন শক্তি আছে, তেমনি ঘোড়া-গাধা, বাঘ, হাতি সবকিছুই শক্তিসম্পন্ন জীব। প্রত্যেকের শক্তির পরিমাপ ও মানদণ্ড আলাদা। বাঘ যে শক্তি রাখে, মানুষ তা রাখে না। সাপের বিষ আছে, বিচ্ছুরও আছে, কিন্তু উভয়ের সমান নয়। সাপে কামড়ালে মানুষ মারা যায় কিন্তু বিচ্ছুর দংশনে কেউ মরে না, কেবল কষ্ট পায়। মোটকথা

প্রত্যেকের ভেতরই কিছু না কিছু শক্তি ক্ষমতা আছে এবং সে শক্তি বৈচিত্র্যময়, একেক সৃষ্টির একেক রকমের।

জিন ও শয়তানদের শক্তি

আল্লাহ তা'আলা জিন ও শয়তানদেরকেও কিছু ক্ষমতা দান করেছেন। অনেক সময় সে ক্ষমতা মানুষের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়, যেমন জিন ও শয়তানদের একটা ক্ষমতা হল দৃষ্টির আড়াল থাকতে পারা। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য। মানুষের এ ক্ষমতা নেই। মানুষ যদি চায় যে কারও দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে না, তবে সে তা পারবে না। এমন কোনও রূপ তার পক্ষে ধরাই সম্ভব নয় যা কারও নজরে আসবে না। এমনিভাবে জিন শয়তানদের আরেকটা ক্ষমতা হল মুহূর্তের মধ্যে দূর-দূরান্তে চলে যাওয়া। পলকের ভেতর তারা কোথা থেকে কোথা উড়ে চলে যায়। কিন্তু মানুষ তা পারে না। কেউ যদি চায় আমি এক লহমার মধ্যে উড়ে আমেরিকায় চলে যাব, তবে সেটা তার সাধ্যের অতীত।

জিন ও শয়তানদের এসব ক্ষমতার কারণে অনেক সময় মানুষ বিস্ময় মানে, মুগ্ধ হয় এবং কখনও বা তাদের প্রতি ভক্তিও সৃষ্টি হয়। তারা মানুষের সেই মুগ্ধতা ও ভক্তির সুযোগও নেয়। তাদের আসল কাজই তো মানুষকে বিপথগামী করা। আর এজন্য অনেক সময় তারা মানুষকে এমন এমন কথা শেখায় ও তা বলতে উৎসাহিত করে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিরক হয়ে থাকে। যেমন তারা মানুষকে প্ররোচনা দেয়, তুমি যদি এই কথাটি বল– যা কিনা একটি শিরকী কথা– কিংবা এই কাজটি কর– যা একটি শিরকী কাজ ও আল্লাহ তা'আলার শানে বেআদবী– তবে আমরা তোমার উপর খুশী হব এবং আমাদের যে ক্ষমতা আছে তা ব্যবহার করে তোমার এই-এই উপকার করব। ব্যস, মানুষ তাদের সেই প্ররোচনা ও ছলনায় পড়ে যায়। মনে করুন, কারও একটা মূল্যবান জিনিস হারিয়ে গেলে। বেচারা সেটা জান দিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোনও হদিস মিলছে না। ঘটনাক্রমে কোনও জিন বা শয়তানের চোখে সে জিনিসটি পড়ে গেল। যত দূরেই থাকুক তার তো এক মিনিটের মধ্যে সেটা এনে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। আল্লাহ তা'আলাই তাকে সে শক্তি দান করেছেন। সে তার ভক্তদের বলে

রেখেছে, তোমরা এই মন্ত্র পাঠ করলে আমি তোমাদের সাহায্য করব। কাজেই এখন সেই ব্যক্তি যদি শয়তানের শেখানো মন্ত্র পাঠ করে, তবে শয়তান তার হারিয়ে যাওয়া বস্তুটি এনে দেবে। এর নাম সিহ্‌র বা যাদু। একে কাহানাত (অতীন্দ্রিয়বাদ) ও ভোজবাজিও বলে। কোনও রকম পুণ্য, তাক্‌ওয়া ও দ্বীনদারীর সাথে এর সম্পর্ক নেই, এমনকি ঈমানের সঙ্গেও নয়। নিকৃষ্টতম কাফেরও এ জাতীয় ভোজবাজি দেখাতে পারে। কারণ এটা যারা করে বশীকরণের মাধ্যমে তারা জিন-শয়তানদেরকে বশ করে নেয়। সেই বশীভূত জিনেরাই তাদের কাজ করে দেয়। লোকে মনে করে তারা খুব উঁচু স্তরের বুযুর্গ, বড় কামেল ব্যক্তি। অথচ আধ্যাত্মিকতার সাথে এসব কাজের বিন্দু-বিসর্গ সম্পর্ক নেই। বরং এর জন্য ঈমানেরও দরকার পড়ে না। এ কারণেই হাদীছে জাদু ও ভোজবাজির নিন্দা করা হয়েছে এবং কঠোরভাবে একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যারা এসব করে অনেক সময় তারা ঈমান হারিয়ে কাফের পর্যন্ত হয়ে যায়।

যা হোক, প্রাক-ইসলামী যুগে এসব জাদু-টোনার প্রচলন ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। কাজেই যদি আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান থাকে, তাঁর কুদরতের উপর বিশ্বাস থাকে তবে এসব শিরকী মন্ত্র-তন্ত্র ও ফযূল বাক্যাবলি উচ্চারণ থেকে বিরত থাকা উচিত। এসবের মাধ্যমে শয়তানকে কাজে লাগানো ও তার সাহার্যে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা মোটেই জায়েয নয়। এরকম হারাম ও অবৈধ জিনিসে লিপ্ত হওয়া কোনও মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

রোগীকে ফুঁক দেওয়ার দু'আ

এ জাতীয় মন্ত্র ও শিরকী শব্দাবলির বিপরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নামে ঝাড়ফুঁক শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি নিজেও পবিত্র নামের দ্বারা ফুঁক দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও তা করতে বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তোমরা এই দু'আ পড়-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَذْهَبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

'হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আপনি এ রোগ দূর করে দিন এবং শিফা দান করুন। আপনিই শিফা ও আরোগ্য দানকারী। আপনার দেওয়া আরোগ্য ছাড়া কোনও আরোগ্য নেই। আমরা আপনার কাছে এমন আরোগ্য চাই, যা বিন্দুমাত্র রোগ অবশিষ্ট রাখবে না।'[১২৫]

কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, তিনি এ দু'আ শেখানোর পর ইরশাদ করেন, এ দু'আ পড়ে একটু থুক দেবে এবং এটা পড়ে ঝাড়বে। তিনি নিজেও এরূপ করেছেন।

সূরা ফালাক ও নাস পড়ে দম করা

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল, প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে মু'আউবিযাতায়ন (সূরা ফালাক ও নাস) পড়তেন। কোনও কোনও বর্ণনায় সূরা কাফিরূনের কথাও আছে। তিনি প্রতিটি সূরা তিনবার করে পড়তেন, তারপর উভয় হাতে দম করে সেই হাত দ্বারা সারা দেহ মুছতেন। তিনি বলেন, এর দ্বারা শয়তানের আছর ও ক্রিয়াদি থেকে হেফাজত হয় এবং যাদুর প্রভাব ও অন্যায়-অহেতুক আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়।[১২৬]

অপর এক হাদীছে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত, নিজের হাত পুরোপুরি উঠানোর মতো ক্ষমতাও ছিল না, সে সময় আমার খেয়াল হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিয়মিতই রাতে শোওয়ার আগে মু'আউবিযাতায়ন পড়ে হাতে দম করতেন এবং সেই হাত দিয়ে সারা শরীর মুছতেন, কিন্তু এখন তো তা করার মতো শক্তি তাঁর নেই। এই চিন্তা করে আমিই মু'আউবিযাতায়ন পড়ে তাঁর পবিত্র হাতে দম করলাম, তারপর তাঁর হাতই তাঁর মুবারক শরীরে বুলিয়ে দিলাম। তাঁর হাত দিয়ে এটা করলাম এজন্য যে, আমার হাত দিয়ে করলে অতটা ফল ও আছর হতো না, যতটা তাঁর হাতের বরকতে হওয়ার ছিল।

---

১২৫. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৫২৪৩; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪০৬১; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৪৮৮

১২৬. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৫৮৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪০৬৫; সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৪০৩

আরও বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কালাম ও তাঁর নাম দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার নামে যে তাছির তা শয়তান ও জিনদের শিরকী তন্ত্রমন্ত্রে কী করে হওয়া সম্ভব?

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি.-এর ঘটনা

বিভিন্ন সূত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি.-এর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার তিনি সাহাবায়ে কেরামের একটি কাফেলায় কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে তাদের রসদ ফুরিয়ে গেল। কোথাও কোনও খাবার মিলছিল না। এ অবস্থায় একটি জনপদের উপর দিয়ে তাদের কাফেলা চলছিল। তারা জনপদবাসীদেরকে নিজেদের রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার কথা জানালেন এবং বললেন, তোমাদের কাছে কিছু পানাহার সামগ্রী থাকলে আমাদের আতিথেয়তা করো। ধর্মীয় কারণে মুসলিমদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে থাকবে, যে কারণে তারা সাফ জানিয়ে দিল, তোমাদের আতিথেয়তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কেরাম তাদের উপর শক্তি খাটালেন না। তারা জনপদের বাইরে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম নিলেন। সময়টা ছিল রাত। তারা চিন্তা করেছিলেন ভোর হলে অন্য কোথাও গিয়ে খাদ্যের সন্ধান করবেন।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল অন্য কিছু। সেই জনপদটির মোড়লকে সাপে কাটল। বিষ নামানোর সব চেষ্টাই তারা করল, কিন্তু কোনওটাই কাজে আসল না। কিন্তু মোড়লকে তো বাঁচাতে হবে। শেষে কেউ বলল, বিশ নামানোর জন্য ঝাড়-মন্ত্রই বেশি কাজ দেয়। দেখো কোথাও ঝাড়-মন্তর জানে এমন কাউকে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সে জনপদে ঝাড়-মন্তর জানা কোনও লোক ছিল না। কেউ বলল, বাইরে যে কাফেলা আছে তাদের কাছেই যাও না! তাদেরকে তো দেখতে দরবেশ কিসিমের মনে হয়। জিজ্ঞেস করে দেখো, তাদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে, যে ঝাড়-মন্তর জানে এবং সাপের বিষ নামাতে পারে। অগত্যা তারা কাফেলার লোকদের কাছেই আসল। সামনে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি.-কে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের মধ্যে সর্পদষ্ট

লোককে ঝাড়তে জানে এমন কেউ আছে? এ জনপদের মোড়লকে সাপে দংশন করেছে। আপনাদের মধ্যে এরকম কেউ থাকলে আসুন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বললেন, ঠিক আছে আমি ঝেড়ে দেব, কিন্তু তোমরা বড় বখিল। একদল মুসাফির, যাদের রসদ ফুরিয়ে গেছে, তোমাদের কাছে পানাহারের বন্দোবস্ত করে দিতে বলল, অথচ তোমরা তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখালে না। কাজেই মুফতে হবে না। বলো, ঝেড়ে দিলে তোমরা কী দেবে? তারা বলল, আমরা আপনাকে এক পাল ছাগল দেব, তাও আসুন, আমাদের মোড়লের চিকিৎসা করে দিন। সুতরাং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. গিয়ে তাকে ঝাড়ফুঁক করলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন–

ঝাড়ফুঁক তো আসলে কিছুই আমি জানতাম না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আল্লাহ তা'আলার কালামে অবশ্যই বরকত থাকবে। সুতরাং তা দিয়েই কাজ হবে। সে মতে আমি তাদের সাথে জনপদের ভেতর গেলাম এবং সূরা ফাতিহা পড়ে দম করতে থাকলাম, এভাবে দম করতে করতে শেষ পর্যন্ত তার বিষ নেমে গেল। ফলে তারা খুব খুশী হল এবং কথামতো এক পাল ছাগল আমাকে দিয়ে দিল। ছাগল নিয়ে আসার পর চিন্তা হল আমাদের জন্য এটা জায়েয হয়েছে কি না এবং এ ছাগল আমাদের জন্য হালাল হবে কি না? সিদ্ধান্ত নিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আমরা তা ব্যবহার করব না।

ঝাড়ফুঁক করে পারিশ্রমিক নেওয়া

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. ছাগলের পাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং সবিস্তারে পূর্ণ ঘটনা তাঁকে জানালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার মাধ্যমে অর্জিত ছাগলগুলো তারা রাখবেন কি না এবং সেগুলো তাদের জন্য হালাল হবে কি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানালেন, হ্যাঁ, সেগুলো রাখা তাদের জন্য জায়েয। তারপর বললেন, আচ্ছা, বলো তো, তুমি কী করে জানলে এটা সাপে কাটার চিকিৎসা? হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি চিন্তা করলাম বেহুদা ফযূল কথা-বার্তার মধ্যেও যখন তাছির আছে,

তখন আল্লাহ তা'আলার কালামের মধ্যে তো আরও বেশি তাছির থাকবে। কাজেই আমি সূরা ফাতিহা পড়ে দম করতে থাকলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থ করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং তার কাজকে অনুমোদন করলেন। তিনি পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত ছাগলগুলোকেও রেখে দেওয়ার অনুমতি দিলেন। এবার দেখুন, এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়ফুঁককে কেবল সমর্থনই করলেন না, বরং পুরস্কার হিসেবে যে ছাগলের পাল দেওয়া হয়েছিল তা রাখারও অনুমতি দিলেন।[১২৭]

এরকম আরও বহু ঘটনা আছে, যা দ্বারা জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঝাড়ফুঁক করা শরী'আতসম্মত একটি বৈধ কাজ।

তাবিজের সুন্নতসম্মত বাক্য

এতক্ষণ তো গেল ঝাড়ফুঁকের ব্যাপার। এবার তাবিজের দিকে আসুন। তাবিজ কাগজ বা অন্য কিছুতে লেখা হয়। কখনও তা ভিজিয়ে পানি খাওয়া হয় এবং কখনও হাতে বা গলায় বাধা হয়। শরীরের অন্য স্থানেও তার ব্যবহার আছে। সত্য বটে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের থেকে তাবিজ লেখার কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যে লিখেছেন তা প্রমাণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু সাহাবীকে নিম্নের দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন–

اَعُوْذُبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[১২৮]

---

১২৭. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৫৩০৮

১২৮. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৫৩০৭

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন সালাম রাযি. ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে ইহুদীরা তার ঘোর শত্রু ছিল। তারা তাঁর ক্ষতি করার বিভিন্ন রকম জাদুটোনা করত। তা থেকে হেফাজতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ দু'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তুমি এটি পড়ে নিজের উপর দম করবে। ইনশাআল্লাহ কোনও জাদুটোনা তোমার উপর আছর করবে না। সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন সালাম রাযি. নিয়মিত এ দু'আটি পড়তেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছিলেন, কারও যদি দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে এবং সে কারণে তার আতংকবোধ হয়, তবে তখন যেন এ দু'আটি পড়ে নেয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বলেন, আমি আমার বড় সন্তানদেরকে এ দু'আটি শিখিয়ে দিলাম, যাতে তারা এটি পড়ে নিজেদের উপর দম করে নেয় এবং এর ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার হিফাজতে থাকে আর যারা ছোট, তারা যেহেতু নিজেরা পড়তে পারবে না, তাই একটি কাগজে এটি লিখে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলাম।[১২৯]

এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর নিজের কাজ, যা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, আসন্নপ্রসবা নারীর সহজ প্রসবের জন্য কোনো পরিষ্কার পাত্রে এ দু'আটি লিখে যদি পান করিয়ে দেওয়া হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে তার প্রসব যন্ত্রণা লাঘব করে দেন। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈন থেকে বর্ণিত আছে, তারা তাবিজ লিখে মানুষকে দিতেন।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. যে কথা বলেছেন সেটাই আসল। হাদীছ দ্বারাও মৌলিকভাবে সেটাই প্রমাণিত। তিনি বলেন, তাবিজের উপকারিতা দ্বিতীয় স্তরের। আসল উপকারের জিনিস হল ঝাড়ফুঁক। যা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

১২৯. সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৪৫১

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। ঝাড়ফুঁক তিনি নিজেও করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও শিক্ষা দিয়েছেন। এতেই তাছির ও বরকত বেশি। তাবিজ হল ঝাড়ফুঁকের বিকল্প। যারা নিজেরা দু'আ পড়তে পারে না এবং অন্যদের দিয়ে দম দেওয়ানোরও সুযোগ পায় না, তাদের জন্যই তাবিজের বিকল্প। নচেৎ ঝাড়ফুঁকই আসল। তবে সাহাবায়ে কেরাম থেকে উভয়টাই প্রমাণিত।

সব তাবিজ শিরক নয়

কিছু লোক মনে করে তাবিজ মাত্রই শিরক ও গুনাহ। তারা এটা মনে করে একটা হাদীছের ভিত্তিতে। আসলে তারা হাদীছটির প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারেনি। আর সে কারণেই তাবিজ ব্যবহার করাকে শিরক বলে। হাদীছটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হল–

اِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.

'ঝাড়ফুঁক, তামাইম ও তাওলা (যাদু বিশেষ) শিরক।'[১৩০]

'তামাইম; শব্দটি 'তামীমা'-এর বহুবচন। আরবীতে শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হতো, উর্দূতে (বাংলায়ও) তার কোনও প্রতিশব্দ নেই। তাই ভুলবশত লোকেরা এর অর্থ করে দিয়েছে তাবিজ। ফলে হাদীছটির অর্থ হয়ে গেছে, তাবিজ শিরক। এরই থেকে মানুষ ধরে নিয়েছে সব রকম তাবিজই শিরক, অথচ বিষয়টা তা নয়। আরবীতে তামীমা বলে মূলত গুটি শামুককে, যা জাহিলী যুগে তাগায় গেঁথে শিশুদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হতো এবং তাতে নানা রকম শিরকী মন্ত্র পড়া হতো। তাদের বিশ্বাস ছিল, তার এমন নিজস্ব ক্ষমতা আছে, যা দ্বারা শিশুকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারে। এটা ছিল পরিষ্কার শিরকী কাজ। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম এ জাতীয় তামীমা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন।

---

১৩০. সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৩৮৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৩৫২১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৩৪৩৩

ঝাড়ফুঁক বৈধ হওয়ার শর্তাবলি

বলাবাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার নামে যে ঝাড়ফুঁক করা হয়, তাতে শিরকের কোনও ব্যাপার নেই। তা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত, কাজেই নিঃসন্দেহে তা বৈধ। অবশ্য তার বৈধতার জন্যও কিছু শর্ত আছে। সেই শর্ত সাপেক্ষেই তা বৈধ। অন্যথায় ঝাড়ফুঁকও জায়েয হবে না।

প্রথম শর্ত হল, ঝাড়ফুঁকে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হবে তাতে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হয় এমন কোনও শব্দ থাকবে না। অনেক সময় দেখা যায়, 'হে অমুক' বা এ জাতীয় অন্য কোনও শব্দ থাকে এবং তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়। এরকম ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ-কবয সম্পূর্ণ হারাম। কেননা ইসলামে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার কোনও অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় শর্ত হল, অজ্ঞাত দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার না করা। অনেক সময় তাবিজ ও ঝাড়ফুঁকে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যার অর্থ যে কী তা কেউ জানে না। এরূপ তাবিজ-কবয কিছুতেই জায়েয নয়। কেননা হতে পারে তা শিরকী কথা এবং তা দ্বারা গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হয় কিংবা শয়তানকে ডাকা হয়।

হ্যাঁ, ঝাড়ফুঁকের কয়েকটি শব্দ এমনও আছে, যার অর্থ আমাদের জানা নেই, কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু তা অনুমোদন করেছেন তাই তা জায়েয। বর্ণিত আছে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলেন, কয়েকটি শব্দ আছে, যা আমরা কাউকে সাপে কামড়ালে বা বিচ্ছু দংশন করলে তার বিষ নামানোর জন্য ব্যবহার করে থাকি। শব্দগুলো হল–

شَجَّةٌ قَرْنِيَّةٌ مِلْحَةٌ بَحْرٍ قفطا.[১৩১]

১৩১. আলমু'জামুল কাবীর, হাদীছ নং ৯৯০৭; মুসান্নাফে ইবন আবী শায়বা, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১২৯

এ শব্দগুলোর অর্থ আমাদের জানা নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এগুলো পেশ করা হলে তিনি যেহেতু নিষেধ করেননি, তাই এর ব্যবহার জায়েয। সম্ভবত এগুলো হিব্রু শব্দ। এ হাদীছটির সনদও সহীহ। তাই উলামায়ে কেরাম বলেন, ঝাড়ফুঁকের কেবল এই শব্দগুলোই ব্যতিক্রম, দুর্জ্ঞেয় হওয়া সত্ত্বেও ঝাড়ফুঁকের জন্য ব্যবহার করা জায়েয। এর দ্বারা তাবিজ দিতেও মানা নেই। অবশ্য এর উপর এই বিশ্বাসে নির্ভর করা সম্পূর্ণ হারাম যে, এর নিজস্ব কোনও ক্ষমতা আছে এবং সেই ক্ষমতা বলেই এটা মানুষের উপকার করে। বরং এটা কেবলই একটা তদবির ও একটা ব্যবস্থা। এর বেশি কোনও মূল্য এর নেই।

মোদ্দাকথা, এই হল ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ করা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি। বহু লোক এই দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে একরোখা চিন্তা-ভাবনা করে থাকে। কেউ তো সাধারণভাবে সব রকম ঝাড়ফুঁককে হারাম মনে করে আবার কারও কাছে নিঃশর্তভাবে সর্বপ্রকার ঝাড়ফুঁকই জায়েয।

তাবিজ দেওয়া আলেম ও মুত্তাকী হওয়ার দলীল নয়

যারা নিঃশর্তভাবে সব ঝাড়ফুঁককে জায়েয মনে করে, তাদের এ ব্যাপারে বাড়াবাড়িরও কোনও সীমা নেই। তাদের অনেকে দ্বীন বলতে কেবল এই তাবিজ-তুমারকেই বোঝে। তাদের দৃষ্টিতে যারা তাবিজ-কবয দেয়, তারা অনেক বড় আলেম, উঁচুস্তরের মুত্তাকী-পরহেযগার এবং খুবই আল্লাহওয়ালা। কাজেই তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের প্রতি ভক্তি অনুরাগ প্রদর্শন করা উচিত। আর যারা তাবিজ-কবয দেয় না বা দিতে জানে না, মনে করে তারা কোনও আলেমই নয় এবং তারা কুরআন-হাদীছের কিছুই জানে না। বহু লোক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাবিজ চায়। যখন বলি, আমি তো তাবিজ লিখতে জানি না, তারা হয়রান হয়ে যায়। তারা মনে করে, এত বড় দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কেবল তাবিজ-তুমার শেখানোর জন্যই আর এখানে যত ক্লাস হয়, সবগুলোতে ঝাড়ফুঁকেরই আলোচনা হয়। কাজেই যে ব্যক্তি

ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-তুমার জানে না, সে এখানে শুধু-শুধু বসে আছে কী জন্য? তার পুরো সময়টাই তো বৃথা গেছে। কারণ এ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠাই করা হয়েছে যে জন্য সেটাই যে শিখল না, তার সব মেহনতই তো বৃথা।

তাবিজ-তুমারের পেছনে বেশি পড়া ঠিক নয়

আসলে তারা তাবিজ-তুমারকেই আসল দ্বীন মনে করেছে। তাদের ধারণা দুনিয়ার এমন কোন কাজ নেই, যা সাধনের জন্য কোন তাবিজ নেই। কাজেই সব কিছুর জন্যই তারা তাবিজ খোঁজে। অমুক কাজটি হচ্ছে না, একটা ওজিফা শিখিয়ে দিন তো। অমুক সমস্যা দেখা দিয়েছে, একটা তাবিজ চাই। কিন্তু আমাদের আকাবির (মহান বুযুর্গগণ) সবকিছুর মত এ ক্ষেত্রেও পরিমিতি রক্ষা করেছেন। তাদের কথা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই মাত্রা পর্যন্ত এটি করেছেন আমরাও সে পর্যন্তই করব। দিনরাত কেবল এই ধান্দাতেই থাকব, দুনিয়ার সবকাজ তাবিজ দিয়েই সমাধা করতে চাব, এটা একটা বাড়াবাড়ি, একটা গলত তরিকা। সবকিছুই যদি তাবিজ দিয়ে হয়ে যেত, তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদ করার কি প্রয়োজন ছিল? ব্যস, এমন কোন ঝাড়ফুঁক করে দিতেন, যাতে সব কাফের দলে-দলে এসে তাঁর পায়ের উপর পড়ে যায়। সত্য বটে, তিনি কখনও কখনও ঝাড়ফুঁক করেছেনও, কিন্তু তার একটা মাত্রা ছিল। এখনকার মত বাড়াবাড়ি করেননি। সব কিছু তাবিজ-কবজ ও ঝাড়ফুঁক দিয়ে সমাধা করার চেষ্টা করেননি।

একটি অভিনব তাবিজ

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গংগুহী রহ.-এর কাছে এক দেহাতী আসল। তার মন-মস্তিষ্কে তো এ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে, মৌলভী যদি তাবিজ-কবয না জানে, সে বিলকুল মূর্খ, সে কিছুই জানে না। গংগুহী রহ. যে একজন অনেক বড় আলেম তা তো সকলেরই জানা। দেহাতীও

জানত। সুতরাং সে এসে বলল, আমাকে একটা তাবিজ দিন। তিনি বললেন, আমি তো তাবিজ লিখতে জানি না। সে বলল, ওসব কথায় হবে না, আমাকে তাবিজ দিন। তিনি বললেন, আমি তো জানি না; কিভাবে দেব? কিন্তু নাছোড়বান্দার একই কথা, তাবিজ দিন। হযরত বলেন, আমি বুঝতে পারছিলাম না কী লিখব। শেষে আমি লিখলাম, 'হে আল্লাহ! সে তো মানে না আর আমি তো জানি না। আপনি নিজ অনুগ্রহে তার কাজ সমাধা করে দিন। এ কথা লিখে আমি তাকে দিলাম এবং বললাম, এটা ব্যবহার করো। সে তাই ব্যবহার করল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজ সমাধা করে দিলেন।

বাঁকা সিঁথির জন্য অভিনব তাবিজ

হযরত গংগুহী রহ.-এরই ঘটনা। এক মহিলা এসে বলল, আমি যখনই মাথা আঁচড়াই, সিঁথি বাঁকা হয়ে যায়। কিছুতেই সোজা হয় না। এর জন্য একটা তাবিজ দিন। হযরত বললেন, আমি তো তাবিজ লিখতে পারি না। তাছাড়া সিঁথি সোজা করার কোনও তাবিজ হয় না কি? কিন্তু সে মহিলা নাছোড়। তাবিজ তাকে দিতে হবে। হযরত বললেন, সে যখন বেশি পীড়াপীড়ি করতে লাগল, অগত্যা আমি একটা কাগজে লিখলাম, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সেটি তাকে দিয়ে বললাম, এটি ব্যবহার করো। তোমার সিঁথি সোজা হয়েও যেতে পারে। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা সোজা করে দিয়েছিলেন। নেক বান্দাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার আচরণ এরকমই হয়। তাদের মুখ থেকে কোনও কথা বের হয়ে গেলে তিনি তা সত্যে পরিণত করেন।

বুযুর্গানে দ্বীনের বিভিন্ন ঘটনায় যে জানা যায়, তারা এই এ কথাটি লিখে দিয়েছেন আর তাতে কাজ হয়ে গেছে, তা এ-রকমরেই ব্যাপার। অর্থাৎ তাদের কাছে কোনও বিষয়ে অনুরোধ জানানো হলে তাদের অন্তরে বিশেষ কোনও কথা জেগে ওঠে এবং এই আশায় সেটাই লিখে দেন যে, হয়তো এর দ্বারা উপকার হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সে ধারণা সত্যে পরিণত করেন। ফলে তাদের উপকার হয়ে যায়।

সব কাজ তাবিজ দিয়ে সমাধা করতে চাওয়া একটা বাড়াবাড়ি

আজকাল তো অবস্থা হল, মানুষ সর্বদা এই ঝাড়ফুঁকেরই ধান্দায় থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত কাজ, তা তাবিজ দ্বারাই সমাধা করতে চায়। কাজেই অমুক কাজের জন্য এক তাবিজ, তমুক কাজের জন্য আরেক তাবিজ, চাকরির জন্য এক তাবিজ, রোগ-ব্যাধির জন্য এক তাবিজ, এভাবে প্রত্যেকটা ব্যাপারে একেকটি তাবিজ খুঁজে বেড়ায়। এটা চরম বাড়াবাড়ি এবং সুন্নতেরও পরিপন্থী। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়ফুঁক করেছেন, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, দুনিয়ার সব কাজই তিনি ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে সমাধা করে ফেলতেন। কাফেরদের সাথে কত যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে, কিন্তু কোথাও এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তিনি তাদেরকে পরাস্ত করার জন্য ঝাড়ফুঁকের ব্যবহার করেছেন।

হ্যাঁ, দু'আ তিনি অবশ্যই করতেন। সবচেয়ে বড় ও আসল জিনিস তো দু'আই। মনে রাখতে হবে, তাবিজ ও ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েয বটে, কিন্তু এটা কোনও ইবাদত নয়। কুরআন মাজীদের কোনও সূরা বা আয়াতকে কিংবা আল্লাহ তা'আলার নামকে পার্থিব কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা বড় জোর জায়েয কাজ; এটা ইবাদত নয় কিছুতেই। কাজেই এতে কোনও ছাওয়াবও নেই। যেমন কারও জ্বর হলে ওষুধ খায়। এ ওষুধ খাওয়াটা একটা জায়েয কাজ। এটা কোনও ইবাদত নয়, কেবল মুবাহ ও বৈধ কাজ। তাবিজ-কবয ও ঝাড়ফুঁকের ব্যাপারটাও এরকমই। পার্থক্য কেবল এই যে, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যবহার হয়, কিন্তু তাঁর নাম ব্যবহার করাটা যেহেতু পার্থিব উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, তাই এটা কোনও ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ নয়।

দু'আ করাই আসল কাজ

কিন্তু সরাসরি যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা হয় কিংবা দু'রাকাআত সালাতুল হাজত পড়ে বলা হয়, হে আল্লাহ! নিজ রহমতে আমার এই মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দিন, হে আল্লাহ! আমার এই সংকট

মোচন করে দিন, হে আল্লাহ! আমার এই পেরেশানি দূর করে দিন, তবে এ দু'আ একটা ইবাদত ও অনেক বড় ছাওয়াবের কাজরূপে গণ্য হবে। এটা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। তাঁর শিক্ষা হল, যখন কোনও প্রয়োজন দেখা দেয়, আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করো। যদি দু'রাক'আত সালাতুল হাজত পড়ে দু'আ করো সেটা আরও ভালো। এর ফলে আল্লাহ চাহেন তো উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে– যদি তা মঙ্গলজন হয়। আর ছাওয়াব তো আছেই। কেননা দু'আ যদি দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে হয়, তবুও তা ছাওয়াবের কাজ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণভাবেই ইরশাদ করেছেন,

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

'দু'আ তো ইবাদই বটে।'[১৩২]

সুতরাং কোনও ব্যক্তি যদি সারা জীবনেও ঝাড়ফুঁক না জানে বা তাবিজ লিখতে না পারে, কিন্তু সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে, তাবে নিঃসন্দেহে তার এ কাজ ঝাড়ফুঁক অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ ওটা তো ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ নয়, কিন্তু এটা ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ। কাজেই সর্বক্ষণ তাবিজ-তুমারের পেছনে লেগে থাকা ভালো না। এটা সুন্নাতের পরিপন্থী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে যে কাজ যে মাত্রায় প্রমাণিত আছে, সে কাজকে সেই মাত্রার ভেতরই রাখা উচিত। তা ছাড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কখনও প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে দোষ নেই, কিন্তু সর্বক্ষণ এর পেছনে পড়ে থাকা, এতে বাড়াবাড়ি করা, একে নেশা ও পেশা বানিয়ে ফেলা কিছুতেই সমীচীন নয়। ব্যস, এই হল তাবীজ-তুমারের হাকীকত। এর বাইরে কিছু নয়।

আধ্যাত্মিক চিকিৎসা কাকে বলে?

আজকাল মানুষ এই ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবয ইত্যাদির নাম দিয়ে দিয়েছে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। এ নাম অতি বিভ্রান্তিকর। এটা একটা

---

১৩২. সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ৩২৯৩

মারাত্মক ধোঁকা। কেননা আধ্যাত্মিক চিকিৎসা বলতে মূলত মানুষের আখলাক-চরিত্রের সংশোধনকেই বোঝাত। মানুষের বাহ্যিক আমল ও তার রূহানী অবস্থার পরিচর্যা ও পরিমার্জনারই নাম ছিল আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। মনে করুন, এক ব্যক্তি অহংকারের রোগে আক্রান্ত। তার এ রোগ কিভাবে নির্মূল হবে? কিংবা তার ভেতর হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, এটা কিভাবে দূর হবে? কেউ লোভ-লালসায় জর্জরিত, তার প্রতিকার কী? মূলত এসবের চিকিৎসাকেই রূহানী বা আধ্যাত্মিক চিকিৎসা বলা হয়। কিন্তু বর্তমানকালে ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ-তুমার করাকেই রূহানী চিকিৎসা বলা হচ্ছে। কত বড় ধোঁকা!

কেবল তাবিজ দিয়ে পীর বনে যাওয়া

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় কারও ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ-তুমার দ্বারা যদি কারও উপকার হয়ে যায়, তবে এটা তার মুত্তাকী-পরহেযগার হওয়ার দলীল নয় এবং সেই ব্যক্তির পীর ও ধর্মগুরু বনে যাওয়ারও প্রমাণ বহন করে না। ঝাড়ফুঁক বা তাবিজে কাজ হওয়াটা ব্যক্তির কোনও কৃতিত্ব নয়। এটা তো আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার প্রতিফলন। তিনি ঝাড়ফুঁকের শব্দাবলির ভেতর কিছুটা তাছির দিয়ে রেখেছেন। কাজেই যে ব্যক্তিই তা পড়বে সেই তাছির প্রকাশ পাবে। কথাটা বলতে হল এ কারণে যে, অনেক সময় মানুষ কারও ঝাড়ফুঁক ও তাবিজে কাজ হচ্ছে দেখে বিষয়টাকে সেই ব্যক্তির কামালিয়াত মনে করে এবং সে কারণে তাকে পীর ও কামেল ব্যক্তির মর্যাদা দেয়, তাকে ধর্মগুরু ও দ্বীনের অনসরণীয় ব্যক্তির আসনে বসায়, তাতে ব্যক্তিজীবনে সেই লোকের কর্মকাণ্ড যতই শরী'আতবিরোধী ও সুন্নতের পরিপন্থী হোক না কেন। এর ফলে তার ভক্ত অনুসারীরাও শরী'আতের প্রতি অবহেলা দেখাতে শুরু করে এবং সুন্নতের পরিপন্থী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কাজেই বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

আমি নিজ চোখে একটা বীভৎস দৃশ্য দেখেছি। একবার এক মসজিদে যাওয়া হয়েছিল। জানা গেল সেখানে এক আমেল (তাবিজ-

কবয দেয় এমন ব্যক্তি)-এর আগমন ঘটেছে। সুন্নত ইত্যাদি আদায়ের পর যখন বাইরে আসলাম, দেখতে পেলাম পথের দু'ধারে মানুষের সুদীর্ঘ সারি। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমেল সাহেবের অপেক্ষা করছে। একসময় তাদের প্রতীক্ষার অবসান হল। আমেল সাহেব বের হয়ে আসলেন, তিনি এসে যেটা করলেন, তা অভাবনীয়, ন্যক্কারজনক। তিনি যার সামনেই যান, সে মুখ খুলে দেয় আর তিনি তার মুখের ভেতর থুতু মারেন। এভাবে কাতারের শুরু থেকে মানুষকে থুতু খাওয়াতে শুরু করলেন। একবার ডান দিকে একবার বাম দিকে। এই করে তিনি কাতারের শেষ মাথায় পৌছলেন। শেষ দিকে কিছু লোক বালতি, জগ ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা অপেক্ষায় আছে পীর সাহেব তাতে থুতু মারবেন আর সেই বরকত তারা বাড়িতে নিয়ে যাবে। বাড়াবাড়িটা এ পর্যায়ে পৌছেছিল এ কারণেই যে, তারা দেখেছিল তার ঝড়ফুঁক ও তাবিজ-কবযে কাজ হয়, ফল পাওয়া যায়।

সারকথা

এসব বাড়াবাড়ি পরিহার করে নিজ চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতিতে ভারসাম্য সৃষ্টি করা দরকার। যে পথে আল্লাহ তা'আলা খুশী হন সেটাই অবলম্বন করা দরকার। পথ একটাই—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথ দেখিয়েছেন, যে পথ তিনি নিজে অনুসরণ করেছেন এবং যে পথে তার মহান সাহাবীগণ চলেছেন। মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে আসল জিনিস হল সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা। তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করে বলা, 'হে আল্লাহ! আমার এই কাজ করে দিন।' এর চেয়ে ভালো কোনো তাবিজ নেই। এর চেয়ে ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই। ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ-করা কোনো ইবাদত নয়। তা চিকিৎসার একটা পদ্ধতি মাত্র। তাতে কোনো ছাওয়াব নেই। আর এ কারণেই তাতে পারিশ্রমিকের লেনদেন জায়েয। তা যদি ইবাদত হতো তাবে পারিশ্রমিক দেওয়া-নেওয়া জায়েয হতো না। কেননা ইবাদতের কোনো বেচাকেনা হয় না। যে কারণে কেউ যদি তিলাওয়াত

করে পারিশ্রমিক নেয়, তবে তা জায়েয হয় না। অথচ তাবিজ বেচাকেনা করা জায়েয। কাজেই এটা কোনো ইবাদত নয়। যদি বাস্তবিকই তাবিযের প্রয়োজন পড়ে, তবে সীমারেখার ভেতর থেকেই তা ব্যবহার করা উচিত, সীমারেখার বাইরে চলে যাওয়া ও সর্বক্ষণ এর ধান্দায় থাকা কোনো ভালো কাজ নয়। এটা সুন্নাতের পরিপন্থী।

হাদীছ শরীফে যে বলা হয়েছে, 'যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা ঝাড়ফুঁক করে না', তার এক ব্যাখ্যা তো আমি এই করলাম যে, এর দ্বারা জাহিলী যুগের ঝাড়ফুঁক বোঝানো হয়েছে। উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেন, হাদীছটির ইশারা বৈধ ঝাড়ফুঁকের দিকেও রয়েছে। অর্থাৎ যেসব ঝাড়ফুঁক জায়েয তাতেও বাড়াবাড়ি করা ও অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া পসন্দনীয় নয়। বরং মানুষ ভরসা কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর রাখবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকের চিন্তা না করে বরং আল্লাহ তা'আলার কাছেই দু'আ করবে। এটাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। এটা অবলম্বন করলে হাদীছে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাও যেমন লাভ হবে, তেমনি পার্থিব উদ্দেশ্যও আল্লাহ তা'আলা চাহেন তো পূরণ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাদেরকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন এবং যারা বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ করবে, আমাদেরকেও তাদের মধ্যে শামিল রাখুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

দুনিয়ার হাকীকত*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ.

অর্থ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্ট, চাকচিক্যময়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এখানে নিজ খলীফা বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তোমরা কেমন কাজ করো তা দেখার জন্য। সুতরাং তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো এবং নারীদের ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করো।'[১৩৩]

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ২২৯-২৫৫

১৩৩. সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ২৭৪২; সুনানুত তিরমিযী, হাদীছ নং ২১১৭; সুনানু ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ২৮৪৬

অর্থাৎ মানুষের চোখে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা, ঠাটবাট ও এর বর্ণচ্ছটা বড় আকর্ষণীয় মনে হয়, অর্থাৎ দুনিয়া আপতদৃষ্টিতে দেখতেও সুন্দর এবং ভোগেও মজাদার। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়ার মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই তোমাদেরকে এখানে নিজ খলীফা বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখতে চান এখানে তোমরা কেমন কাজ কর; তোমরা বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে দুনিয়ার মোহে পড়ে যাও এবং দুনিয়া অর্জনের পেছনেই জীবন বিলিয়ে দাও, না আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতকে স্মরণ রাখ এবং জান্নাত লাভের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাও? সেই প্রচেষ্টার একটা অংশ হল দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা এবং নারীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। পুরুষের জন্য নারীও একটি পরীক্ষার বিষয়। পুরুষ যদি বৈধ পন্থা ছেড়ে অবৈধ পথে নারীর সাথে ফূর্তি করে, তবে সে দুনিয়ার প্রতারণায় পড়ে গেল। এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হল।

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার সবকিছু আপাতমধুর ও ক্ষণস্থায়ী। তাই এখানকার জীবন সত্যিকার অর্থে জীবন নামে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য নয়। হযরত সাহল ইবন সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا الْاٰخِرَةِ.

'হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবন তো প্রকৃত জীবন।'[১৩৪]

অর্থাৎ আখিরাতের বিপরীতে দুনিয়ার জীবন কোনো মূল্য রাখে না। যে কারণে এটা জীবন নামেরই উপযুক্ত নয়।

কবর পর্যন্ত তিনটি জিনিস যায়

দুনিয়ার জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি ক্ষণস্থায়ী এর প্রতিটি জিনিস। এর কোনো কিছুই মানুষ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। সবকিছু ত্যাগ করে

---

১৩৪. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ২৮৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৩৩৬৬; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৭৯১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৮৫৯৪

নিঃসঙ্গভাবে কবরে যেতে হয়। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اِثْنَيْنِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَا لُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

'মায়্যিতের পেছনে পেছনে যায় তিনটি জিনিস। তার পরিবারবর্গ, তার সম্পদ ও তার আমল। তা থেকে দুটি ফিরে আসে আর একটি থেকে যায়। ফিরে আসে তার পরিবারবর্গ ও সম্পদ আর তার সঙ্গে থেকে যায় তার আমল।[১৩৫]

অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর জানাযা শেষে যখন তার লাশ দাফন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার আত্মীয়-স্বজন ও আপনজন তাকে দাফন করার জন্য সঙ্গে যায়। আর সম্পদ যায় এ অর্থে যে, সে কালে অনেক জায়গায় মৃত ব্যক্তির সাথে কবরস্থানে পর্যন্ত তার সম্পদ নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তো এ দু'টি মৃত ব্যক্তিকে কবরে শোওয়ানোর পর চলে আসে। আর তৃতীয় জিনিস অর্থাৎ আমল আর ফিরে আসে না। তা মায়্যিতের সাথে কবরে চলে যায়।

সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন কোনো উপকারে আসবে না

এর দ্বারা জানা গেল কবরে সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন মৃতব্যক্তির কোনো উপকারে আসে না। অথচ এ জিনিসকেই তো সে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসত। সম্পদ ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়। আত্মীয়-স্বজন ছিল তার প্রাণের বস্তু। এ দুই ছাড়া তার এক মুহূর্ত চলত না। এছাড়া সে চলতেই পারত না। সম্পদ নিয়ে তার কত অহংকার ছিল। বুক ফুলিয়ে বলত, আমার এত এত সম্পদ আছে। আমার এই পরিমাণ ব্যাংক ব্যালেন্স আছে। কিন্তু এসব কবরে তার সাথে যাবে না। সবই মাটির উপর থেকে যাবে। কবরে তার সাথে যাবে মাত্র একটি জিনিস–তার

---

১৩৫. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬০৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৫২৬০; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২৩১; সুনান নাসাঈ, হাদীছ নং ১৯১১

আমল। দুনিয়ায় সে ভালো-মন্দ যেসব কাজ করত, তাই তার সাথে যাবে। এছাড়া আর কোনো কিছুই সঙ্গে যাওয়ার নয়।

সুতরাং হাদীছ শরীফে আছে, কোনও মায়্যিতকে দাফন করার পর যখন তার আত্মীয়-স্বজন চলে যেতে শুরু করে, তখন মায়্যিত তাদের পদধ্বনি শুনতে পায়। তাকে এটা শোনানো হয় এ কথা বোঝানোর জন্য যে, দেখো, তুমি যাদের উপর ভরসা করেছিলে, সকাল-সন্ধ্যা তুমি যাদের নিয়ে কাটাতে, যাদের ভালোবাসার উপর তোমার বড় আস্থা ছিল, তারা সব তোমাকে এই গর্তের ভেতর ফেলে চলে যাচ্ছে। আসলে তারা তোমার সত্যিকারের সঙ্গী ছিল না।

যা হোক এভাবে সম্পদও তার সঙ্গ ত্যাগ করবে এবং স্বজনেরাও তাকে ফেলে চলে আসবে। শুধু একটি জিনিসই তার সঙ্গে যাবে আর তা হচ্ছে তার আমল। আমল যদি নেক হয়, তবে সেই নেক আমলের আলোতে সেই গর্ত আলোকিত হয়ে যায়। সেই আমলের সুফল সে সেখানে পায়। ছোট্ট কবর প্রশস্ত হয়ে যায়। তা আর তুচ্ছ গর্ত থাকে না। তা জান্নাতের একটা টুকরা হয়ে যায়।

কবর জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত হয়ে যায়

হাদীছ শরীফে আছে, নেককার ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়–

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَا يُوْقِظُهٗ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهٖ اِلَيْهِ.

'তুমি নববধুর মতো ঘুমাও, যাকে জাগায় কেবল তার সর্বাপেক্ষা মনের মানুষ।'[১৩৬] অর্থাৎ তোমার কবরকে তো পুষ্পোদ্যান করে দেওয়া হল, জান্নাতের সাথে জানালা পথ খুলে দেওয়া হল। সেই পথে জান্নাতের স্নিগ্ধ সুবাসিত হাওয়া আসছে। তার পরশে এখন তুমি পরম সুখে ঘুম দাও। ঘুম দাও নববধূর মতো, যাকে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জাগায় না। এভাবে আমল ভালো হলে কবরের ক্ষুদ্র গর্ত

১৩৬. সুনানুত তিরমিযী, হাদীছ নং ৯৯১

চিরশান্তির আগদুয়ার হয়ে যায়। তা হয়ে যায় জান্নাতের একটি বাগান। আর আল্লাহ না করুন, আমল যদি মন্দ হয়, তবে কবর হয়ে যায় জাহান্নামের গর্ত। আর ভেতরে থাকে নানা রকম আযাব। এভাবে কবর থেকেই তার একটানা শাস্তির সূচনা হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমকে তা থেকে রক্ষা করুন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতেন যে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

'হে আল্লাহ! আমি কবর আযাব থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।'

এ দুনিয়ায় আপন কেউ নেই

আলোচ্য হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সত্যই ব্যক্ত করছেন যে, যখন আয়ু ফুরিয়ে যাবে এবং তোমার আত্মীয়-স্বজন তোমাকে কবরের গর্তে রেখে চলে যাবে, তখনই তোমার কাছে দুনিয়ার স্বরূপ উন্মোচিত হবে। তখন বুঝতে পারবে, এ দুনিয়ায় আপন কেউ নেই। আত্মীয়-স্বজনও আপন নয় এবং অর্থ-সম্পদও নিজের নয়। কিন্তু সেই সময়ের উপলব্ধি তো কোনও কাজে আসবে না। কেননা তখন তো আত্ম-সংশোধনের সময় নয়। তখন কেউ নিজেকে বদলাতে চাইলে তার কোনও ফায়দা নেই। বদলানোর সময় আগেই চলে গেছে। বদলাতে হবে মৃত্যুর আগেই। মৃত্যু এসে গেলে তখন আর সুযোগ দেওয়া হবে না। তখন মানুষ নিজের অশুভ পরিণাম চাক্ষুস দেখতে পাবে। আর তা দেখে আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করবে–

فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ۝

'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু কালের জন্য সুযোগ দিলে না কেন? তা হলে আমি দান-সদাকা করতাম এবং নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।'[১৩৭]

---

১৩৭. সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ১০

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলবেন,

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾

'যখন কারও নির্ধারিত কাল এসে যাবে তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।'[১৩৮]

মৃত্যুর সময় এসে গেলে তখন আর কোনও নবী, ওলী, কোনও সাহাবী কিংবা বড় থেকে বড় ব্যক্তিকেও সময় দেওয়া হয় না। কাজেই তখন আর নিজেকে বদলানোর চিন্তা করার কোনও ফায়দা নেই। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে থেকেই আমাদেরকে সচেতন করে দিচ্ছেন যে, সময় থাকতেই চিন্তা করো। মৃত্যু আসার আগেই দুনিয়ার স্বরূপ বুঝে নাও, ভালোভাবে বুঝে রাখো, দুনিয়ার সবকিছু তোমাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেবে। তুমি একটি কবরে পড়ে থাকবে। সঙ্গে থাকবে কেবল তোমার আমল।

شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ
اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

'যারা আমাকে কবর পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছ, তোমাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা ছেড়ে আমি এখন একাকিই চলে যাচ্ছি।'

তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, এখনই হুঁশিয়ার হয়ে যাও। দুনিয়ার সবকিছুই যে ছেড়ে চলে যেতে হবে সে বিষয়টা মাথায় রাখো। সহসাই একদিন তোমার চোখে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, দুনিয়ার সব আনন্দ-ফূর্তি, এখানকার সব ভোগ-সামগ্রী, সমস্ত কাজ-কারবার এবং মনলোভা সকল জিনিস বিলকুল ফাঁকি। এর কোনও মূল্য নেই। আসল জিনিস সেটাই, যা আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য করা হয়েছে।

---

১৩৮. সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ১১

জাহান্নামের একটি বারের ডুব

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يُؤْتٰى بِاَنْعُمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ يَقُوْلُ لا وَاللهِ يَا رَبِّ! وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهٗ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ ؟ فَيَقُوْلُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِىْ بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যার সমগ্রজীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কেটেছে এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ভোগসম্ভার সে লাভ করেছিল (অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন চাকর-নকর, বন্ধু-বান্ধব, কুঠি-বাংলো তথা দুনিয়ার সর্বপ্রকার আসবাব-উপকরণ ও ভোগ-সামগ্রী সর্বাপেক্ষা বেশি তার অর্জিত হয়েছিল। এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ডাকবেন। চিন্তা করে দেখুন, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ধনী ও সর্বাপেক্ষা বেশি সুখী কাউকে বেছে ডাকা হবে)। তাকে জাহান্নামের মধ্যে একবার চুবানি দেওয়া হবে। (ফিরিশতাদেরকে বলা হবে তাকে জাহান্নামের মধ্যে একবার চুবানি দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। ফিরিশতাগণ তাই করবেন।) তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনও আরেম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি দেখেছ? কখনও কি তুমি কোনও নি'আমত লাভ করেছ? সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমি কখনও আরাম আয়েশ ও সুখ-শান্তি দেখিনি (অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবনভর যে অর্থ-সম্পদ লাভ করেছিল, সুখ-শান্তি পেয়েছিল ও আরাম-আয়েশ ভোগ করেছিল, জাহান্নামের মাত্র একটি চুবানিতে তা সব

ভুলে যাবে। কেননা সেই একটি চুবানিতে তার যে কষ্ট হবে, যে শাস্তি বা যন্ত্রণাবোধ হবে তা দুনিয়ার সব আরাম-আয়েশের কথা ভুলিয়ে দেবে।

জান্নাতের ভেতর এক পাক

তারপর এমন এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে, যে ছিল দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা অভাবী ও দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত। (যেন সে দুনিয়ায় এমন এক জীবন কাটিয়েছে, যে জীবনে সুখ ও আরাম কী জিনিস তা বুঝতেই পারেনি।) কিন্তু আখেরাতে সে জান্নাত লাভের উপযুক্ত হয়ে গেছে। তাকে ডেকে জান্নাতের ভেতর একবার ঘুরিয়ে আনা হবে (ফিরিশতাদেরকে বলা হবে, তাকে জান্নাতের ভেতর থেকে ঘুরিয়ে আনো, ফিরিশতাগণ তাই করবেন)। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনও অভাব-অনটন দেখেছ? কখনও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছ? সে উত্তরে বলবে, না আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! দুনিয়ায় আমার কখনও অভাব-অনটন যায়নি, কখনও দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়নি।[১৩৯] কেননা দুনিয়ায় সারা জীবন সে যত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছিল, জান্নাতের ভেতর মাত্র একটি পাক দেওয়ার ফলে তা সব ভুলে যাবে।

দুনিয়া এক তুচ্ছ মূল্যহীন জিনিস

এসব আমার নয়, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলে যাওয়া কথা। তাঁর এ কথা বলার উদ্দেশ্য আখিরাতের সামনে দুনিয়ার হীনতা তুলে ধরা। অর্থাৎ আখিরাতের বিপরীতে দুনিয়ার নি'আমত ও অর্থ-সম্পদ এতই অল্প, তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী যে, জাহান্নামের ক্ষণিকের কষ্টের সামনে মানুষ দুনিয়ার সারা জীবনের সুখ-শান্তির কথা ভুলে যাবে এবং সারা জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথাও জান্নাতের ভেতর একটিবার ঘুরে আসার ফলে ভুলে যাবে। এ দুনিয়া এমনই তুচ্ছ-নগণ্য বস্তু। অথচ এরই জন্য মানুষ দিন রাত দৌড়ঝাঁপ করছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এরই চিন্তা-ধান্দায় পার করছে। কিভাবে আরও অর্থ কুড়াবে, সঞ্চয়ের পরিমাণ আরও বাড়াবে, কিভাবে

---

১৩৯. সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৫০২১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১২৬৩৮

বাড়ি-গাড়ি করবে এবং কিভাবে আরাম-আয়েশের অত্যাধুনিক আসবাব উপকরণ সংগ্রহ করবে, কেবল এই ফিকিরই তার মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সব চেষ্টা ও ব্যস্ততা কেবল এরই জন্য। এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীছ ইরশাদ করেছেন। অর্থাৎ একটু চিন্তা করে দেখো, তোমরা কিসের সন্ধানে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছ! কিসের পেছনে পড়ে তুমি আখিরাতের সুখ-দুঃখ ভুলে থাকছ। দুনিয়া কী জিনিস, কতটুকু এর মূল্য তা বুঝতে চেষ্টা করো এবং সে হিসেবেই দুনিয়ার সাথে আচরণ করো। বস্তুত এরই নাম যুহ্‌দ, অর্থাৎ দুনিয়া যে আচরণেরই উপযুক্ত তার সাথে সেই আচরণ এবং আখিরাত যার উপযুক্ত তার সাথে সেই আচরণ করা।

দুনিয়ার মূল্য এক ফোঁটা পানির সমান

এ ব্যাপারে হযরত মুস্‌তাওরিদ ইবন শাদ্‌দাদ রাযি. বর্ণিত একটি হাদীছ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْأٰخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهٗ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ.

'আল্লাহর কসম! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল এরকম, তোমাদের মধ্যে কেউ সাগরে আঙুল ঢুকিয়ে তা আবার বের করে আনুক, তারপর দেখুক তার আঙুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে।[১৪০]

অর্থাৎ সাগর থেকে আঙুলে লেগে যতটুকু পানি আসে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া ততটুকুও নয়। কেননা সাগরের তো একটা সীমা আছে। কিন্তু আখিরাতের নি'আমতের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তা অফুরন্ত। কখনওই শেষ হওয়ার নয়। তাই সাগরের পানির সাথে আঙ্গুলে লেগে আসা পানির যে তুলনা, আখিরাতের নি'আমতের সাথে দুনিয়ার সেই তুলনাও চলে না। কাজেই কেবল আমাদেরকে বোঝানোর জন্যই হাদীছে

---

১৪০. সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৫১০১; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২২৪৫; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪০৯৮; মুসনাদে আহমদ, ১৭৩২২

এ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেন আঙুলের এক ফোঁটা পানি হল দুনিয়া আর অবশিষ্ট জলরাশি আখিরাত।

কিন্তু আজব ব্যাপার হল, মানুষ দিবারাত্র এই এক ফোঁটা পানির জন্য ধান্দা করছে আর সাগরের অথৈ পানির কথা ভুলে গেছে। অথচ আখিরাতের সেই অথৈ সাগরের সম্মুখীন তো একসময় হতেই হবে। আজ হোক কাল হোক, একদিন না একদিন সেখানে পৌছতেই হবে। কখন যে যেতে হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে-কোনও সময়ই যেতে হতে পারে। এই পরম সত্য সম্পর্কে আমরা চরম গাফেল হয়ে আছি। এই গাফলতীর পর্দা সরানোর জন্যই যুগে যুগে দুনিয়ায় নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে। কেননা চোখের এ পর্দা সরানো জরুরি। এ পর্দার কারণেই তো আমাদের দিনমানের দৌড়ঝাঁপ এক ফোঁটা পানি হাসিলের জন্যই হচ্ছে আর আখিরাতে যে অথৈ পানি রয়ে গেছে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হচ্ছে না।

দুনিয়া হল মরা ছাগলছানার মতো

অপর এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়াকে মরা ছাগলছানার সাথে তুলনা করেছেন। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত,

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوْقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتُهٗ فَمَرَّ بِجَدْيٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهٗ فَاَخَذَ بِاِذْنِهٖ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهٗ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ اَنَّهٗ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهٖ؟ قَالَ اَتُحِبُّوْنَ اَنَّهٗ لَكُمْ؟ قَالُوْا وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيْهِ لِاَنَّهٗ اَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ.

'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দু'পাশে একদল লোক চলছিল। এ অবস্থায় তিনি একট মরা ছাগলছানা অতিক্রম করছিলেন। ছাগলছানাটি ছিল কানকাটা। তিনি সেই কাটা কান ধরে সেটিকে তুললেন তারপর বললেন, তোমাদের

মধ্যে এমন কে আছে, যে এক দিরহাম দিয়ে এই ছানাটি কিনবে? তারা বললেন, কোনও তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়েও এটি নেওয়া আমরা পসন্দ করি না। তাছাড়া এটি দিয়ে করবই বা কী? তারপর তিনি বললেন, আচ্ছা এক দেরহাম না হয় বাদ গেল। কে এটি মুফতে নিতে রাজি আছে? তারা আরয করলেন, আল্লাহর কসম, এটি জীবিত থাকলেও তো (পসন্দের মাল ছিল না যেহেতু) কান কাটা হওয়ার কারণে এর একটা খুঁত ছিল। অধিকন্তু এটি যখন মরা তখন কী করে এটি পসন্দনীয় হতে পারে?

সুতরাং হীন হওয়ার কারণে যখন তোমরা বিনামূল্যেও এ মরা ছানাটি নিতে রাজি নও, তখন আল্লাহর কাছে যা এর চেয়েও বেশি হীন, তা অর্জনের জন্য কিভাবে দিবারাত্র ছোটাছুটি করছ? এই ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদানের নিয়ম। তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এভাবে উদাহরণের মাধ্যমে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করতেন। দুনিয়ার প্রতি মানুষের যে তীব্র মোহ, তা মানুষের আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের পক্ষে মস্ত বড় অন্তরায় ছিল। তাই এ মোহ ঘুচানো ছিল অতি জরুরি কাজ। এজন্য তিনি কদমে-কদমে তাঁদের সামনে দুনিয়ার হীনতা ও নিকৃষ্টতা তুলে ধরতেন এবং বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা পরিষ্কার করে দিতেন। এ হাদীছে তিনি তাই করেছেন।

উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণব্যয়

হযরত আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত–

كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا اُحُدٌ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَال مَا يَسُرُّنِيْ اَنَّ عِنْدِىْ مِثْلَ اُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا تَمْضِىْ عَلَيَّ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلَّا شَيْئًا اَرْصُدُهٗ لِدَيْنٍ اِلَّا اَنْ اَقُوْلَ بِهٖ فِىْ عِبَادِ اللهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَمِنْ خَلْفِهٖ ثُمَّ مَشٰى فَقَالَ اِنَّ الْاَكْثَرِيْنَ هُمُ الْاَقَلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَمِنْ خَلْفِهٖ وَقَلِيْلٌ

مَا هُمْ ثُمَّ قَالَ لِيْ مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتّٰى اٰتِيَكَ ثُمَّ انْطَلَقَ فِيْ سَوَادِ اللَّيْلِ حَتّٰى تَوَارٰى فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ فَتَخَوَّفْتُ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَاَرَدتُّ اَنْ اٰتِيَهِ فَتَذَكَّرْتُ قَوْلَهٗ لِيْ لَا تَبْرَحْ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَلَمْ اَبْرَحْ حَتّٰى اَتَانِيْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَكَرْتُ لَهٗ فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهٗ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَانِيْ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ.

'হযরত আবূ যর রাযি. একজন দরবেশ সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার হাররায় হাঁটছিলাম (হাররা বলা হয় কালো পাথুরে ভূমিকে। মদীনা মুনাওয়ারায় যাদের যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, তারা দেখে থাকবেন মদীনার চার দিকে কালো পাথুরে ভূমি আছে। তাকেই হাররা বলে), পথ চলতে চলতে আমাদের সামনে উহুদ পাহাড় এসে গেল। এ সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবূ যর!

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি উপস্থিত রয়েছি, হুকুম করুন।

তিনি বললেন, এই যে উহুদ পাহাড় দেখা যাচ্ছে, যদি এই গোটা পাহাড়টিকে সোনায় পরিণত করে আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়, তবুও আমার কাছে তা থেকে একটি দীনারও থাকুক এ অবস্থায় আমার তিন দিনও কাটানো ভালো লাগবে না। হ্যাঁ, আমার যদি কোনও দেনা থাকে, তবে তা পরিশোধের জন্য যতটুকু দরকার কেবল ততটুকুই থাকবে। তার বেশি এক দীনারও আমি নিজের কাছে রাখব না। বরং আমি তার সমুদয় এভাবে ও এভাবে মুঠো ভরে ভরে মানুষের মধ্যে বিতরণ করব—ডান দিকে, বাম দিকে ও পেছন দিকে। তারপর বললেন,

মনে রেখো, দুনিয়ায় যাদের কাছে ধন-সম্পদ বেশি কিয়ামতের দিন তাদেরই অংশ হবে কম।

(অর্থাৎ দুনিয়ায় যারা অনেক অর্থ-সম্পদের মালিক, যারা বড় বড় পুঁজিপতি এবং যার যত বেশি বিত্ত, কিয়ামতের দিন সেই অনুপাতে তার নি'আমত অন্যদের তুলনায় কম হবে)।

তবে সেইসব বিত্তবানদের কথা আলাদা, যারা নিজ অর্থ ডানে, বামে ও পেছনে দু'হাত ভরে এভাবে, এভাবে ও এভাবে মানুষের মধ্যে বিতরণ করে। কিন্তু তাদের সংখ্যা বড় কম।

(অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে বেশি-বেশি খরচ করবে, আখিরাতে তাদের প্রাপ্ত নি'আমত কম হবে না। কিন্তু যারা তা করবে না; বরং কার্পণ্য করবে, আল্লাহর পথে খরচ করবে না, তাদের অর্থ-বিত্ত যত বেশি হবে আখিরাতে সেই অনুপাতে নি'আমতও কম পাবে। হযরত আবূ যর রাযি.-কে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কথা বলছিলেন পথ চলতে চলতে। এক জায়গায় পৌছে তিনি আবূ যর রাযি.-কে বললেন, তুমি এই জায়গায় দাঁড়াও। আমি এখনই আসছি। আর দেখো আমি না আসা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে সরবে না। হযরত আবূ যর রাযি. বলেন, এই বলে অন্ধকারের ভেতর তিনি যেন কোথায় চলে গেলেন। কোথায় গেলেন আমি তা বুঝতে পারলাম না। তিনি সম্পূর্ণ চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। একটু পর আমি একটা আওয়াজ শুনলাম। আওয়াজটি ছিল উঁচু, যে কারণে আমি শঙ্কিত হলাম। কোনও শত্রু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর চড়াও হয়নি তো! আমি বিলম্ব না করে সেখানে চলে যেতে চাইলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাকে বারণ করে বলেছেন, 'আমি না আসা পর্যন্ত তুমি এ স্থান ত্যাগ করবে না।' (এই ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলে দিয়েছেন, এই জায়গা থেকে সরবে না তখন আর সরার কথা চিন্তা করতে পারলেন না। অথচ আওয়াজ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষতির আশঙ্কা করেছিলেন আর তারা তো তার এমনই আশেক ছিলেন যে, তাঁর ক্ষতি রোধ করার জন্য যদি প্রাণ দেওয়ারও প্রয়োজন হতো, তবে তা দিতে পারাকে সৌভাগ্যের বিষয়

মনে করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন না। কারণ তাঁর যে হুকুম হয়েছে, 'আমি না আসা পর্যন্ত এখান থেকে সরবে না।' আর তাঁর হুকুমের মর্যাদা সবকিছুর উপরে। সুতরাং সকল যুক্তি ও আবেগ কুরবানী দিয়ে হুকুম পালনকেই অগ্রাধিকার দিলেন)।

হযরত আবূ যর রাযি. বলেন, কিছুক্ষণ পর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি আওয়াজ শুনেছিলাম এবং সে কারণে আশঙ্কা করেছিলাম আপনার কোনও বিপদ হল কি না। তিনি বললেন, তুমি কি সে আওয়াজ শুনেছিলে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, আমি তা শুনেছিলাম। তিনি বললেন, আসলে তা ছিল জিবরাঈল (আ.)-এর আওয়াজ। জিবরাঈল আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমাকে সুসংবাদ দেন যে, আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে কোনও কুফরি কথা বলেনি, বরং তাওহীদের উপর মারা গেছে এবং আল্লাহ তা'আলা এক, তাঁর কোনো শরীক নেই– এ কথার উপর বিশ্বাস রাখা অবস্থায় মারা গেছে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। তার কোনও পাপ থেকে থাকলে শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে যাবে– যদি তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা না করে থাকেন। অন্যথায় সে প্রথম যাত্রাতেই জান্নাত লাভ করবে। মোটকথা তাওহীদী বিশ্বাসের বদৌলতে সে জান্নাতে একদিন না একদিন যাবেই।

হযরত আবূ যর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে থাকে কিংবা চুরি করে থাকে, তবুও (সে জান্নাতে যাবে)? তিনি উত্তরে বললেন, যদিও সে ব্যভিচার করে থাকে বা চুরি করে থাকে। অর্থাৎ অন্তরে যদি ঈমান থাকে, তবে তার দ্বারা কখনও কোনও গুনাহ হয়ে গেলেও একসময় না একসময় সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। হ্যাঁ, সে যে গুনাহ করেছে, যেসব পাপকর্ম তার দ্বারা হয়ে গেছে, তাঁর শাস্তি ভোগের জন্য প্রথমে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। জাহান্নামে

তাকে কিছুকাল সেই পাপের শাস্তি দেওয়া হবে। যদি সে ব্যভিচার করে থাকে, চুরি-ডাকাতি করে থাকে, সুদ-ঘুস খেয়ে থাকে বা গীবত-শিকায়াত ও মিথ্যা কথা ইত্যাদি বলে থাকে, তবে সেইসব গুনাহের জন্য প্রথমে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। শাস্তি ভোগের পর ইনশাআল্লাহ তা'আলা সে অবশ্যই একদিন জান্নাতে পৌঁছে যাবে।'[১৪১]

কিন্তু তাই বলে এই দুঃসাহস দেখানো ঠিক হবে না যে, ভাই জান্নাতের সুসংবাদ তো পাওয়া গেছে, এবার চলো কিছু গুনাহ করে নিই, কিছু মজা লুটে নিই। কেননা এইমাত্র হাদীছ শুনে এসেছেন যে, দুনিয়ায় যে ব্যক্তি আরাম আয়েশের ভেতর জীবন কাটিয়েছে, পাপ-পুণ্য বিচার করে চলেনি, তাকে জাহান্নামে মাত্র একবার চুবানি দেওয়া হলে তার কষ্টেই দুনিয়ার সকল আরাম-আয়েশের কথা ভুলে যাবে। তখন সমগ্র দুনিয়া তার কাছে তুচ্ছ মনে হবে, সব আনন্দ-ফূর্তি নাস্তি মনে হবে, যেন সে দুনিয়ায় কখনও কোনো সুখ-শান্তির মুখ দেখেনি। কাজেই জাহান্নামের শাস্তি কোনও হাসি তামাশার বিষয় নয়। তাতে একটি চুবানি খাওয়ার যে কষ্ট তাই বা বরদাশত করা কার পক্ষে সম্ভব? কাজেই এ হাদীছ যেন আমাদের কাউকে গুনাহের কাজে স্পর্ধিত করে না তোলে। ভেতরে যেন এই ধারণা না জন্মায় যে, জান্নাতে যখন যাবই, তখন কিছু গুনাহের মজা লুটে নিলে ক্ষতি কী! আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

দুনিয়ায় থাক মুসাফিরের মতো

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বলেন,

أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِيْ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ.

'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধে হাত রাখলেন। (কাঁধে হাত রাখার দ্বারা স্নেহ-মমতা প্রকাশ পায়। এভাবে

---

১৪১. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৫৯৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ২৫৬৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২০৩৮৫

স্নেহ-মমতার সাথে) তিনি বললেন, দুনিয়ায় এভাবে থাকো, যেন তুমি একজন পরদেশী কিংবা একজন পথিক ও মুসাফির।

অর্থাৎ মুসাফির যেমন সফরকালে কোনও মনজিলে যাত্রা বিরতি দেয়, কোনও মুসাফিরখানা বা পান্থশালায় ওঠে, তুমিও দুনিয়ায় সে রকম থাকো। মুসাফিরখানায় ওঠার পর পথিক সে ঘরটিকে স্থায়ী ঠিকানা মনে করে না এবং সেই ঘরের মোহে পড়ে নিজের আসল ঠিকানা ও সফরের উদ্দেশ্য ভুলে যায় না। তুমিও তেমনি দুনিয়ার মোহে পড়ে আখিরাতকে ভুলে যেও না। আর ভুলে যেওনা যে, তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে। মনে করুন, এক ব্যক্তি এখানে থেকে বিশেষ কোনও কাজে লাহোর গেল। এখন এই ব্যক্তি যদি সেই কাজটি ভুলে গিয়ে লাহোরে ঘর-বাড়ি বানানোর তালে পড়ে যায়, সেখানে কিভাবে আনন্দ-ফূর্তিতে দিন কাটানো যাবে সেই ফিকিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে সকলেই বলবে, লোকটা বেজায় নির্বোধ। এ হাদীছে মুমিনকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সে যেন এরকম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেয়।

দুনিয়া এক মনোরম দ্বীপের মতো

ইমাম গাযালী রহ. একটা সুন্দর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন, একটি জাহাজ কোথাও যাচ্ছিল, জাহাজটি যাত্রীতে ঠাসা। পথে একটি দ্বীপ পড়লে কাপ্তান সেখানে জাহাজটি ভেড়াল, যাতে পরবর্তী যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে নেওয়া যায়। কাপ্তান ঘোষণা করে দিল, দরকারি কাজ সারার জন্য আমাদেরকে এখানে কয়েক ঘণ্টা দেরি করতে হচ্ছে। কাজেই কোনো যাত্রী যদি এ দ্বীপে কিছুক্ষণের জন্য নামতে চায় তবে আমার পক্ষ থেকে তার অনুমতি আছে। এ ঘোষণা পাওয়ার পর জাহাজে যত যাত্রী ছিল সকলেই দ্বীপটিতে নেমে পড়ল। দ্বীপটি ছিল বড় মনোরম! চারদিকে চমৎকার সব দৃশ্য এবং মন মাতানো প্রাকৃতিক পরিবেশ। তারা তা প্রাণভরে উপভোগ করছিল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো তারা সেই সৌন্দর্যেই বিভোর হয়ে থাকল। ইত্যবসরে বিরতির সময় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার সময় কাছে এসে গেল। তখন একদল লোক– যারা ছিল হুঁশিয়ার ও সাবধানী। চিন্তা

করল, জাহাজ ছাড়ার সময় যেহেতু কাছে এসে গেছে, তাই এখানে আর দেরি করা উচিত নয়। এখনই গিয়ে জাহাজে চড়া দরকার। সে মতে তারা দ্রুত চলে আসল এবং জাহাজে উঠে উত্তম ও পসন্দমতো জায়গা দখল করে বসে পড়ল। আরেক দল চিন্তা করল এ দ্বীপটি তো বড় সুন্দর ও মনোরম। আমরা আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকি। আরও কিছুক্ষণ এর রূপ ও শোভা উপভোগ করে নিই। সুতরাং তারা আরও কিছুটা সময় সেখানে ঘুরে ফিরে কাটাল, পরিশেষে খেয়াল হল জাহাজ চলে যায়নি তো, আর দেরি না করে তারা জাহাজের দিকে ছুটে আসল। এসে জাহাজ পেল ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণ ভালো-ভালো আসন সব দখল হয়ে গেছে। নিম্নমানের জায়গাই খালি আছে। অগত্যা তারা তাতেই বসে গেল এবং ভাবল তাও ভালো, অন্তত জাহাজ তো পেয়েছি। ছেড়ে গেলে কী অবস্থা হতো! যাত্রীদের মধ্যে আরও কিছু লোক ছিল। তারা তখনও পর্যন্ত সেই দ্বীপে রয়ে গেছে। তারা ভাবল, এ দ্বীপটি তো খুবই জমকালো। বড় ভালো লাগছে এখানে। জাহাজে এতটা মজা পাচ্ছিলাম না। সুতরাং তারা আর জাহাজে ফিরে আসল না। দ্বীপেই থেকে গেল। বরং তারা দ্বীপের প্রাকৃতিক শোভা উপভোগেই এমনই মাতোয়ারা হয়ে থাকল যে, জাহাজে ফিরবার কথাই ভুলে গেল। ইত্যবসরে জাহাজ ছেড়ে দিল। তারা আর তাতে চড়তে পারল না। কিন্তু সে খবর তো তাদের নেই। দিনের উজ্জ্বল আলোয় দ্বীপের রূপ ও শোভা তাদের চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছিল। বড় চমৎকার লাগছিল তার নৈসর্গিক পরিবেশ। তবে কতক্ষণ? অবশেষে সূর্য অস্ত গেল। চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে গেল। ঘন অন্ধকারের ভেতর এতক্ষণকার সেই সৌন্দর্য শোভা গা ছমছম করা এক ভয়াল পরিবেশে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এখন আর সেই মনোরম দ্বীপে এক লহমাও কাটানো সম্ভব হচ্ছে না। পাছে বাঘ-সিংহের পেটে যেতে হয়। আছে আরও কত কিছুর ভয়।

বলুন, যারা দ্বীপের সৌন্দর্য-শোভায় এমনই মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেছে যে, জাহাজ চলে যায় যাক, কিন্তু দ্বীপ ছাড়তে রাজি নয়, তারা কতটা মূঢ় ও নির্বোধ?

এ উদাহরণ দেওয়ার পর ইমাম গাযালী রহ. বলেন, এ দুনিয়াও ওই দ্বীপের মতো। কাজেই এর চাকচিক্য ও সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে পড়া ও সেই মোহে মনপ্রাণ সমর্পণ করে আর সবকিছু ভুলে যাওয়া ঠিক ওই রকমরেই নির্বুদ্ধিতা, যেমনটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে দ্বীপের শোভায় আত্মসমর্পিত লোকগুলি। ওই লোকগুলিকে যেমন সারা জগৎ আহাম্মক বলবে, তেমনি এই দুনিয়ার রূপ-শোভায় আত্মনিবেদিত লোকেরাও প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাছে আহাম্মকই গণ্য হবে।

দুনিয়া স্থায়ী ঠিকানা নয়, বরং এক পান্থশালা

এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুনিয়ায় এভাবে থাকো, যেন তুমি এক পরদেশী কিংবা মুসাফির। বস্তুত দুনিয়ায় আমরা সকলে সফরের ভেতর আছি। প্রকৃত ঠিকানা আখিরাত। আমাদের এ সফর সেই ঠিকানারই উদ্দেশে। আল্লাহ তা'আলাই জানেন কার কখন গন্তব্যে পৌছার ডাক এসে যাবে আর দুনিয়ার ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। যে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে, তা তো বাড়ি নামের উপযুক্ত নয়। তা কেবল পথিকের বিশ্রামাগার, কেবলই পান্থশালা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ–

اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ.

'দুনিয়া সেই ব্যক্তির বাড়ি, যার কোনও বাড়ি নেই আর এর জন্য সঞ্চয় করে সেই, যার কোনও বুদ্ধি নেই।[১৪২]

অর্থাৎ তোমরা এ দুনিয়াকে নিজের ঘর-বাড়ি কিভাবে মনে করছ? চিন্তা করে দেখেছ কি নিজ বাড়ি কাকে বলে, নিজ বাড়ি তো বলে তাকেই, যেখানে নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে, যা নিজ দখলে থাকে, যাতে নিজ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে, যেখানে নিজ ইচ্ছামতো প্রবেশ করা যায়, কেউ বাধা দিতে পারে না, যতক্ষণ ইচ্ছা থাকা যায়, কেউ আপত্তি করতে পারে না এবং কারও বের করে দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, একেই

১৪২. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৩২৮৩

বলে নিজ বাড়ি। এসব সুযোগ যেখানে থাকে না সেটা নিজ বাড়ি নয়। এ কারণেই আপনি অন্য কারও বাড়ি গিয়ে বলতে পারেন না এটা আমার বাড়ি। পারেন না এজন্য যে, সেখানে আপনার কোনও কর্তৃত্ব নেই। কর্তৃত্ব থাকলেই সেটা হয় নিজের বাড়ি।

এবার চিন্তা করুন, এই দুনিয়ার ঘর-বাড়িতে আপনার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কতটুকু? আপনার ক্ষমতার বহর এখানে বড়ই সীমিত। যতক্ষণ চোখ খোলা আছে, ততক্ষণই। যেই না চোখ বন্ধ হয়ে যাবে ক্ষমতা শেষ। ঘরের বাসিন্দারাই আপনাকে সেদিন আপনার প্রিয় ঘর ও প্রিয় বিছানা থেকে বের করে দেবে। নিয়ে যাবে কবরে– মাটির গর্তে, সেখানে নিঃঙ্গ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে আসবে। এখন আর সে বাড়ির সাথে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। এটা যে-কোনও সময়ই হতে পারে। যে-কোনও দিন আপনার হাতেগড়া বাড়ি আপনার থেকে কেড়ে নেওয়া হবে, সঞ্চিত সব অর্থ-সম্পদও হাতছাড়া হয়ে যাবে। তো যে বাড়ির উপর আপনার ক্ষমতা এত কম, ইচ্ছামতো যেখানে থাকার এখতিয়ার নেই, তাকে নিজ বাড়ি কিভাবে মনে করেন? তাই তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ দুনিয়া সেই ব্যক্তির বাড়ি, আখেরাতে যার কোনও বাড়ি লাভ হবে না। আখিরাতের বাড়িই স্থায়ী বাড়ি। তা সর্বদা দখলে থাকবে, কখনও হাতছাড়া হবে না। সে বাড়িতে একবার প্রবেশ করলে আর কখনও তা থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হতে হবে না। সেই বাড়ি যার নসীবে নেই, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বাড়িকেই সে প্রকৃত বাড়ি মনে করে।

মন-মস্তিষ্ক যেন দুনিয়া দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকে

পরবর্তী বাক্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ দুনিয়ার জন্য সে ব্যক্তিই অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে, যার আকল-বুদ্ধি নেই।

এ হাদীছ দ্বারা বৈরাগ্যবাদ হচ্ছে না; বরং দুনিয়ার প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যতদিন বেঁচে আছ দুনিয়ায়

তো থাকতেই হবে। তা থাকো। কিন্তু দুনিয়ার হাকীকত ও প্রকৃতি কী তা বুঝে থাকো। দুনিয়া দ্বারা নিজ মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রেখো না। চেতনাটা এরকম রেখো যে, এ দুনিয়া যাত্রাপথের একটা মনজিল মাত্র। এটা একভাবে না একভাবে কেটেই যাবে। আখিরাতই যেহেতু আসল ঠিকানা, তাই মুখ্য চিন্তা সে নিয়েই থাকা উচিত। এমন কর্মপন্থা মুমিনের জন্য শোভা পায় না যে, সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল দুনিয়ার জন্যই দৌড়ঝাঁপ করবে। দুনিয়াই হবে তার ধ্যানজ্ঞান। বরং দুনিয়ার জন্য সে প্রয়োজন মাফিক চিন্তা ও চেষ্টা করবে আর প্রকৃত সাধনা থাকবে আখিরাতের ব্যাপারে।

দুনিয়াপ্রীতির একটি আলামত

অন্তরে দুনিয়ার আসক্তি আছে কি নেই তার আলামত কী? কী করে বুঝব আমি একজন দুনিয়াপ্রেমী? হ্যাঁ, এরও আলামত আছে। আপনি নিজ চিন্তার খতিয়ান নিন। দেখুন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনার অন্তরে কিসের চিন্তা বিরাজ করে। সর্বক্ষণ কি এরই ফিকির যে, কিভাবে বেশি বেশি অর্থোপার্জন হবে? কামাই রোজগার আরও কিভাবে বাড়ানো যাবে? সঞ্চয়ের খাতা কী উপায়ে সমৃদ্ধ হবে? না কি মৃত্যু-চিন্তাও অন্তরে স্থান পায়? একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এই ভাবনাও অন্তরে দাগ কাটে? যদি মরার ভয় ও আখিরাতের পেরেশানিও অন্তরে স্থান পায়, তবে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতে পারেন। কেননা এটা কুরআন মাজীদে যে দুনিয়াপ্রীতির নিন্দা করা হয়েছে, আপনার অন্তরে তা না থাকার পরিচয় বহন করে। পক্ষান্তরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুনিয়া অর্জনের চিন্তাই যদি মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে, তবে বুঝতে হবে অন্তর থেকে আখেরাত বিস্মৃত এবং সে অন্তর দুনিয়ার ভালোবাসায় প্লাবিত।

হযরত শেখ সা'দী রহ. তার বিখ্যাত রচনা গুলিস্তায় একটি ঘটনা লিখেছেন। সে ঘটনার ভেতর আমাদের জন্য অতি মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে। তিনি বলেন, একবার আমি এক সফরে ছিলাম। সফর চলাকালে

আমি এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে মেহমান হলাম। ব্যবসায়ী লোকটি রাতভর তার ব্যবসা-বাণিজ্যের গল্প শুনিয়ে আমাকে ত্যক্তবিরক্ত করে ফেলে। সে একের পর এক তার বাণিজ্যিক সফরের বৃত্তান্ত শোনাচ্ছিল এবং কোথায় তার কী ব্যবসা আছে তার খতিয়ান দিচ্ছিল। অমুক জায়গায় আমার এই ব্যবসা আছে। হিন্দুস্তানে আমার এই-এই কারবার আছে। ইরানে অমুক ব্যবসা জমে উঠেছে। খুরাসানে এই ব্যবসা শুরু করেছি ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব ঘটনা শোনানোর পর বলল, আমার সব আশাই পূর্ণ হয়ে গেছে। আমার ব্যবসা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করছে। এখন মাত্র একটা আশা বাকি আছে। সবশেষে আরেকটি সফর করার ইচ্ছা আছে। দু'আ করবেন যেন আমার সে সফরও সফল হয়। এ আশা পূরণ হয়ে গেলে ব্যস আমার আর কিছুর দরকার হবে না। আমার পরিতৃপ্তি এসে যাবে, অবশিষ্ট জীবন দোকানে বসে কাটিয়ে দেব।

শেখ সাদী রহ. জিজ্ঞেস করলেন, সর্বশেষ সেই সফর কোথায় করতে চাচ্ছেন? বলল, আমি এখান থেকে এই-এই মাল নিয়ে চীনদেশে যাব। সেখানে তা বিক্রি করব। তারপর চীন থেকে শিশা কিনে রোম নিয়ে যাব। রোমে চীনা শিশার বড় কদর। চড়া দামে বিক্রি হয়। সেখানে তা বিক্রি করে সেখানকার অমুক-অমুক পণ্য কিনব এবং তা আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে যাব। সেখানে তা বিক্রি করে কার্পেট কিনব। হিন্দুস্তানে আলেকজান্দ্রির কার্পেটের বিপুল চাহিদা। কাজেই আমি হিন্দুস্তানে তার একটি চালান নিয়ে যাব। তারপর সেখানে তা বিক্রি করে গ্লাস কিনব। হালাবে হিন্দুস্তানী গ্লাসের মার্কেট ভালো। সুতরাং আমি তা নিয়ে হালাব চলে যাব। এভাবে সে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক সফরের যে মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আমাকে সেই মহাভারত শুনিয়ে দিল। তারপর বলল, দু'আ করুন আমার এ আশা যেন পূরণ হয়। এরপর আমার আর কিছু চাওয়ার থাকবে না। অবশিষ্ট জীবন দোকানে বসে-বসে কাটিয়ে দেব। অর্থাৎ এত বড় লম্বা-চওড়া সফরের পরেও তার যে জীবন অবশিষ্ট থাকবে বলে যে স্থির করে রেখেছে, তা সে দোকানে বসে গুযরান করবে।

শেখ সা'দী রহ. বলেন, তার এতসব কথা শোনার পর আমি তাকে বললাম,

آشنید استی کہ در صحراءے غور
بار سالارے بیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیا دار را
یا قناعت پر کند یا خاک غور

তুমি এ ঘটনা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, গোর মরুভূমিতে এত বড় সওগাদরের মালপত্র খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। পতিত সেই মালপত্রের সাথে খচ্চরটিও সেখানে মরে পড়ে রয়েছিল এবং সঙ্গে সেই সওদাগরও। সেইসব মালামাল যেন বলছিল, তোমরা শোনো হে! দুনিয়াদারের চোখের ক্ষুধা মিটাতে পারে কেবল দু'টি জিনিস, অল্পেতুষ্টি অথবা কবরের মাটি। তৃতীয় কোনও জিনিস দ্বারা তার এ ক্ষুধা মিটবার নয়।

শেখ সা'দী রহ. বলেন, এ দুনিয়া যখন মানুষের উপর জেঁকে বসে, তখন আর অন্তরে অন্য কোনো চিন্তা ঠাঁই পায় না। একেই বলে দুনিয়াপ্রীতি, কুরআন-হাদীছে যার নিন্দা করা হয়েছে। যদি এই দুনিয়াপ্রীতি ও বিষয়াসক্তি না থাকে, আর এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে অর্থ-সম্পদ দান করেন, অতঃপর সেই সম্পদে তার অন্তর মগ্ন হয়ে না পড়ে এবং তা আল্লাহ তা'আলার বিধনাবলি পালনের পথে প্রতিবন্ধক না হয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী খরচ করা হয়, তবে সেই সম্পদ নিন্দনীয় দুনিয়া নয়; বরং তা আখিরাত অর্জনেরই উপায়-উপকরণ। পক্ষান্তরে সে সম্পদের আসক্তি যদি আখিরাতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তবে সেটাই দুনিয়াপ্রীতি।

অন্তর থেকে দুনিয়াপ্রীতি অপসারণের উপায়

দুনিয়ার ভালোবাসা দূর করে অন্তরকে আখিরাতমুখী করে তোলা কোনো কঠিন কাজ নয়। সেই ইচ্ছা যদি থাকে, তবে দিবারাত্রির চব্বিশ

ঘণ্টা থেকে সামান্য কিছু সময় এর জন্য বরাদ্দ করুন। তা যখনই হোক। সেই সময়ে বসে বসে এই মুরাকাবা ও ধ্যান করুন- গাফলতি ও উদাসীনতার ভেতর আমার জীবন কাটছে, আমি মৃত্যুর ব্যাপারে গাফেল। একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতে হবে, সে ব্যাপারেও গাফেল। গাফেল হিসাব কিতাব সম্পর্কে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের পুরস্কার-শাস্তি সম্পর্কে। আখিরাতের কোনও কিছু সম্পর্কেই আমি সচেতন নই। এক মহা গাফলতি আমাকে গ্রাস করে নিয়েছে। অথচ একদিন মরতে আমাকে হবেই। কবরের অন্ধকারে পড়ে থাকতে হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলার সামনে আমাকে উপস্থিত হতে হবে। না জানি কেমন হয় সে উপস্থিতি! তখন আমাকে প্রশ্ন করা হবে- কত কত প্রশ্ন! তার কী জবাব আমি দেব? কী প্রস্তুতি আমার আছে? প্রতিদিন কিছু সময় এসব বিষয়ে মুরাকাবা বা ধ্যান করুন।

হযরত থানভী রহ. বলেন, প্রতিদিন কোনো ব্যক্তি এই মুরাকাবা করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ কয়েক সপ্তাহের ভেতরই উপলব্ধি করতে পারবে, অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর হতে শুরু করেছে, আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাকে ও আপনাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

আখিরাতের চিন্তা*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾

'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাত কত বেশি উৎকৃষ্ট ও কত বেশি স্থায়ী![১৪৩]

হযরত উলামায়ে কেরাম ও মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! এটা আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলা আজ আমাকে আমার সম্মানিত বুযুর্গদের সাক্ষাত ও সাহচর্য লাভের সুযোগ দান করেছেন।

মানুষের মূল রোগ

আমি আপনাদের সামনে সূরা আ'লা-র একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এটা কুরআন মাজীদেরই এক অলৌকিক বৈশিষ্ট্য যে, আপনি

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৫৮-২৭৮

১৪৩. সূরা আ'লা, আয়াত ১৬-১৭

তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি আয়াতের প্রতিও যদি লক্ষ করেন, দেখতে পাবেন শাব্দিক দিক থেকে তা ছোট বটে, কিন্তু তার মর্ম অতি গভীর এবং তাৎপর্য অনেক ব্যাপক। ফলে সেই ছোট্ট আয়াতখানিই গোটা জীবনের দিশারী হয়ে যায়। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের একটি মৌলিক রোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আয়াতটি বলে দিচ্ছে তোমরা এই রোগে আক্রান্ত।

রোগটি বড় সর্বনাশা। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা ধ্বংস ডেকে আনে। আয়াতটি সে রোগের প্রতি আঙ্গুলিনির্দেশের সাথে সাথে তার ব্যবস্থাপত্রও বলে দিয়েছে। সংক্ষিপ্ত দু'টি আয়াত। প্রথমটিতে শনাক্ত করা হয়েছে ব্যাধি আর দ্বিতীয়টিতে জানানো হয়েছে তার নিরাময় ব্যবস্থা। রোগটা কী সে সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও।' অর্থাৎ তোমাদের মৌলিক দোষ হল আখিরাতের উপর দুনিয়াকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা চিন্তা করো পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে। দুনিয়ার সফলতা, পার্থিব জীবনের উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই তোমাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এ নিয়েই তোমাদের দিনমানের ধ্যান জ্ঞান। তো এই যে আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছ- এটা তোমাদের একটা রোগ। এ রোগ থেকে তোমাদের মুক্তি দরকার। কিভাবে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে? কী এ রোগের দাওয়াই?

রোগের প্রতিকার

এ রোগের দাওয়াই হচ্ছে দুনিয়ার স্বরূপ ও তার বিপরীতে আখিরাতের মর্যাদা অনুধাবন করা। একটু চিন্তা করে দেখো, যে দুনিয়ার জন্য তোমরা দৌড়ঝাঁপ করছ, যার জন্য তোমাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ও দিবারাত্রের অবিরাম মেহনত, তার হাকীকত কী? যেই দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে কেন্দ্র করে তোমাদের সব শ্রম-সাধনা আবর্তিত হচ্ছে, কিভাবে ভালো বাড়ি বানানো যায়, প্রচুর টাকা-পয়সার মালিক হওয়া যায়, ইজ্জত-সম্মান লাভ হয়, চারদিকে সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, প্রভাব-প্রতিপত্তির ডঙ্কা বেজে যায় এবং বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হওয়া

যায় এবংবিধ স্বপ্নে তোমরা যেই দুনিয়াকে নিয়ে বিভোর তার স্বরূপ তোমরা কখনও ভেবে দেখেছ? যে দুনিয়ার জন্য তোমরা প্রাণান্ত চেষ্টা করছ, যার জন্য হালাল-হারাম একাকার করে ফেলেছ, যার খাতিরে নিত্য-নতুন সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছ, স্থায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ কিনে নিচ্ছ কিংবা হচ্ছ অন্যের রক্তপিপাসু, কখনও চিন্তা করে দেখেছ, তা কত দিনের জীবন? তারপর যে একদিন মরতে হবে এবং মাটির কবরে পড়ে থাকতে হবে তা কি কখনও মাথায় এনেছ? তারপর সামনে আসছে আখিরাতের জীবন। সে জীবন ইহলোক অপেক্ষা যে কত শ্রেষ্ঠ। তা স্থায়ী ও অন্তহীন। একটিবার সেই জীবনের সাথে ইহজীবনকে মিলিয়ে দেখো।

দুনিয়ার কোনো আনন্দই পরিপূর্ণ নয়। এখানে প্রতিটি হরিষের সাথে বিষাদের কাঁটা রয়েছে। কখনও দুশ্চিন্তার কাঁটা, কখনও আঘাতের কাঁটা, কখনও আপদ-বিপদের কাঁটা, কোনও খুশীই নিখুঁত নয়। কোনও আস্বাদ অবিমিশ্র নয়। উপাদেয় খাবার পরিবেশিত, পেটে খিদে আছে, আস্বাদ নিয়েই খাওয়া হচ্ছে, কিন্তু মনের ভেতর ছিল দুশ্চিন্তা। ছিল কোনও আঘাতের রক্তক্ষরণ। সেই যাতনার ভুড়বুড়িতে সব আস্বাদ বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে তা সব আনন্দ মাটি করে দিচ্ছে। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এই একই অবস্থা। দুনিয়ার কোনো আনন্দই পূর্ণাঙ্গ নয়।

মানুষ মনে করে অর্থ-সম্পদ হাতে আসলেই নিশ্চিত লাভ হবে, সুখ মুঠোয় এসে যাবে। ব্যাপার মোটেও তা নয়। দুনিয়ার বড়-বড় সম্পদশালী ও মিল-কারখানার মালিকদের কেবল বাইরের অবস্থাটাই লক্ষ্য করা হয়। তাদের ভেতরের অবস্থাটাও উঁকি মেরে দেখুন। বাইরে তো দেখা যাচ্ছে বড়-বড় মিল-কারখানা চলছে। তাতে হাজার-হাজার শ্রমিক খাটছে। তাদের আলিশান গাড়ি। জমকালো বাড়ি চাকর-নকর, ভৃত্য-চাপরাশিতে সদা সরগরম। আয়েশী জীবনের সব উপকরণ তাদের মুঠোর ভেতর। কিন্তু মালিক বাহাদুরের চোখে ঘুম নেই। ঘুমের বড়ি খেতে হয়। ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করতে হয়। অনেক সাধনা করে একটু ঘুম আনতে হয়। কত আরামের বিছানা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ। সুনসান ঘুম-ঘুম বাতাবরণ। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না। অপরদিকে

এক কৃষক বা এক দিনমজুরকে দেখুন। মশারি নেই, চাদর নেই। চকি-বালিশের কোনো ঠিকানা নেই। কিন্তু দিনভর খাটুনি শেষে রাতেরবেলা যেই না ক্লান্ত অবসন্ন শরীর নিয়ে ঘুমাতে যায়, চাটাই বা ছেড়া কাঁথার উপর মাথার নিচে হাত রেখে শুয়ে পড়ে, অমনি রাজ্যির ঘুম তার দুচোখ জেঁকে বসে। কী নিবিড় ঘুমের ভেতর টানা আট ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। তারপর আড়মোড়া দিয়ে চটকা ভেঙে যখন জেগে ওঠে, তখন একদম ফ্রেশ, ঝড়ঝড়ে তার দেহমন। বলুন তো কার রাতটা সুন্দর কাটল? ওই শিল্পপতির, না এই দিনমজুরের?

যা হোক, আল্লাহ তা'আলা ইহলোকের ব্যবস্থাটাই এমন করেছেন যে, এখানকার কোনো আনন্দ পূর্ণাঙ্গ নয়, কোনো আস্বাদ বিশুদ্ধ নয়। প্রত্যেক হরিষের সাথেই বিষাদ আছে এবং প্রত্যেক নিরানন্দের সাথেই আনন্দ আছে।

ত্রিজগতের তিন অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা তিনটি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। একটি জগৎ এমন, যেখানে কেবলই সুখ, আনন্দ ও আয়েশ। সেখানে কোনো দুঃখ-বেদনা নেই, কোনও রকমের কষ্ট-ক্লেশ নেই। তার নাম জান্নাত। জান্নাত চির শান্তির জায়গা। সেখানে দুঃখ-কষ্টের প্রবেশাধিকার নেই। আরেকটি জগৎ এর সম্পূর্ণ বিপরীত, সেখানে শুধু দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট ও বেদনা। যন্ত্রণা-যাতনায় ভরপুর সে স্থান। তার নাম জাহান্নাম। জাহান্নামে সুখ-শান্তির লেশমাত্র নেই। তা চির দুর্ভোগের জায়গা। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদের সকলকে তা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

তৃতীয় জগৎ হচ্ছে এই দুনিয়া। এ জগৎ সুখ-দুঃখের মিশেলে তৈরি। এখানে আরামও আছে, কষ্টও আছে, আনন্দও আছে, বেদনাও আছে। এখানে হর্ষ-বিষাদের পাশাপাশি অবস্থান। সুতরাং এ জগতে বাস করে কেউ যদি আশা করে কোনো দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করবে না, কোনও বিপদাপদে সে আক্রান্ত হবে না এবং তার ইচ্ছা-মরজির বিপরীত কিছু ঘটবে না, তবে বলতে হবে সে দুনিয়া কী জিনিস তা বুঝতে পারেনি।

বুঝলে সে এ আশা করত না। সে যা আশা করেছে দুনিয়ায় তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আরে ভাই, তুমি আর কোথায়। যারা আল্লাহ তা'আলার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সেই নবী-রাসূলগণকেও তো নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এমন কোনও নবী-রাসূল নেই, যিনি দুনিয়ায় এসে বিপদাপদের সম্মুখীন হননি। হাজারও বেদনায় তাঁদেরকেও আহত হতে হয়েছে।

এ জগতে অবিমিশ্র আনন্দ যদি লাভ করা সম্ভব হতো, তবে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় সেই বান্দাগণই লাভ করতেন। তা লাভ করার হক তাঁদের চেয়ে বেশি আর কারও থাকতে পারে না। অথচ তাঁদের জীবন ঠিক এভাবে কাটেনি। তাঁদের জীবনও কেটেছে নানারকম কষ্ট-ক্লেশের ভেতর। বরং সর্বাপেক্ষা বেশি কষ্টের ভেতর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন–

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ

এ দুনিয়ায় বিপদাপদ সর্বাপেক্ষা বেশি পোহাতে হয়েছে নবীগণকে তারপর তাদেরকে, যারা নবীগণের বেশি নিকবর্তী এবং এভাবে অনুকরণ-অনুসরণের যারা যত বেশি নবীগণের নিকটবর্তী, তারা ততবেশি বিপদাপদের সম্মুখীন হয়।[১৪৪]

আমি আরয করছিলাম, দুনিয়ার কোনও আনন্দই পূর্ণাঙ্গ নয়। এখানকার কোনও সুখ অবিমিশ্র নয় এবং কোনও আরামই স্থায়ী নয়। এখন যে ব্যক্তি স্বস্তিতে আছে, একটু পরেও যে এ স্বস্তি অটুট থাকবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে ক্ষণিক পরেই তার ফাসাদ দেখা দেবে। কিংবা পরের সপ্তায়, পরের মাসে বা পরের বছর সে বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। একসময় না একসময় তার বর্তমান সুখের সমাপ্তি ঘটবেই। ঠিক দুঃখের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা। কাজেই এখানকার সুখও পরিপূর্ণ নয়, দুঃখও পরিপূর্ণ নয়।

---

১৪৪. কানযুল উম্মাল, হাদীছ নং ৬৭৮৩

আখিরাতের সুখই হবে পরিপূর্ণ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى 'আখিরাত অনেক বেশি উৎকৃষ্ট এবং বেশি স্থায়ী।' কেননা আখিরাতের সুখ পরিপূর্ণ, তাতে দুঃখের কোনও মিশেল নেই। সেখানকার আনন্দ পরিপূর্ণ, বিষাদের লেশমাত্র নেই। সেখানকার আরাম-আয়েশ সবই পরিপূর্ণ আবার তা স্থায়ীও বটে, কখনও শেষ হওয়ার নয়। যেসব নি'আমত দেওয়া হবে, তা অনন্তকালের জন্যই দেওয়া হবে। সুতরাং হারানোর কোনও ভয় থাকবে না। আবার সেখানে কোনও স্বাদ বিস্বাদেও পরিণত হবে না। কখনও কোনও নি'আমত ভোগ করতে করতে তার প্রতি অনাগ্রহ ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হবে না। সেখানে নি'আমাতের স্বাদ কখনও শেষ হবে না।

দুনিয়ায় নি'আমাতের স্বাদ ফুরায়। কোনও একটা খাবার হয়তো আপনার ভালো লাগছে। আপনি আগ্রহ ভরে খাচ্ছেন। এক প্লেট খেলেন, দু'প্লেট খেলেন, একটি রুটি খেয়ে শেষ করলেন, আরও একটি নিলেন। এভাবে খেতে খেতে একসময় পেট ভরে গেল এবং চাহিদা শেষ হয়ে গেল। এখন আর চাইলেও আপনি খেতে পারবেন না। সে খাবারের প্রতি আপনার আগ্রহই থাকবে না; বরং অরুচি লাগবে। এতক্ষণ যা ছিল প্রিয় খাবার, যার প্রতি মন প্রলুব্ধ ছিল, বড় মজা করে খাচ্ছিলেন, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেই আগ্রহ খতম হয়ে গেল। উল্টো তার প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়ে গেল। এখন আর তা খেতে মনে চাচ্ছে না। কেউ পুরস্কার দিতে চাইলেও খাবেন না। কেন এমনটা হল? ব্যাপারটা হল পার্থিব সীমাবদ্ধতার। এখানকার সবকিছু সীমাবদ্ধ। পেটের সংকুলান ছিল সীমাবদ্ধ, সেই সীমা শেষ হয়ে গেছে। এখন আর তাতে সংকুলান নেই। তাই চাহিদা শেষ হয়ে গেছে এবং মজাও ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু আখিরাতে সবকিছুই হবে অপরিমিত। সেখানে যে নি'আমত ও যে খাবারই দেওয়া হবে, তাতে কখনও অরুচি ধরবে না। এমন হবে না যে, ভাই পেট ভরে গেছে, তাই আর খাওয়া সম্ভব নয়। এটা দুনিয়ায় হয়, সেখানে হবে না। কাজেই সেখানকার আস্বাদ ও আনন্দ পরিপূর্ণ। তা কখনও ম্লান হবে না। সে কথাই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, আখিরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। দুনিয়া

উৎকৃষ্টও নয়, স্থায়ীও নয়। তা সত্ত্বেও তোমরা উল্টো পথে চলছ। তোমরা আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছ। দিনরাত দুনিয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকছ এবং দুনিয়ারই জন্য দৌড়ঝাঁপ করছ। আখিরাতকে নিয়ে ভাবছ না।

এ আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট দেখতে পাব, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা আমাদের সর্বরোগের মূলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে তার প্রতিকারও বাতলে দিয়েছেন।

মৃত্যু এক অমোঘ সত্য

দুনিয়ায় সত্য তো বহু কিছুই। কিন্তু প্রত্যেককে একদিন মরতে হবে– এটা এমন এক সত্য, যা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। এটা এক অবিসংবাদিত সত্য। এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। মুসলিম তো বটেই, প্রত্যেক কাফেরও স্বীকার করে যে, হ্যাঁ একদিন মরতে অবশ্যই হবে। আজ অবধি দুনিয়ায় এমন কোনও লোক জন্ম নেয়নি, যে মৃত্যু সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করছে এবং ঘোষণা করেছে, মানুষের জন্য মৃত্যু অবধারিত নয়। মানুষ তো আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করেছে। এক শ্রেণির লোক তো প্রকাশ্যেই বলে, সৃষ্টিকর্তা মানি না। কিন্তু 'মৃত্যু মানি না' এ কথা বলার লোক আজ অবধি জন্ম নেয়নি। আকাট নাস্তিক, ঘোরতর বেদ্বীন, স্পর্ধিত অবিশ্বাসী, কেউই আজ পর্যন্ত দাবি করেনি যে, আমি মরব না। সবকিছু নিয়েই মতভেদ আছে, কিন্তু মৃত্যু যে অবধারিত সে নিয়ে কোনও মতভেদ নেই। এমনিভাবে মৃত্যুর দিনক্ষণ যে অনিশ্চিত সে বিষয়টাও অবিসংবাদিত। কেউ জানে না কে কোন দিন মরবে, বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। মানুষ চাঁদে পৌছেছে, মঙ্গলে পদার্পণ করেছে, কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছে, যন্ত্রমানব তৈরি হয়েছে, কত কিছুই হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করুন, বলো তো তোমার সামনে যে লোকটি বসে আছে সে কোনদিন মরা যাবে?

সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান এ ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ করবে। সব বিদ্বান বিজ্ঞানী স্বীকার করবে, কার মৃত্যু কখন তা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আজব

ব্যাপার হল, মৃত্যু যত বেশি নিশ্চিত এবং তার দিন যত বেশি অনিশ্চিত, আমরা সকলে মৃত্যুর ব্যাপারে ঠিক ততখানিই গাফিল ও উদাসীন।

নিজেই নিজের খতিয়ান নিয়ে দেখি– ঘুম থেকে জাগার পর আবার রাতের বেলা শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত এই সারাটা বেলা আমরা কত কিছুই ভাবি, কত কিছু চিন্তা করি, আয়-রোজগার, মেহনত-মজদুরি চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, গৃহস্থালি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সভা সমিতি, অফিস-ক্লাব এবং না জানি আরও কত কিছু মাথার ভেতর ঘুরপাক খায়, কিন্তু একদিন যে মরণ আসবে, কবরে যেতে হবে, কখনও মন-মস্তিষ্কে এ চিন্তা উঁকি মারে? বারেকের জন্য কি এই চিন্তা আমাদের উদ্বিগ্ন করে যে, কবরে যাওয়ার পর কী অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে?

হযরত বাহলূল রহ.-এর ঘটনা

বহু পূর্বে খলিফা হারূনুর রশীদের আমলে এক বুযুর্গ ছিলেন। বাহলুল নামে পরিচিত। মাজযূব ও আত্মভোলা প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু মাঝে-মধ্যে যেসব কথা বলতেন, তা বড় তাৎপর্যপূর্ণ হতো, খুবই সারগর্ভ হতো। যে কারণে লোকে তাকে 'জ্ঞানী বাহলুল', 'প্রাজ্ঞ বাহলূল', 'মাজযূব' ইত্যাদি বলত। খলীফা হারূনুর রশীদ তাঁর সাথে রসিকতা করতেন। তাঁর পক্ষ থেকে ঘোষণা ছিল, বাহলূল যখনই আমার কাছে আসতে চাবে, কেউ যেন বাধা না দেয়। সেমতে খলিফার দরবারে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। একদিনকার কথা। খলিফা হারূনুর রশীদ দরবারে বসে আছেন। হঠাৎ বাহলূল উপস্থিত। তাঁর সাথে হারূনুর রশীদের তো আনন্দ-ফূর্তি করার অভ্যাস ছিলই। আজও তা-ই করলেন। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল তিনি সেটি বাহলূলকে দিয়ে বললেন, এই ছড়িটি আমি তোমার কাছে আমানত রাখছি। তুমি দেখো দুনিয়ায় তোমার চেয়ে বড় বোকা কাউকে পাও কিনা। পেলে আমার পক্ষ থেকে এটি তাকে উপহার দিও। ইশারায় বোঝাতে চাচ্ছিলেন তুমিই দুনিয়ার সেরা বোকা। তোমার চেয়ে বড় বোকা আর কেউ নেই। তা বাহলূল ছড়িটি নিলেন এবং কিছুই না বলে সেটি নিজের কাছে রেখে দিলেন। দিন আসে দিন যায়। এভাবে মাস গেল, বছর গেল। বহুদিন কেটে

গেল। এর মধ্যে খলীফা হারুনুর রশীদ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কঠিন ব্যাধি। একদম শয্যাশায়ী। কোথাও যাতায়াত নেই। চিকিৎসকদের বারণ– কোথাও যাওয়া যাবে না। টানা বিশ্রামে থাকতে হবে।

খলিফার অসুস্থতার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাহলূলের কানেও পৌছে গেল। কাজেই তাঁকে দেখার জন্য তিনি চলে আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমীরুল মুমিনীন! কেমন লাগছে? খলিফা বললেন, কী অবস্থা শোনাব! সামনে যে অনেক দীর্ঘ সফর! কোথাকার সফর আমীরুল মুমিনীন? বললেন আখিরাতের সফর। বাহলূল বললেন, বটে, অনেক লম্বা সফর! তা সেখানকার জন্য আপনি কত ব্যাটলিয়ন সৈন্য পাঠিয়েছেন? সিভিলের কতজন? তাছাড়া প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, তাঁবু ইত্যাদি? হারুনুর-রশীদ বললেন, বাহলূল। কী বোকার মতো কথা বলছ? সে তো এমন সফর, যাতে তাঁবু কোনও কাজে লাগে না। কোনও দেহরক্ষী ও লোক লশ্‌কর সঙ্গে যায় না– যেতে পারে না। বাহলূল বললেন, তা ফিরে আসছেন কবে? খলিফা বললেন, আবার সেই আজব কথা। এটা তো আখিরাতের সফর। সেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না কি? না আসতে পারে?

বাহলূল বললেন, আচ্ছা! এত দীর্ঘ সফর যে, সেখান থেকে কেউ ফিরে আসতে পারে না এবং আগে থেকে কেউ সেখানে যেতেও পারে না?

খলিফা বললেন, হ্যাঁ, তা এরমকই সফর। বাহলূল, আমীরুল-মুমিনীন! আপনার হয়তো মনে আছে, অনেক দিন আগে আপনি আমার কাছে একটি আমানত রেখেছিলেন। বলেছিলেন, আমার চেয়েও বড় বোকা পেলে তাকে যেন সেটি আপনার পক্ষ থেকে উপহার দিই। খলিফা! আজ আমি সেই ব্যক্তির সন্ধান পেয়ে গেছি। উপহারটির সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার আপনি। নিন এই সেই ছড়ি, আপনার প্রাপ্য উপহার। কেননা আমি দেখেছি অতি অল্প দূরত্বের সফরেও, যে সফর থেকে অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে আসা হতো, আপনি আগে থেকেই অনেক আয়োজন করতেন। আগেই বহু সৈন্য পাঠিয়ে দিতেন। তারা আপনার পথ প্রস্তুত করত। মনজিল ও বিরতিস্থান ঠিক করত এবং সব রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করত। অথচ এত বড় দীর্ঘ সফর আপনার

সামনে আর সেজন্য আপনার কোনও পূর্বপ্রস্তুতি নেই। যে সফর থেকে আপনার ফিরে আসার কোনও সুযোগ নেই, তার জন্য কোনওরূপ ব্যবস্থাপত্র নেই। এটা তো চরম নির্বুদ্ধিতা! কাজেই আমার চেয়ে বড় বোকা এই আপনাকেই পেলাম। এ ছড়ি আপনারই উপযুক্ত।

হারূনুর-রশীদ বাহলূলের কথায় কেঁদে দিলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাহলূল! আমরা তোমাকে পাগল মনে করতাম, কিন্তু প্রমাণ করলে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানবান আর কেউ নেই।

মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা চাই

এটা তো বাস্তব কথা, দুনিয়ায় মামুলি কোনও সফরের প্রয়োজন হলেও তার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, কথায় কথায় তার উল্লেখ করা হয় এবং কত রকমের আয়োজন করা হয়, কিন্তু আখিরাতের সফরের ক্ষেত্রে কিছুই চোখে পড়ে না। কোনও রকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া এমনি-এমনিই তার যাত্রা শুরু হয়ে যায়। দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা এমনভাবে মাথায় জেঁকে বসে আছে যে, তাছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। দুনিয়ার জন্য নিজেকে বড় কাজের, বড় দরকারী মনে হয়। আমাকে ছাড়া যেন দুনিয়ার চাকা ঘুরবে না। বড় পেরেশানি– আমি না থাকলে বাচ্চাদের কী হবে, স্ত্রীর কী হবে, কাজ-কারবার কিভাবে চলবে? অথচ অন্তিম যাত্রার সময় যে চলে আসছে সেজন্য কোনও চিন্তা নেই, চিন্তা করতে প্রস্তুতও নই। নিজ কাঁধে কত লাশের খাটিয়া বহন করি। নিজ হাতে প্রিয়জনদের কবরে শোয়াই, নিজ হাতে তাদের কবরে মাটি দিই, অথচ চিন্তা করি না আমার নিজের পালাও সামনে আসছে– ভাবখানা এমন, যেন এসব তাদের বেলায়ই ঘটেছে, আমার সাথে এর কোনও সম্বন্ধ নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ.

'সব স্বাদ-আহ্লাদ বিনাশকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করো।'[১৪৫]

---

১৪৫. সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২৩০৮

নিজেরও একটু খতিয়ান নেওয়া দরকার। চব্বিশ ঘণ্টা থেকে কতটুকু সময় আমরা মৃত্যুচিন্তায় ব্যয় করি? আদৌ কি করি? দিন মানের সবটাই তো দুনিয়ারির জন্য বরাদ্দ। সময় কোথা যে, মৃত্যু-চিন্তায় সময় দেব? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীছের মাধ্যমে আমাদের সচেতন করছেন। আমাদের মূল রোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। মূল রোগ এটাই যে, আমরা মৃত্যু সম্পর্কে গাফেল। যদি আখিরাতকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেওয়া যায়, আখিরাত চোখের সামনে এসে যায় এবং মন-মস্তিষ্কে তার চিন্তা জায়গা পায়, তবে জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দুনিয়ায় যত অপরাধ হচ্ছে, অশান্তি, অবিচার ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে তার মূল এখানেই যে, আমাদের চিন্তা-চেতনা সব এই দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। আখিরাতের দিকে নজর নেই। আখিরাতের কোনও ভাবনা নেই। কখন কার সম্পদ গাপ করব, কার অধিকারে হাত বসাব, কার রক্ত পান করব– সর্বক্ষণ এরই ধান্দা। আর তা কেবলই নিজ দুনিয়া নির্মাণের জন্য। মৃত্যুর পর কী হবে সে চিন্তার ফুরসত নেই।

প্রিয়নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই আমাদেরকে এ ফাসাদ থেকে মুক্তির ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। সে ব্যবস্থাপত্রের সারকথা হল অন্তরে মৃত্যুচিন্তা ও আখিরাতের ভাবনা জাগ্রত করা। সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে তিনি এ চিন্তার বীজ বুনেছিলেন এবং তার ফলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে তাঁরা কৃতকার্য হয়েছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে ও সাহাবায়ে কেরামের আমলে শান্তি ও নিরাপত্তার যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তা মূলত এই আখিরাতমুখী চিন্তা-চেতনারই সুফল। মৃত্যুচিন্তা যখন মন-মস্তিষ্ক ছাপিয়ে ওঠে, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে এই ভাবনা যখন জীবনদৃষ্টিতে পরিণত হয় এবং জাহান্নাম ও তার শাস্তি আর জান্নাত ও তার নি'আমতরাজি যখন দৃষ্টিবলয়ের ভেতরে এসে যায় তখন মানুষের সব কাজই শুধরে যায় এবং তখন সে যে কাজই করে, তা আল্লাহর মরজি মোতাবেক হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর ঘটনা

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. কয়েক সঙ্গীসহ মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে এক এলাকায় গিয়েছিলেন। তার পাশ দিয়ে এক রাখাল এক পাল বকরি নিয়ে যাচ্ছিলেন। সে ছিল রোযাদার। তিনি সেই রাখালের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করার জন্য বললেন, তুমি এই পাল থেকে একটি বকরি আমার কাছে বেচে দাও। আমি তোমাকে তার দাম তো দেবই, তাছাড়া যবাহ করার পর তোমাকে গোশতও দেব, যা দ্বারা তুমি ইফতার করতে পারবে। রাখাল উত্তরে বলল, এ বকরিগুলো তো আমার নয়। এগুলো আমার মনিবের। আমি বেচব কী করে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বললেন, এর থেকে একটা বকরি হারিয়ে গেলে কী করবে? রাখাল তখন পেছন ফিরে আকাশের দিকে আঙুল তুলল এবং বলল, তাহলে আল্লাহ কোথায়? অর্থাৎ এগুলো আমার কাছে আমানত। আমি এতে খেয়ানত করলে আর কেউ না দেখুক আল্লাহ তো ঠিকই দেখবেন। এই বলে সে বকরিগুলো নিয়ে চলে গেল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. রাখালের উত্তরে খুব মুগ্ধ হলেন। তিনি তার কথাটি বারবার উচ্চারণ করতে থাকলেন, তারপর যখন মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরলেন, তার মনিবকে খুঁজে বের করলেন। তিনি তার কাছ থেকে সবগুলো বকরি কিনে নিলেন, সঙ্গে রাখালকেও। তারপর তিনি সেই রাখালকে আযাদ করে দিলেন এবং বকরিগুলোকে উপহারস্বরূপ দিয়ে দিলেন।[১৪৬]

এই হচ্ছে আখিরাত-চিন্তা। নির্জন মাঠে বকরি চরানো অবস্থায়ও মাথায় এই চিন্তা জাগ্রত আছে যে, আমাকে একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে, আমার সামনে আখিরাত আছে, আমাকে সেই জীবনও গড়তে হবে। অন্যায় পথে টাকা-পয়সা কামাই করলে তা ইহজীবনে কোনও উপকারে আসতেও পারে, কিন্তু আমার আখিরাত তো বরবাদ হয়ে যাবে। এই চিন্তা তাকে অন্যায় পন্থা অবলম্বন থেকে বিরত রেখেছে। এর ফলে তার আখিরাতের পুরস্কার তো বরাদ্দ রয়েছেই,

---

১৪৬. উস্‌দুলগাবা, ৩খ, ২২৮

দুনিয়ায়ও তার একটা সুফল পেয়ে গেছে। বস্তুত আখিরাতের চিন্তা দ্বারা পার্থিব জীবনেও মানুষ লাভবান হয়।

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর ঘটনা

হযরত উমর ফারুক রাযি. মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য রাতের বেলা বের হয়ে পড়তেন। কোথায় মানুষ কী হালে আছে তা ঘুরে ঘুরে দেখতেন। একবার এরকম নিশি-ভ্রমণকালে একটি বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বাড়ির ভেতর থেকে কথোপকথনের আওয়াজ শুনতে পেলেন, মা-মেয়েতে কথা হচ্ছিল। মা বলছিল, বাছা! ভোর হয়েছে, দুধ দোওয়ানোর সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে দুধ দোওয়াও। আর দেখো, আজকাল আমাদের বকরি দুধ কম দিচ্ছে। কাজেই একটু পানি মিশিয়ে দিও। তাহলে রোজগার ঠিক থাকবে। মেয়ে বলল, মা! আমীরুল মুমিনীনের যে নিষেধ– কেউ যেন দুধে পানি না মেশায়, মা বলল, বাছা! আমীরুল মুমিনীন নিষেধ করেছেন ঠিক, কিন্তু তিনি কি আর তাকিয়ে আছেন যে, তোমার পানি মেশানো দেখবেন? তিনি হয়তো নিজ ঘরে শুয়ে আছেন! পানি মেশালে তার খবরও থাকবে না। মেয়ে বলল, সে কথা ঠিক যে, আমীরুল মুমিনীনের হয়ত খবরও থাকবে না। কিন্তু আমীরুল মুমিনীনেরও যে একজন আমীর আছেন, তিনি তো ঠিকই দেখবেন! সেই আসল আমীর যখন দেখে ফেলবেন, তখন আমি এ কাজ কিভাবে করতে পারি?

হযরত উমর ফারুক রাযি. বাইরে দাঁড়িয়ে এ কথোপকথন শুনছিলেন। তারপর বাড়ি ফিরে এসে ফজরের পর খোঁজ নিলেন কে এই মেয়েটি, যে আল্লাহ তা'আলাকে এতটা ভয় করে? তিনি মেয়েটির সন্ধান জানার পর তাকে নিজ পুত্রের বউ করে আনলেন। তারই বংশে মহান খলিফা হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয রহ.-এর জন্ম। যিনি দ্বিতীয় উমর নামে জগদ্বিখ্যাত।

এই হচ্ছে আখিরাতের চিন্তা। যে ব্যক্তি জানে وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী এবং মন-মস্তিষ্কে এ বিশ্বাস বসে যায়, তখন

আখিরাতই হয়ে যায় তার চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। ফলে তার সমস্ত কাজ সেই চেতনা দ্বারা চালিত হয়, যে কারণে তখন আর কোনও পাপ ও অন্যায়-অনাচারের দিকে তার হাত বাড়ে না। এরকম লোক কেবল এমন কাজের দিকেই অগ্রর হয়, যা জান্নাত নির্মাণ ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধান করে। আর যেসব কাজে আল্লাহ তা'আলা নারাজ হন তা থেকে সতর্কতামূলক দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

আলোচ্য আয়াত মূলত আমাদেরকে এ শিক্ষাই দান করে যে, তোমাদের উচিত নিজেদের আসল রোগ চিনে নেওয়া ও তাঁর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। তোমাদের আসল রোগ হল দুনিয়াকেন্দ্রিকতা। তোমরা দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই সব চিন্তা করছ। তোমাদের সকল দৌড়ঝাঁপ এরই জন্য। এ রোগের প্রতিকার হল মৃত্যু চিন্তা ও আখিরাতের ভাবনা। ক্ষণিক বসে এভাবে চিন্তা করো যে, কত লোককে আমি মরতে দেখেছি, কত লোকের দাফন-কাফনে আমি শরীক হয়েছি। একদিন তো আমার ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটবে। আমাকেও কবরে যেতে হবে তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্তারিত বলে গেছেন। কবরের হাল-হাকীকত, কবর-উত্তর অবস্থাবলি সবই তিনি জানিয়ে গেছেন। কুরআন মাজীদ আখিরাত সংক্রান্ত বর্ণনায় পরিপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছে বিস্তারিতভাবে বলে দেওয়া হয়েছে আখিরাতে কী কী ঘটবে। উদ্দেশ্য একটাই– মৃত্যুচিন্তা মন-মস্তিষ্কে বসিয়ে দেওয়া এবং চিন্তা-চেতনাকে আখিরাতমুখী করে দেওয়া। মুশকিল হল আমরা চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর থেকে সামান্য একটু সময়ও বের করতে প্রস্তুত নই, যখন একান্তভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করব।

চিন্তা-চেতনাকে আখিরাতমুখী করে তোলার উপায়

প্রশ্ন হচ্ছে, চিন্তা-চেতনাকে আখিরাতমুখী করে তোলার উপায় কী? দুনিয়ার চিন্তাই যে অন্তরে প্রবল হয়ে আছে, এটাকে দুর্বল করা যাবে কিভাবে? কিভাবে আখিরাত-ভাবনাকে শক্তিশালী করা যাবে? ওই রাখালের মনে যে চেতনা বসে গিয়েছিল আমাদের মনে তা বসানোর উপায় কী?

আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই চেতনায় যেভাবে ওই তরুণীটি উদ্দীপিত ছিল, কিভাবে আমরাও সেই রকম নিজেদের উদ্দীপিত করতে পারি?

এর পথ একটাই—আল্লাহওয়ালার সাহচর্য গ্রহণ। যার অন্তরে আখিরাতের ফিকির আছে, যার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহী করার চেতনা আছে, তার সাহচর্য অবলম্বন করুন, তার কাছে যাতায়াত করুন, তার সঙ্গে ওঠাবসা করুন এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। ইনশাআল্লাহ ধীরে-ধীরে আপনার অন্তরেও আখিরাতের চিন্তা জন্ম নিতে থাকবে।

এই সাহচর্যই সেই জিনিস, যা সাহাবায়ে কেরামকে বদলে দিয়েছিল। তাদের বিগত জীবন তো অন্যরকমই ছিল। যারা এককালে কথায় কথায় মারামারি-কাটাকাটি করতেন। একটা মুরগির বাচ্চার জন্য টানা চল্লিশ বছর যারা খুনোখুনিতে লিপ্ত ছিলেন। মামুলি কুয়ার জন্য, জমির জন্য, কিংবা ছাগল-বকরির জন্য যাদের মধ্যে হানাহানি, রক্তারক্তি লেগে থাকত, সেই তাদেরই ভাগ্যে যখন জুটে গেল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য, তখন সেই সাহচর্যের আলোকধারায় তাদের মনের সব অন্ধকার ঘুচে গেল। ঘটে গেল মহাবিপ্লব। কোথায় যে উঠে গেল তাদের এতদিনের দুনিয়াপ্রীতি, তার নাম নিশানও বাকি থাকল না। কী অবলীলায় তারা ঘর-বাড়ি, স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পদ ছেড়ে দিয়ে কেবল পরনের কাপড়টুকু নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করলেন!

সাহাবায়ে কেরামের আখিরাতমুখিতা

মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পর আনসারগণ প্রস্তাব দিলেন, আপনারা তো আমাদের ভাই। কাজেই আমাদের জমি-জায়েদাদ অর্ধেক আপনারা নিয়ে নিন এবং অর্ধেক আমাদের থাকুক। কিন্তু মুহাজিরগণ তা গ্রহণ করলেন না। তারা বললেন, আমরা এভাবে আপনাদের জমি নিতে পারব না। তবে আমরা আপনাদের জমিতে শ্রম খাটাতে পারি। শ্রম খাটানোর পর জমিতে যে ফসল হবে তা আমরা ভাগাভাগি করে নেব। বলুন, কোথায় গেল তাদের সেই বিষয়াসক্তি?

রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছে, মৃত্যু চোখের সামনে নৃত্য করছে– এহেন মুহূর্তে কেউ হাদীছ শোনাল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছ? বললেন, হ্যাঁ, আমার কান এ কথা শুনেছে এবং অন্তর স্মরণ রেখেছে। সেই সাহাবী বললেন, ব্যস, এখন তো জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকা আমার জন্য হারাম হয়ে গেল। এই বলে তিনি তরবারি হাতে নিলেন এবং সোজা শত্রুর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তিনি প্রাণপণ লড়ছেন। এ অবস্থায় শত্রুর একটি তীর এসে তার বুকে বিদ্ধ হল। নিজ বুক থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটতে দেখে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তা আখিরাত প্রেমের কতই না উজ্জ্বল নিদর্শন এবং লক্ষার্জনের কী গৌরবদীপ্ত উচ্চারণ। তিনি বলে উঠেছিলেন–

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

'কা'বার রব্বের কসম, আমি সফল হয়ে গেলাম।'[১৪৭]

এ তো সেই সাহাবীগণই, যারা এতকাল ছিলেন দুনিয়ার পূজারী, দুনিয়ার পেছনে দৌড়ঝাঁপকারী এবং দুনিয়ারই জন্য মত্ত-মাতাল, কিন্তু যেই না তাঁরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে আসলেন এবং হৃদয়ে লাগল সেই স্পর্শমণির ছোয়া, অমনি ঘটে গেল আমূল পরিবর্তন। দুনিয়াপ্রেম লোপ পেয়ে মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে গেল আখিরাতের আসক্তি। বলা বাহুল্য এসব উচ্চারণ ছিল সেই আসক্তিরই বহিঃপ্রকাশ।

যাদুকরদের ঈমানী দৃঢ়তা

কুরআন মাজীদে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনায় বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা আলাইহি সালাম যখন ফির'আউনকে দাওয়াত দিলেন, তাকে মু'জিযা দেখালেন এবং মাটিতে লাঠি ফেললে সেটা সাপ

---

১৪৭. হায়াতুস সাহাবা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৫০

হয়ে গেল, তখন ফির'আউন সে দাওয়াতে সাড়া তো দিলই না, উল্টো তাঁর মিশন ব্যর্থ করার উদ্যোগ নিল। এজন্য প্রথমে সে যাদু দ্বারা তাঁর মুজিযার মুকাবিলা করতে চাইল। হুকুম দিল দেশের বড়-বড় সব যাদুকরকে ডেকে আনা হোক, তারা পত্রপাঠ রাজধানীতে ছুটে আসল। ফির'আউন বলল, আজ এক বড় যাদুকরের সাথে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তোমরা তোমাদের যাদুশক্তি প্রদর্শন করো। দেখিয়ে দাও তোমাদের ক্ষমতা। এ যাদুকরগণ ছিল ফির'আউনের বড় প্রিয়পাত্র। তা সত্ত্বেও প্রথমে তারা দরদাম ঠিক করে নিল। বলল,

أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

'আমরা যদি জয়যুক্ত হই, তবে আমরা পুরস্কার পাব তো।'[১৪৮]

ফির'আউন আজ সবকিছুতেই রাজি। যে-কোনও মূল্যে আজ প্রতিপক্ষকে তার হারাতেই হবে। কাজেই বিপুল উদ্দীপনায় সে বলল,

نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

'তা তো অবশ্যই। সেই সঙ্গে তোমরা স্থায়ীভাবে আমার নৈকট্যপ্রাপ্তও হবে।'[১৪৯]

উভয় পক্ষ ময়দানে নেমে আসল। যাদুকরগণ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সামনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। তারাই প্রথমে তাদের যাদুশক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করল। সঙ্গে রশি ও লাঠি নিয়ে এসেছিল। সেগুলো সামনে ছুঁড়ে দিল। এমনি তা বড় বড় সাপ হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। হযরত মূসা আলাইহিস সালামও আতঙ্কবোধ করলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো সত্যকেই জয়যুক্ত করে থাকেন। তিনি মূসা আলাইহিস সালামকে হুকুম দিলেন, তোমার হাতের লাঠিটি নিক্ষেপ করো। তিনি নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা অতিকায় অজগর হয়ে গেল আর সেটি যাদুকরদের তৈরি করা সাপগুলোকে এক-এক করে গিলতে শুরু করল। যাদুকরগণ যখন দেখল মূসা আলাইহিস

---

১৪৮. সূরা শু'আরা, আয়াত ৪১

১৪৯. সূরা শু'আরা, আয়াত ৪২

সালামের অজগররূপী লাঠি তাদের সবগুলো সাপ গিলে ফেলেছে, তখন তাদের আর বুঝতে বাকি থাকল না মূসা আলাইহিস সালাম কিসের শক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছেন। তারা যাদুবিদ্যার রহস্য জানত। তারা ঠিক ধরে ফেলল যে, তিনি যা-কিছু দেখাচ্ছেন তা মোটেই যাদু নয়। যাদু হলে আজ আমাদেরই জেতার কথা। এটা যাদু নয় বলেই এত সহজে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। আসলে তিনি মাঠে নেমেছেন আল্লাহর সাহায্য নিয়ে। ওই ক্ষমতা আল্লাহপ্রদত্ত। নিশ্চয়ই তিনি একজন নবী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ মু'জিযা নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছেন। এভাবে তাঁর মু'জিযা দেখে তাদের অন্তরে সত্যের আলো জ্বলে উঠল। তারা সেই মুহূর্তেই ঈমান আনল। হযরত মূসা আ.-এর অনুসারী হয়ে গেল। মাত্র কিছুক্ষণের সঙ্গ। সামান্য সময়ের জন্যই তারা তাঁর সাহচর্য লাভ করেছিল। কিন্তু সেই সাহচর্যের কী তাছির! তারা সবাই একযোগে ঘোষণা দিয়ে উঠল– নির্ভীক নিসংকোচ ঘোষণা–

اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى

'আমরা ঈমান আনলাম হারূন ও মূসার প্রতিপালকের উপর।'[১৫০]

ফির'আউন স্তম্ভিত! এত বড় স্পর্ধা! তার চোখের সামনে তারা এত বড় ঘোষণা দিল? হুঙ্কার দিয়ে উঠল,

اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ

'আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা তার উপর ঈমান আনলে।'[১৫১] সেই সঙ্গে এই ঈমান আনার পরিণতি কী, সে সম্পর্কে হুঁশিয়ারী বাণী শুনিয়ে দিল–

فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى

'আমি বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত-পা কেটে দেব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শুলে দেব। তখন তোমরা টের পাবে

১৫০. সূরা তোয়াহা, আয়াত ৭০
১৫১. সূরা তোয়াহা, আয়াত ৭১

কার শাস্তি বেশি কঠিন ও স্থায়ী।[১৫২] চিন্তা করে দেখুন, এতে সেই যাদুকরগণই, যারা ক্ষণিক পূর্বে ফির'আউনের কাছে পুরস্কারের আবদার জানাচ্ছিল এবং যারা ফির'আউনের কথামতো হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মুকাবিলা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল। সাহচর্যের এক ঝাপটায় কী আমূল পরিবর্তন তাদের। আর সেই পরিবর্তনের কারণে পরিস্থিতিরও কী ওলট-পালট। কোথায় সেই পুরস্কারের আবদার? এখন তো ফাঁসিতে ঝোলার অপেক্ষা মাত্র! ফির'আউনের উদ্ধত ঘোষণা– তোমাদের হাত-পা কেটে দেব। এহেন বিপজ্জনক অবস্থায়ও কী আশ্চর্য অবিচলতা! তাদের শঙ্কাহীন উত্তর–

لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ؕ

'যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই সত্তার কসম! আমাদের কাছে যে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলি এসেছে, তার উপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দিতে পারব না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও করো। তুমি যাই করো না কেন, তা এই পার্থিব জীবনেই তো হবে।[১৫৩]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে খোলা চোখে যে নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে দিয়েছেন, তার উপর তোমাকে, তোমার অর্থ-সম্পদ ও রাজক্ষমতাকে কিছুতেই প্রাধান্য দিতে পারব না। কাজেই তোমার যা করার করতে পারো। আমরা তার পরোয়া করি না। কেননা তুমি যা করবে, তার সম্পর্ক বড়জোর আমাদের পার্থিব জীবনের সাথে। তুমি যদি আমাদের হাত-পা কাটো, শূলে চড়াও কিংবা ফাঁসিতে ঝোলাও, তা এই দুনিয়াতেই তো হবে? কিন্তু আমরা যে দৃশ্য দেখেছি, তা আখিরাতের দৃশ্য, তা স্থায়ী জীবনের দৃশ্য। দেখুন, একটু আগেই যারা পুরস্কারের জন্য লালায়িত ছিল, মুহূর্তের মধ্যে কি যে পরিবর্তন ঘটে গেল, যদ্দরুন শূলে চড়ার জন্যও প্রস্তুত। কোন জিনিস এই মহাবিপ্লব সাধন করল? আর কিছু নয়, ঈমানের সাথে নবীর সাহচর্য। এ আমূল পরিবর্তন সেই সাহচর্যেরই সুফল।

---

১৫২. সূরা তোয়াহা, আয়াত ৭১

১৫৩. সূরা তোয়াহা, আয়াত ৭২

সাহচর্যের উপকারিতা

ঈমান ও ভক্তি-বিশ্বাসের সাথে আল্লাহওয়ালার সাহচর্য গ্রহণ খুবই ফলপ্রসূ জিনিস। এর দ্বারা অন্তরে ঈমানী জযবা সৃষ্টি হয়। ফলে দুনিয়াপ্রীতি লোপ পায় ও আখিরাতের ফিকির শক্তিশালী হয়। আখিরাতের ফিকিরে শক্তি সঞ্চার হলেই মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে। মন-মস্তিষ্কে যতক্ষণ দুনিয়ার আধিপত্য থাকে, ততক্ষণ মানুষ আকার-আকৃতিতে মানুষ হলেও প্রকৃতি ঠিক মানুষের থাকে না। প্রকৃতি হয়ে যায় পাশবিক। কারণ তখন সে যেকোনও উপায়ে পার্থিব উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়– তা অন্যের ক্ষতি করে হোক, অন্যকে খুন করে, অন্যের রক্ত শোষণ করে বা অন্যের লাশের উপর দাঁড়িয়েই হোক। আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সে এভাবে হিংস্র হয়ে যায়। মানবিক মানুষ আর থাকে না। মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হওয়ার পথ একটাই। আর তা হল মৃত্যুচিন্তা, মৃত্যু-উত্তর অবস্থা নিয়ে ভাবনা এবং আখিরাতকে লক্ষ্যবস্তু বানানো। আর এটা সম্ভব কেবল যারা সর্বদা আখিরাতের চিন্তা করে তাদের সাহচর্য অবলম্বন দ্বারা।

প্রকৃতপক্ষে দ্বীন অর্জন ও নিজ জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানোর একমাত্র পথ হল আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য অবলম্বন। যে ব্যক্তির অন্তরে আখিরাতের চিন্তা প্রবল সেই আল্লাহওয়ালা। তার কাছে গিয়ে যে ব্যক্তি বসবে তার অন্তরেও আখিরাতচিন্তা জাগ্রত হবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমত ও ফযল-করমে আমাদের অন্তরে এ জযবা সৃষ্টি করে দিলে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।

অধুনা বিশ্ব পরিস্থিতি

আজকের বিশ্ব বড়ই সমস্যাসঙ্কুল। চারদিক থেকে নানা রকম সংকট ও সমস্যা আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। তা সমাধান করার জন্য পুলিশ ও আইন-আদালত আছে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। সরকারি অফিসগুলোতে ঘুস ছাড়া কাজ হয় না। সর্বত্র ব্যাপক দুর্নীতি। এর কী প্রতিকার হতে পারে? অনেক চিন্তাভাবনা করে দুর্নীতি দমন বিভাগ

প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আশা– এর মাধ্যমে দুর্নীতি দূর হবে, কিন্তু ফল ফলেছে উল্টো। আগে পাঁচশ' টাকা ঘুস দিতে হতো, এখন এক হাজার দিতে হয়, ঘুস দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কারণ খাদক বেড়ে গেছে। ঘুসের এক ভাগ খাবে সরকারি অফিসার, আরেকভাগ দুর্নীতি দমনের অফিসার, কাজেই ঘুস তো ডবলই দিতে হবে। এখন এটা রোধ করার জন্য দুর্নীতি দমন বিভাগের উপর আকেরটি কমিশন গঠন করো; তো তারাও ঘুস খাবে। তখন তাদের উপর আরেক কমিশন গঠন করতে হবে। এভাবে এক অনিঃশেষ ধারা চালু করতে থাকো। কিন্তু ফল উল্টোই হবে। ঘুসের চক্রবৃদ্ধি হতে থাকবে। কারণ যাকেই বসানো হবে, তার সামনেও তো রঙিন দুনিয়ারই স্বপ্ন। তারও লক্ষ্যবস্তু কিভাবে অন্যের বাংলো অপেক্ষা আরো জমকালো বাংলো এবং অন্যের গাড়ি অপেক্ষা আরও দামী গাড়ির মালিক হওয়া যাবে। তারও মন-মস্তিষ্কে এই একই ভূত সওয়ার থাকবে। কাজেই যত বেশিই কমিশন গঠন করা হোক, আইন তৈরি করা হোক বা আদালত বসানো হোক সবই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এখন তো আইন-আদালতও টাকায় বিক্রি হয়। আমি দাবি করেই বলতে পারি, যদি আল্লাহর ভয় না থাকে, আখিরাতের চিন্তা না থাকে, আল্লাহর সামনে জবাবদিহীর চেতনা না থাকে, তবে কোনও চেষ্টাই কাজে আসবে না। হাজারও আইন তৈরি করা হোক, হাজারও আদালত প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং পুলিশ দিয়ে অফিস-আদালত, রাস্তা-ঘাট ছেয়ে ফেলা হোক, আল্লাহ ভীতি না থাকলে সবই নিষ্ফল প্রমাণিত হবে।

আমেরিকাকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সভ্য দেশ মনে করা হয়। প্রতিটি শিশু লেখাপড়া করে। শতভাগ লোক শিক্ষিত। সম্পদের ছড়াছড়ি। সায়েন্স টেকনোলোজি এবং দুনিয়ার সব রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি। চৌকশ পুলিশ সর্বদা কর্ম তৎপর। কেউ ঘুস খায় না। ঘুস দিয়ে কাউকে কেনা যায় না। কল দেওয়া মাত্র পুলিশ এসে হাজির হয়ে যায়। সেই দেশেরও তো এই অবস্থা যে, আমাকে উপদেশ দেওয়া হয়, আপনি যখন হোটেল থেকে বের হবেন, হাতে যেন ঘড়ি না থাকে এবং পকেটে বেশি টাকা-পয়সাও না থাকে। ব্যস সামান্য যা দরকার পড়ে কেবল ততটুকুই।

কেননা যেকোনো মুহূর্তে ঘড়ি ছিনতাই হয়ে যেতে পারে। কেউ পকেট মেরে দিতে পারে এবং এটা এতই বিপজ্জনক যে, সামান্য টাকার জন্য ছিনতাইকারীরা আপনাকে খুন করে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করবে না। এই হচ্ছে আধুনিক আমেরিকার অবস্থা। এত সব অপরাধ হচ্ছে আর আইন বসে বসে তামাশা দেখছে। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা চৌকশ পুলিশও সেখানে অসহায়। আদালত-কাচারি সব আপন-আপন স্থানেই আছে, কিন্তু অপরাধের কাছে সকলেই অসহায়। একদিকে চাঁদে মার্কিন পতাকা ওড়ানো হচ্ছে, অন্যদিকে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে বলছে- আজ আমাদের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা হচ্ছে- সর্বগ্রাসী অপরাধ। অপরাধ কিভাবে দমন করা যাবে সেই প্রশ্নই এখন সবচেয়ে জটিল। মরহুম ইকবাল বলেছিলেন-

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
جس نے سورج شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

খুঁজে বেড়ায় যে নক্ষত্রের গতিপথ
নিজ চিন্তার জগতে আজও সে ঘুরে আসতে পারল না।
যে কিনা সূর্যরশ্মিকেও করে ফেলেছে কৌটাবন্দী
আজও সে পারল না ঘুচাতে জীবনের আঁধার রাতি।

এমনই দৃশ্য সারা জাহান আজ দেখছে এবং দেখতেই থাকবে। যতক্ষণ এ বিশ্ব দোজাহানের সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমে মাথা না রাখবে, যতক্ষণ তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী মানব মনে আখিরাতচিন্তার আধিপত্য না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দৃশ্য পরিলক্ষিত হতেই থাকবে। যত আইনই রচনা করো না কেন এবং যত কোর্ট-কাচারিই বসাও না কেন তোমাদের সমস্যার সমাধান কখনও হবে না। সমস্যা সমাধানের পথ একটাই- আল্লাহওয়ালাদের

সাহচর্য অবলম্বন করুন, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করুন, তাদের কথা শুনুন এবং আখিরাতের অবস্থাদি জানুন ও অন্তরে সেই চিন্তা জাগ্রত করুন।

আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাদেরকে এর হাকীকত বোঝার তাওফীক দান করুন। আমাদের অন্তরে আখিরাতের চিন্তাকে প্রবল করে দিন। আমরা দুনিয়াপ্রীতি ও দুনিয়া সন্ধানের যে দৌড়ের ভেতর আছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন এবং আমাদেরকে আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য অবলম্বনের সুযোগ দিন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

মৃত্যুর আগে মৃত্যুর প্রস্তুতি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَحَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا.

'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ করো এবং কিয়ামতের দিন তোমাদের হিসাব গ্রহণের আগেই নিজেরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো।'[১৫৪]

মৃত্যু এক অবধারিত জিনিস

মৃত্যু একদিন অবশ্যই আসবে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৃত্যু যে অবধারিত সে নিয়ে আজ অবধি কেউ দ্বিমত প্রকাশ করেনি এবং কেউ কখনও মৃত্যুকে অস্বীকার করেনি। অস্বীকারকারীগণ তো এ যাবৎ কত কিছুই অস্বীকার করেছে। এমনকি তাদের অনেকে আল্লাহ তা'আলার

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৬৯-২৯০

১৫৪. কাশফুল-খাফা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০২

অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করেছে– না'উযুবিল্লাহ! তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছে আমরা সৃষ্টিকর্তা মানিনা এবং নবী রাসূল স্বীকার করি না। কিন্তু সেই ঘোর অবিশ্বাসীরাও মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারেনি। প্রত্যেকেই স্বীকার করে, যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় একবার এসেছে, তাকে একদিন না একদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। আর মৃত্যুর দিনক্ষণ যে নির্ধারিত নয়, যে-কোনও সময়ই হতে পারে, এ বিষয়েও সকলে একমত। এখন যে জীবিত, পরক্ষণেই তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে, কিংবা একদিন পর, এক সপ্তাহ পর বা এক বছর পরও তার মৃত্যু হতে পারে। হবে একদিন অবশ্যই, কিন্তু কখন যে সে মুহূর্ত তা কেউ বলতে পারে না, বলা সম্ভব নয়। আধুনিক বিজ্ঞান তো এখন উৎকর্ষের তুঙ্গে, কিন্তু এই বিজ্ঞান কি বলতে পারে কে কখন মারা যাবে?

মৃত্যুর আগে মরে নাও

সুতরাং মৃত্যু অবধারিত এটা যেমন নিশ্চিত, তেমনি মৃত্যুর দিনক্ষণ কেউ জানে না, এটাও অবিসংবাদিত, মানুষ যদি এই মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন থাকে আর এ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলাই জানেন সেখানে পৌঁছে তার কী অবস্থা হবে! সেখানে তো আল্লাহর গযব ও সুকঠিন শাস্তির ব্যবস্থাও আছে। তা থেকে বাঁচার উপায় কী? হ্যাঁ, সেই বাঁচার উপায়টাই আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলেছেন, তোমরা মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ করো। মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণ কিভাবে সম্ভব? কী এর অর্থ? উলামায়ে কেরাম এর দুটি ব্যাখ্যা করেছেন– (ক) নিজ খেয়াল খুশী ও কুপ্রবৃত্তির দমন এবং (খ) অন্তরে মৃত্যুচিন্তার উজ্জীবন।

প্রথমটির অর্থ হচ্ছে– প্রকৃত মৃত্যু আসার আগে তোমরা মনের সেই খেয়াল-খুশি ও সেই প্রবৃত্তির দমন ও নির্মূল করে ফেলো, যা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধের পরিপন্থী, যা অন্তরে গুনাহ ও নাজায়েয কাজ করার উৎসাহ জোগায় এবং যা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে।

অন্তরে মৃত্যুচিন্তা জাগ্রত করো

দ্বিতীয় ব্যাখ্যার সারকথা, মৃত্যুর আগে নিজ মৃত্যুর কথা চিন্তা কর। মাথায় এই ভাবনা নিয়ে আসো যে, একদিন আমাকে এ দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে। আমাকে চলে যেতে হবে একদম খালি হাতে। সাথে টাকা-পয়সাও যাবে না, ছেলে-মেয়ে-আত্মীয়-স্বজনও না। কুঠি-বাংলো সব পড়ে থাকবে। নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ অবস্থায় একা-একা চলে যেতে হবে।

বস্তুত এ দুনিয়ায় আমাদের দ্বারা যত অন্যায়-অপরাধ ও পাপাচার হয় তার সর্বাপেক্ষা বড় কারণ হল মৃত্যুর বিস্মরণ। আমরা মৃত্যুর কথা বিলকুল ভুলে গেছি। যতক্ষণ শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকে, শরীরে শক্তি থাকে এবং হাত-পা ঠিকঠাক চলে, ততক্ষণ অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। ভাবখানা যেন আমার চেয়ে বড় কে আছে? এই অহংকারে অন্যকে হিসাবে আনি না, অন্যের হক স্বীকার করি না। অবলীলায় জুলুম করে যাই, অন্যের অধিকার খর্ব করতে থাকি এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করে চলি। সুব্যবস্থা ও যৌবনকালটা এভাবেই কাটাই। তখন একবারও মাথায় আসে না যে, একদিন আমাকেও এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। নিজ হাতে প্রিয়জনকে কবরে রেখে আসি, কত আত্মীয় ও বন্ধুজনের লাশ কাঁধে বয়ে নিয়ে যাই, তা সত্ত্বেও নিজ মৃত্যুর কথা ভাবি না। বরং ভাব-ভঙ্গি দ্বারা জানান দিই, মৃত্যুর ব্যাপারটা তাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এমন ঘটবে না, এভাবেই গাফলতির রাহুগ্রাস হয়ে জীবন কাটাই–মৃত্যুর জন্য কোনও প্রস্তুতি নেই না।

দুটি মহা নি'আমত ও তা নিয়ে অবহেলা

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী চমৎকার বলেছেন–

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ.

'দু'টি নি'আমত এমন যে ব্যাপারে বহু লোক ধোঁকায় পড়ে থাকে- সুস্বাস্থ্য ও অবসর।'[১৫৫]

---

১৫৫. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৫৯৩৩; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২২২৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪১৬০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৩০৩৮

অর্থাৎ যতক্ষণ স্বাস্থ্য ঠিক আছে, মানুষ এই ধোঁকায় পড়ে থাকে যে, এ নি'আমত বুঝি স্থায়ী, কখনও লুপ্ত হবে না, আর যেহেতু মনে করে স্বাস্থ্য সর্বদাই ভালো থাকবে কখনও নষ্ট হবে না, তাই ইবাদত-বন্দেগী ও নেক কাজে অবহেলা করতে থাকে। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু এভাবে গড়িমসির ভেতর দিয়েই সময় বয়ে যায়। পরিশেষে সেই সময় চলে আসে, যখন শারীরিক সুস্থতা আর বাকি থাকে না। তখন চাইলেও ইবাদত-বন্দেগী করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় নি'আমত হল সময়-সুযোগ ও অবসর। অর্থাৎ নেক কাজ করার সুযোগ আছে, হাতে সময় আছে। ইচ্ছা করলেই তা করা যায়। কিন্তু মানুষ এই ভেবে সুযোগ হাতছাড়া করে যে, এখনও তো সময় আছে, পরে করব। এখনও তো যৌবনকাল মাত্র, সামনে বিস্তর সময় রয়েছে। অথচ যৌবনকালটাই ইবাদত-বন্দেগীর প্রকৃষ্ট সময়। এ সময় শক্তি ও সাহস থাকে। দুর্দমনীয় ইচ্ছা থাকে, পাহাড় টলানোর মতো উদ্যম থাকে। ফলে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজও অনায়াসে করা যায়। কাজেই এটাই উপযুক্ত সময়। যত পার ইবাদত করে নাও, মুজাহাদা ও সাধনা করে নাও, মানব-সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ো। আল্লাহ তা'আলাকে রাজি খুশী করার জন্য আমলনামায় পুণ্যের স্তূপ গড়ে তোলো। পুণ্য সংগ্রহের উদ্দীপনায় তোমার যৌবনকে কর্মমুখর করে তোল। কিন্তু তা নয়। মন-মস্তিষ্কে ভূত চেপে আছে, আরে সময় কি বয়ে গেল না কি? এই তো যৌবন মাত্র। জীবনের কিছু মজা তো লুটে নিই। ইবাদত করার ও পুণ্যার্জনের জন্য বিস্তর সময় পড়ে আছে। পরেই তা করা যাবে। এভাবে নেক কাজে গড়িমসি চলতে থাকে। আর এই অবহেলার ভেতর বেলা বয়ে যেতে থাকে। যৌবন অস্তাচলে চলে যায়। খবরও থাকে না কখন যৌবন গিয়ে বার্ধক্য শুরু হয়ে গেছে। সেই গড়ানকালে শক্তি কমে আসে। উদ্যম উদ্দীপনা ফুরিয়ে যায়। স্বাস্থ্য জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ঘিরে ধরে। ফলে শরীর জবাব দিয়ে দেয়। এখন আর চাইলেও ইবাদত-বন্দেগী করা সম্ভব হয় না। কিংবা তখন নানা রকম ঝক্কি-ঝামেলা পেয়ে বসে, ফলে ইবাদত করার অবকাশ হয় না।

এ সবকিছুর মূল হল মৃত্যুর বিস্মরণ। মানুষ মৃত্যু সম্পর্কে গাফেল। চিন্তা করে না আমার যেকোনো সময়ই তো মৃত্যু হতে পারে। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় যদি চিন্তা করত, একদিন আমাকে মরতে হবে, মৃত্যুর আগেই আমাকে ইবাদত-বন্দেগী ও পুণ্যার্জন করতে হবে, তবে এই চিন্তা তাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করত এবং পুণ্যের পথে চালাত। এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'মৃত্যুর আগেই মরে যাও।'

হযরত বাহলূল রহ.-এর উপদেশমূলক ঘটনা

খলিফা হারূনুর রশীদের আমলে বাহলূল নামে এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি মাজযূব ও আত্মভোলা প্রকতির লোক ছিলেন। হারূনুর রশীদ তাঁর সাথে রসিকতা করতেন। মাজযূব হলেও তিনি প্রজ্ঞাজনোচিত কথাবার্তা বলতেন। হারূনুর-রশীদ প্রহরীদেরকে বলে রেখেছিলেন, বাহলূল যখনই আমার সাথে দেখা করতে চাইবে তাকে আসতে দেবে। তাকে যেন কখনও বাধা দেওয়া না হয়। সুতরাং তিনি যখনই চাইতেন বাদশাহর সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে পারতেন।

একদিন তিনি দরবারে আসলেন। তখন বাদশাহর হাতে একটি লাঠি ছিল। বাদশাহ তাঁকে ঘাঁটাতে চাইলেন। বাহ্লূল সাহেব! আপনার কাছে আমার একটি আবেদন আছে। বাহ্লূল, জিজ্ঞেস করলেন, তা কী?

হারূনুর-রশীদ বললেন, আমি আমানতস্বরূপ এই লাঠিটি আপনাকে দিচ্ছি। দুনিয়ায় আপনার চেয়ে বড় বোকা যদি কাউকে পান, তাকে লাঠিটি আমার পক্ষ থেকে উপহার দেবেন।

বাহলূল বললেন তথাস্তু। সুতরাং লাঠিটি তিনি নিজের কাছে রেখে দিলেন।

বাদশাহ তো স্ফূর্তি করার জন্যই তাকে একটু খুঁচিয়েছিলেন, বোঝাতে চাচ্ছিলেন, তুমি দুনিয়ার সেরা বোকা, তোমার চেয়ে বড় বোকা আর কেউ নেই। যা হোক বাহলূল লাঠিটি নিয়ে চলে গেলেন।

এরপর কয়েক বছর গত হল। এর মধ্যে লাঠি নিয়ে কোনও কথা নেই। হঠাৎ একদিন বাহলূল জানতে পারলেন, হারূনুর রশীদ খুব অসুস্থ। একদম শয্যাশায়ী। যথারীতি চিকিৎসা চলছে, কিন্তু কোনও সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। বাহলূল সংবাদ পেয়েই বাদশাহকে দেখতে আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমিরুল মুমিনীন! কী অবস্থা?

বাদশাহ উত্তর দিলেন, অবস্থা আর কী বলব। সফর আসন্ন। বাহলূল জিজ্ঞেস করলেন, কোথাকার সফর আসন্ন? বাদশাহ বললেন, আখিরাতের সফর। দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

বাহলূল জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন পর ফিরছেন? হারূনুর রশীদ বললেন, ভাই এটা কেমন কথা? এ যে আখিরাতের সফর! সেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না কি? বাহলূল বললেন, বটে, তা এই সফরের আরাম ও নিরাপত্তার জন্য আপনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? কত সংখ্যক সৈন্য পাঠিয়েছেন?

হারূনুর রশীদ উত্তরে বললেন, তুমি ফের বেকুবের মতো কথা বলছ। জানো না আখিরাতের সফরে কেউ সাথে যায় না, না কোনো বডিগার্ড, না সেনা-সামন্ত। মানুষ সেখানে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই চলে যায়।

বাহলূল বললেন, এত বড় লম্বা সফর যেখান থেকে ফিরে আসাও সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও আপনি সেখানে সেনা-সামন্ত পাঠালেন না, অথচ এর আগে আপনি যত সফর করতেন, তাতে কত রকম ব্যবস্থা নিতেন। আসবাব-পত্র ও লোক লশকর পাঠাতেন। কত রকম আয়োজন! এ সফরে সে রকম কেন করলেন না?

বাদশাহ বললেন, এটা এমন সফর, যেখানে লোক লশকর পাঠানো যায় না। বাহলূল বললেন, বাদশাহ নামদার! বহুদিন যাবত আপনার একটা আমানত আমার কাছে রাখা আছে। একটি লাঠি। আপনি বলেছিলেন, আমার চেয়ে বড় বোকা কাউকে পেলে তাকে যেন আপনার পক্ষ হতে সেটি উপহার দিই। আমি অনেক তালাশ করেছি। কিন্তু আমার চেয়ে বড় বোকা কাউকে কোথাও পাইনি। এই মাত্র দেখলাম আমার

চেয়েও বড় বোকা একজন আছে, আর সে আপনিই। কেননা আমি দেখতাম, ছোট-ছোট সফরেও আপনি মাসাধিক কাল আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, রসদ, তাঁবু, লোক লশকর ইত্যাদি আগে থেকেই পাঠিয়ে দিতেন এবং সঙ্গে বডিগার্ড রাখতেন। অথচ এত বড় দীর্ঘ সফরে যাচ্ছেন, যেখান থেকে ফিরে আসাও সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও এর জন্য আপনার কোনও রকম পূর্বপ্রস্তুতি নেই। কাজেই আপনার চেয়ে বড় বোকা আমি আর কাউকে পাইনি। আপনি দুনিয়ার সেরা বোকা। সুতরাং আপনিই সে উপহারের প্রকৃত হকদার। নিন এই সেই উপহার।

এ কথা শুনে হারূনুর রশীদ কেঁদে দিলেন। বললেন, বাহ্লূল! তুমি সত্য বলেছ। সারা জীবন তোমাকে বোকা মনে করেছি। কিন্তু তুমি অনেক বড় বুদ্ধিমান। গভীর জ্ঞানের কথা তুমি আমাকে শোনালে। বাস্তবিকই আমি আমার জীবনটা নষ্ট করেছি। আখিরাতের জন্য কোনও প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি।

বুদ্ধিমান কে?

প্রকৃতপক্ষে বাহ্লূল যে কথা বলেছিলেন, তা হাদীছেরই কথা। হাদীছ শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

বুদ্ধিমান সেই, যে নিজেকে চিনল, অর্থাৎ যে নিজ প্রবৃত্তিকে বশীভূত রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তীকালের জন্য কাজ করে।[১৫৬]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীছে বুদ্ধিমানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। আজকের জগতে যে ভালো টাকা-পয়সা কামাতে জানে, টাকা থেকে টাকা তৈরির কলা-কৌশল যার রপ্ত আছে, মানুষকে বেকুব বানাতে ওস্তাদ, তাকেই বুদ্ধিমান মনে করা হয়। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বুদ্ধিমান হল সেই ব্যক্তি, যে নিজ প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে রাখে, নিজ খেয়ালের পেছনে চলে না;

---

১৫৬. সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৩৮৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪২৫০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৬৫০১

বরং নিজ খেয়াল-খুশীকে শরী'আতের অধীন করে ফেলে। আল্লাহর তা'আলার বিধানমতো জীবন-যাপন করে এবং মৃত্যু উত্তর কালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই গুণ যার মধ্যে নেই, সে বুদ্ধিমান নয়; চরম বোকা। কারণ সে ফযূল ও অর্থহীন কাজের ভেতর জীবন বরবাদ করে। স্থায়ীভাবে যেখানে থাকতে হবে, সেখানকার জন্য কোনও প্রস্তুতি গ্রহণ করে না।

আমরা বোকাই বটে

বাহ্‌লূল বাদশাহ হারূনুর রশীদকে লক্ষ্য করে যে কথা বলেছিলেন, একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে সে কথা আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই খাটে। কেননা দুনিয়ায় বসবাস করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য তো আমাদের চেষ্টার কোনো কমতি নেই। সর্বক্ষণ ফিকিরে থাকি কোথায় বাড়ি বানাব, কিভাবে বানাব, তাতে কী কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে এবং আরাম-আয়েশের কী কী ব্যবস্থা রাখা হবে? কোথাও সফরে যাওয়া হলে কয়েক দিন আগেই বুকিং দেওয়া হয়, পাছে সিট পাওয়া না যায়। কয়েকদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়, গন্তব্যস্থলে আগেই খবর পাঠানো হয়, হোটেলে বুকিং দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অথচ সফর হয় মাত্র তিন দিনের জন্য। কিন্তু যেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে, যেখানকার জীবন অনিঃশেষ, সেখানে কিভাবে বাড়ির ব্যবস্থা হবে, সেখানকার জন্য কিভাবে বুকিং দেওয়া যাবে তার জন্য কোনো চিন্তা নেই, কোনও রকমের পেরেশানি নেই। এই যখন আমাদের অবস্থা তখন আমরা বোকা নই তো কী?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে মৃত্যু-পরবর্তীকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তা যে ব্যক্তি করে না, সে অতি নির্বোধ, তাতে যত টকা-পয়সারই মালিক হোক না কেন, যত বড় ক্ষমতাবান ও যত বড় ডিগ্রিধারীই হোক না কেন। বুদ্ধিমানরূপে গণ্য হতে হলে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আর আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উপায় হল মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর চিন্তা করা; আমাকে একদিন মরতে হবে– এই ভাবনাটা মাথায় রাখা।

মৃত্যু ও আখিরাতের কথা চিন্তা করার পদ্ধতি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, দিনের যে-কোনও একটা সময় স্থির করে নাও। তখন বসে বসে ধ্যান করবে, আমার বিদায় বেলা এসে গেছে। রূহ কবযা করার জন্য ফিরিশতা পৌছে গেছে। সে আমার রূহ কবযা করে ফেলেছে। আমার আত্মীয়-স্বজন আমার গোসল ও দাফন-কাফনের কাজ শুরু করে দিয়েছে, এসব সমাধা করার পর তারা আমাকে কবরস্থানে নিয়ে গেল। জানাযার নামায পড়ার পর আমাকে কবরে রাখল। কবরের উপর বাঁশের চালি দিয়ে কবর ঢেকে দিল এবং মাটি দ্বারা তা ভরাট করে দিল। কাজ শেষে তারা সব কবরস্থান থেকে বিদায় হল। এখন অন্ধকার কবরে আমি একা। এরই মধ্যে ফিরিশতা সওয়াল-জওয়াবের জন্য হাজির হয়ে গেল। তারা আমাকে সওয়াল-জওয়াব করছে।

তারপর আখিরাতের কথা ধ্যান করো– আমাকে আবার কবর থেকে ওঠানো হল। হাশরের ময়দান কায়েম হয়ে গেল। সমস্ত মানুষ সমবেত। প্রচণ্ড গরম। শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। সূর্য খুব কাছাকাছি। সমস্ত মানুষ গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় জর্জরিত। তারা নবীগণের কাছে গিয়ে সুপারিশের জন্য আবেদন করছে, যাতে আল্লাহ তা'আলা বিচারকার্য শুরু করে দেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে হিসাব-কিতাব, পুলসিরাত ও জান্নাত-জাহান্নামের কথা কল্পনা করবে। রোজ ফজরের নামায পড়ার পর তিলাওয়াত, মুনাজাতে মাকবুল ও যিকির-আযকার শেষ করে কিছুক্ষণের জন্য এরকম ধ্যান করবে। চিন্তা করবে এই সবকিছুই ঘটবে আর কখন ঘটবে তার কোনো ঠিকানা নেই। হতে পারে আজই শুরু হয়ে যাবে।

এই ধ্যানের পর দু'আ করবে, 'হে আল্লাহ! আমি দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য বের হচ্ছি। এমন কোনো কাজ যেন না করে বসি, যা আমার আখিরাতকে বরবাদ করে দেবে এবং যা আপনার অন্তুষ্টির কারণ হয়ে যাবে।

প্রতিদিন কাজে বের হওয়ার আগে এভাবে ধ্যান কল্পনা করবে। একাবার অন্তরে চিন্তা বসে গেলে ইনশাআল্লাহ আত্মসংশোধনের ইচ্ছা ও আগ্রহ তৈরি হয়ে যাবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবন আবী নু'ম রহ.

হযরত আব্দুর রহমান ইবন আবী নু'ম রহ. নামে এক বড় মুহাদ্দিছ ও বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর আমলে এক ব্যক্তির আগ্রহ হল আলেম-উলামা, মুহাদ্দিছীন, ফুকাহা ও বুযুর্গানে দ্বীনের কাছে গিয়ে জানতে চাইবে, তারা যদি জানতে পারেন আগামীকালই মৃত্যু, জীবনের মাত্র একদিন অবশিষ্ট আছে, তবে সেই একটা দিন কিভাবে কাটাবেন এবং কী কাজে সেই দিনটি ব্যয় করবেন? তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সর্বোত্তম কাজের সন্ধান করা। কেননা তাদের কাছে এই প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই তাঁরা সর্বাপেক্ষা ভালো ভালো কাজের কথাই বলবেন, যেই কাজে তাঁদের জীবনের অবশিষ্ট দিনটি ব্যয় করবেন। ব্যস এভাবে তাঁদের কাছ থেকে সর্বোত্তম কাজের সন্ধান নিয়ে সেও তার অবশিষ্ট জীবন সেইসব কাজের ভেতর দিয়েই কাটাবে। সুতরাং সে একের পর এক বড়-বড় ব্যক্তির কাছে গিয়ে এই প্রশ্ন শুরু করে দিল। বহুজনের কাছেই গেল। তাদের একেকজন তার প্রশ্নের জবাবে একেক কথা বললেন। সবশেষে হযরত আব্দুর রহমান ইবন আবূ নু'ম রহ.-এর কাছে উপস্থিত হল। জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি যদি জানতে পারেন, আগামীকালই আপনার মৃত্যু, জীবনের মাত্র একদিন বাকি আছে, তবে সেই একদিন আপনি কী কাজের ভেতর দিয়ে কাটাবেন? তিনি বললেন কেন, যা রোজ করে থাকি তাই করব। আমি তো আগে থেকেই আমার দৈনন্দিন কাজকর্ম এই চিন্তা সামনে রেখেই ঠিক করে নিয়েছি যে, এটাই হয়তো আমার জীবনের শেষ দিন এবং আজই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। কাজেই এই কার্যসূচির ভেতর নতুন কোনো কাজের সংযোজন সম্ভব নয়। রোজ আমি যেসব কাজ করে থাকি শেষ দিন পর্যন্ত আমি তাই করে যাব। হাদীছ–

مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا

মৃত্যুর আগেই মরে নাও– এর দ্বারা এভাবেই দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচি সাজাতে বলা হয়েছে। বুযুর্গানে দ্বীন মৃত্যুচিন্তা সামনে রেখে এমনভাবে জীবন গঠন করে থাকেন, যেন সর্বক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, যখন আসার তা আসতে পারে। তার জন্য নতুন কোনো প্রস্তুতির দরকার হবে না।

আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ

এরই সম্পর্কে হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ اَحَبَّ لِقَآءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَآءَهٗ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আগ্রহী, আল্লাহ তা'আলাও তার সঙ্গে সাক্ষাত করার আগ্রহ রাখেন।'[১৫৭]

আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কখন সাক্ষাত হবে, সেই আগ্রহে যারা অপেক্ষমান, তারা তো মৃত্যুর জন্য বসেই আছে। তারা যেন তাদের আচার-আচারণের ভাষায় বলে-

غَدًا نَّلْقِى الْاَحِبَّةَ. مُحَمَّدًا وَّحِزْبَهٗ

'আগামীকাল মিলিত হব প্রিয়জনদের সাথে- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সাথে।' এই মৃত্যুচিন্তার ফলেই জীবন শরী'আত ও সুন্নাত অনুযায়ী রচিত হয়ে যায় এবং সে কারণেই মৃত্যুর জন্য তা সদাপ্রস্তুত থাকে।

মোটকথা, কিছু সময় বের করে মৃত্যুর ধ্যান করুন যে, মৃত্যু তো অবধারিত, যেকোনো সময়েই তা এসে যাবে; আমি তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি?

আজই নিজের হিসাব গ্রহণ করুন

হাদীছটির দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে-

وَحَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسِبُوْا

নিজেই নিজের হিসাব নিয়ে নাও সেই দিনের আগে, যেদিন তোমাদের হিসাব নেওয়া হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আখিরাতে তোমাদের প্রতিটি কাজের হিসাব নেওয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

---

১৫৭. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬০২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪৮৪৪; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ৯৬; সুনান নাসাঈ, হাদীছ নং ১৮১৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২১৬৩৮

فَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَّرَهٗ ۞ وَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۞

'যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।[১৫৮] সুতরাং

تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہوگا

'কর্মফল দিবসে যা কিছু ঘটবে, মনে করে নাও যেন আজই তা ঘটছে।' রোজ রাতে ঘুমানোর আগে হিসাব নাও যে, আজ আমার সারাটা দিন কী কী কাজে কেটেছে। তার মধ্যে এমন কী আছে, যে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি এ কাজ কেন করলে? তখন আমার পক্ষে তার কোনো জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না। প্রতিদিন এভাবে নিজে নিজের হিসাব নিয়ে নাও।

প্রতিদিন ভোরে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

ইমাম গাযালী রহ. আত্মসংশোধনের একটা চমৎকার ব্যবস্থা দান করেছেন। আমরা সে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা আমাদের জন্য ভালো সুফল বয়ে আনতে পারে। তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তিনি বলেন, প্রতিদিন কয়েকটি কাজ করবে। প্রথম কাজ হচ্ছে আপন মনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। ভোরে যখন ঘুম থেকে জাগবে প্রথমেই এই অঙ্গীকার করবে যে, আজ এই ভোর থেকে রাতে শোওয়া পর্যন্ত কোন গুনাহের কাজ করব না এবং আমার যিম্মায় যত ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত কাজ আছে তা যথাযথভাবে পালন করব। এভাবে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ তথা আল্লাহ তা'আলার ও মানুষের সমস্ত হক আমি আদায় করব। যদি ভুলক্রমে এর কোন ব্যত্যয় ঘটে, প্রতিশ্রুতির বিপরীত কোন কাজ হয়ে যায়, তবে হে মন! তোমাকে শাস্তি দেব। এই হল প্রথম কাজ। একে 'মুশারাতা' বলে, অর্থাৎ নিজের উপর শর্ত আরোপ করা যে, এসব তোমাকে করতে হবে, না করলে শাস্তি পাবে।

---

১৫৮. সূরা যিলযাল, আয়াত ৭-৮

প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য দু'আ

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল-হাই (রহ.) ইমাম গাযালী (রহ.)-এর এই প্রথম কথার সাথে একটু কথা সংযোজন করেছেন। তিনি বলেন, এই প্রতিশ্রুতির পর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! আমি তো এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছি যে, আজ কোনো গুনাহ করব না এবং সমস্ত ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত আদায় করব, শরী'আত অনুযায়ী চলব, হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল-ইবাদের সমস্ত ধারা পূরণ করব। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনার তাওফীক ছাড়া এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আপনি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাওফীক দান করুন, আমাকে এর উপর অবিচলিত থাকার শক্তি দান করুন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দুর্বলতা থেকে আমাকে হেফাজত করুন এবং আমাকে এ অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন।

নিজ কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ

দু'আ করার পর দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য বের হয়ে পড়া। চাকরি করলে চাকরিতে, ব্যবসা করলে ব্যবসায়ে কিংবা আয়-রোজগারের যে কাজই হোক না কেন তার উদ্দেশ্যে চলে যাও। যাওয়ার পর কাজ শুরুর আগে একটু চিন্তা করে নাও, এই যে কাজটি আমি করতে যাচ্ছি, তা আমার অঙ্গীকারের বিপরীত নয় তো? এই যে কথা বলতে যাচ্ছি তা আমার অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তো? সঙ্গতিপূর্ণ মনে না হলে তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা। এভাবে যাপিত জীবনের প্রতিটি কাজ নিজ পর্যবেক্ষণে রাখা চাই। এই পর্যবেক্ষণকে বলে মুরাকাবা। এটা দ্বিতীয় কাজ।

শোয়ার আগে হিসাব গ্রহণ

তৃতীয় কাজ মুহাসাবা বা হিসাব গ্রহণ। রাতে শোয়ার আগে নিজেকে লক্ষ্য করে বলবে, তুমি ভোরে ঘুম থেকে উঠে অঙ্গীকার করেছিলে কোনও গুনাহের কাজ করবে না, প্রতিটি কাজ শরী'আত মোতাবেক করবে এবং হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ পুরোপুরি আদায় করবে। এখন

বলো, তুমি তোমার সে অঙ্গীকার কতটুকু রক্ষা করেছ। কোন কাজ অঙ্গীকার অনুযায়ী করেছ এবং কোন কাজ তার বিপরীত করেছ? এভাবে সারা দিনের প্রতিটি কাজের খতিয়ান নেবে। যেমন, আজ ভোরে ঘর থেকে বের হওয়ার পর সর্বপ্রথম অমুকের সাথে দেখা হয়েছিল। তার সাথে এই এই কথা বলেছিলাম। সে কথাগুলো কতটুকু সঠিক ছিল? চাকরিতে যাওয়ার পর সেখানে নিজ দায়িত্ব কিভাবে পালন করা হয়েছে? ব্যবসা কিভাবে করা হয়েছে– হালাল পন্থায় না হারাম উপায়ে? যত লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে, তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করা হয়েছে তো? স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির হক কতটুকু আদায় করা হয়েছে? এভাবে সকল কাজের হিসাব নেবে, এই হিসাব নেওয়াকে বলা হয় মুহাসাবা।

শোকর আদায়

হিসাব গ্রহণ করলে দুই অবস্থার এক অবস্থা সামনে আসবে। হয়তো দেখা যাবে সারা দিনের কাজকর্ম ভোরের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হয়েছে অথবা সেই মোতাবেক হয়নি। যদি দেখা যায়, তা প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হয়েছে এবং এভাবে নিজ প্রতিশ্রুতিতে কৃতকার্যতা অর্জিত হয়েছে, তবে সে জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে যে, হে আল্লাহ! তুমিই আমাকে প্রতিশ্রুতিতে রক্ষার তাওফীক দিয়েছ। এজন্য তোমার শোকর। বলবে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

'হে আল্লাহ! তোমারই সব প্রশংসা এবং তোমারই শোকর। এ শোকর আদায়ের কী লাভ, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

'তোমরা যদি নি'আমাতের শোকর আদায় কর, তবে আমি তোমাদের সে নি'আমত বৃদ্ধি করে দেব।'[১৫৯] সুতরাং প্রতিশ্রুতি পালনের

---

১৫৯. সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৭

যে নি'আমত আল্লাহ তা'আলা দান করলেন, সেজন্য শোকর আদায় করলে পরবর্তী সময়ে এ নি'আমত আরও বেশি লাভ হবে এবং সেই সঙ্গে শোকর আদায়ের ছাওয়াব তো আছেই।

পক্ষান্তরে মুহাসাবা করে যদি দেখা যায় কোনো কাজ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হয়নি, শরী'আত যেভাবে বলেছে সব কাজ ঠিক সেভাবে করা যায়নি, ক্ষেত্রবিশেষে শরী'আতের সীমা লঙ্ঘন হয়ে গেছে, আপন অঙ্গীকার রক্ষা করা যায়নি, তবে দেরি না করে এখনই তওবা করে নেবে। বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি এ অঙ্গীকার করেছিলাম, কিন্তু শয়তানের ফাঁদে পড়ে আমি সে অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারিনি। হে আল্লাহ! আমি ক্ষমা চাচ্ছি, তওবা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

নিজের উপর শাস্তি আরোপ

তওবার সাথে সাথে নিজেকে কিছুটা শাস্তিও দেওয়া চাই। মনকে লক্ষ্য করে বলবে, আরে মন! তুই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিস, এর শাস্তি হল তোকে এখন আট রাকাআত নফল নামায পড়তে হবে। এ শাস্তি ভোরবেলা প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালেই স্থির করে রাখবে। সুতরাং রাতে শোওয়ার সময় মনকে লক্ষ্য করে বলবে, তুই নিজ আরাম-আয়েশের খাতিরে এবং সামান্য একটু আনন্দ-ফুর্তির জন্য আমাকে অঙ্গীকার অপরাধে অপরাধী করলি। এখন তোকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। তার শাস্তি এই যে, এখন শোওয়ার আগে তোকে আট রাকা'আত নফল নামায পড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। আট রাকা'আত পড়ার পর বিছানায় যাবে– তার আগে নয়।

শাস্তি পরিমিত হতে হবে

হযরত থানভী রহ. বলেন, এমন শাস্তি স্থির করবে, যাতে মনের উপর কিছুটা চাপও পড়ে, কিছুটা কষ্টও হয়। খুব বেশি কষ্টও না হয়, যাতে মন বিগড়ে যায় এবং খুব হালকাও না হয়, যাতে মন কোনও চাপই বোধ না করে। ভারতে স্যার সাইয়্যেদ মরহুম যখন আলীগড় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন আইন করেছিলেন, সমস্ত ছাত্রকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায

মসজিদে গিয়ে জামাতে আদায় করতে হবে। কোনও ছাত্রের জামাত ছুটে গেলে জরিমানা দিতে হবে। জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল সম্ভবত প্রতি ওয়াক্তের জন্য এক আনা। এটা খুবই লঘু শাস্তি ছিল, যে কারণে বিত্তবান ছাত্ররা সারা মাসের জরিমানা এক সঙ্গে আদায় করে নামায থেকে ছুটি নিয়ে নিত। ব্যস জরিমানা তো দিয়ে দিয়েছে, আর নামায কিসের?

হযরত থানবী রহ. বলেন, জরিমানা এত কম হলে চলবে না, যা এক সাথে মিলিয়ে আদায় করা সহজ হয়। আর না এত বেশি ধরা উচিত হবে, যদ্দরুন উল্টো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে; বরং মাঝামাঝি পর্যায়ের ও পরিমিত জরিমানা ধার্য করতে হবে। সে হিসেবে আট রাকা'আত নফল নামায পড়ার জরিমানা বেশ সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত।

হিম্মতের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

নিজেকে সংশোধন করতে চাইলে অল্প-বিস্তর হাত-পা চালাতে হবে, কিছু না কিছু কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করতে হবে। আর এজন্য দরকার হিম্মত ও মানসিক শক্তি। পরিপক্ক সংকল্প ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকলে জগতে কোনও কাজই কঠিন নয়। এমনি বসে বসে তো কোনও কাজই হয় না। তা নিজের ইসলাহ ও আত্মসংশোধনের কাজটাও বসে বসে আরামে হয়ে যাবে এটা কী করে আশা করা যায়? সুতরাং স্থির করে নেবে যে, যখনই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে, কোনও ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাবে, তার প্রতিকারস্বরূপ আট রাকা'আত নফল নামায অবশ্যই পড়ব। মন যখন বুঝে ফেলবে আট রাকা'আত নফল পড়ার নতুন মসিবত মাথার উপর নেমে এসেছে, তখন এই মনই তোমাকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে, যাতে আট রাক'আতের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এভাবে ধীরে ধীরে মন ইনশাআল্লাহ সোজা পথে চলে আসবে। অতঃপর মন আর তোমার বিপথগামিতার কারণ হবে না।

চারটি কাজ নিয়মিত করুন

সুতরাং ইমাম গাযালী রহ.-এর নসীহত মোতাবেক এই চারটি কাজ শুরু করে দিন।

এক. ভোরে ঘুম থেকে জেগে মুশারাতা বা অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।

দুই. প্রতিটি কাজে মুরাকাবা বা পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি।

তিন. রাতে শোওয়ার সময় মুহাসাবা বা হিসাব গ্রহণ।

চার. কোনো কাজ ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে মু'আকাবা বা মনকে শাস্তিদান।

প্রকাশ থাকে যে, এ কাজগুলি নিয়মিত করে যেতে হবে, দু'চার দিন করেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছি, বুযুর্গ বনে গেছি– এরূপ মনে করা ঠিক হবে না। বরং নিরবচ্ছিন্নভাবে এ প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। এটা একটা নিত্যকৃত্য সাধনা। এ সাধনায় কখনও তুমি জয়যুক্ত হবে, কখনও শয়তানের সবলতা প্রকাশ পাবে। কিন্তু শয়তানের শক্তি দেখে ঘাবড়ালে চলবে না। হতাশ হয়ে সাধনা ছেড়ে দেওয়া চলবে না। কেননা শয়তানের এই সবলতা প্রকাশের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার কোনও হিকমত ও রহস্য আছে। ইনশাআল্লাহ এভাবে আছাড়ি-পিছাড়ি চলতে চলতে এক সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। যদি প্রথম দিনেই তুমি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাও, তবে হিতে বিপরীত হওয়ারও আশঙ্কা আছে। কেননা তখন মাথায় খন্নাস সওয়ার হয়ে যাবে। নিজ সম্পর্কে ধারণা উঁচু হয়ে যাবে- আমি তো জুনায়দ বাগদাদী বা শিবলী হয়ে গেছি। তাই প্রথম দিকে চড়াও-উতরাওই ভালো। কখনও তুমি বিজয়ী হবে, কখনও শয়তান। যেদিন তুমি কৃতকার্য হবে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে আর যেদিন অকৃতকার্য হবে সেদিন তাওবা-ইসতিগফার করবে এবং নিজের উপর শাস্তি প্রয়োগ করবে, সেই সঙ্গে ভুল-ত্রুটির কারণে অনুতাপ-আক্ষেপও প্রকাশ করবে। মন্দ কাজের দরুন অনুতাপ-আক্ষেপ খুবই ফলপ্রসূ জিনিস। এটা মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়।

হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর ঘটনা

হযরত থানভী রহ. হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর ঘটনা লিখেছেন যে, তিনি প্রতিদিন রাতেই তাহাজ্জুদের জন্য জাগতেন। একবার তাঁর চোখ আর খুলল না। তাহাজ্জুদ ছুটে গেল। সারা দিন কেঁদে কেঁদে কাটালেন। তওবা-ইসতিগফার করলেন। আক্ষেপ করতে থাকলেন, হায় আল্লাহ! আমার তাহাজ্জুদ যে আজ ছুটে গেল! পরের রাত যখন ঘুমালেন

তাহাজ্জুদের সময় এক ব্যক্তি আসল এবং তাঁকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে দিল। ঘুম থেকে জেগে তিনি দেখলেন, যে ব্যক্তি তাকে জাগিয়েছে সে এক অপরিচিত লোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? বলল, আমি ইবলীস। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইবলীস হয়ে থাকলে আমাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগানোর এত গরয কেন দেখা দিল? শয়তান বলল, সেটা কোনও ব্যাপার নয়। আপনি উঠুন এবং তাহাজ্জুদ পড়ুন। হযরত মু'আবিয়া রাযি. বললেন, তোর কাজ তো তাহাজ্জুদে বাধা দেওয়া তাহাজ্জুদে উৎসাহদাতা কেমনে হয়ে গেলি? শয়তান উত্তর দিল, আসল ব্যাপার অন্য। গতরাতে আমি আপনাকে তাহাজ্জুদের সময় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। ফলে আপনার তাহাজ্জুদ ছুটে যায়। কিন্তু তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার কারণে আপনি এত কান্নাকাটি, আক্ষেপ-অনুতাপ ও তওবা-ইসতিগফার করেছেন, যে কারণে তাহাজ্জুদ পড়ে যে ছাওয়াব পেতেন তার চেয়ে আরও বেশি ছাওয়াব পেয়ে গেছেন। তার চেয়ে বরং তাহাজ্জুদ পড়াই ভালো ছিল। তাই আজ আমি নিজে আপনাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতে এসেছি, যাতে অতিরিক্ত ছাওয়াব লাভ করতে না পারেন।

অনুশোচনা ও তাওবা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি

মানুষ তার অতীত ভুলের জন্য যদি খাঁটি মনে অনুশোচনা করে এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার জন্য স্থিরসংকল্প হয়, তবে এর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে বহু দূর পৌঁছিয়ে দেন। আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বলতেন, কোনও বান্দা ভুল করার পর যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয় এবং খাঁটি মনে তাওবা-ইসতিগফার করে, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দাকে বলেন, তোমার দ্বারা যে ভুল হয়ে গেছে তা তোমার পক্ষে বড় মঙ্গলজনক সাব্যস্ত হয়েছে, কারণ এর ফলে তুমি আমার অনুগ্রহভাজন হয়ে গেছ, তুমি আমার ক্ষমাসুলভ আচরণের উপযুক্ত হয়ে গেলে। বান্দার দোষ গোপন রাখার যে গুণ আমার রয়েছে তুমি সে গুণের প্রকাশস্থল হতে পেরেছ।

হাদীছ শরীফে আছে, ঈদুল-ফিতরের দিনে আল্লাহ তা'আলা তার গৌরব ও মহিমার শপথ করে ফিরিশতাদেরকে বলেন, আজ আমার এ বান্দাগণ ঈদগাহে একত্র হয়ে তাদের উপর যা ফরয ছিল তা আদায়

করছে, আমাকে ডাকছে, আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে এবং নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণের দু'আ করছে। আমার গৌরব ও মহিমার কসম! আমি আজ অবশ্যই তাদের দু'আ কবূল করব, আর তাদের গুনাহ ও মন্দ কাজসমূহকে নেকি ও ভালোকাজের দ্বারা বদলে দেব।[১৬০]

প্রশ্ন হতে পারে, গুনাহ ও মন্দ কাজ কিভাবে নেকি দ্বারা বদলে যাবে? এর উত্তর হল, কারও দ্বারা যখন অসচেতনতা ও অজ্ঞতাবশত কোনও গুনাহ হয়ে যায় আর সেজন্য তার মনে আক্ষেপ ও অনুশোচনা দেখা দেয়, ফলে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে তাকে ডাকে, হে আল্লাহ! অসচেতনতা ও অজ্ঞতাবশত আমার দ্বারা এই গুনাহ হয়ে গেছে, আপনি ক্ষমা করুন, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সে অনুশোচনার কারণে কেবল গুনাহ ক্ষমা করেই দেন না, বরং তার বদৌলতে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি করেন। এভাবে তার সেই গুনাহও কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

'আল্লাহ তাদের পাপরাশিকে পুণ্য দ্বারা বদলে দেবেন।'[১৬১]

আমাদের এক বুযুর্গ ছিলেন বাবা নাজ্‌ম আহ্‌সান রহ.। হযরত থানভী রহ.-এর ইজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন। অনেক উচ্চস্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তিনি কবিতা রচনা করতেন। তাঁর দু'টি চরণ আমার বড় পসন্দ। আমার বার বার মনে পড়ে। তিনি বলেন,

دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی
ایسی تیسی مرے گناہوں کی

'মিলে গেছে আমার আক্ষেপ-অনুশোচনার ধন
নিকুচি আমার সব গুনাহের।'

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদেরকে গুনাহের কারণে আক্ষেপ-অনুশোচনা ও উহ্ আহ্ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং দু'আও করতে পারছি যে, হে আল্লাহ! আমার এ গুনাহ ক্ষমা করে দিন, আমার

---

১৬০. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৫; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং ২০৯৬

১৬১. সূরা ফুরকান, আয়াত ৭০

দ্বারা ভুল হয়ে গেছে, আপনি দয়া করুন, তখন গুনাহ আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। গুনাহও তো আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা কোনও জিনিসই তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করেননি। নিশ্চয়ই গুনাহ সৃষ্টির পেছনেও তাঁর কোনও হিকমত ও রহস্য আছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যেও কোনও তাৎপর্য নিহিত আছে। সে তাৎপর্য এই যে, গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর বান্দা যখন তাওবা করবে, অনুশোচনার সাথে কান্নাকাটি করবে এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার সংকল্প করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা সে গুনাহ তো মাফ করবেনই, অতিরিক্ত তার মর্যাদা এত উঁচুতে পৌঁছিয়ে দেবেন যা তার কল্পনারও অতীত।

মনের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই

সুতরাং নিয়মিতভাবে শোওয়ার আগে সারাদিনের কাজ কর্মের হিসাব গ্রহণ করতে হবে। কোনও দিন হিসাব গ্রহণকালে যদি দেখা যায়, আজ কোনও গুনাহ হয়ে গেছে, তবে সেজন্য হতাশ না হয়ে তাওবা ইসতিগফার করা চাই এবং অনুতাপ ও আক্ষেপের সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হওয়া চাই। জীবন তো একটা সংগ্রামই বটে। মৃত্যু পর্যন্ত মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। আরও আছে শয়তানের সাথে যুদ্ধ। যুদ্ধ-বিগ্রহে একবার তুমি জিতবে একবার শত্রু জিতবে– এটাই স্বাভাবিক। কাজেই শয়তান কখনও তোমার উপর জিতে গেলে হতোদ্যম হয়ে পড়ো না; বরং ফের নতুন উদ্যমে উঠে দাঁড়াও, পুনরায় তার সাথে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হও। তোমার পক্ষে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে, যদি হতোদ্যম না হও, পুনরায় মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হও এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাও, তবে পরিশেষে বিজয় তোমারই অর্জিত হবে। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে–

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

'শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে।'[১৬২]

সুতরাং শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হবে তুমিই।

---

১৬২. সূরা কাসাস, আয়াত ৮৩

তুমি উঠে দাঁড়াও আল্লাহ তা'আলাই সাহায্য করবেন

আল্লাহ তা'আলা অনত্র ইরশাদ করেছেন–

'যারা আমার পথে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ দেখাব।'[১৬৩] অর্থাৎ তোমার মন ও শয়তান যদি তোমাকে বিপথগামী করতে চায়, আর তুমি তার সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হও এবং ভ্রান্ত পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা চালাও, তবে আমার পক্ষ থেকে সাহায্যের ওয়াদা রয়েছে, আমি অবশ্যই আমার পথে চেষ্টা ও সংগ্রামকারীদেরকে পথের দিশা দেব।

হযরত থানবী রহ. বলতেন, আমি আয়াতটির অর্থ করে থাকি এরকম, 'যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদের হাত ধরে আমার পথে পরিচালিত করি।'

অতঃপর তিনি একটি উদাহরণের মাধ্যমে আয়াতটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, শিশু যখন হাঁটার বয়সে পৌছে, তখন পিতা-মাতার বড় আগ্রহ তাদের শিশু হাঁটা শিখে ফেলুক। শেখানোর জন্য তারা নানা রকম চেষ্টাও করে। যেমন একটা চেষ্টা এভাবে করে যে, তাকে একটু দূরে নিয়ে ছেড়ে দেয়। তারপর তাকে ডাক দেয়, এসো আব্বু! আমার কাছে এসো। শিশু যদি না হেঁটে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে তবে বাবা মা'ও দাঁড়িয়ে থাকে, শিশুর কাছে যায় না, তাকে কোলে নেওয়ার চেষ্টা করে না; বরং দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে শিশু যখন পা ফেলে, তারপর আরও এক পা ফেলার চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন বাবা-মা এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলে, তাকে আর পড়তে দেয় না। কোলে তুলে নিয়ে আদর করে। শিশু যেহেতু নিজের চেষ্টাটুকু করেছে, তাই বাবা মা' খুশী হয়ে তার পতন ঠেকিয়ে সাদরে কোলে তুলে নিয়েছে। ঠিক এরমকই মানুষ যখন আল্লাহর সাথে চলতে শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলাও তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এটা কি সম্ভব যে, বান্দা তার পথে চলার চেষ্টা

---

১৬৩. সূরা আনকাবূত, আয়াত ৬৯

করবে, আর তিনি তাকে অসহায় ছেড়ে দেবেন, পতন ঠেকানোর জন্য তাকে ধরবেন না? কখনই তা হতে পারে না। সুতরাং এ আয়াতে তিনি ওয়াদা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি আমার পথে চলতে চেষ্টা করো, তবে আমি অবশ্যই সাহায্য করব। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে তোমাদেরকে কোলে তুলে নেব। কাজেই সামনে কদম ফেলো। হিম্মত করে চলতে থাকো। কিছুতেই আশাহত হয়ো না।

سوئے ما یوی مرو امید ہا است
سوئے تاریکی مرو خورشید ہا است

'তার দরবার বড় আশাস্থল, মনে হতাশা ঠাঁই দিও না।
সেথায় শুধু আলোই আলো, অন্ধকারের দিকে যেও না।'

সুতরাং নফ্স ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও কোনও, ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলেও হতাশ হয়ে পড়ো না, উদ্যম হারিয়ে ফেলো না, চেষ্টা বহাল রাখো। ইনশাআল্লাহ একদিন কৃতকার্য হবেই।

সারকথা তোমার যতটুকু কাজ তা তুমি করে ফেলো, আল্লাহ তা'আলার যা কাজ তিনি তা অবশ্যই করবেন। মনে রেখো, তোমার কাজে ত্রুটি ও কমতি হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাজে কোনও ত্রুটি নেই, তাতে কোনও কমতি হতে পারে না। সুতরাং তুমি যখন পা বাড়াবে, তোমার জন্য ইনশাআল্লাহ পথ খুলে যাবে। এরই দিকে ইশারা করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা মরার আগে মরে নাও এবং একদিন তো তোমাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে, তার আগে তোমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব নিয়ে নাও।

আল্লাহ তা'আলার কাছে কী জবাব দেবে?

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বলতেন, মুহাসাবা বা নিজের হিসাবগ্রহণের একটা পদ্ধতি হল এই কল্পনা করা যে, তুমি যেন হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানে তোমার হিসাব নেওয়া হচ্ছে, আমলনামা পেশ করা হচ্ছে, তোমার আমলনামায় যে মন্দ আমলসমূহ

লিপিবদ্ধ আছে, তা তোমার সামনে খুলে দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে প্রশ্ন করছেন, তুমি এসব অন্যায়-অপরাধ কেন করেছ? তখন তুমি আলেম-উলামাকে এখন যেসব জবাব দিয়ে থাকো আল্লাহ তা'আলাকেও সেই রকম জবাব দেবে? এখন তোমাকে কোনও আলেম বা পীর যদি বলে, অমুক কাজ করো না, দৃষ্টির হেফাজত করো, সুদের লেনদেন করো না, গীবত করো না, মিথ্যা বলো না, টিভিতে যে অশ্লীল ও নগ্ন প্রোগ্রাম থাকে তা দেখো না, বিয়েশাদির অনুষ্ঠানে পর্দাহীনতার প্রশ্রয় দিও না, তখন এর উত্তরে মৌলভী সাহেবকে বলে থাকো আমরা কী করব, যুগটাই খারাপ হয়ে গেছে, সারা বিশ্ব উন্নতি করছে, মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে, আমরা কি তাদের পেছনে পড়ে থাকব? আমরা কি জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ঘরে বসে থাকব? বর্তমান সমাজে এসব না করে পারা যায় না কি? এখন তোমরা এসব উত্তর দিয়ে মৌলভী সাহেবের মুখ বন্ধ করতে চাও, তা আল্লাহ তা'আলার সামনেও কি এসব উত্তরই দেবে? না দিতে পারবে? এবং দিলেও তা সেখানে চলবে কি? একটু বুকে হাত রেখে চিন্তা করো। যদি এসব উত্তর সেখানে না চলে, তবে আজ দুনিয়ায়ও এ উত্তর চলতে পারে না।

হিম্মত ও সাহস আল্লাহ তা'আলার কাছেই চাও

যদি আল্লাহ তা'আলার সামনে এই উত্তর দাও যে, হে আল্লাহ সমাজ ও পরিবেশের কারণে আমরা গুনাহ করতে বাধ্য ছিলাম, তবে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা বলো তো তোমরা বাধ্য ছিলে না আমি? এর উত্তর নিশ্চয় বলবে, হে আল্লাহ! আপনি নন, আমরা বাধ্য ছিলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি যদি বাধ্য ও অপারগ না হয়ে থাকি, তবে তোমরা নিজ অক্ষমতা দূর করার জন্য আমার কাছে দু'আ করলে না কেন? আমি কি তোমাদের অক্ষমতা দূর করতে সক্ষম ছিলাম না? আমি সক্ষম হয়ে থাকলে আমার কাছে দু'আ করতে—হে আল্লাহ! আমরা এই পরিস্থিতিতে পড়েছি, গুনাহ করতে বাধ্য হয়ে যাচ্ছি। হয় আপনি আমাদের অক্ষমতা দূর দিন, নয়তো এর কারণে জবাবদিহিতা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিন। তা কেন এরকম দু'আ করলে না? তোমাদের কাছে কি এ প্রশ্নের কোনও

উত্তর আছে? যদি না থাকে, তবে আজ ইহজীবনে তোমরা সঠিক পথ অবলম্বন করো। তোমরা যেসব ক্ষেত্রে নিজেদেরকে অপারগ মনে করছ, তাতে বাস্তবিকই যদি অপরাগ হও বা সমাজ ও পরিবেশের কারণে অপারগতা দেখা দেয়, সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করো হে আল্লাহ! এই অপারগতা দেখা দিয়েছে, এর দরুন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা। এর থেকে বাঁচার হিম্মত আমার হচ্ছে না, আপনি সর্বশক্তিমান, আপনি আমার এই অপারগতা ও অক্ষমতা দূর করে দিন এবং আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচার হিম্মত ও শক্তি দান করুন।

মোটকথা আল্লাহর কাছে চাও। এটা একটা পরীক্ষিত বিষয় যে, বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে আন্তরিকভাবে কোনও কিছু চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা অবশ্যই দান করেন। কেউ যদি না-ই চায়, তবে তার তো কোনও দাওয়াই নেই। আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল-হাই রহ. আবৃত্তি করতেন–

کوئی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج
ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

'কেউ যদি রীতি-রেওয়াজই না বোঝে তার কী প্রতিকার?
আমার মাওলার দানের তো কোনও কমতি নেই।'

সুতরাং কেউ যদি নাই চায় বা চাইতে না পারে, তার তো কোনও ওষুধ নেই। দয়াময়ের করুণাধারা অবারিত; তার রহমতের দুয়ার সতত উম্মুক্ত। সেখানে হাত পাতলে খালি ফেরার সম্ভাবনা নেই। তবে হাত পাততে তো হবে!

যা হোক আজ আমরা সকাল-সন্ধ্যার চারটি কাজের সবক পড়লাম। আমরা যদি এ সবককে কাজে লাগাই, তবে ইনশাআল্লাহ যে হাদীছটির উপর আলোচনা হল, সে অনুযায়ী সহজেই আমল দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন এবং এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দিন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

পুরস্কার ও শাস্তির চিন্তা*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

যেসব মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের উপর ইসলামের ভিত্তি, তার মধ্যে তাওহীদ ও রিসালাতের পর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল 'আখিরাতের বিশ্বাস'। 'আখিরাতে বিশ্বাস' এর অর্থ হচ্ছে– মৃত্যুর পর মানুষকে এমন এক স্থায়ী জীবনের সম্মুখীন হতে হবে, যেখানে তার থেকে এই দুনিয়ায় কৃত সমস্ত কাজের হিসাব নেওয়া হবে। সেই স্থায়ী জীবনকে আখিরাত বলে। কুরআন মাজীদ এ সত্যের পৌনঃপুনিক ঘোষণা দিয়েছে যে, আখিরাতে মানুষকে তার ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হবে এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

'যে ব্যক্তি বিন্দুপরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা (আখিরাতে) দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি বিন্দুপরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সে তাও দেখতে পাবে।'[১৬৪]

আমরা একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাই– এ মহাবিশ্ব কী সুদৃঢ়, প্রাজ্ঞোচিত ও সুসমঞ্জস নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে চলছে। এ পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে যে, এই জগৎ আপনাআপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং এর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন।

---

* নাশরী তাকরীরেঁ, পৃষ্ঠা : ১৭-২১

১৬৪. সূরা যিলযাল, আয়াত ৭-৮

সে সৃষ্টিকর্তা অসীম জ্ঞান-প্রজ্ঞার অধিকারী এবং তাঁর কোনও কাজ হিকমত ও তাৎপর্যহীন নয়।

আমরা লক্ষ করলে আরও দেখি, এ দুনিয়ায় সব রকমের লোক আছে। ভালো লোকও আছে, দুষ্ট লোকও আছে। মুত্তাকী-পরহেযগারও আছে, আছে নাফরমান ও পাপাচারীও। জালেম-মাজলূম, সাধু-ভণ্ড, আস্তিক-নাস্তিক হার কিসিমের লোকের সমাহার এ জগতে। এমতাবস্থায় এই পার্থিব জীবনই যদি হয় সবকিছু, এরপর আর কোনও জীবন না থাকে, তবে সৃষ্টির এ মহাকারখানা নিরর্থক হয়ে যায়। কেননা তাহলে ভালো লোক তার ভালো কাজের প্রতিদান পাচ্ছে না আর মন্দলোকও তার মন্দকাজের বদলা পাচ্ছে না। আর এভাবে ভালো-মন্দ ও পাপ-পুণ্য একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়– উভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকে না। এটা একজন প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তার পক্ষে মানানসই হয় না যে, তিনি ভালো মন্দের ফলাফলে কোনও তারতম্য রাখবেন না এবং জালিম-মাজলূম ও নেককার-বদকারের সাথে অভিন্ন আচরণ করবেন। সুতরাং সৃষ্টিজগত স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছে মৃত্যু দ্বারা মানব জীবন চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং মৃত্যুর পর মানুষ এক নিঃশেষ জগতে চলে যায়, যেখানে তাকে পার্থিব জীবনের কর্মফল দেওয়া হবে। এই মহাসত্যের প্রতি অঙ্গুলীনির্দেশ করেই কুরআন মাজীদ বলছে–

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝

'তবে কি তোমরা মনে করেছ আমি তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?'[১৬৫]

বোঝা গেল, আখিরাত এবং পুরস্কার ও শাস্তির প্রতিষ্ঠা একটি বৌদ্ধিক প্রয়োজন। তা না হলে সৃষ্টির কারখানা অর্থহীন হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য সত্য সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা এবং নিজ বিধি-বিধানের শিক্ষাদানের জন্য যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই অতি গুরুত্বের সাথে আখিরাতের বিশ্বাস সম্পর্কে

---

১৬৫. সূরা মুমিনূন, আয়াত ১১৬

শিক্ষাদান করেছেন এবং আখিরাতের ঘটনাবলি সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিতভাবে অবগত করেছেন। খোদ কুরআন মাজীদেরও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আখিরাত এবং পুরস্কার-শাস্তির বিবরণই বিবৃত হয়েছে।

কুরআন-সুন্নাহ ও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের শিক্ষায় আখিরাতের বিশ্বাসের প্রতি এতটা গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যিকারের মানুষরূপে গড়ে তোলা। মানুষের মনুষ্যত্ব জাগ্রত করার জন্য 'শাস্তি ও পুরস্কারে গভীর বিশ্বাস' অপেক্ষা বেশি কার্যকর আর কোনও জিনিস নেই। একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের প্রতিটি কথা ও কর্মের জবাবদিহী করতে হবে– এ বিশ্বাস মানুষের মন-মস্তিষ্কে যতক্ষণ পর্যন্ত শক্ত হয়ে না বসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইন্দ্রিয়পরবশতা থেকে মুক্তি পেতে পারে না; বরং এই বিশ্বাসহীন মানুষ সর্বদা কুপ্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের দাস হয়েই জীবন-যাপন করে। ফলে পাপাচার, কুঅভ্যাস ও দুশ্চরিত্রতার আবিলতা হতে কখনও তার নাজাত মেলে না।

মানুষের চোখের সামনে আখিরাতের জবাবদিহিতার বিষয়টা না থাকলে কঠিন থেকে, কঠিনতর আইনও তাকে অপরাধ ও চরিত্রহীনতা থেকে বিরত রাখতে পারে না। কেননা পুলিশ ও আদালতের ভয় ক্ষুদ্রায়তন বৃত্তের মধ্যেই কাজ করে। বড়জোর দিনের আলোয় এবং তাও নগর-কোলাহলের ভেতর। এই ক্ষুদ্র পরিসরের ভেতরই আদালতভীতি মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কিংবা পল্লী-পাড়াগায়ে কোনও পাহারাদার তার অপরাধ-প্রবণতা দমন করে রাখবে? সেখানে এক আল্লাহর ভয় ও আখিরাত ভীতিই তার অন্তরে প্রহরীর ভূমিকা রাখতে পারে, আর কিছু নয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে যে বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তার রহস্য এখানেই। তিনি তার নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে মানব মনে আখিরাতের চিন্তা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম আখিরাতের হিসাব-নিকাশের বিষয়টাকে সর্বদা দৃষ্টির সামনে রাখতেন– যেন তা চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছেন।

এই আখিরাত চিন্তা তাদের দ্বারা এমন সব কঠিন কাজও অনায়াসে করিয়ে নিচ্ছিল, যা যুগ-যুগান্তরের তালিম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও আঞ্জাম দেওয়ানো কঠিন।

মদপানের অভ্যাসটাকেই ধরুন না! মদপান যে একটা বদ অভ্যাস, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ও চরিত্র ধ্বংসকর, এ বিষয়ে আজ দুনিয়ার অধিকাংশ সভ্য জাতি একমত এবং তারা বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিকভাবে স্বীকারও করে। এ বিষয়ের উপর অতি মূল্যবান নিবন্ধ লেখা হচ্ছে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সারগর্ভ গবেষণা প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ আজকের সভ্যজগত– নিজ জ্ঞান-গরিমা ও সায়েন্টিফিক উৎকর্ষ নিয়ে রীতিমত গর্বিত– অখণ্ডনীয় দলীল-প্রমাণ, পত্র-পত্রিকার তথ্যবহুল, হৃদয়স্পর্শী বিশেষ সংখ্যা এবং আধুনিক, উন্নত প্রচার মাধ্যমে ও মানসিকতা গঠনের সর্বাধুনিক উপকরণাদি ব্যবহার সত্ত্বেও মাদকাসক্তদের মদ ছাড়ানোর প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। উন্নত বিশ্ব মাদকাসক্তি নির্মূলের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদান এবং নৈতিক ও আদর্শিক প্রণোদনাদান থেকে শুরু করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ পর্যন্ত সর্বপ্রকার কৌশল পরীক্ষা করে দেখেছে, কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না, উল্টো মদ্যপায়ীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এর বিপরীতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সমাজ ও পরিবেশে প্রেরিত হয়েছিলেন, তার দিকে একবার নজর দিন। প্রাক-ইসলামী যুগ তো বটেই, ইসলামের প্রাথমিকযুগেও আরব সমাজে মদপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ঘরে-ঘরে মদপান করা হতো পানির মতো। মদের প্রতি আরবদের যে কী গভীর আসক্তি ও তীব্র আকর্ষণ ছিল 'মদ'-এর বহুল প্রতিশব্দ দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। আরবী ভাষায় এর প্রায় আড়াইশ' প্রতিশব্দ আছে। সে সমাজে মদপান দোষের হবে কি, রীতিমতো গর্বের বিষয় ছিল। কিন্তু কুরআন মাজীদ যেই না মদের নিষিদ্ধতা ঘোষণা করল, অমনি সেই জাতি তাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় এই পানীয়কে এমন ক্ষিপ্রতার সাথে পরিত্যাগ করল, ইতিহাসে যার নজীর পাওয়া দুষ্কর।

হযরত বুরায়দা রাযি. বলেন, মদের নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন এক আসরে মদ পরিবেশিত হচ্ছিল। আমি তাদেরকে সে আয়াত পড়ে শোনানো মাত্র যে যেই অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায়ই তা ফেলে দিল। কারও ঠোঁট পেয়ালায় চাপানো ছিল, কেউ চুমুক দিয়ে মুখের ভেতর মদ নিয়ে ফেলেছিল। আয়াত শোনামাত্র ঠোঁট সরিয়ে ফেলল। মুখেরটুকু পর্যন্ত কেউ গিলে ফেলল না, তাও কুলি করে ফেলে দিল।[১৬৬]

হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি এক মজলিসে মদ পরিবেশন করছিলাম। হঠাৎ ঘোষকের ঘোষণা শোনা গেল, 'মদ হারাম করা হয়েছে' শোনামাত্র আসরের সকলেই মদ ফেলে দিল এবং মদের মটকা ভেঙে ফেলল। মদীনার অলিগলিতে পানির মতো মদ প্রবাহিত হতে থাকল।[১৬৭]

অভ্যাস ও আখলাক-চরিত্রের এ বিস্ময়কর পরিবর্তন ছিল মূলত আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও ভয় এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। এভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মন-মস্তিষ্কে এ ভক্তি-বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। আর এরই ফলশ্রুতিতে রিসালাতের যুগে অন্যায়-অপরাধের মাত্রা হ্রাস পেতে পেতে শূন্যের কোঠায় পৌছে গিয়েছিল। মানবীয় দুর্বলতাবশে কদাচিত কারও দ্বারা কোনও অপরাধ ঘটে গেলেও তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের দরকার হতো না; বরং সে নিজেই এসে ধরা দিত এবং অনুনয়-বিনয় করে নবী কারীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে নিজের উপর শাস্তি প্রয়োগ করাত। কেননা তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস প্রোথিত ছিল যে, দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা আখিরাতের শাস্তি ঢের কঠিন; বরং আখেরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি কোনও ব্যাপারই নয়। সে হিসেবে এটা অনেক সহনীয়। আজও দুনিয়ায় কোনও জিনিস যদি অপরাধ, অনৈতিকতা, অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি থেকে মুক্তি দিতে পারে, তবে তা পারে এই কেবল আল্লাহভীতি, আখিরাতচিন্তা এবং

---

১৬৬. তাফসীরে ইবন কাছীর, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯০, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩২
১৬৭. তাফসীরে ইবন কাছীর, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯০, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩০

পুরস্কার-শাস্তির বিশ্বাস। তবে এজন্য এসব বিশ্বাসের কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট নয়; বরং দরকার এর জীবন্ত বিশ্বাস ও সদা জাগ্রত চেতনা। চেতনাকে জাগ্রত করে রাখার সহজ পন্থা হল কুরআন ও হাদীছে আখিরাত সংক্রান্ত যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা বারবার পড়া এবং যাপিত জীবনের শত ব্যস্ততার ভেতরেও কিছুটা সময় আখিরাত চিন্তার জন্য বরাদ্দ রেখে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থানসমূহ নিয়মিতভাবে চিন্তা করা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاضِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتُ.

'তোমার স্বাদ-আহ্লাদ বিনাশকারী বস্তু তথা মৃত্যুর কথা বেশি-বেশি স্মরণ করো।'[১৬৮]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব হাদীছসমূহের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

---

১৬৮. সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২৩৮৩

জান্নাতের নয়নাভিরাম দৃশ্য*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۝

অর্থ : এটাই সেই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের বিনিময়ে। এখানে রয়েছে তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত ফল, যা থেকে তোমরা খাবে।[১৬৯]

আখিরাতের অবস্থাদি জানার উপায়

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! মৃত্যুর পর কী কী ঘটবে, তা জানার কোনও উপায় মানুষের হাতে নেই। এমন কোনও জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই, যা মানুষকে মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে পারে। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে গত হয়, সে তো সেখানকার অবস্থাদি জানতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি চলে গেল তার সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারি না।

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৩১-২৫৩

১৬৯. সূরা যুখরুফ, আয়াত ৭২-৭৩

জনৈক বুযুর্গের বিস্ময়কর ঘটনা

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এক বুযুর্গের ঘটনা শোনাতেন। ঘটনাটি এরকম, কোনও এক যুগে এক বুযুর্গ ছিলেন। একবার মুরীদগণ তাকে বলল, হযরত! যে ব্যক্তিই মারা যায়, সে চিরতরে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়, কখনও ফিরে এসে জানায় না, সে কোথায় গিয়েছিল, তার সাথে কী রকম ব্যবহার করা হয়েছে কিংবা সে ওই জগতে কী দৃশ্য দেখেছে। এমন কোনও ব্যবস্থা বলে দিন, যা অবলম্বন করলে আমরা সেখানকার খবরাখবর জানতে পারব। বুযুর্গ বললেন, তোমরা একটা কাজ করো। আমার মৃত্যুর পর যখন আমাকে দাফন করবে, তখন আমার কবরের ভেতর কাগজ-কলম রেখে দিও। সময়-সুযোগ পেলে আমি সেখানকার অবস্থা লিখে তোমাদের জানাব। মুরীদগণ তো বেজায় খুশী। তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণের একটা ব্যবস্থা বুঝি হয়ে গেল।

সুতরাং সেই বুযুর্গের মৃত্যুর পর মুরীদগণ তার ওসিয়তমতো দাফনকালে তার কবরে কাগজ-কলম রেখে দিল। বুযুর্গ এ কথাও বলে দিয়েছিলেন যে, দাফনের পরের দিন যেন তারা কবর থেকে সেই কাগজ বের করে আনে। তাতে তারা কবরের অবস্থাদি লেখা পাবে। সে মতে তারা পরদিন কবরে গেল। দেখে কি, কবরের উপর একটা লিখিত কাগজ পড়ে আছে। দেখে তারা বড় খুশী হল। আজ বুঝি প্রতীক্ষার অবসান হল; তারা কবরদেশের খবর জানতে যাচ্ছে। কিন্তু হায়! কাগজটি তুলে যখন পড়ল, দেখতে পেল তাতে লেখা আছে–

‘এখানকার অবস্থা বলে বোঝানোর মতো নয়; বরং দেখে উপলব্ধি করার মতো।’

আল্লাহ তা‘আলাই ভালো জানেন, এ ঘটনা সত্য না মিথ্যা। আল্লাহ তা‘আলার এরূপ ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা যে আছে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই; বাকি বাস্তবে এরূপ ঘটেছিল কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু এ ঘটনায় যে কথাটি বলা হয়েছে তা বাস্তব সত্য। সে

জগতের অবস্থাদি সত্যিই এমন যে, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। যখন চাক্ষুষ দেখা হবে তখনই বোঝা যাবে তা কী ও কেমন? আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সেখানকার অবস্থাসমূহ রহস্যাবৃত করে রেখেছেন। ফলে কারও চোখেই বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায় না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীছে যতটুকু বলে দিয়েছেন তার বেশি জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। জানার কোনও পথই নেই। কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে আমাদের কাছে যতটুকু পৌঁছেছে, এ স্থলে তার খানিকটা তুলে ধরা যাচ্ছে।

সর্বনিম্নস্তরের জান্নাতবাসীর অবস্থা

হযরত মুগীরা ইবন শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে প্রতিপালক! জান্নাতে কোন ব্যক্তি সর্বনিম্নস্তরের হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, সকল জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি অবশিষ্ট থেকে যাবে, যে জান্নাতের আশ-পাশে বসে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি যখন দুনিয়ায় ছিলে তখন বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নাম তো শুনে থাকবে। তুমি তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে চারজন বাদশাহর নাম বলো এবং তাদের প্রত্যেকের শাসনাধীন এলাকার যেই-যেই অংশের কথা তোমার জানা আছে তাও উল্লেখ করো। সেই ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! আমি অমুক-অমুক বাদশাহর নাম শুনেছিলাম। তাদের প্রত্যেকের ছিল সুবিশাল সাম্রাজ্য। ছিল বিপুল ধনৈশ্বর্য। এভাবে সে এক-এক করে তাদের নামধাম ও সাম্রাজ্যের বৃত্তান্ত উল্লেখ করবে। আর বলবে, হে আল্লাহ! আমারও যদি সেরকম হতো! আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি তাদের নাম ও সাম্রাজ্যের বিবরণ তো দিলে, কিন্তু সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের যে সামগ্রী তারা লাভ করেছিল, তাও তো তুমি শুনে থাকবে। সেই ব্যক্তি বলবে, আমি শুনেছি, অমুক বাদশাহর এই-এই জিনিস ছিল, আর অমুক বাদশাহর এই-এই জিনিস। এভাবে সে সেইসব সামগ্রীর ফর্দ পেশ করে বলবে, আমারও যদি এসব হতো!

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন বান্দা! তুমি যেই বাদশাহদের নাম বললে, তাদের যে সাম্রাজ্যের বিবরণ দিলে এবং তাদের যে ভোগ-সামগ্রীর খতিয়ান দিলে, সেই সমুদয়ের সমপরিমাণ যদি তোমাকেও দেওয়া হয়, তবে কি তুমি খুশী হবে? সেই ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই খুশী হব। কেননা তার বেশি আর কিছু হতে পারে কি? ফের আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে বান্দা! তুমি যতগুলো সাম্রাজ্যের নাম নিলে এবং তার যত ভোগ-সামগ্রীর কথা বললে, আমি তোমাকে তার দশ গুণ দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস-সালামকে বললেন, এই ব্যক্তিই হল সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের জান্নাতবাসী। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের জান্নাতবাসীরই যখন এই অবস্থা, তখন যারা আপনার প্রিয় বান্দা, যাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দেওয়া হবে, তাদের যেন কী অবস্থা হবে? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা! যারা আমার প্রিয় বান্দা তাদেরকে যা কিছু দ্বারা সম্মানিত করা হবে, আমি তা নিজ হাতে তৈরি করে মোহর লাগিয়ে রেখেছি এবং তা জান্নাতের কোষাগারে সংরক্ষিত আছে। তার ভেতর এমন সব জিনিস রয়েছে–

مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ يَسْمَعْ اُذُنٌ وَلَمْ يَخْطَرْ عَلٰى قَلْبِ اَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ.

যা কোনও চোখ দেখেনি, কোনও কান শোনেনি এবং সৃষ্টির মধ্যে কারও অন্তর তা কল্পনাও করেনি।[১৭০]

অপর এক হাদীছে আছে, সবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই ব্যক্তি এমন, যাকে তার কৃত দুষ্কর্মের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বস্তুত কোনও ব্যক্তি মুমিন হলেও সে যদি পাপাচার করে থাকে, তবে প্রথমে তাকে সেই কর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ কারণেই সেই ব্যক্তিকে প্রথমে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং সে জাহান্নামে দগ্ধ হতে থাকবে। শাস্তি-ভোগরত অবস্থায় সে আল্লাহ

১৭০. সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ২৭৬; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ৩১২২

তা'আলাকে বলবে, হে আল্লাহ! এই জাহান্নামের তাপ ও দাহ তো আমাকে ঝলসে দিয়েছে। দয়া করে আপনি ক্ষণিকের জন্য আমাকে জাহান্নাম থেকে বের করে উপরে বসিয়ে দিন, যাতে কিছুক্ষণের জন্য আমি এই জ্বলন থেকে নিস্তার পাই।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি যদি তোমাকে বের করে তীরে বসিয়ে দিই, তবে তুমি সেখান থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়ার আবেদন করবে না তো? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি ওয়াদা করছি, একবারের জন্য আমাকে জাহান্নাম থেকে তীরে বসিয়ে দিন, আমি আরও দূরে সরিয়ে দেওয়ার আবেদন করব না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ঠিক আছে, আমি তোমার আর্জি মানলাম। কাজেই তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে তীরে বসিয়ে দেওয়া হবে। যখন তাকে তীরে বসিয়ে দেওয়া হবে এবং তার কিছুটা বোধশোধ ফিরে আসবে, তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে বের করে এখানে বসিয়ে তো দিয়েছেন, কিন্তু জাহান্নামের যে হলকা এখানে ছুটে আসছে, তাতে বড় কষ্ট পাচ্ছি। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে আরেকটু দূরে সরিয়ে দিন, যাতে এই কষ্ট থেকে একটু রেহাই পাই।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি সবে ওয়াদা করলে এখান থেকে দূরে যাওয়ার বায়না ধরবে না। এরই মধ্যে ওয়াদা ভাঙলে, সে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে এখান থেকে একটু দূরে সরিয়ে দিলে আমি আর কিছু চাইব না। আর কোনও আবদার করব না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাকে একটু দূরে সরিয়ে দেবেন। এবার তাকে যেখানে রাখা হবে সেখান থেকে জান্নাত দেখা যাবে। তার পক্ষে বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরা সম্ভব হবে না। কাজেই একটু পরেই সে বলে উঠবে, হে আল্লাহ! আপনি তো মেহেরবানী করে আমাকে জাহান্নাম থেকে বের করেছেন। এবার আমি জান্নাত দেখতে পাচ্ছি। আপনি আমাকে একটু অনুমতি দিন, আমি জান্নাতের দরজার কাছে গিয়ে তার দৃশ্যটা খানিক দেখে আসি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি আবার ওয়াদাখেলাফী করেছ। সে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি নিজ দয়ায় যখন আমাকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তখন

আমাকে একটি বারের জন্য জান্নাতও দেখিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাকে যদি জান্নাত দেখানো হয় তবে কি তুমি তার ভেতর প্রবেশও করতে চাইবে? সে বলবে, না হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাত শুধু দেখতে দিন। তারপর আমি আর কিছু চাইব না।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দেখার অনুমতি দেবেন, কিন্তু যেই না সে জান্নাতের দরজায় পৌছবে আর তার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে পাবে তার পক্ষে কিছুতেই আত্মসংবরণ করা সম্ভব হবে না। জান্নাতের সুতীব্র আকর্ষণ তাকে উদ্বেলিত করে তুলবে। বলে উঠবে, হে আল্লাহ! আপনি তো আরহামুর রাহিমীন– সকল দয়ালুর শ্রেষ্ঠ দয়ালু। আপনি যখন আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন, তখন হে আল্লাহ! নিজ করুণায় আমাকে ভেতরে প্রবেশেরও অনুমতি দিন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখো, আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করবে। ঠিক তাই করলে। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে যখন নিজ রহমতে এ পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছি, এখন তোমাকে ভেতরে প্রবেশও করতে দিচ্ছি। যাও তোমাকে জান্নাতে পৃথিবীর সমপরিমাণ জায়গা দিয়ে দিলাম। সে ব্যক্তির যেন তা বিশ্বাস হতে চাবে না। বলবে, হে আল্লাহ! আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? কোথায় আমি আর কোথায় জান্নাতের এই সুবিস্তৃত জায়গা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, না ঠাট্টা করছি না। বাস্তবিকই তোমাকে জান্নাতের এই পরিমাণ জায়গা দেওয়া হয়েছে।[১৭১]

পৃথিবীর সমায়তন জান্নাত

যা হোক এই হল সেই ব্যক্তি, যে সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবার অনুমান করুন, জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারীকে বলা হচ্ছে, পৃথিবী যত বড়, তোমাকে জান্নাতে সেই পরিমাণ জায়গা দেওয়া হল, তাহলে যারা জান্নাতের প্রথম শ্রেণিতে থাকবে তাদের অবস্থা কী?

---

১৭১ সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ২০৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ২৭২; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪২০

তারা জান্নাতে কত বড় জায়গা পাবে? আসলে আমরা যেহেতু পৃথিবীর চার দেয়ালে বন্দী, ওই জগতের বাতাসও আমাদের গায়ে লাগেনি, তাই সে জগৎ যে কতটা বিস্তৃত তা আমাদের পক্ষে অনুমান করাই সম্ভব নয়। আর এ কারণেই আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে, যখন শুনি একজন জান্নাতীকে পৃথিবীর সমপরিমাণ জায়গা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে প্রশ্নও জাগে একজন মানুষ এত বিপুল জায়গা দিয়ে কী করবে? এই জগতের বাসিন্দার কাছে ওই জগতের এসব ব্যাপার অস্বাভাবিক মনে হতেই পারে।

পরজগতের দৃষ্টান্ত

পরজগতের তুলনায় ইহজগত হল 'মাতৃগর্ভে শিশু'-এর মতো। যে শিশু মায়ের পেটে আছে, পৃথিবীর বাতাসও তাকে স্পর্শ করেনি। কাজেই তার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয় পৃথিবী কত বড়। সে তো মায়ের পেটকেই সবকিছু মনে করে। কিন্তু সে যখন পৃথিবীতে আসে তখন বুঝতে পারে পৃথিবী কত বড় এবং সে হিসেবে মায়ের পেট কত ছোট। বরং কোনও তুলনাই চলে না। ঠিক এরকমই দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আমরা বুঝতে পারব না জান্নাত কত বড়। সে হিসেবে আমরা যেন মায়ের পেটে আছি। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাদেরকে জান্নাত দান করুন। সেই দিন আমরা বুঝতে পারব সে জগৎ কী বিশাল, তার ব্যাপ্তি কত বড় এবং মুমিনদের জন্য কী বিস্তৃত নিবাস তৈরি করা হয়েছে।

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বলতেন, আলহামদুলিল্লাহ! জান্নাত মুমিনদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ঈমানদার ব্যক্তির জন্য তৈরি করা হয়েছে। তোমাদের যদি আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর প্রতি ঈমান থাকে, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো, তা তোমাদেরই জন্য তৈরি করা হয়েছে। তবে সে পর্যন্ত পৌছার জন্য এবং তার পথের বাধা অপসারণের জন্য কিছু কাজ করতে হবে। সেই কাজটুকু করে নাও, তাহলে জান্নাত তোমার দখলে এসে যাবে– ইনশাআল্লাহ। তা তো তোমারই জন্য তৈরি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাদের সকলকে জান্নাত দান করুন, আমীন।

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি.-এর আখিরাত চিন্তা

এক বর্ণনায় আছে, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব রহ., যিনি উচ্চস্তরের একজন তাবিঈ ও অতি বড় বুযুর্গ এবং হযরত আবূ হুরায়রা রাযি.-এর ছাত্র, বর্ণনা করেন, একবার আমি হযরত আবূ হুরায়রা রাযি.-এর সাথে কোনও এক বাজারে গেলাম। দিনটি ছিল জুমু'আর। তাঁর কোনও জিনিস কিনবার ছিল। বাজারে গিয়ে তা কিনলেন। বাজার থেকে ফেরার পথে তিনি আমাকে বললেন, হে সাঈদ! আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তোমাকে যেন জান্নাতের বাজারে মিলিত করেন। ব্যাপারটা লক্ষ করার মতো। দুনিয়ার বাজারে গিয়ে কিভাবে আখিরাতের বাজারের কথা স্মরণ করা হচ্ছে। এই হলো মহান সাহাবীগণের শান। আখিরাত সর্বক্ষণ তাদের দৃষ্টির সামনে থাকত, যে-কোনও রকমের প্রসঙ্গ ধরেই তারা আখিরাতের ও জান্নাতের স্মরণ তাজা করে নিতেন, যাতে দুনিয়ার কাজকর্ম মানুষকে এমনভাবে নিজের ভেতর নিমজ্জিত করে রাখতে না পারে, যদ্দরুন আখিরাত বিস্মরণ হয়ে যায়। সুতরাং দেখুন হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. সওদা কিনতে বাজারে গেছেন, সম্পূর্ণ দুনিয়ার কাজ, কিন্তু কিভাবে দুনিয়ার বাজার তার অন্তরে আখিরাতের বাজারের কথা জাগ্রত করে দিয়েছে। ফলে নিজের ও ছাত্রের জন্য তা প্রাপ্তির দু'আ করছেন।

জান্নাতের বাজার প্রসঙ্গে

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব রহ. বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাতেও কি বাজার থাকবে? প্রশ্ন জাগার কারণ, আমরা শুনেছি জান্নাতে সবকিছুই মুফ্তে পাওয়া যাবে। আর বাজারে তো বেচাকেনা হয়। কাজেই জান্নাতে বাজার থাকার বিষয়টা অসংগতিপূর্ণ মনে হয় না কি? উত্তরে হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বললেন, সেখানেও বাজার থাকবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, জান্নাতবাসীদের জন্য প্রতি জুমু'আর দিন বাজার বসবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টার

বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে করেন যে, জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে চলে যাবে এবং তারা আপন-আপন ঠিকানায় পৌছে আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করতে থাকবে আর এত অপরিমিত নি'আমত তারা সেখানে লাভ করবে যে, অন্য কোথাও যাওয়ার চিন্তাই তাদের মাথায় আসবে না, এ অবস্থায় হঠাৎ ঘোষণা দেওয়া হবে, সব জান্নাতবাসীকে নিজ নিজ ঠিকানা থেকে বের হয়ে একটি বাজারের দিকে আসার আহ্বান জানানো যাচ্ছে। সে মতে তারা বের হয়ে একটি বাজারে চলে যাবে। সেখানে তারা নানা রকম জিনিসপত্র দেখতে পাবে, বড় চমৎকার, অদ্ভুত, অভূতপূর্ব! তারা এর আগে কখনও তা দেখেনি। সেসব জিনিস দোকানে-দোকানে থরে-থরে সাজানো থাকবে। তবে সেখানে কোনও বেচাকেনা হবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, যার যে জিনিস পসন্দ, তা দোকান থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং জান্নাতবাসীগণ বাজারের এক দিক থেকে দোকানের পর দোকান দেখতে দেখতে অগ্রসর হবে, চমৎকার সব জিনিস দেখে তাদের প্রাণ ভরে যাবে, চোখ জুড়িয়ে যাবে। আর একেক দোকান থেকে তারা তাদের পসন্দমতো জিনিসপত্র তুলে নিতে থাকবে।[১৭২]

জান্নাতে আল্লাহর দরবার

জান্নাতের বাজার থেকে যখন প্রত্যেকের পসন্দমতো জিনিসপত্র তুলে নেওয়া শেষ হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হবে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে চলে আসুন। সেখানে আপনাদের একটি সমাবেশ হবে। বলা হবে আজ সেই দিন, যেদিন দুনিয়ায় থাকাকালে আপনারা নিজ-নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে এক জায়গায় একত্র হতেন এবং সেখানে জুমু'আর নামায আদায় করতেন। আজ জুমু'আর সেই সম্মেলনের বদলে আপনাদের জন্য জান্নাতে সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সম্মেলন হবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে। আপনাদেরকে সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া যাচ্ছে। সেমতে সমস্ত

---

১৭২. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৯ ও ওয়াসফুল-ফিরদাউস, পৃষ্ঠা ৬০

জান্নাতবাসী আল্লাহ তা'আলার দরবারে সেই সম্মেলনে যোগদান করবে। সেখানে প্রত্যেকের জন্য আলাদা কুরসি পাতা থাকবে। কারও কুরসি হবে মনি-মুক্তার তৈরি, কারও কুরসি সোনার এবং কারওটা রুপার। প্রত্যেকের শ্রেণি অনুযায়ী আসন সাজানো থাকবে। যে ব্যক্তি যত উচ্চ শ্রেণির হবে তার কুরসিও তত জমকালো হবে, তবে প্রত্যেকের কাছে আপন-আপন আসন এত মনমতো হবে যে, অন্যের আসন দেখে কারও মনে খেদ জাগবে না যে, আহ! আমার অপেক্ষা অমুকের আসন কত ভালো।! কেননা জান্নাত এমনই এক জগৎ যেখানে শোক-তাপ ও আক্ষেপ-অনুযোগের কোনও ব্যাপার নেই। তাই আরও উন্নতটার প্রতি কারও লোভ জাগবে না। সর্বনিম্নস্তরের জান্নাতবাসীদের জন্য কুরসির আশপাশে মিশ্ক ও আম্বরের স্তূপমতো থাকবে। তার উপর তাদের বসার জন্য আসন পাতা হবে।

আপন আপন আসনে জান্নাতবাসীদের আসনগ্রহণের পালা যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু করা হবে। সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার কালাম আবৃত্তি করা হবে। হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালামকে– যিনি কিয়ামতের শিঙ্গা ফুঁকেছিলেন– হুকুম করা হবে, যেন সকলের সামনে তা আবৃত্তি করে শোনান। তিনি এমন সুরে পবিত্র কালাম আবৃত্তি করবেন, যার সামনে দুনিয়ার সকল সুর-মূর্ছনা তুচ্ছ মনে হবে।

মিশক ও জাফরানের বৃষ্টি

পবিত্র কলাম আবৃত্তির পর আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে যাবে, যেন এখনই বৃষ্টি হবে। সকলেই সেই মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকবে। হঠাৎ জান্নাতবাসীদের উপর তা থেকে মিশ্ক ও জাফরান-গুড়ি ঝরানো হবে। আর তার সুবাসে সেই মহতি মাহ্ফিল আমোদিত হয়ে উঠবে। এমন সুবাস ইতঃপূর্বে তারা কখনও কোথাও পায়নি তো বটেই, কখনও তারা কল্পনাও করেনি।

তারপর আল্লাহ তা'আলার হুকুমে বিশেষ এক ধরনের বায়ু প্রবাহিত হবে। যার ছোয়ায় প্রত্যেকের দেহ-মনে এক অনির্বচনীয় স্ফূর্তি ও

প্রফুল্লতা সঞ্চার হবে। এতে তাদের রূপ-লাবণ্যে নতুন চমক সৃষ্টি হবে। প্রত্যেকের চেহারা ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের সৌন্দর্য আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে উপস্থিত অতিথিদের মাঝে জান্নাতী শরাব পরিবেশিত হবে। সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদ ও বিচিত্র বর্ণের সে শরাব। দুনিয়ার কোনও শরাবের সাথে তার তুলনা চলে না।

জান্নাতের শ্রেষ্ঠ নি'আমত আল্লাহর দীদার

তারপর আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! দুনিয়ায় আমি ওয়াদা করেছিলাম, ঈমান ও সৎকর্মের বিনিময়ে আমি তোমাদেরকে অমুক-অমুক নি'আমত দান করব। বলো তো তোমরা কি সেসব নি'আমত পেয়ে গেছ, না কিছু বাকি আছে? সমস্ত জান্নাতবাসী সমস্বরে বলে উঠবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তার চেয়ে বড় নি'আমত আর কী হতে পারে? আপনি তো সকল ওয়াদা পূরণ করেছেন। আমরা আমাদের সমস্ত আমলের বিনিময় পেয়ে গেছি, আমরা সর্বপ্রকার নি'আমত লাভ করেছি, আমাদের আর কোনও কিছুর চাহিদা নেই। আরাম-আয়েশ, আমোদ-আস্বাদ সব অর্জিত হয়েছে। আর কী নি'আমত বাকি? কিন্তু কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, সেই সময়ও আলেম-উলামা কাজে আসবে। তখন সকলে উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হবে। আপনারাই বলুন এখনও এমন কী নি'আমত অবশিষ্ট আছে, যা আমাদের অর্জিত হয়নি? তারা বলবে, হ্যাঁ এখনও একটি নি'আমত বাকি রয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে তা প্রার্থনা করো। তা হল আল্লাহ তা'আলা দীদার– তাঁকে দেখতে পাওয়া। অনন্তর সমস্ত জান্নাতবাসী এক যোগে বলে উঠবে, হে আল্লাহ! একটি মহানি'আমত এখনও বাকি রয়ে গেছে। আমরা এখনও আপনাকে দেখতে পাইনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, তোমাদের এই নি'আমতটি এখনও বাকি রয়ে গেছে। নাও এবার তোমাদেরকে সেই নি'আমত দ্বারা ধন্য করা হচ্ছে। এই বলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে জান্নাতবাসীদের সামনে প্রকাশ করবেন। নিজ দিদার দ্বারা ধন্য করবেন। আল্লাহ তা'আলার সেই দীদার লাভের পর জান্নাতবাসীদের মনে হবে ইতঃপূর্বে তাদেরকে যত

নি'আমত দেওয়া হয়েছে, এই মহানি'আমতের সামনে তা কিছুই নয়। এর সামনে তা কোনও হিসাবেই আসে না। এর চেয়ে বড় কোনও নি'আমত হতেই পারে না। আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ হবে সেই সম্মেলনের সর্বশেষ উপহার। এর মাধ্যমে দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। তারপর জান্নাতবাসীগণ আপন-আপন ঠিকানায় ফিরে যাবে।[১৭৩]

রূপ ও সৌন্দর্যের বৃদ্ধি

জান্নাতবাসীগণ আপন-আপন ঠিকানায় ফিরে আসলে হূর ও স্ত্রীগণ তাদেরকে দেখে বলবে, ব্যাপার কী? আজ যে তোমাদের রূপ ও সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে। তোমরা তো অনেক বেশি রূপবান হয়ে ফিরে এসেছ! উত্তরে তারা বলবে, আমরাও তো তোমাদেরকে যেমন রেখে গিয়েছিলাম এখন তার চেয়ে অনেক বেশি রূপবতী হয়ে গেছ। তোমাদেরকে অনেক বেশি মোহনীয় দেখা যাচ্ছে! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, উভয় পক্ষের শ্রীবৃদ্ধি মূলত সেই বায়ুস্পর্শেরই ফল, যা আল্লাহ তা'আলা সম্মেলন চলাকালে প্রবাহিত করেছিলেন।[১৭৪]

যাক এটা জান্নাতে জুমাবারের সম্মেলন এবং আল্লাহর দরবারের এক ক্ষুদ্র চিত্রাঙ্কন। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে তাঁর দীদার উপলক্ষ্যে আয়োজিত সে পবিত্র সম্মেলনে তাঁর বান্দাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকেও সে নি'আমতের কিছু অংশ দান করুন। আমীন।

জান্নাতের নি'আমত কী রকম তা কল্পনা করা সম্ভব নয়

আমি পূর্বেই আরয করেছি, জান্নাতের নি'আমত সম্পূর্ণ অনির্বচনীয় অকল্পনীয় বিষয়। ভাষার অলংকারে তা প্রকাশ কিংবা তুলির আঁচড়ে তার

---

১৭৩. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬০৬৭; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৫০৫৭
১৭৪. হাবিল-আরওয়াহ, পৃষ্ঠা ৪১৩

ছবি আঁকা সম্ভব নয়। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা একটি হাদীছে কুদসী'তে ইরশাদ করেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

'আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন নি'আমত তৈরি করে রেখেছি, যা কোনও চোখ দেখেনি, কোনও কান শোনেনি এবং কোনও মানুষের মন তা কল্পনাও করেনি।[১৭৫]

এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেন, জান্নাতের নি'আমতসমূহের নাম তো দুনিয়ার নামের মতই যেমন ফলের নাম আনার, খেজুর ইত্যাদি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা যে কী রকম হবে তা আজ দুনিয়ায় বসে আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তা কী রকমের আনার, কী রকমের খেজুর বা কী রকমের আঙ্গুর হবে তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

বর্ণনায় পাওয়া যায়, জান্নাতে ঘর-বাড়ি থাকবে এবং তা শুনলে আমাদের মনে হয় দুনিয়ার ঘর-বাড়িরই মতো হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়, জান্নাতের ঘর-বাড়ি কেমন হবে, এমনিভাবে কুরআন মাজীদ ও হাদীছ শরীফ দ্বারা জানা যায়, সেখানে শরাব, দুধ ও মধু থাকবে। শুনলে তো মনে হয় দুনিয়ার শরাব, দুধ ও মধুর মতই, যে কারণে আমাদের অন্তরে তার যথাযথ মূল্য ও মর্যাদাবোধ জন্ম নেয় না। অথচ জান্নাতের এসব নি'আমতের স্বরূপ উপলব্ধি করা ইহজগতে বসে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

জান্নাতে কোনও ভয় ও দুঃখ-দুশ্চিন্তা থাকবে না

জান্নাতের অসংখ্য নি'আমতরাজির মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ নি'আমত হল– সেখানে কোনও ভয়-ভীতি ও দুঃখ-দুশ্চিন্তা থাকবে না। না থাকবে অতীত নিয়ে দুঃখ, না ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা। এটা এমনই এক নি'আমত,

---

১৭৫. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৩০০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৫০৫০; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ৩১২১

যা দুনিয়ার পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কল্পনা করা সম্ভব নয়। কেননা দুনিয়ায় আমরা এ নি'আমতের সাথে পরিচিত নই। এখানে এটা দুর্লভই নয়, অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা ইহজগতকে আনন্দ-বেদনা ও সুখ-দুঃখের সমন্বয় করেই বানিয়েছেন। এখানে অবিমিশ্র কোনও সুখ নেই এবং অবিমিশ্র কোনও দুঃখও নেই। প্রত্যেক খুশীর সাথে কোনও না কোনও দুঃখের মিশেল আছে। প্রতিটি আমোদের সাথে আছে কোনও না কোনও তিক্ততা। খাবারের কথাই ধরুন না। খাবার খেতে বসেছেন। খুব স্বাদের খাবার, মজা করেই খাচ্ছেন। কিন্তু যত মজা করেই খান না কেন মনে কিন্তু একটা শঙ্কা লেগেই আছে– পাছে বেশি খেলে বদ হজম হয়ে যায়।

কিংবা আপনি কোনও শরবত পান করছেন। বড় সুস্বাদু। স্বাদ লাগছে বটে, তবে ভয়ও আছে, বেশি পান করলে না বিষম লেগে যায়! এভাবে যে-কোনও আনন্দের সাথেই কোনও না কোনও কষ্ট ও দুঃখ-বেদনা জড়িত থাকেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জান্নাত নামক যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন সেখানে সকল সুখই নিখুঁত, অনাবিল ও অবিমিশ্র। তা সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত। কোনও জান্নাতবাসীর কোনও রকমের ভয় ও দুঃখ থাকবে না। না অতীত নিয়ে দুঃখ, না ভবিষ্যতের ভয়। থাকবে না কোনও ইচ্ছা অপূরণের খেদ। যার মনে যেই ইচ্ছা জাগবে তা অবশ্যই পূরণ হবে।

দুনিয়ায় জান্নাতী নি'আমতের ঝলক

হাদীছ শরীফে আছে, জান্নাতবাসীদের সব মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। কারও কোনও চাহিদা অপূর্ণ রাখা হবে না। কারও ইচ্ছা জাগল অমুক আনারের রস খাবে। তা সে অনায়াসেই খেতে পাবে। এজন্য তার আনার নিংড়িয়ে রস বের করতে হবে না। বরং আনারের জুস আপনিই সামনে হাজির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের এ নি'আমতের একটা ক্ষুদ্র নমুনা দুনিয়াতেও দেখিয়ে দিয়েছেন। বিগতকালে যখন জান্নাতের নি'আমতরাজি সম্পর্কে আলোচনা করা হতো, তখন অনেকের কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হতো। ধরে নিত এসব ভোজবাজি ধরনের কিছু

হবে। অনেকেই এসব বিষয়ে বিশ্বাস আনতে দ্বিধাবোধ করত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিষয়টা পার্থিব একটা ক্ষুদ্র নমুনার মাধ্যমে সকলের দৃষ্টিগোচর করে দিয়েছেন। মানুষ তার অতি সীমিত জ্ঞান ও ততোধিক সীমিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এমন সব কাজ করে দেখাচ্ছে, যে সম্পর্কে শত বছর আগে মানুষকে কিছু বললে তারা বিষয়টা হেসেই উড়িয়ে দিত। শত বছর তো দূরের কথা, আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে যদি বলা হতো, এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হতে যাচ্ছে, যা তোমাদের চিঠিপত্র মিনিটের মধ্যে এখান থেকে আমেরিকায় ও পৃথিবীর কোণে-কোণে পৌছিয়ে দেবে, তবে লোকে এর সংবাদদাতাকে উম্মাদ ঠাওরাত। বলত মিয়া, কোথায় পাকিস্তান আর কোথায় আমেরিকা, উড়োজাহাজ গেলেও তো অন্ততপক্ষে বিশ-বাইশ ঘণ্টা লেগে যায়। এক মিনিটে কিভাবে চিঠি পৌছবে? আল্লাহ তা'আলা ফ্যাক্স ও ট্যালেক্সের আবিষ্কার করিয়ে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে মিনিটের মধ্যে এখানকার চিঠি ওখানে পৌছে যায়। ফ্যাক্স মেশিনের মধ্যে চিঠি ফেলল, আর সেই মুহূর্তে তার কপি আমেরিকার মেশিনের ভেতর থেকে বের হয়ে আসল। মানুষের বুদ্ধি আর কতটুকু, অথচ তারই মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন বিস্ময়কর যন্ত্র আবিষ্কারের তাওফীক দিয়েছেন। সৃষ্ট মানব যখন তার সীমিত বুদ্ধি দ্বারা এমন আশ্চর্য কাজ করতে সক্ষম, তখন তার সৃষ্টিকর্তা, যিনি অসীম শক্তি-প্রজ্ঞার অধিকারী, নিজ বান্দাদের জন্য কেন এমন ব্যবস্থা করতে পারবে না, যার দরুন বান্দা কোনও কিছুর ইচ্ছা করবে আর সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই পারবেন। আমাদের মহান প্রতিপালক সব রকম ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে পবিত্র!

জান্নাত কেবল মুত্তাকীদেরই প্রাপ্য

বস্তুত কোনও সত্য যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টির সামনে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তা অবিশ্বাস্য জ্ঞান করে, কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালাম, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন জ্ঞান দান করেছেন, যা দুনিয়ার অন্য কোনও মানুষকে দান করেননি, আমাদেরকে জান্নাত ও তার নি'আমতরাজি সম্পর্কে সত্য-সঠিক সংবাদ দান করেছেন। তা সম্পূর্ণ

সন্দেহমুক্ত, কোনও সংবাদ তার চেয়ে বেশি সন্দেহমুক্ত হতে পারে না। তাতে বিশ্বাস আনার জন্য চাক্ষুষ দেখার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং জান্নাতও সত্য এবং জান্নাতের নি'আমতরাজিও সত্য। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

ধাবিত হও তোমাদের প্রতিপালকের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রশস্ততা পরিমাণ। তা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।[১৭৬]

জান্নাতের চৌদিকে কাঁটার বেড়া

তবে এই যে আজিমুশ-শান জান্নাত, যাতে এত সব জমকালো নি'আমত, তার চারপাশটা কিন্তু কঠিন বেড়ায় ঘেরা, এক হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

'জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে কঠিন ও অপসন্দীয় বিষয়াবলি দ্বারা।'[১৭৭]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে এমন-এমন জিনিস দ্বারা ঘিরে রেখেছেন, বাহ্যত যা মানুষের কাছে কঠিন ও অপ্রীতিকর মনে হয়। মনে করুন একটি শানদার অট্টালিকা, যার চারপাশটা কাঁটাতারের বেড়া দ্বারা বেষ্টিত। সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করতে হলে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করতে হবে। বেড়া পার হওয়া ছাড়া তাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। অট্টালিকার ভেতর আরাম-আয়েশ ও ভোগ-উপভোগের বিপুল উপকরণ। কিন্তু তা হাসিল করতে হলে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙাতেই হবে, তাছাড়া কোনও বিকল্প নেই। ঠিক এরকমই আলিশান জান্নাতের চারধারে আল্লাহ তা'আলা এমনসব জিনিসের বেড়া খাড়া করে দিয়েছেন, যা মানব মনে অপ্রীতিকর, যাতে মানসিক চাপ পড়ে ও ক্লেশ বোধ হয়। যেমন আল্লাহ

১৭৬. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৩
১৭৭. সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৫০৪৯; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪২৮

তা'আলা বিভিন্ন কাজ ফরয-ওয়াজিব করেছেন। যার মধ্যে নামায সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এ নামায মসজিদে গিয়ে জামাতে আদায় করাই নিয়ম। কিন্তু কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদে চলে যেতে ও নামায আদায়ে রত হতে কেমন যেন কষ্টবোধ হয়। এমনিভাবে বহু কাজ এমন আছে, যা করতে মনে আনন্দবোধ হয়, কিন্তু শরী'আত তা হারাম করেছে। আদেশ করা হয়েছে নিজ দৃষ্টি সংযত রাখো অনুচিত দেখা হতে বিরত থাকো। পর নারীর দিকে তাকিও না, নাজায়েয প্রোগ্রাম দেখ না ইত্যাদি। কিন্তু এসব করতে যেহেতু মনে আনন্দবোধ হয়, তাই এর থেকে বিরত থাকা কষ্টকর। মন তো চায় এসব করতে, কিন্তু শরী'আতের নিষেধ। এটাই হচ্ছে কাঁটাতারের বেড়া! জান্নাতের চারধার এ বেড়া দ্বারা বেষ্টিত, এমনিভাবে বন্ধুবান্ধবের সাথে বসে আছেন। মন চাচ্ছে ঝাঁপি খুলে তার কুৎসা গাইতে। কিন্তু শরী'আতে বারণ–অন্যের গীবত করা যাবে না, পরচর্চা হতে জিহ্বা হেফাজত করো। এই হল কাঁটার বেড়া। জান্নাত হাসিলের আশা থাকলে এ বেড়া পার হতে হবে। অর্থাৎ মনের যতই অপ্রিয় হোক, শরী'আতের বিধান মানতে হবে। তাছাড়া জান্নাত লাভ সম্ভব নয়। এটাই আল্লাহ তা'আলার নীতি।

জাহান্নামের চারপাশে আমোদ-প্রমোদের বেড়া

ওই হাদীছেরই প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে–

حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

'জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে আমোদ-প্রমোদ দ্বারা।'[১৭৮]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের চারধারে আকর্ষণীয় বস্তুরাজি ও মনমাতানো বিষয়াবলির বেড়া দিয়ে রেখেছেন। মন সে দিকে বড় ধাবিত হয়। কিন্তু তার ভেতরে আগুন আর আগুন। ওই আকর্ষণ ও প্ররোচনার ফাঁদে পড়ে কেউ যদি তাতে লিপ্ত হয়, মন আনন্দ পায় বলে তাতে মগ্ন হয়, তবে তার পরিণতি হবে জাহান্নাম।

---

১৭৮. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬০০৬; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪৮৩; সুনানুন-নাসাঈ, হাদীছ নং ৩৭০৩

যা হোক, কথা হচ্ছিল, জান্নাত ও জান্নাতের নি'আমত সম্পর্কে। তো জান্নাতের চারধার কাঁটার বেড়াবেষ্টিত, কিন্তু আল্লাহ বড় মেহেরবান। কেউ যদি হিম্মত করে সেই বেড়া ডিঙাতে চায়, তবে তিনি তার জন্য সেই কাঁটাকে কুসুমে পরিণত করেন। সে কাঁটা ততক্ষণই কাঁটা হয়ে থাকে, যতক্ষণ তুমি তা দূর থেকে দেখবে। তুমি যতক্ষণ তার কাঁটা হওয়ার বিষয়টাকে কল্পনা করে দূরে-দূরে থাকবে এবং কষ্টদায়ক ভেবে গা বাঁচিয়ে চলবে, ততক্ষণ এ বেড়া ডিঙানো কঠিন বোধ হবে। কিন্তু একবার যখন স্থির সংকল্প হয়ে কাজ শুরু করে দেবে, দেখবে সহজেই তা উৎরাতে পারছ। অন্তরে হিম্মত জাগ্রত করো। আমাকে এ বেড়া ডিঙাতেই হবে– এই প্রতিজ্ঞায় নিজেকে আবদ্ধ করো। কল্পনা করো ওই কাঁটার পেছনে আছে পুষ্পোদ্যান, তা ফল-ফুলে ভরা, তাতে বিপুল নি'আমতের সমাহার, আমাকে এই বেড়া পার হয়ে সেই সুখের কাননে পৌঁছাতেই হবে– ইনশাআল্লাহ এই হিম্মত নিয়ে অগ্রসর হলে কৃতকার্যতা আসবেই। এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যে পথ চলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কাঁটাকেও ফুল বানিয়ে দেন, পথের বাধা অপসারিত করে দেন। ফলে সহজেই সে মনজিলে মাকসাদে পৌঁছে যায়।

এক সাহাবীর প্রাণ বিসর্জন

এক সাহাবী জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি দেখতে পেলেন, শত্রু বাহিনী বিপুল বিক্রমে মুসলিমদের উপর চড়াও হচ্ছে। তাদের থেকে প্রাণ রক্ষার পথ নেই। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে প্রাণ রক্ষার তাগিদ নয়; বরং তার রক্তে কলরোল উঠল প্রাণ বিলানোর উদ্দীপনায়। তখন তার মুখ থেকে শোনা যাচ্ছিল স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ–

غَدًا نَلْقِى الْأَحِبَّةَ

مُحَمَّدًا وَصَحْبَهٗ

'আগামীকাল মিলিত হব বন্ধুদের সাথে–মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের সাথে।'

চিন্তা করে দেখুন, সেখানে চলছিল আগুন ও রক্তের খেলা। দেখা যাচ্ছিল ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত গলাকাটা লাশের তড়পানি। প্রাণ রক্ষার গরজই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠার কথা এবং এটাই স্বাভাবিক যে, প্রাণ বিসর্জনই হবে সেখানে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। কিন্তু মহান সেই সাহাবীকে দেখছি ভিন্ন দৃশ্যে। তিনি প্রাণ বিসর্জনের মতো সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজকেই আনন্দে বরণ করে নিচ্ছেন। হাদীছ শরীফে আছে, আল্লাহর পথের মুজাহিদ যখন শহীদ হতে শুরু করে এবং মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়, তখন তার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা পিপঁড়ের কামড়ের চেয়েও বেশি সহনীয় হয়ে যায়।[১৭৯]

কী এর রহস্য? প্রকৃত ব্যাপার ওইটাই যা আগে বলা হয়েছে। আল্লাহর পথে প্রণোৎসর্গ করার কাজটি ছিল জান্নাতের বেড়া-কঠিন কাঁটাতারের বেড়া। জান্নাতে পৌঁছতে হলে এ বেড়া টপকাতে হতো। কাজটি কঠিন বটে, কিন্তু যেই না বান্দা স্থিরসংকল্প হয়ে গেছে এবং চিন্তা করেছে–

جان دی ہوئی اسی کی تھی

تو یہ حق ہے کہ حق ادا نہ ہوا

'এ প্রাণ তো আল্লাহর দেওয়া। সত্য বটে, তাঁর পথে এ প্রাণ উৎসর্গ করলেও তো তাঁর সে দানের যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হবে না।'

বান্দা এই সংকল্প ও এই চিন্তা-চেতনার সাথে যখন সামনে অগ্রসর হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা কাঁটাকে ফুল বানিয়ে দেন। যদি বিছানায় শুয়ে মারা যেত, না জানি কত কষ্ট হতো, যন্ত্রণায় ছটফট করতে হতো এবং বেদম টানাহেঁচড়ার পর জান বের হতো। কিন্তু আল্লাহর পথের সৈনিক যখন শাহাদাতের বাসনায় উদ্দীপিত হল এবং প্রাণদানের মতো কঠিন কাঁটার বেড়া ডিঙানোর চেষ্টায় নেমে পড়ল, তখন আল্লাহ তা'আলা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফলে প্রাণ ত্যাগের কঠিন যাতনাকে পিপঁড়ের কামড় অপেক্ষাও বেশি সহনীয় করে দিলেন।

---

১৭৯. সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ১৫৯১

দুনিয়াদারদের নিন্দা-কটাক্ষে কান দিও না

বলছিলাম যে, এ কাঁটাও এমন, যা কেবল দূর থেকে দেখলেই কাঁটা মনে হয়। কেউ যদি দৃঢ় মনোবল নিয়ে সামনে অগ্রসর হয় এবং কাঁটার আচড় খেয়ে হলেও বেড়া ডিঙাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সে কাঁটা আর কাঁটা থাকে না, পুষ্পে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং আমরা যে চিন্তা করি দ্বীনের উপর চলা বড় কঠিন, অমুক হুকুম যদি পালন করি বা অমুক গুনাহ থেকে যদি বাঁচতে চাই, তবে তা সহজ হবে না, অনেক কষ্ট-ক্লেশ করতে হবে, তাছাড়া সমাজই বা কী বলবে, সেও একটা বাড়তি যন্ত্রণা, লোকে বলবে, বেশ তো হুজুর হয়ে গেছে, মান্ধাতার আমলে ফিরে গেছে কিংবা বলবে এ লোক সৃষ্টি ছাড়া, এ সমাজে অচল এবং নানাবিধ কত কথা, কত নিন্দা-সমালোচনা। কিন্তু মনে রাখতে হবে। এসবই কাঁটা। জান্নাতের চার ধারে যে কাঁটার বেড়া দেওয়া আছে, এসব সে কাঁটারই অংশ। তুমি যদি একবার হাসিমুখে এসব কাঁটা বরণ করে নাও আর তাদেরকে ধীর-শান্তভাবে বলে দাও, হ্যাঁ, আমরা হুজুর বটে এবং আমরা পশ্চাদগামী। কিন্তু আমরা এমন পশ্চাদগামী, যাদের দৃষ্টি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের দিকে। তোমরা একবার যদি এমন কৃতসংকল্প হতে পারো, বিশ্বাস করো এসব কাঁটা তোমাদের জন্য ফুল হয়ে যাবে।

দ্বীনের অনুসরণের মধ্যেই সম্মান নিহিত

আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়াতেই দেখিয়ে দেন যারা দ্বীনদারদের নিন্দা ও কটাক্ষ করে, একসময় তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। পরিশেষে সম্মান তারাই লাভ করে, যারা আল্লাহ তা'আলার বশ্যতা স্বীকার করে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুনাফিকরাও মুমিনদেরকে এ জাতীয় কটাক্ষ করত। তারা বলত আমরা সম্মানী লোক আর মুসলিমগণ হীন। এক সফরে তারা মুমিনদের সম্পর্কে এরকম বলছিল। আরও বলছিল, মদীনায় ফিরে নেই। আমরা অভিজাতরা ওই

ছোট লোকদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেব– (নাউযুবিল্লাহ)। এভাবে তারা মুসলিমদেরকে হীন ও নীচ বলে কটাক্ষ করত। তার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۝

অর্থাৎ সম্মান তো কেবল আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা (প্রকৃত অবস্থা) অবগত নয়।[১৮০]

জান্নাতের চারধারে কাঁটা অবশ্যই আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা পরীক্ষার কাঁটা। তুমি যখন তার দিকে এগুতে এগুতে কাছে পৌছে যাবে, আল্লাহ তা'আলা সে কাঁটাকে ফুল বানিয়ে দেবেন। তারপর এতদিন যে ইবাদত তোমার কাছে কষ্টসাধ্য মনে হতো, এখন থেকে তাতে তুমি আনন্দ পাবে। তোমার কাছে তা এমনই সুখকর হয়ে উঠবে যে, দুনিয়ার আর কিছুতেই সেই সুখ পাবে না। তাই তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

قُرَّةُ عَيْنِى الصَّلَاةُ.

'নামায আমার পক্ষে নয়ন প্রীতিকর।'[১৮১]

অর্থাৎ এমনিতে তো নামায একটি ইবাদত এবং শ্রেষ্ঠ ইবাদত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য তার ভেতর এমন আস্বাদ রেখেছেন, দুনিয়ার সকল আস্বাদ তার সামনে তুচ্ছ।

গুনাহ পরিহারের কষ্ট

এমনিভাবে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও বেশ কষ্টকর। মনের উপর বড় চাপ পড়ে। কিন্তু যত বড় চাপ পড়ুক না কেন, কেউ যখন গুনাহ ছাড়তে প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং হিম্মত নিয়ে বলবে, আমি আল্লাহ তা'আলার জন্য মনের এসব চাহিদা কুরবানী করছি, তখন প্রথম দিকে কষ্টবোধ হলেও এক পর্যায়ে মনের চাহিদা দলন করতেই আনন্দবোধ

---

১৮০. সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ৮

১৮১. সুনানুন-নাসাঈ, হাদীছ নং ৩৮৭৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৫৩৬৩

হবে। বান্দা যখন কল্পনা করে আমি মনের কামনা-বাসনা আমার মালিকের জন্য দমন-দলন করছি, আমার স্রষ্টা ও মুনিবের জন্য তা কুরবানী করছি, তখন এর ভেতর সে যারপরনাই সুখ ও আনন্দবোধ করে থাকে।

দেখুন, এক মা তার শিশু সন্তানের জন্য কী পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করে। শীতের রাত। শিশু সন্তানের সাথে একই লেপের নিচে ঘুমিয়ে আছে। এ অবস্থায় শিশুটি পেশাব-পায়খানা করে দিল। টের পাওয়া মাত্র মা লেপ ছেড়ে উঠে পড়ে। আরাম ও উষ্ণ বিছানা থেকে নেমে আসে। নিজের আরামের চেয়ে শিশুর পরিচর্যাই এখন তার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জলদি তার কাপড় পাল্টে দেয়। তার বিছানা ও কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলে। শীতের ভেতর নিজের ঘুম নষ্ট করে আরামের বিছানা ছেড়ে এসব কাজ করা কতই না কষ্টকর। কিন্তু হাজার কষ্ট সত্ত্বেও মা তা ঠিকই করে। একটুও আলস্য করে না। তবে কি তার কষ্ট হয় না? কষ্ট নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু সে যখন চিন্তা করে আমি তো এটা আমার সন্তানের জন্য করছি, আমার প্রাণের ধন, কলিজার টুকরার জন্য করছি, তখন এই কষ্টের ভেতরই সে এক অনির্বচনীয় সুখ অনুভব করে। সমস্ত কষ্ট ক্লেশ ছাপিয়ে তার দেহ-মন সেই সুখেরই অনুরণন হতে থাকে। কেউ যদি সেই মা'কে বলে, তোমার তো বড় কষ্ট। এই এক রত্তি শিশুর জন্য তোমার রাত জাগতে হচ্ছে। শীতের কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে এবং আরও কত ঝক্কি-ঝামেলা। তার চেয়ে এ বাচ্চা কেউ নিয়ে যাক। তোমার আরাম হবে। কষ্ট-ক্লেশের অবসান হবে। কী মনে করেন, এ কথায় কি মা খুশী হবে? কক্ষনো না। সে বলবে, এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি কষ্ট করতে আমি প্রস্তুত, তবুও আমার দুলাল আমার কোলেই থাকুক। কেন সে এরকম বলবে? কারণ স্পষ্ট। সে তার সন্তানকে ভালোবাসে। সেই ভালোবাসর কারণে তার জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর কাজের জন্যও সে প্রস্তুত। কেবল প্রস্তুতই নয়, যত কষ্টেরই হোক না কেন সেই কাজের ভেতর সে এক অবর্ণনীয় সুখ ও তৃপ্তিবোধ করে। ঠিক এরকমই কোনও বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহপ্রেম সঞ্চারিত হয়, তখন সে আল্লাহর পথে নিজ কামনা-বাসনা চূর্ণ করার ভেতর এমন সুখ ও তৃপ্তি বোধ করে, যা সেই কামনা চরিতার্থে করার ভেতর বোধ হতো না।

জান্নাত ও আখিরাতের ধ্যান

যা হোক, এখানে জান্নাতের নি'আমত সম্পর্কে অতি সামান্যই আলোচনা করা হল, কুরআন মাজীদ এ সংক্রান্ত আলোচনায় আকীর্ণ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীছে জান্নাতের সুখ-শান্তি বিবৃত করেছেন। এসব বিবৃত করার উদ্দেশ্য মানুষকে আখিরাত ও জান্নাতের প্রতি আগ্রহী করে তোলা, যাতে মানুষ তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে এবং জান্নাতের চারধারে যে কাঁটার বেড়া আছে তা অতিক্রম করতে সচেষ্ট থাকে। এর জন্য বুযুর্গানে দ্বীন এই নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন যে, আখিরাতের অবস্থাদি এবং কুরআন হাদীছে জান্নাতের যেসব নি'আমতের কথা বর্ণিত হয়েছে তা মাথায় এনে কিছুক্ষণ চিন্তা ও ধ্যান করবে। নিয়মিত এটা করতে থাকলে অন্তর আখিরাত ও জান্নাতমুখী হয়ে উঠবে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. তাঁর মাওয়ায়েয-এ বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কিছুক্ষণ আখিরাতের কথা চিন্তা করা এবং বিশেষভাবে জান্নাতের নি'আমতরাজি কল্পনা করা। প্রতিদিন একটা সময় নির্দিষ্ট করে এই মুরাকাবা ও ধ্যান করবে যে, আমি এ দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছি। আমাকে কবরে দাফন করা হয়েছে। মানুষজন আমাকে কবরে রেখে চলে গেছে। এভাবে আমি বরযখে (দুনিয়া ও আখিরাতে মধ্যবর্তী জগতে) চলে গেলাম। তারপর আখিরাত শুরু হয়ে গেল। এখানে হিসাব-কিতাব চলছে। মীযান (তুলাদণ্ড) স্থাপিত আছে। পুলসিরাত দেখা যাচ্ছে। তার একদিকে জান্নাত, অন্যদিকে জাহান্নাম। জান্নাতে এই-এই নি'আমত আছে আর জাহান্নামে এই-এই শাস্তি। এভাবে কিছুক্ষণ বসে এসব বিষয় ধ্যান ও চিন্তা করবে।

এ ধ্যান করার প্রয়োজন এ কারণে যে, আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিষয়কর্মে ব্যস্ত থাকি। ফলে আখিরাতের জগৎ সম্পর্কে গাফিল হয়ে যাই। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এ বিশ্বাস তো আছেই যে, দুনিয়া থেকে একদিন বিদায় নিতে হবে এবং আখিরাতের জগতে চলে যেতে হবে। কিন্তু কেবল এই বিশ্বাস ও আকীদাই যথেষ্ট নয়। আমলের জন্য সেই বিশ্বাস মন ও মননে জাগ্রত রাখাও জরুরি। তা জাগ্রত থাকলেই

মানুষ ইবাদত আনুগত্যে অনুপ্রাণিত হয় এবং গুনাহ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার শক্তি পায়। এজন্যই কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করে আখিরাতের মুরাকাবা ও ধ্যান করবে। নিয়মিত তা করলে ইনশাআল্লাহ আখিরাত আর বিস্মরণ হবে না, অন্তরে জাগ্রত হয়ে থাকবে।

দুনিয়ার কাজ কর্মের ভেতর থাকলে, মনের মধ্যে পরকাল জাগরুক থাকলে, তা তোমাকে ইবাদত-আনুগত্যে উৎসাহী করবে এবং গুনাহ থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে। কুরআন-হাদীছে জান্নাতের নি'আমতরাজি বর্ণনার উদ্দেশ্য এটাই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে আমাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বপ্ন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبَشَّرَاتُ قَالُوْا وَمَا الْمُبَشَّرَاتُ ؟ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নবুওয়াতের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন 'মুবাশশিরাত' ছাড়া নবুওয়াতের কোনও অংশ বাকি নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুবাশ্‌শিরাত কী? তিনি বললেন, সত্যস্বপ্ন।'[১৮২]

'মুবাশশিরাত' অর্থ সুসংবাদদানকারী জিনিস। সত্যস্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা হয়ে থাকে আর এটা নবুওয়াতের

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৮৯-১০২

১৮২. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬৪৭৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২২৬৭৯; মুআত্তা মালিক, হাদীছ নং ১৫০৬

একটা অংশ। অপর এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ.

'সত্যস্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিতম ভাগের এক ভাগ।'[১৮৩]

সত্য-স্বপ্ন নবুওয়াতের অংশ

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় ঘনিয়ে আসলে প্রথমেই ওহী নাযিল না করে ছয় মাস পর্যন্ত তাঁকে সত্যস্বপ্ন দেখানো হতে থাকে। হাদীছে আছে তিনি যখনই কোনও স্বপ্ন দেখতেন, জাগ্রত হওয়ার পর স্বপ্নে দেখা সেই ঘটনা সত্যিই ঘটে যেত আর এভাবে তাঁর প্রতিটি স্বপ্ন সত্য হয়ে দেখা দিত। ঠিক ভোরের আলোর মতো সত্য। টানা ছয় মাস তাঁকে সত্যস্বপ্ন দেখানো হতে থাকে। অবশেষে ওহী নাযিলের ধারা সূচিত হয়।[১৮৪]

নবুওয়াত লাভের পর তিনি তেইশ বছর ইহজীবন যাপন করেন। তেইশ বছরের মধ্যে ছয় মাস অর্থাৎ আধা বছর ছিল সত্যস্বপ্নের কাল, যা সর্বমোট নবুওয়াতী জীবনের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এ হিসেবেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'সত্যস্বপ্ন' নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ তাঁর নবুওয়াতী জীবনকে ছেচল্লিম ভাগ করলে তার এক অংশ দাঁড়ায় স্বপ্নের কাল, যখন তিনি শুধু স্বপ্নই দেখতেন, তখন কোনও ওহী নাযিল হয়নি। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন 'সত্যস্বপ্ন' নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ, এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, সত্যস্বপ্নের এ ধারাবাহিকতা আমার পরেও বলবৎ থাকবে। মুমিনদেরকে সত্যস্বপ্ন দেখানো হবে এবং তার মাধ্যমে তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হবে। অপর

---

১৮৩. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬৪৭৭২; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪২০১; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২১৯৭; সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৩৬৪

১৮৪. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬৪৯৯

এক হাদীছে আছে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে মুসলিমদের অধিকাংশ স্বপ্নই সত্য হবে।

এর দ্বারা বোঝা গেল, স্বপ্নও আল্লাহ তা'আলার একটি নি'আমত, যেহেতু তা দ্বারা মানুষকে সুসংবাদ দেওয়া হয়। কাজেই স্বপ্নযোগে কোনও সুসংবাদ লাভ করলে সেজন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা চাই।

স্বপ্ন সম্পর্কে দু'টি মত

কিন্তু মানুষের মধ্যে স্বপ্নের ব্যাপারে বিপরীতধর্মী দুই প্রান্তিক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। কিছুলোক তো এমন, যারা স্বপ্নকে স্বীকারই করে না। তারা স্বপ্নের কোনও অর্থ আছে বলে মনে করে না। যে কারণে তারা তার ব্যাখ্যাও মানে না। এটা ভ্রান্ত ধারণা। কেননা সদ্য হাদীছ শোনানো হল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যস্বপ্নকে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলেছেন এবং তিনি আরও বলেছেন যে, সত্যস্বপ্ন সুসংবাদ দান করে।

অপরদিকে কিছু লোক এমনও আছে, যারা সর্বদা স্বপ্নের পেছনে পড়ে থাকে এবং স্বপ্নকেই মুক্তির চাবিকাঠি ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি মনে করে। কেউ কোনও ভালো স্বপ্ন দেখে ফেললে তাকে আকাশে তুলে নেয় এবং তার ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে যায়। আবার নিজের সম্পর্কে স্বপ্ন দেখলে নিজেরই ভক্ত হয়ে যায় আর ভাবে এখন তো আমি অনেক বড় বুযুর্গ হয়ে গেছি।

এ স্বপ্ন তো হয় ঘুমের ভেতর। কখনও জাগ্রত অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে কোনও কোনও জিনিস দেখিয়ে দেন। তাকে কাশফ বলে। এ ব্যাপারে তো আরও বেশি বাড়াবাড়ি। কারও কাশফ হলে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাকে কিছু দেখিয়ে দিলে তো আর কথাই নেই। সেই এখন সবকিছু। সবার বড় বুযুর্গ। তাতে সে সুন্নতের অনুসরণ করুক বা নাই করুক।

মনে রাখতে হবে স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ শ্রেষ্ঠত্বের কোনও মাপকাঠি নয়। আসল মাপকাঠি হল সুন্নতের অনুসরণ ও শরী'আত অনুযায়ী চালচলন। দেখতে হবে জাগ্রত অবস্থায় সে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকছে কি না। সে আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে চলে কি না। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য না করলে তার স্বপ্নে কিছু যায় আসে না। সে হাজারও স্বপ্ন দেখুক, কাশ্‌ফ লাভ করুক, হাজারও কারামত ও অলৌকিক ঘটনা তার দ্বারা প্রকাশ পাক, তার বিশেষ কোনও মর্যাদা নেই। এসব জিনিস মর্যাদার মাপকাঠি নয় আদৌ। হাল আমলে এসবের ভিত্তিতে মানুষ ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করছে। পীর-মুরিদীর জন্য এটাকে অপরিহার্য মনে করছে। মানুষ সারাক্ষণ স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ-কারামতের পেছনে পড়ে থাকে। এটা চরম বাড়াবাড়ি।

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বপ্নের মর্যাদা

হযরত মুহাম্মাদ ইবন সীরীন রহ. একজন উচ্চস্তরের তাবিঈ ও বুযুর্গ। স্বপ্ন ব্যাখ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, বরং গোটা উম্মতের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় স্বপ্নবিশারদ সম্ভবত আর কেউ জন্ম নেয়নি। আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নব্যাখ্যার এক বিশেষ দক্ষতা ও যোগ্যতা তাঁকে দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বহু ঘটনা আছে, যা অত্যন্ত বিস্ময়কর, চমকপ্রদ। স্বপ্ন সম্পর্কে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি আছে। উক্তিটি অতি মূল্যবান ও স্মরণীয়। স্বপ্নের মর্যাদা নিরূপণে এর চেয়ে সুন্দর, সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বাক্য কিছু হতে পারে না। তিনি বলেন,

اَلرُّؤْيَا تَسُرُّ وَلَا تَغُرُّ.

'স্বপ্ন যেন আনন্দই দেয়, ধোঁকায় না ফেলে।' অর্থাৎ স্বপ্ন এমন এক জিনিস, যা সুসংবাদ হওয়ার কারণে মানুষের পক্ষে আনন্দদায়ক, কিন্তু সাবধান, স্বপ্ন দেখে কেউ যেন এই ধোঁকায় না পড়ে যে, এখন তো আমি অনেক উচ্চস্তরে পৌছে গেছি, বুযুর্গ হয়ে গেছি, কাজেই এখন আর আমলের বিশেষ প্রয়োজন নেই। এভাবে স্বপ্ন দেখার ফলে কেউ যেন শরী'আতের অনুসরণ থেকে গাফেল না হয়ে যায়।

হযরত থানভী রহ.-ও স্বপ্নের ব্যাখ্যায় খুব পারদর্শী ছিলেন। মানুষ স্বপ্ন দেখলেই তাবিরের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তাবির দিতে গিয়ে এই বয়েতটি পড়তেন–

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم
ہمہ آفتاب گفتند ہمہ افتاب گویم

'আমি তো রাত নই, না রাতের পূজারী যে, স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করব। আমার সম্পর্ক হল সূর্যের সাথে, অর্থাৎ নবুওয়াত ও রিসালাতের সূর্য মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। তাই আমি কেবল তাঁরই কথা বলি।'

যা হোক কথা এটাই যে, স্বপ্নই সবকিছু নয়। স্বপ্ন যত ভালোই হোক, তা শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গীর মাপকাঠি নয়। ভালো স্বপ্ন দেখলে সুসংবাদবাহী হিসেবে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা চাই। হতে পারে কখনও আল্লাহ তা'আলা তার বরকত দান করবেন।

আমার মহান পিতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. সম্পর্কে বহু লোক স্বপ্ন দেখেছেন, খুবই উচ্চস্তরের স্বপ্ন। যেমন কেউ বলেছেন, তিনি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেছেন আর তখন তাঁর আকৃতি ছিল আমার পিতার মতো। এরকম আরও বহু স্বপ্ন। কেউ যখন এ জাতীয় স্বপ্নের কথা লিখে তাঁর কাছে পাঠাত, তিনি তার সংরক্ষণ করে রাখতেন। 'মুবাশ্‌শিরাত' নামে তাঁর একটি রেজিষ্টার ছিল। তিনি তাতে এসব স্বপ্ন টুকে রাখতেন। একটি রেজিষ্টারের প্রথম পৃষ্ঠায় নিজ হাতে নোট লিখেছেন যে,

'এই রেজিষ্টারে আমি সেইসব স্বপ্ন বৃত্তান্ত লিখে রাখছি, যা আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাগণ আমার সম্পর্কে দেখেছেন। লিখে রাখছি এ কারণে যে, আর যাই হোক না কেন, এগুলো মুবাশশিরাত তো বটে, যা শুভ ইংগিত বহন করে। হয়তো এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সংশোধন করে দেবেন। কিন্তু এটা যে-কেউ পড়বে আমি সাবধান করছি, এতে যেসব স্বপ্ন উদ্ধৃত হবে, তাকে যেন শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি মনে না

করে। মনে রাখতে হবে এটা বিশেষ কোনও ফযীলতের বিষয় নয়। কাজেই এর ভিত্তিতে আমার সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। জাগ্রত অবস্থার কথা ও কাজই আসল মাপকাঠি। সুতরাং স্বপ্নের কারণে কেউ যেন বিভ্রান্তিতে না পড়ে।

তিনি এই সর্তকবাণী লিখেছেন এই উদ্দেশ্যে, যাতে কেউ তা পড়ে বিভ্রান্তির শিকার না হয়। ব্যাপার কেবল এতটুকুই যে, ভালো স্বপ্ন দেখলে তাকে সুসংবাদবাহী মনে করে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে এবং দু'আ করবে, হে আল্লাহ! এটাকে আমার জন্য বরকতপূর্ণ করে দিন। কিন্তু স্বপ্নকে মাপকাঠি বানানো যাবে না। কাজেই স্বপ্ন দেখে যেন কেউ নিজের বা অন্যের ব্যাপারে বিভ্রান্ত না হয় যে, এটা তার বুযুর্গীর প্রমাণ। ব্যস এই এতটুকুই স্বপ্নের হাকীকত।

এই স্বপ্ন সম্পর্কে আরও দু'তিনটি হাদীছ আছে। অধিকাংশ লোক তার প্রকৃত মর্ম ও ব্যাখ্যা জানে না, যে কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে। সেই হাদীছগুলোও ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে।

শয়তান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপ ধারণ করতে পারে না

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ.

'যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল, সে আমাকেই দেখল। কেননা শয়তান আমার রূপ ধরতে পারে না।'[১৮৫]

অর্থাৎ হাদীছ শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আকার-আকৃতি বর্ণিত হয়েছে, কেউ স্বপ্নে তাঁকে সেই আকৃতিতে দেখলে বুঝতে হবে অন্য কাউকে নয়; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১৮৫. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ১০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪২০৬; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২২০৬; সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৩৬৯

ওয়াসাল্লামকেই দেখেছে। কেননা শয়তান যে তাঁর আকৃতি ধরে কাউকে ধোঁকা দেবে এটা সম্ভব নয়। এটা শয়তানের সাধ্যাতীত। এভাবে এ হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নদর্শনে তাঁর বিশেষত্ব তুলে ধরেছেন।

স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ

প্রকাশ থাকে যে, স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাওয়াটা একটা মহাসৌভাগ্য। এটা আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় দান। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বহু বান্দাকে এ সৌভাগ্য দান করেছেন। তাঁর রহমতে অনেকেই স্বপ্নযোগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করেছে। তবে এ ব্যাপারে আমাদের বুযুর্গদের মনোভাব এক রকম নয়। অর্থাৎ স্বপ্নযোগে তাঁকে দেখার জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টা করা হবে কিনা? দেখা যায় অনেকে এ সৌভাগ্য লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে থাকে। এমন কিছু আমল ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, যা দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা পাওয়া যায়। বুযুর্গগণ এমন কিছু পদ্ধতি শিক্ষাও দিয়েছেন। যেমন, জুমু'আর রাতে এত বার দরূদ শরীফ পড়ার পর এই-এই আমল করে ঘুমাবে। তাহলে স্বপ্নযোগে তাঁর দেখা পাবে বলে আশা করা যায়। এ জাতীয় বহু প্রক্রিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তো অনেক বুযুর্গের মনোভাব এই প্রচেষ্টার অনুকূলে। কাজেই কেউ যদি তাঁদের মনোভাব অনুযায়ী স্বপ্নযোগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাওয়ার কোনও প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, তবে তা করতে পারে। যেহেতু তার সাক্ষাত লাভ করাটা একটা মহানসৌভাগ্য, তাই এ সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা দোষের কিছু নয়।

আবার বুযুর্গানে দ্বীনের অনেকের মনোভাব এর বিপরীত। আমার মহান পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর কথাই ধরুন না। তিনি এ ব্যাপারে কোনও প্রক্রিয়া গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর কাছে

জনৈক ব্যক্তির যাতায়াত ছিল। একবার সে এসে বলল, মনে বড় আগ্রহ, স্বপ্নযোগে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা পেতাম! আপনি আমাকে কোনও আমল শিখিয়ে দিন, যার বদৌলতে আমি এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারব। আমার ওয়ালিদ সাহেব রহ. বললেন, ভাই, তোমার তো অনেক বড় হিম্মত! আমার অত বড় হিম্মত হয় না। কোথায় আমি, আর কোথায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার মহিমা! তাই এই তামান্না করার হিম্মতই হয় না। সংগত কারণেই কখনও এ জাতীয় প্রক্রিয়া শেখা হয়ে ওঠেনি বা শেখার কথা মাথায়ও আসেনি, যা দ্বারা স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সম্ভাবনা আছে।

এর একটা বড় কারণ হল, যদি স্বপ্নযোগে সাক্ষাত লাভ হয়ে যায় তবে তার আদব, হক ও দাবি কিভাবে আদায় করব এবং কতটুকু আদায় করতে পারব? তাই নিজের থেকে এটা অর্জনের চেষ্টা করিনি। তবে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে যদি কাউকে এই মহানসৌভাগ্য দান করেন, তবে সন্দেহ নেই এটা তাঁর অনেক বড় দান। আর তিনি নিজেই যদি এটা দান করেন, তবে এর হক ও দাবি আদায়ের তাওফীকও দেবেন বৈকি! কিন্তু নিজের থেকে এটা চাওয়ার সাহস হয় না। বাকি মনের সুপ্ত বাসনার ব্যাপারটা ভিন্ন। একজন মুমিনের অন্তরে তাঁকে স্বপ্নে দেখার বাসনা থাকাটা তো খুবই স্বাভাবিক। অন্যদের মতো আমার অন্তরে সে বাসনা আছে বৈকি! কিন্তু তার জন্য চেষ্টা করাটা একটা হিম্মতের ব্যাপার। আমার সেই হিম্মত নেই। যা হোক এ ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনের দু'রকম মনোভাব ও দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গিই আছে।

আমি আমার মহান পিতার এ ঘটনাও আপনাদেরকে শুনিয়েছি যে, তিনি যখন রওযা মুবারকে হাজির হতেন, তখন পবিত্র রওযার জাফ্‌রি পর্যন্ত পৌছতেই পারতেন না। সব সময় দেখেছি, জাফরির সামনে যে স্তম্ভ আছে, তার সাথে লেগে দাঁড়াতেন। আর কখনও জাফরির সোজাসুজি দাঁড়াতেন না। বরং সেখানে কোনও লোক দাঁড়ানো থাকলে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেন।

একদিন তিনি নিজেই বললেন, একদা আমার অন্তরে এই ধারণা জন্মাল যে, তুই বড় হতভাগা। ওই যে আল্লাহর বান্দাগণ জাফ্‌রির কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে, তুই তো তা পারিস না! মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত বেশি নৈকট্য লাভ করা যায় ততই তো ভালো এবং তা অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। মনে তো এই ভাবনা আসল। কিন্তু আমি কী করব, কদম যে সামনে এগোয়ই না। এটা হতভাগ্যের বিষয়ও হতে পারে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এসব ভাবনায় ডুবে ছিলাম আর এ অবস্থায় সহসাই অনুভূত হল, যেন রওযা মুবারক থেকে আওয়াজ আসছে–

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নত অনুযায়ী চলে, সে আমার
নিকটবর্তী, তা সে হাজার মাইল দূরেই থাকুক না কেন।
আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের অনুসরণ করে না, সে
আমার থেকে দূরে, তা সে আমার জাফ্‌রির
সাথে এঁটেই থাকুক না কেন।"

জাগ্রত অবস্থার আমলই আসল জিনিস

মোটকথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করাটাই প্রকৃত সম্পদ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার তাওফীক দান করুন, আমীন। জাগ্রত অবস্থায় তাঁর সুন্নত অনুসারে চলার তাওফীক লাভ হলে তার মতো সম্পদ আর হতে পারে না। এটাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত নৈকট্য। যদি সুন্নাতের উপর আমল না থাকে, আর এ অবস্থায় রওযা মুবারকের জাফ্‌রি বরাবর গিয়ে দাঁড়ায় এবং জাফরির সাথে নিজেকে এঁটে ধরার চেষ্টা করে, তবে আমাদের দৃষ্টিতে এটা অতি বড় দুঃসাহস। কাজেই সুন্নতের উপর আমল করা হচ্ছে কিনা এই চিন্তাই মুখ্য হওয়া উচিত। স্বপ্নের পেছনে পড়া বড় কোনও কথা নয়, এটা জীবনের লক্ষ্যবস্তু নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক জীবন গঠন করাটাই আসল কথা। এরই ফিকির করা উচিত, হ্যাঁ স্বপ্নে যদি তাঁর দেখা পাওয়া যায় সেটাও

নি'আমত বৈকি, অনেক বড় সৌভাগ্য! কিন্তু মুক্তি ও নাজাত তার উপর নির্ভর করে না। কারণ সেটা নিজ ইচ্ছার অতীত জিনিস।

আমাদের প্রজন্মের বহু লোককে দেখা যায় স্বপ্নের পেছনেই পড়ে আছে। দিন রাত এই একই চিন্তা–কিভাবে ভালো স্বপ্ন দেখা যায়। এটাকেই চরম লক্ষ্যবস্তু মনে করে রেখেছে। তাদের এ ভাবনা মোটেই ঠিক নয়; বরং এটা অনেক বিভ্রান্তির উৎস। তাই তো নিজের সম্পর্কে কখনও কোনও ভালো স্বপ্ন দেখে ফেললে তাকে আর হাতের নাগালে পাওয়া যায় না। তখন নিজ সম্পর্কে ধারণা বড় উঁচু হয়ে যায়। মনে করে কোথায় যেন পৌঁছে গেছে। মনে রাখতে হবে, স্বপ্ন দ্বারা কারও মর্যাদা বেড়ে যায় না এবং এটা কোনও ছাওয়াব ও পুণ্যের বিষয়ও নয়। মর্যাদার ভিত্তি হল আমল– শরী'আতের অনুসরণ। কাজেই দেখতে হবে জাগ্রত অবস্থায় আমল কতটুকু করা হচ্ছে এবং কী আমল করা হচ্ছে।

ভালো স্বপ্ন যেন ধোঁকার কারণ না হয়

সুতরাং কেউ যদি স্বপ্ন দেখে জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং জান্নাতের ঘর-বাড়ি ও পুষ্পোদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তবে সন্দেহ নেই এটা অনেক বড় সুসংবাদ। কিন্তু এ স্বপ্ন দেখে যেন নিজেকে জান্নাতবাসী মনে করার ধোঁকায় পড়ে না যায়। স্বপ্নে যখন নিজেকে জান্নাতে দেখেছি, ব্যস আমি জান্নাতী হয়ে গেছি, এখন আর আমার কোনও আমলে লিপ্ত হওয়ার বা চেষ্টা-চরিত্র করার কোনও দরকার নেই, এ জাতীয় ভাবনা মারাত্মক ভুল। বরং এরকম ভালো স্বপ্ন দেখার পর আমলের প্রতি আরও উৎসাহী হওয়া উচিত। কেউ ভালো স্বপ্ন দেখার পর যদি শরী'আতের অনুসরণ ও আমলের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়, তবে এটা তার স্বপ্নটি ভালো হওয়ার একটি আলামত হবে। বোঝা যাবে তার স্বপ্নটি সত্য ছিল ও তার জন্য সুসংবাদবাহী ছিল, যে কারণে সে তা দ্বারা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়নি। কিন্তু আল্লাহ না করুন স্বপ্ন দেখার পর যদি আমল ছেড়ে দেয় বা আমলে গাফলতি দেখা দেয়, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে স্বপ্ন তাকে ধোঁকায় ফেলেছে।

স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কোনও কাজের হুকুম

প্রকাশ থাকে যে, স্বপ্নে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা পাওয়া যায়, তবে বিষয়টাকে গুরুত্বের সঙ্গেই দেখা উচিত। কেননা তিনি তো বলেই দিয়েছেন, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। সুতরাং স্বপ্নে যদি তাঁর সাক্ষাত লাভ হয় এবং তখন তিনি এমন কোনও হুকুম করেন, যা শরী'আতের বিধান মোতাবেক, যেমন তিনি কোনও ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত বা মুবাহ কাজ করতে বললেন, তবে তাঁর সে হুকুমকে গুরুত্ব দিয়ে কাজটিতে যত্নবান হওয়া উচিত। কেননা তিনি যখন শরী'আতের বলয়ভুক্ত কোনও কাজ করার হুকুম করছেন, তখন এটা প্রমাণ করে তার স্বপ্ন সত্য, যা তার জন্য একটি সুসংবাদ। এমতাবস্থায় কাজটি তার জন্য অবশ্যই উপকারী হবে। আর যদি তা না করে, তবে তার জন্য তা অনেক বড় ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে।

স্বপ্ন শরী'আতের দলীল নয়

কিন্তু তাই বলে স্বপ্ন শরী'আতের দলীল নয়। কাজেই স্বপ্নে যদি মনে হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনও কাজের আদেশ করেছেন যা শরী'আত অনুমোদন করে না, তবে সে কাজ কিছুতেই করা যাবে না। মনে করুন কেউ স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করল আর তার মনে হল তিনি তাকে শরী'আতবিরোধী কোনও কাজের আদেশ করছেন, তো স্বপ্নযোগে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে বলে যে সেই কাজ তার জন্য জায়েয হয়ে যাবে, এমন কিছুতেই নয়। কেননা, আমাদের দেখা স্বপ্নকে আল্লাহ তা'আলা শরী'আতের বিষয়ে আমাদের জন্য দলীল বানাননি। আমাদের জন্য দলীল তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেইসব বাণী ও নির্দেশ, যা নির্ভরযোগ্য পন্থায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আমাদেরকে সেটাই মানতে হবে। স্বপ্নের কথা মানা আমাদের জন্য জরুরি নয়। সত্য বটে, শয়তান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি ধারণ করতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেছে, সমস্যাটা তার দিক

থেকেও তো সৃষ্টি হতে পারে। অনেক সময়ই এমন হয় যে, স্বপ্নদ্রষ্টতার চিন্তা-ভাবনা স্বপ্নের সাথে মিশে গোলমেলে হয়ে যায়। ফলে কতটুকু স্বপ্ন আর কতটুকু তার মস্তিষ্কের কল্পনা তা সে পার্থক্য করতে পারে না। কিংবা স্বপ্নের অংশটুকু বিস্মরণ হয়ে নিজ কল্পনার অংশটুকুই স্মরণ থাকে আবার অনেক সময় বুঝতেও ভুল হয়। মোটকথা তার দিক থেকে অনেক কিছুই ঘটার অবকাশ আছে। এ কারণেই আমাদের স্বপ্ন প্রামাণিক মর্যাদা রাখে না।

স্বপ্নের একটি আশ্চর্য ঘটনা

কোনও এক কালে একজন কাযী (বিচারক) ছিলেন। মানুষের মধ্যে বিচার-আচার করতেন। একবার এক মামলায় সাক্ষী-সাবুদ পেশ করা হল। শরী'আত অনুযায়ী সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা যাচাইও করা হল। পরিশেষে বাদীর পক্ষে রায় প্রদান করবেন বলে মনস্থিরও করে ফেললেন। কিন্তু কাযী সাহেব তখনই রায় প্রকাশ না করে বললেন, এ মামলার রায় ঘোষণা আগামীকাল করব। তিনি ভাবলেন এর মধ্যে আরও একটু চিন্তা-ভাবনা করে নেবেন। তিনি যথারীতি এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেনও। এ অবস্থায় রাতে যখন নিদ্রা গেলেন, স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ হল। সকালবেলা ঘুম থেকে জাগার পর তার মনে হল স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন বলছিলেন, তুমি যে রায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছ সেটা ভুল। রায় বরং এরকম হওয়া উচিত। উঠে তিনি বিষয়টি নিয়ে আরও চিন্তা-ভাবনা করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে রায় দিতে বলেছেন বলে তার মনে হচ্ছিল, তা কোনওভাবেই শরী'আতের নিয়ম-নীতির সাথে খাপ খায় না। তিনি বড় পেরেশানিতে পড়ে গেলেন, কেননা এক দিকে শরী'আতের মূলনীতি, যে হিসেবে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন সেটাই সঠিক। অন্যদিকে স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ। বিষয়টা বড় জটিল হয়ে গেল। বস্তুত রায় প্রদানের বিষয়টা এমনিতেও কঠিন। যাদের উপর

এ দায়িত্ব চাপে তারাই বোঝে এটা কত গুরুভার। এ ভার বহন করতে গিয়ে রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত কাযী সাহেব সে যুগের খলিফার কাছে ছুটে গেলেন এবং মামলার পূর্ণ বৃত্তান্ত তাঁকে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে যেভাবে রায় দিতে আদেশ করেছেন তাও জানালেন। তারপর বললেন, আপনি আলেম-উলামার মজলিস ডাকুন। যাতে এ বিষয়ে তাদের পরামর্শ নেওয়া যায়। সুতরাং রাজধানীর সমস্ত আলেমকে ডাকা হল এবং তাদের সামনে মামলার সুরতহাল তুলে ধরা হল। কাযী সাহেব বললেন, শরী'আতের নীতিমালা অনুযায়ী এ মামলার রায় তো এরকম হওয়া উচিত, কিন্তু স্বপ্নে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে নির্দেশ পেয়েছি তা এই রকম। এবার আপনারা সিদ্ধান্ত দিন। আলেমগণ বললেন, বিষয়টা জটিলই বটে। কেননা স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ হয়েছে আর তাঁর হাদীছ দ্বারা আমরা জানতে পারি শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। সুতরাং এ মামলার ব্যাপারে তিনি যে হুকুম করেছেন সেটাই পালন করা উচিত। কিন্তু সে কালেরই একজন বুযুর্গ আলেম, যাকে সে যুগে মুজাদ্দিদ বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ শায়খ ইযযুদ-দ্বীন ইবন আব্দুস সালাম রহ., তিনিও মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। সকলের কথা শেষ হওয়ার পর তিনি দাঁড়ালেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, কাযী সাহেব! শরী'আতের নীতিমালার আলোকে এ মামলায় আপনি যে রায় দেবেন বলে স্থির করেছেন সেটাই ঘোষণা করুন। এতে যদি কোনও গুনাহ হয় বলে মনে করেন, তবে সে গুনাহের বোঝা আমার মাথায় থাকল। স্বপ্নের কথা অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া জায়েয নয়। কেননা স্বপ্নের ভেতর নানান রকমের সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন আপনার কোনও চিন্তা ও কল্পনা এতে মিশে গেছে কি না। সত্য বটে, শয়তান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি ধারণ করতে পারে না, কিন্তু এমন তো হতে পারে যে, ঘুম থেকে জাগার পর শয়তান কোনও বিভ্রম সৃষ্টি করেছে বা অন্তরে

কোনও ভুল কথা সরবরাহ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে আমরা যেসব বাণী ও নির্দেশনা পেয়েছি তার বিপরীতে স্বপ্নেপ্রাপ্ত বিষয়কে শরী'আত আমাদের জন্য দলীলের মর্যাদা দেয়নি। বিশুদ্ধ সূত্রে প্রাপ্ত হাদীছই আমাদের জন্য অনুসরণীয় এবং তাই আমাদের দলীল। সুতরাং কাযী সাহেব! আপনি সে হিসেবেই রায় ঘোষণা করুন। গুনাহ আমার মাথায় থাকল।

স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদি দ্বারা শরী'আতের বিধান বদলাতে পারে না

তাঁরাই আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত বান্দা, যে কারণে এতটা দৃঢ়তার সাথে শরী'আতের পক্ষে অবস্থান নিতে পেরেছেন। নচেৎ গুনাহ আমার মাথায়—এরকম কথা বলা এত সহজ নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনের ব্যাখ্যা ও হেফাজতের জন্য যাদেরকে পাঠান, তাদের মুখ দিয়ে তিনিই এরকম কথা বলিয়ে থাকেন। 'স্বপ্নের দ্বারা শরী'আত বদলানো যায়'- এ নীতি যদি একবার গ্রহণ করে ফেলা হতো, তবে শরী'আতের আর রক্ষা ছিল না। একেকজন একেকটা স্বপ্ন দেখত আর শরী'আতের বিপরীতে তা দাঁড় করাত। কালক্রমে গোটা শরী'আতই স্বপ্নের গ্রাস হয়ে যেত।

আজও আপনি লক্ষ করে দেখুন না, যত জাহেল অজ্ঞ পীর আছে, যারা বিদ'আতের মধ্যে নিমজ্জিত, তারা এই স্বপ্ন-টপ্নকেই সবকিছু মনে করে। ব্যস কোনও স্বপ্ন দেখল বা কাশ্‌ফ হল, অমনি সেটাকে শরী'আতের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দিল আর তা দ্বারা শরী'আত-বিরোধী কাজকে জায়েয করে নিল। স্বপ্ন তো স্বপ্ন, শরী'আতের বিপরীতে যদি কাশ্‌ফও হয়– যা কিনা জাগ্রত অবস্থায় হয় এবং আওয়াজও হয়– আর সে আওয়াজ কান দিয়ে শোনাও যায়, তবে তা দ্বারাও তো শরী'আতের বিধান বদলানো যায় না। কোনও ব্যক্তি যত বড় আলেম ও যত বড় বুযুর্গই হন না কেন তার দেখা কোনও কাশ্‌ফ বা স্বপ্ন কিছুতেই শরী'আতের বিপরীতে দলীল-প্রমাণের মর্যাদা লাভ করবে না।

হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী রহ.-এর একটি ঘটনা

ওলীকুল শিরোমণি হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী রহ. এক রাতে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। সময়টা ছিল তাহাজ্জুদের। হযরত জীলানী রহ.-এর মতো বুযুর্গ ইবাদত করছেন। চারধারে তার তো একটা প্রভাব পড়তেই পারে! তো সহসাই এক জবরদস্ত আলো ঝলকে উঠল এবং সেই আলোর ভেতর থেকে আওয়াজ আসল, আব্দুল কাদের! তুমি আমার ইবাদতের হক আদায় করে ফেলেছ। ইবাদত করতে করতে তুমি এমন এক স্তরে পৌছে গেছ, যেখানে পৌছার পর আর কোনও ইবাদতের প্রয়োজন থাকে না। কাজেই আজকের পর আমার পক্ষ থেকে তোমার উপর আর কোনও ইবাদত ফরয থাকল না। না নামায, না রোযা, না হজ্জ-যাকাত। তোমার জন্য সবই মাফ হয়ে গেল। এখন তোমার যা-ইচ্ছা করতে পারো। আমি তোমাকে জান্নাতী বানিয়ে দিলাম। এ কথাটা যে কার হতে পারে তা বুঝতে হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী রহ.-এর এক মুহূর্ত দেরি হল না। তিনি পত্রপাঠ উত্তর দিলেন, দূর হয়ে যা মরদুদ! এ নামায মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মাফ হয়নি, তার মহান সাহাবীদের জন্য মাফ হয়নি, তা আমার জন্য কী করে মাফ হতে পারে? তুই দূর হ'। এই বলে তিনি শয়তানকে বিতাড়িত করলেন। ক্ষণিক পরে আরেকটি আলোর ঝলকানি দেখা গেল। তার ভেতর থেকে আওয়াজ আসল, আব্দুল কাদের! তোমার ইলম আজ তোমাকে বাঁচিয়ে দিল। নয় তো এটা এমনই এক অস্ত্র ছিল, যা দ্বারা আমি বড়-বড় আবেদকে কূপোকাত করেছি। তোমার কাছে ইলম না থাকলে আজ তোমরাও রক্ষা ছিল না। হযরত শায়খ জীলানী রহ. বললেন, দূর হ' মরদূদ! আরেক চাতুর্য নিয়ে এসেছিস? আমাকে আমার ইলম নয়, আল্লাহ তা'আলাই রক্ষা করেছেন। তত্ত্বজ্ঞানী বুযুর্গগণ বলেন, এই দ্বিতীয় অস্ত্রটি প্রথম অস্ত্র অপেক্ষা বেশি বিপজ্জনক ছিল। কেননা এর মাধ্যমে শয়তান তাঁর ভেতর ইলমের অহমিকা সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল, যাতে তাঁর ভেতর এই ধারণা জন্ম নেয় যে, হ্যাঁ আমার ইলম বড় গভীর, যা দ্বারা আমি শয়তানের চাল ধরে ফেলেছি। কাজেই ইলমের বলেই আজ

আমি বেঁচে গেছি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে শয়তানের এই সূক্ষ্ম চালও নস্যাৎ হয়ে গেছে। তিনি সাফ বলে দিয়েছেন ইলম নয়; বরং আল্লাহ তা'আলাই আমাকে রক্ষা করেছেন।

স্বপ্নের দ্বারা হাদীছ রদ করা জায়েয নয়

ভাইয়েরা! স্বপ্নবাজির ব্যাপারটা বড় খতরনাক পর্যায়ে পৌছে গেছে। মানুষ নির্বিচারে স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির পেছনে পড়ে গেছে। শরী'আত কী বলছে বা শরী'আতের কী দাবি, সে দিকে তাকাচ্ছে না। ভালো-ভালো দ্বীনদার ও লেখা-পড়া জানা লোক পর্যন্ত দাবি করতে শুরু করেছে যে, আমার কাশ্‌ফ হয়েছে অমুক হাদীছ সহীহ নয়। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে অমুক হাদীছ ইহুদীদের তৈরি করা। আমি কাশফের দ্বারা এটা জানতে পেরেছি। এভাবে যদি কাশফই সবকিছুর মাপকাঠি হয়, তবে দ্বীনের ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সেইসব আলেমে দ্বীনকে তার রহমতের সাগরে ডুবিয়ে রাখুন, যারা শয়তানের এসব চোরাগলি বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বীনের সংরক্ষক বানিয়েছেন। তারা দ্বীনের প্রহরী। লোকে তাদেরকে হাজারও গালমন্দ করুক, কিছু যায় আসে না। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁদের মর্যাদা অনেক উঁচুতে। তাঁরা আল্লাহ তা'আলারই মনোনীত। তিনিই তাদেরকে দ্বীনের প্রহরী ও সংরক্ষক বানিয়েছেন, যাতে কেউ দ্বীনের উপর হামলা করতে না পারে, কেউ দ্বীনের বিকৃতি সাধনে সক্ষম না হয়। সুতরাং সেই উলামায়ে কেরাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, স্বপ্ন, কাশফ, কারামত যাই হোক না কেন, এর কোনওটিই দ্বীনের দলীল নয়। বিশুদ্ধ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীছ আমাদের কাছে পৌছেছে, তাই দলীল। কাজেই তার বিপরীতে কোনও স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ-কারামতের ধোঁকায় পড়বে না।

হযরত থানভী রহ. বলেন, বিশুদ্ধ কাশ্‌ফও অনেক সময় পাগল, এমনকি কাফেরদেরও হয়ে যায়। 'কাজেই নূর চোখে পড়েছে' 'অন্তর চলতে শুরু করেছে' বা 'দিলে বাড়ি লেগেছে' এবং বিবিধ আরও যেসব

কথা কাশফের দাবিদাররা বলে থাকে, তাতে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা শরী'আতে এসব জিনিস সত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়।

যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে তার করণীয়

হযরত আবূ কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ভালো স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয় এবং মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং কেউ যদি অপ্রীতিকর কোনও স্বপ্ন দেখে, সে যেন বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলে এবং বলে, أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ, 'অতি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি।' সেই সঙ্গে পার্শ্ব পরিবর্তনও করবে। অর্থাৎ যে কাতে শোয়া অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছে, জাগার পর তা পরিবর্তন করে অন্য কাতে শোবে। এ আমল করলে ইন্‌শাআল্লাহ সে স্বপ্নে কোনও ক্ষতি হবে না।[১৮৬]

অনেক সময় মানুষ ভীতিকর স্বপ্ন দেখে কিংবা খারাপ কোনও কিছু ঘটতে দেখে। সে ক্ষেত্রেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আমল শিক্ষা দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে কেউ যদি কোনও ভালো স্বপ্ন দেখে, তা দ্বীনী বিষয়ে হোক বা দুনিয়াবী বিষয়ে, তবে তা কেবল নিজ প্রিয়জনদের কাছেই বর্ণনা করবে, অন্য কারও কাছে নয়। কেননা অনেকে স্বপ্ন শোনার পর উল্টা-পাল্টা একটা ব্যাখ্যা করে দেয়। ফলে ভালো স্বপ্নেরও ফল সেই ব্যাখ্যা মোতাবেক হয়ে যায়। কাজেই কেবল প্রিয়জনদের কাছেই স্বপ্নের কথা প্রকাশ করবে এবং ভালো স্বপ্ন দেখার কারণে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে।

---

১৮৬. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬৪৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪১৯৫; সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ২২০৩; সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৩৬৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৩৮৯৯

স্বপ্ন বর্ণনাকারীর জন্য দু'আ

কেউ স্বপ্ন দেখার পর তা কারও কাছে বর্ণনা করলে, শ্রোতার উচিত তার জন্য দু'আ করা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কেউ এসে যদি বলত আমি এই স্বপ্ন দেখেছি, তবে তিনি দু'আ করতেন–

'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এ স্বপ্নের কল্যাণ দান করুন এবং এর অনিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় এ স্বপ্ন আমাদের জন্য শুভ হোক এবং দুশমনদের জন্য অশুভ হোক।'[১৮৭]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু'আটি সংক্ষিপ্ত হলেও বড় পূর্ণাঙ্গ। এর ভেতর সবকিছুই এসে গেছ। সকলেরই এ অনুযায়ী আমল করা উচিত। যখনই কেউ আপনার কাছে তার কোনও স্বপ্নের কথা প্রকাশ করবে, তার জন্য এ দু'আটি পড়বেন। আরবী মুখস্ত না থাকলে এর অর্থটাই বলে দেবেন।

এই হল শরী'আতের দৃষ্টিতে স্বপ্ন ও তার আদব। এসব কথা মনে রাখা উচিত। স্বপ্নের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে যে ফযূল ধ্যান-ধারণা ও বিপথগামিতা আছে, তা যেন আপনাকে স্পর্শ করতে না পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন এবং সঠিক পন্থায় দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দিন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

---

১৮৭. তাবারানী, আল-মু'জামুল-কাবীর, অধ্যায় স্বপ্ন ব্যাখ্যা।

শরী'আতের দৃষ্টিতে তাবাররুক*

بَابُ الْمَسَاجِدِ : اَلْمَسَاجِدُ الَّتِىْ فِىْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ.

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَتَحَرّٰى اَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيْقِ فَيُصَلِّىْ فِيْهَا وَيُحَدِّثُ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يُصَلِّىْ فِيْهَا وَاَنَّهٗ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ وَحَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهٗ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا اَعْلَمُهٗ اِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِى الْأَمْكِنَةِ كُلِّهَا اِلَّا اَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِىْ مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ.

এটা বুখারী শরীফের 'সালাত' অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদ। ইমাম বুখারী রহ. এ পরিচ্ছেদে মদীনা মুনাওয়ারার সড়কসমূহে যেসকল মসজিদ আছে এবং যেসব স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করেছেন তা বিবৃত করেছেন। এতে একটু পরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে। এ হাদীছটিও হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তার থেকে বর্ণনা করেছেন সালিম (র.) ও নাফি (র.) এবং তাদের থেকে মূসা ইবন উক্‌বা। মূসা ইবন উক্‌বা রাযি. বলেন, আমি সালিম ইবন আব্দুল্লাহ রহ.-কে (মদীনা থেকে মক্কাগামী) পথের বিশেষ বিশেষ স্থান খুঁজে-খুঁজে তাতে নামায পড়তে দেখেছি। আর তিনি বলতেন, তাঁর পিতাও সেসব স্থানে নামায পড়তেন এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই স্থানগুলিতে নামায পড়তে দেখেছেন।

---

* ইনআমুল বারী শরহে বুখারী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৯-২৩৯

৭১. নবীগণের স্মৃতিবিজড়িত বস্তুরাজিকে বরকতপূর্ণ মনে করা।

মূসা ইবন উকবা রহ. বলেন, আমার কাছে নাফি' রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেই স্থানসমূহে নামায পড়তেন। মূসা ইবন উকবা রহ. আরও বলেন, আমি সালিমকে জিজ্ঞেস করলে– আমার ঠিক মনে আছে, তিনি সবগুলি স্থানের ব্যাপারে নাফি' রহ.-এর সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করেছিলেন, কেবল রাওহার উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি মসজিদের ব্যাপারে তাঁরা ভিন্ন-ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।[১৮৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. যখন মক্কা-মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যে সফর করতেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসকল স্থানে নামায পড়েছিলেন, খুঁজে খুঁজে যেসব স্থানে নামায পড়তেন। সেই সঙ্গে তিনি অন্যদেরকেও সাগ্রহে বলতেন যে, দেখো এই-এই স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছেন। এমনকি কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, একটি স্থান সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বলেন যে, দেখো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জায়গায় প্রস্রাব করেছিলেন। বোঝা যাচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ তিনি বেশ লক্ষ রেখেছিলেন, যে কারণে তার সকল শিষ্যকে সেসব স্থান সবিস্তারে চিনিয়েও দিয়েছিলেন, যেমন পরের দীর্ঘ হাদীছটিতে আছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. সেসব স্থানের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তা সেই সময়ের স্থানগত পরিবেশ অনুযায়ী, যা দ্বারা বর্তমানকালে সাহায্য নেওয়া কঠিন। তিনি বলেছেন, দেখো অমুক জায়গায় এই নামের এই রকমের একটি গাছ আছে বা অমুক জায়গায় একটি টিলা আছে, অমুক জায়গায় একটা পাহাড়ি পথ আছে কিংবা একটা লোকালয় আছে। বলা বাহুল্য কাল পরিক্রমায় এসব চিহ্ন মিটে গেছে। এমনকি সেই হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে হাফেয ইবন হাজার

৭২. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৪৬১; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ২২২৫; সুনান নাসাঈ, হাদীছ নং ২৬১২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৪২৩০; মুআত্তা মালিক, হাদীছ নং ৮০৪; সুনান দারিমী, হাদীছ নং১৮৪৭

আসকালানী রহ. বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. যেসব স্থান চিহ্নিত করেছিলেন, তার মধ্যে মাত্র দুটি স্থান এখন চেনা যায়। একটি রাওহা এবং দ্বিতীয়টি যুল-হুলায়ফা। অন্যান্য স্থান এখন অজ্ঞাত হয়ে গেছে। হযরত ইবন উমর রাযি. জায়গাগুলির যে নাম বলেছিলেন, যদিও তার অধিকাংশ নাম এখনও বলবৎ আছে, কিন্তু তিনি জায়গাগুলির যে পরিচয় দিয়েছেন, যেমন ডান দিকে বাঁক নেবে, বাঁ দিকে ঘুরবে ইত্যাদি, তা আর বাকি নেই। কেবল রাওহা নামক স্থানটি এখনও সে রকমই আছে। সউদী সরকারের বুলডেজার এখনও সেখানে পৌছেনি।

বছর কয়েক আগে আমি সেখানে গিয়েছিলাম, দেখতে পেলাম সেখানকার কুয়াটি (বি'রে রাওহা) এখনও আছে এবং তার কাছে যে জায়গাটির কথা বলা হয়েছে তাও সংরক্ষিত আছে। আর যেসব জায়গার কথা বলা হয়েছে তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। এমন কি যুল হুলায়ফার যেই স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছিলেন, তাও সংরক্ষিত নেই। সেখানে এখন বিশাল জমকালো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেই স্থানটি মসজিদের ভেতরে অন্যান্য জায়গার সাথে মিলেমিশে গেছে। আলাদাভাবে তা চিহ্নিত করা হয়নি।

এর কারণ, বর্তমান নজদী আলেমদের মতে এ জাতীয় স্থানসমূহ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা জায়েয নয়। কেননা তাদের মতে এটা বিভিন্ন ধর্মে নবীগণের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহকে পূজা করার যে শিরক চালু আছে, তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই নিষেধ। এ কারণেই তারা মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিবাহী কোনও জায়গার চিহ্ন রাখেনি। এক-এক করে সব নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে।

বিষয়টি কি ভাবনার নয়?

কী নির্মম পরিহাস! মদীনা মুনাওয়ারায় ইহুদী সর্দার এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ঘোরশত্রু কা'ব ইবন আশরাফের দুর্গটি সরকারিভাবেই সংরক্ষিত। সেখানে বোর্ড লাগিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে লেখা– এটা একটা প্রাচীন নিদর্শন। সাবধান কেউ এর কোনও রকম ক্ষতিসাধন করবেন না।

এভাবে কা'ব ইবন আশরাফের দুর্গ হেফাজত করা হয়েছে। কেবল হেফাজতই নয়, তাতে সতর্কতামূলক বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের স্মৃতি বিজড়িত যত নির্দশন ছিল খুঁজে খুঁজে সেগুলি সব চিহ্নিত করে ফেলা হয়েছে। নিশ্চিহ্ন করার জন্য যেখানে যতটুকু সম্ভব ছিল তা করা হয়েছে। এক কালে তো আমরা সেসব জায়গায় যেতাম এবং অতীত খুঁজে পেতাম। কিন্তু এখন আর তার কোনও চিহ্ন নেই। সর্বশেষ একটি জিনিস বাকি ছিল। হযরত আসআদ ইবন যুরারা রাযি. এর বাড়ি, যা কুবার মসজিদ বরাবর অবস্থিত ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে আসলে সর্বপ্রথম এ বাড়িতে চৌদ্দদিন অবস্থান করেছিলেন। তিন-চার বছর আগে দিয়ে দেখি সে বাড়িটিও ভেঙে ফেলা হয়েছে। এভাবে সর্বশেষ নিদর্শনটিও এখন অন্তর্হিত। তাদের কথা হচ্ছে, প্রাচীন নির্দশন বাকি রাখা এবং নবী-রাসূল ও বুযুর্গানে দ্বীনের স্মৃতিবিজড়িত বস্তুসমূহকে বরকতপূর্ণ মনে করা এক ধরনের শিরক। কাজেই তা নিশ্চিহ্ন করাই জরুরি ছিল।

এর স্বপক্ষে দলীল হিসেবে তারা হযরত উমর রাযি.-এর যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করে থাকে। সুনানে সাঈদ ইবন মানসূর-এ বর্ণিত আছে, হযরত উমর রাযি. হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় গেলে সেখানে তিনি দেখতে পান হজ্জ আদায়ের পর বহু লোক একটি বৃক্ষের কাছে জড়ো হয় এবং সেখানে বেশ ভিড় লেগে যায়, এমনকি একে অন্যের আগে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা লেগে যায়। হযরত উমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কী? লোকে বলল, এটা সেই স্থান, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছিলেন, এ কারণেই মানুষ ওখানে গিয়ে নামায পড়ার চেষ্টা করে। হযরত উমর রাযি. বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তো এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহকে সিজদাস্থলে পরিণত করেছিল। তারা মনে করত সেখানে গিয়ে নামায পড়াটা বিশেষ ছাওয়াবের কাজ। তারপর তিনি বললেন, কারও যদি

নামায থেকে থাকে তবে সে পড়ে নিক, আর যার নামায নেই, সে চলে যাক।[১৮৯]

নবীগণের স্মৃতি দ্বারা বরকত লাভ

নজদী আলেমগণ বলেন, দেখো, হযরত উমর রাযি. অন্যান্য নবীগণের স্মৃতিস্থানের মতো আমাদের রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিস্থানেও নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। অথচ বুখারী শরীফের যে হাদীছ উদ্ধৃত করা হল তাতে আপনারা দেখছেন, হযরত ইবন উমর রাযি. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মৃতিস্থানসমূহ খুঁজে খুঁজে তাতে নামায পড়তেন। এ কারণেই সারা বিশ্বের উলামায়ে কেরাম বলেন, আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালামের স্মৃতি দ্বারা তাবাররুক তথা বরকত গ্রহণ করা জায়েয। ফাতহুল-বারী গ্রন্থে হাফেয ইবন হাজার রহ.-ও এরূপ লিখেছেন।

কিন্তু হালে সউদী আরবে সেখানকার আলেমদের তত্ত্বাবধানে ফাতহুল-বারীর যে নতুন মুদ্রণ বের হয়েছে, তাতে এই কাজ করা হয়েছে যে, যেখানেই এই তাবাররুকের কথা এসেছে, সেখানে একটা টীকা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে– هٰذَا خَطَأٌ وَهٰذَا فِيْهِ نَظَرٌ এটা ভুল এবং এতে আপত্তি আছে।

কখনও কখনও তাদের পক্ষ থেকে এ কথাও বলা হয় যে, এ বিষয়ে হযরত উমর রাযি. তাঁর পুত্র (আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.) অপেক্ষা বেশি জানেন। কাজেই পুত্র অপেক্ষা তাঁর কথাই বেশি অনুসরণযোগ্য।

উল্লেখ্য, হযরত ইবন উমর রাযি.-এর হাদীছটি তো বুখারী শরীফের আর হযরত উমর রাযি.-এর হাদীছটি আছে সুনানে সাঈদ ইবন মানসূর-এ। অন্য কোনও ক্ষেত্রে যদি বুখারী শরীফের হাদীছের বিপরীতে সুনানে

---

১৮৯. বিস্তারিত দেখুন, মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বা, হাদীছ নং ৭৫৫০; খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫১, রিয়াদ ১৪০৯ হি; উমদাতুল কারী ৩খ, ৫৫৯; ফাতহুল-বারী, ১খ, ৫৬৯

সাঈদ ইবন মানসূরে বর্ণিত হাদীছ পেশ করা হয়, তবে তারা রে-রে করে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে ওঠে সাহেব! সাঈদ ইবন মানসূরের হাদীছ দ্বারা বুখারী শরীফের হাদীছকে মুকাবিলা করছেন? কোথায় বুখারী শরীফের হাদীছ আর কোথায় সাঈদ ইবন মানসূরের হাদীছ! এ দুয়ের মধ্যে কোনও তুলনা চলে? অথচ এই ক্ষেত্রে বুখারী শরীফের হাদীছ কোনও দাম পেল না। তার বিপরীতে সাঈদ ইবন মানসূরের রায় দিয়ে দেওয়া হল যে, এটা শিরক।

তাবার্রুক অস্বীকার করা একটা বাড়াবাড়ি

বস্তুত তাবাররুককে নাজায়েয ও শিরক সাব্যস্ত করা একটা চরম বাড়াবাড়ি। এটা শরঈ দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালামের স্মৃতি দ্বারা বরকত হাসিল করার স্বপক্ষে হাদীছ শরীফে এত বেশি দলীল ও এ সম্পর্কে এত বেশি ঘটনা আছে, যা জানার পর বিষয়টা অস্বীকার করার কোনও অবকাশ থাকে না। তা সত্ত্বেও অস্বীকার করলে সেটা হঠকারী মনোভাবেরই পরিচায়ক হবে। একটি হাদীছ তো আপনি সবে দেখলেন যে, কিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের স্থান দেখিয়ে বলছেন, এখানে নামায পড়ো। এছাড়া আপনাদের জানা আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থুথু নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেত। তাঁর পবিত্র দেহ থেকে ঘাম ঝড়লে কী গভীর ভালোবাসায় তা চোখে-মুখে লাগাতেন। বলে দাও না এটাও শিরক?

তাবাররুক জায়েয হওয়ার দলীল

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাম ও থুথু নিয়ে নিজের শরীরে মাখানোর বিষয়টা কি তাবার্রুক ছাড়া অন্য কিছু? হাদীছে এ কথাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র চুল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। এ বণ্টনের উদ্দেশ্য কী ছিল? নবীগণের স্মৃতি দ্বারা যদি বরকত হাসিল জায়েয না হয়, তবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কেন কেশরাজি বণ্টন করলেন? এবং সাহাবায়ে কেরামই বা কেন তা হেফাজত করেছিলেন? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পানিতে কুলি করেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামা রাযি. তা দেখে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও একটু রেখো।[১৯০]

হযরত উম্মু সালামা রাযি.-এরই ঘটনা যে, তিনি এক শিশি পানিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চুল রেখে দিয়েছিলেন। বুখারী শরীফের 'পোশাক' অধ্যায়ে এক রিওয়ায়েতে আছে যে, শহরের কোনও লোক অসুস্থ হয়ে পড়লে তার পরিবার এক পেয়ালা পানি নিয়ে হযরত উম্মু সালামা রাযি.-এর কাছে আসত এবং তাঁর কাছে অনুরোধ করত তিনি যেন চুল ভিজিয়ে রাখা শিশি থেকে তাদের পেয়ালায় একটু পানি ঢেলে দেন। তিনি তাদের পেয়ালায় শিশির পানি ঢেলে দিতেন। তারা আরোগ্য লাভের আশায় রোগীকে সেই পানি পান করাত। সাহাবায়ে কেরাম এভাবে তাঁর কাছে পানির জন্য পাঠাতেন। তিনিও আরোগ্যের আশায় এই তাবাররুক বিতরণ করতেন।[১৯১]

হযরত উম্মু সুলায়ম রাযি. ছিলেন হযরত আনাস রাযি.-এর মা। বুখারী শরীফে তাঁর রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে যে,[১৯২] তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আছেন। গরমের দিন। তাঁর শরীর থেকে ঘাম ঝরছিল। আমি তাড়াতাড়ি একটা শিশি নিয়ে আসলাম এবং তাঁর শরীরের সেই ঘাম তাতে ভরে নিলাম। সর্বোৎকৃষ্ট আতরের সুরভি অপেক্ষাও সেই ঘাম বেশি সুবাসিত ছিল। লোকে আমাকে বলত, আমরা আমাদের হানূতে (সুগন্ধি বিশেষ) তা একটু মিলিয়ে নিতে চাই। আমি তাদেরকে তা দিতাম।

---

১৯০. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৪৩৩৮

১৯১. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৫৮৯৬, ৫৮৯৭

১৯২. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৬৩১৮

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আরও আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সন্তানদের জন্য তাবাররুক গ্রহণ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক করেছ।[১৯৩]

এই বলে তিনি হযরত উম্মু সুলায়ম রাযি.-এর কাজটি অনুমোদন করলেন। তাঁর এ সমর্থনের পরও যদি কেউ তাবাররুককে অস্বীকার করে তবে তার জবাব এছাড়া আর কী হতে পারে যে, সত্য অস্বীকারের পরিণাম পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী?

হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ রাযি. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ তালহা রাযি. যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ মুবারক বিতরণ করছিলেন, তখন হযরত খালিদ রাযি. তার কাছ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার সামনের দিকের কিছু চুল চেয়ে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি সেই চুল নিজের টুপিতে লাগিয়েছিলেন। রণক্ষেত্রে সেই টুপি তাঁর মাথায় থাকত এবং তার বরকতে যুদ্ধে জয় লাভ করতেন। ইয়ামামার যুদ্ধে সেই টুপি পড়ে গেলে হযরত খালিদ রাযি. সেটি তুলে আনার জন্য অমিত তেজে লড়েছিলেন, এমনকি তিনি প্রাণের ঝুঁকি পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন।[১৯৪]

বুখারী শরীফের পানীয় অধ্যায়ে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাহ্ল ইবন সা'দ রাযি.-কে বলেছিলেন, ভাই একটু পানি আনো। তিনি তখন কোনও কাজে 'সাকীফায়ে বনূ সা'ইদায়' গিয়েছিলেন। হযরত সাহ্ল রাযি. এক পেয়ালা পানি এনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পান করালেন। তারপর তিনি সেই পেয়ালাটি সংরক্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে হযরত সাহ্ল রাযি. যখন হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন পেয়ালাটি বের করে দেখাতেন এবং বলতেন, এই পেয়ালায় আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি

---

১৯৩. সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪৩০১
১৯৪. মুস্তাদ্রাকে হাকিম, হাদীছ নং ৫৩০৫

পান করিয়েছি। সকলে বলত, আমরাও এতে পানি পান করতে চাই। তা তিনি দিতেন এবং তারা তাতে পানি পান করতেন। সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীকালে তাবিঈগণ যত্নসহকারে পেয়ালাটি সংরক্ষণ করেছিলেন।[১৯৫]

হাফেয ইবন হাজার আসকালানী রহ. আল-ইসাবা গ্রন্থে 'সহীহ ইবনুস-সাকান'-এর বরাতে হযরত আনাস রাযি.-এর জীবন বৃত্তান্ত লেখেন যে, তাঁর কাছে একটি পেয়ালা সংরক্ষিত ছিল। তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করেছিলেন। পেয়ালাটি বেশি পুরানো হয়ে গেলে ভেঙে যেতে শুরু করে। ফলে হযরত আনাস রাযি. সেটি সরু শিকড় দ্বারা বেঁধে নিয়েছিলেন।[১৯৬]

এভাবে সাহাবায়ে কেরাম গুরুত্বের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি সংরক্ষণ করতেন।

এরকম ঘটনা এক-দু'টি নয়। হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসহ আরও বহু ঘটনায় এরকম উল্লেখ পাওয়া যায়।

হযরত আবূ মাহ্যূরা রাযি. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আযান শিক্ষা দিয়েছিলেন। শিক্ষাদান কালে তিনি তার মাথায় হাত রেখেছিলেন। সেই স্মৃতি রক্ষার্থে হযরত আবূ মাহ্যূরা রাযি. জীবনে কখনও সেই চুল কাটেননি। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের ছোঁয়া সেই চুলে আছে।[১৯৭]

এটা প্রেম ও ভালোবাসার ব্যাপার। বেরসিক বুদ্ধি এর নাগাল পাবে না। তা নাগাল না পাক, কিন্তু হাদীছগ্রন্থসমূহে এসব ঘটনার উল্লেখ আছে।

হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয রহ.-এর কথা উমর ইবন শাব্বাহ 'আখবারু মাদীনা' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মদীনা মুনাওয়ারা ও তার আশপাশের যেসব মসজিদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১৯৫. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ১২১৩, ৫৬৩৭
১৯৬. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৫৬৩৮
১৯৭. মুসতাদরাক, হাদীছ নং ৬১৮১, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৮৯

নামায পড়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি লোক পাঠিয়ে রীতিমতো তা যাচাই-বাছাই করেন, তারপর পাথরের ফলকে লিখে দেন যে, এ মসজিদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছেন।[১৯৮]

বলুন, এসব কি ফযূল কাজ ছিল কিংবা মুশরিকী পন্থা? তারা কি শিরকী কাজ করেছিলেন?

হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর নিষেধ করার কারণ

প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে হযরত উমর ফারূক রাযি. নিষেধ করেছিলেন কেন? আসলে নিষেধ করার বিভিন্ন কারণ থাকে। তিনি নিষেধ করেছিলেন এই সতর্কতা হিসেবে যে, লোকে যাতে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের তরিকা অনুযায়ী সেই স্থানসমূহকে উপকার ও অপকার-সাধক বলে বিশ্বাস না করে। কিংবা সেসব স্থানে নামায পড়াকে ওয়াজিব মনে না করে এবং ফরয কাজ ছেড়ে দিয়ে সে দিকেই বেশি মনোযোগী না হয়ে পড়ে।[১৯৯]

এসব বিবেচনায় নিষেধ যুক্তিযুক্ত, কিন্তু এ কারণে তাবাররুকের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় না।

হযরত উমর রাযি. তাবাররুকের বিরোধী ছিলেন না

হযরত উমর ফারূক রাযি. যেমন স্মৃতিস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন বলে বর্ণিত আছে, তেমনি তাঁর সম্পর্কে এরকম বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, তিনি গুরুত্বের সাথে স্মৃতিরক্ষার কাজও করেছেন। বুখারী শরীফের মাগাযী অধ্যায়ে আছে, হযরত যুবায়ের রাযি.-এর একটি বর্শা ছিল, যেটি দিয়ে আবূ যাতিল-কারশকে হত্যা করেছিলেন। সে বর্শাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাছে নিয়ে রাখেন। তাঁর ওফাতের পর সেটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. নিয়ে যান এবং নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.-এর ওফাতের পর হযরত যুবায়ের রাযি. সেটি ফেরত নিয়ে গেলেন।

---

১৯৮. ফাতহুল বারী ১খ, ৫৭১; উমদাতুল কারী, ৩খ, ৫৬৮
১৯৯. উমদাতুল কারী, ৩খ, ৫৬০-৫৬৮

তা জানতে পেরে হযরত উমর রাযি. তাকে বললেন, ভাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যে বর্শাটি ছিল সেটি আপনি নিয়ে গেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হযরত উমর রাযি. বললেন, সেটি আমাকে দিয়ে দিন। আমি আমার কাছে হেফাজত করব। হযরত যুবায়ের রাযি. দিয়ে দিলেন। হযরত উমর রাযি.-এর কাছে তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত সেটি ছিল। তারপর সেটি হযরত উছমান রাযি. চেয়ে নেন।

এটা একটা বর্শাই তো ছিল। দুনিয়ায় বর্শার তো কোনও অভাব ছিল না যে, সেটি সংরক্ষণ করতে হবে? তা সত্ত্বেও এই মহান ব্যক্তিবর্গ এত গুরুত্ব সহকারে সেটি নিজের কাছে নিয়ে রাখছেন কেন?

হাদীছে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'আনাযা'। অর্থ বর্শা। হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর মতো ব্যক্তি তা নিজের কাছে হেফাজত করছেন। বোঝা গেল, স্মৃতিকে বরকত হিসেবে গ্রহণ করা তাঁর কাছেও দোষের ছিল না। আমাদের দেশেও (পাকিস্তানে) এক মিযাইলের নাম 'আনাযা'। নাম সেখান থেকেই গৃহীত। বস্তুত আনাযাটি যেহেতু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিল। এর সাথে তাঁর স্মৃতি জড়িয়ে ছিল, এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম এটাকে নিজের কাছে রাখতে পারাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন।[২০০]

বায়'আতুর-রিয্ওয়ান যে বৃক্ষের নিচে হয়েছিল

হযরত উমর রাযি.-এর দ্বিতীয় যে ঘটনাটি এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ, তা হল হুদায়বিয়ার সেই গাছটি কেটে ফেলা, যার নিচে বায়'আতুর-রিয্ওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে প্রথম কথা হল, লোকে যে বৃক্ষটিকে রিয্ওয়ান বৃক্ষ মনে করত, সেটি আসলেই সেই বৃক্ষ কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, যেমন বুখারী শরীফের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়।[২০১]

---

২০০. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৩৯৯৮

২০১. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৪১৬২, ৪১৬৪, ৪১৬৫

তাতে আছে, হযরত উমর রাযি. বলেছিলেন, আমার তো খবর নেই সে গাছ কোন্‌টি, তোমাদের জানা থাকলে বলো। অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে সে গাছটির কথা স্মরণ নেই। তোমাদের স্মরণ থাকলে বলো। লোকে যেহেতু সুনির্দিষ্টভাবে সেটিকেই মনে করত, অথচ সেটি সন্দেহপূর্ণ, তাই হযরত উমর রাযি.-এর নির্দেশে সেটি কেটে ফেলা হয়েছিল।[২০২]

দ্বিতীয় কারণ এমনও হতে পারে যে, তার আশঙ্কা বোধ হয়েছিল, কালক্রমে লোকে এটিকে ওরশের জায়গা বানিয়ে নেবে। সেই আশঙ্কাতেই তিনি কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সব স্মৃতিই মুছে ফেলতে হবে। আপনারা লক্ষ করে থাকবেন, আমি যেসকল রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছি, তা সবই নবী-রাসূল ও বুযুর্গানে দ্বীনের স্মৃতিকে বরকত হিসেবে গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করে।[২০৩]

নবীগণের স্মৃতিসমূহ দ্বারা বরকত লাভের অর্থ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও বস্তুরাজিকে তাবাররুক মনে করার অর্থ কেবল এতটুকুই যে, তার মাধ্যমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে এবং তা দ্বারা বরকত হাসিল করবে। এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনের কোনও অবকাশ নেই। অর্থাৎ তাকে যদি মাবূদ মনে করা হয় বা তার ইবাদত-উপাসনা শুরু করে দেওয়া হয়, কিংবা তা স্পর্শ করাকে ওয়াজিব ও ছাওয়াবের কাজ মনে করা হয়, তবে স্পষ্টতই তা শরী'আত-বিরোধী কাজ।

হযরত উমর ফারূক রাযি. এই আশঙ্কাই করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে এটা সীমালঙ্ঘনের কারণ হতে পারে আর সেজন্যই তিনি নিষেধ করেছিলেন। তাঁর নিষেধাজ্ঞার কারণ আসলে তাবাররুক বলতে যে কিছু নেই তা নয়। তিনি তো 'হাজারে আসওয়াদ'-কে লক্ষ্য করেও

---

২০২. মুসান্নাফে ইবন আবী শায়বা, ১৫০; আত-তাবাকাতুল- কুবরা, ১০০; ফতহুল-বারী, ৪৪৮; উমদাতুল-কারী, ১৯১

২০৩. উমদাতুল-কারী, ৫৩৬

বলেছিলেন "আমি জানি তুমি কেবলই একটা পাথর। তোমার কোনও উপকার-অপকার করার ক্ষমতা নেই। আমি তোমাকে চুমো দিচ্ছি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুমো দিতে দেখেছি বলে।[২০৪]

তাঁর দৃষ্টি ছিল মানুষের সীমালঙ্ঘন প্রবণতার দিকে। পাছে ভবিষ্যতে কেউ এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকার হয়ে পড়ে। তিনি নিষেধ করেছিলেন কেবল এ কারণেই। কাজেই এর এই অর্থ নেওয়া ঠিক নয় যে, তাঁর নিকট তাবাররুক বলতে কিছু ছিল না বা তিনি একে নাজায়েয মনে করতেন।

তাবাররুক নির্মূলের চেষ্টা একটি চরম বাড়াবাড়ি

সুতরাং তাবাররুক ও স্মৃতিচিহ্নসমূহ নির্মূলের প্রচেষ্টা দ্বীনের নামে একটি চরম বাড়াবাড়ি এবং সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণেরও পরিপন্থী। সেই সঙ্গে হঠকারিতাও বটে। এ কথা সত্য যে, তাবাররুককে তাবাররুকের সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। একে উপকার ও অপকারের ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা, এর ইবাদত শুরু করে দেওয়া কিংবা এত বেশি সম্মান দেখানো, যা ইবাদতুল্য হয়ে যায়, তা কিছুতেই অনুমোদনযোগ্য নয়; বরং তা সুস্পষ্ট সীমালঙ্ঘন ও শরী'আত-বিরোধী কাজ। ক্ষেত্রবিশেষে এটা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কাজেই যেসব জায়গায় এরূপ সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকে, সেখানে মানুষকে এর থেকে বিরত রাখতে হবে এবং তাদেরকে সীমার ভেতর রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর যেখানে তা সম্ভব হবে না, সেখানে সীমালঙ্ঘনের পথ বন্ধ করার জন্য বিলকুল নিষেধও করে দেওয়া যেতে পারে। তবে এটা কেবল সেখানেই, যেখানে মানুষ সীমা রক্ষা করবে না। এভাবে স্থান-কাল বিচার না করে সাধারণভাবে তাবাররুককে শিরক সাব্যস্ত করা এবং জেনে-শুনে সব স্মৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা করা একটা চরম বাড়াবাড়ি। এটা কতই না

---

২০৪. সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ৮৬০; সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ১৫৯৭, ১৬০৫, ১৬১০

হৃদয়বিদারক কাজ যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিসমূহকে এক-এক করে মুছে ফেলা হচ্ছে!

রওযা মুবারকও তো তোমাদের ক্ষমতার ভেতর। একসময় তো মানুষ এখানেও শিরক করত, এখানেও নানা রকম বিদ'আতী কাজ করত। তোমরা এ ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নিয়েছ যে, সার্বক্ষণিক প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছ, যাতে কেউ এসব করতে না পারে। এখন কি কারও সাধ্য আছে যে, পবিত্র রওযার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে? সীমালঙ্ঘন ও শিরকের আশঙ্কায় পবিত্র রওযাকে তোমরা বন্ধ করে দাওনি। এখানে যাতে কেউ যেতে না পারে সে ব্যবস্থা নাওনি। যেতে ঠিকই দিচ্ছ, তবে শরী'আত-বিরোধী কাজ যাতে করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিয়েছ। একই ব্যবস্থা তোমরা অন্যান্য স্মৃতিস্থানেও নিতে পারতে। যাতে কেউ বাড়াবাড়ি করতে বা বিদ'আতে লিপ্ত হতে না পারে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। তা না করে স্মৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে এবং এ কাজকে যথারীতি একটা মিশন বানিয়ে ফেলা হয়েছে! এটা যে কত বড় নির্মমতা তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এ উম্মত চৌদ্দশ বছর অবধি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিসমূহ সংরক্ষণ করেছে। একেকটি স্মারককে নিজেদের বুকে আগলে রেখেছে। ভালোবাসার এমন নিদর্শন অন্য কোনও জাতি পেশ করতে পারবে না। বরং তাদের পক্ষে এর কল্পনাও সম্ভব না। হযরত আবূ বকর রাযি.-এর দরজাকে সংরক্ষণ করেছে। এ সংরক্ষণ শিরকের জন্য নয়। এটা প্রেম ও মহব্বতের ব্যাপার। ইশক ও মহব্বত বলতে একটা জিনিসও তো আছে। এসব স্মৃতির সাথে উম্মতের রয়েছে প্রাণের সম্পর্ক। এগুলো দেখলে তাদের নজর চলে যায় দূর অতীতের ঘটনাবলির দিকে। তাদের মনে পড়ে যায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন। এসব স্মৃতি তাদের মানুষচক্ষে নবী-সত্তাকে ভাস্বর করে তোলে। আর এভাবে তাদের মন-প্রাণে আল্লাহপ্রেম ও রাসূলের ভালোবাসা পায় নতুন মাত্রা।

চৌদ্দশ বছর ধরে যেসব স্মৃতি সংরক্ষণ করা হয়েছে, কিছুকালের মধ্যে তা উপড়ে ফেলা হল। তারা ক্ষমতায় আসার পর এক-একটি করে তা মুছে ফেলতে শুরু করল। একসঙ্গে সব খতম করেনি। একেকটি করে ধরেছে। চিন্তা করেছে একবারে সব ধরলে মানুষ রুখে দাঁড়াবে, বিক্ষুব্ধ হবে। তাই একেকটি করে বিলুপ্ত করেছে। একবার একটা ধরেছে তো কিছুদিন পর আরেকটা। এভাবে ক্রমান্বয়ে সবগুলো স্মৃতি শেষ করে ফেলেছে। একটিও বাকি রাখেনি।

নির্ভরযোগ্য-স্মৃতিরাজি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন স্মৃতি বিভিন্ন স্থানে এখনও সংরক্ষিত আছে। পৃথিবীর বহু জায়গায় তাঁর নামে কথিত বহু তাবাররুক পাওয়া যায়। তবে ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত তাবাররুকসমূহই সর্বাপেক্ষা বেশি নির্ভরযোগ্য। তার মধ্যে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জোব্বা, তাঁর দু'টি তরবারি, তাঁর একটি পতাকা। প্রকাশ থাকে যে, সেটি বদরের যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং আরও আছে তাঁর পবিত্র চুল, দাঁত, মিসরের বাদশাহ মুকাওকিসের নামে লেখা চিঠি এবং তার সীল।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি দ্বারা জানা যায় যে, এসব তাবাররুক আব্বাসীয় খলিফাদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। হাত বদল হতে হতে তা সর্বশেষ খলিফা মুতাওয়াক্কিলের যিম্মায় আসে। তিনি বড় দুর্বল শাসক ছিলেন। শেষ দিকে তিনি মিসরে চলে আসেন এবং মামলুক শাসকদের আশ্রয়ে জীবন-যাপন করতে থাকেন। দেশ পরিচালনায় তার কোনও ক্ষমতা ও এখতিয়ার ছিল না। হিজরী দশম শতাব্দীতে হিজায ও মিসর উছমানী শাসক প্রথম সালীমের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং তাকে "খাদেমুল-হারামায়ন" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তখন আব্বাসী খলিফা মুতাওয়াক্কিল 'খিলাফত'-এর পদও সুলতান সালীমের হাতে ন্যস্ত করেন। সেই সঙ্গে এ পদের সনদস্বরূপ 'হারামায়ন' শরীফ ও পবিত্র স্থানসমূহের চাবি এবং তাবাররুকসমূহও তার হাতে অর্পণ করেন। এরপর থেকেই

উছমানী সুলতানগণ খলিফা ও আমীরুল-মুমিনীনরূপে বরিত হন। সমগ্র মুসলিম জাহান অবিসংবাদিতভাবে তাদের এ মর্যাদা স্বীকার করে নেয়।

এভাবেই হিজরী দশম শতাব্দীতে সুলতান সালীম এ তাবাররুকসমূহ মিসর থেকে ইস্তাম্বুল নিয়ে আসেন এবং 'তোপ কাপে সারায়ে'[২০৫] নামক দূর্গের ভেতর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং এজন্য প্রাসাদের ভেতর একটি আলাদা কক্ষ তৈরি করেন। এসব তাবাররুকের প্রতি সুলতানের যে কী পরিমাণ ভক্তি-ভালোবাসা ছিল তা এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং সুলতানের নিজের কর্মপন্থার দিকে লক্ষ করলেই অনুমান করা যায়। সুলতান সালীম তাঁর জীবদ্দশায় যতদিন ইস্তাম্বুলে থাকতেন নিজ হাতে কক্ষটি ঝাড়-পোছ করতেন। এ কক্ষে যাতে সর্বক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত

---

২০৫. 'তোপ কাপে সারায়ে' ইস্তাম্বুলের একটি বিশাল দূর্গ। তুর্কি ভাষায় সারায়ে অর্থ প্রাসাদ এবং 'কাপে' অর্থ দরজা। সুতরাং 'তোপ কাপে সারায়ে' অর্থ হয় এমন প্রাসাদ, যার ফটকে তোপ স্থাপিত আছে। বায়জান্টাইন আমলে এখানে একটি দরজা ছিল, যা দিয়ে কন্‌স্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল)-এ প্রবেশ করা হতো। তখন এর নাম ছিল 'রুমানূস দরজা'। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ যখন কনস্টান্টিনোপলে আক্রমণ করেন, তখন মুসলিম সৈন্যগণ এই প্রবেশ দ্বারে একটি ভারি কামান স্থাপন করেছিল। তাদের গোলার আঘাতে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এ দরজাটিই। সুলতান মুহাম্মাদ এ দরজা দিয়েই নগরে প্রবেশ করেছিলেন। এ কারণেই দরজাটি 'তোপ কাপে' বা তোপ দরজা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এখানে একটি প্রাসাদও নির্মাণ করা হয়। উছমানী আমলে (সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ থেকে সুলতান আব্দুল মাজীদের আমল পর্যন্ত) এ প্রাসাদ সুলতানদের বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রাসাদটির নাম রাখা হয় 'তোপ কাপে সারায়ে' বা 'তোপদ্বার প্রাসাদ (যেমন সিংহদ্বার প্রাসাদ)। হাল আমলে এটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন ছাড়া যাদুঘর হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। মূল্যবান ও বিরল সংগ্রহের দিক থেকে এটি বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ যাদুঘর হিসেবে গণ্য। সুলতান সালিম এই প্রাসাদের ভেতর একটি স্বতন্ত্র কক্ষ তৈরি করে তাতে মিসর থেকে নিয়ে আসা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবাররুকসমূহ সংরক্ষণ করেছিলেন।
হযরত তাকী উছমানী (দা. বা.)-এর সফরনামা 'জাহানে দীদাহ'- থেকে উদ্ধৃত।

হয় সেজন্য কয়েকজন হাফেয নিযুক্ত করেছিলেন, যারা পালাক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। একদল হাফেয তিলাওয়াত শেষ করার আগে-আগেই আরেক দল শুরু করে দিত। এভাবে দিবারাত্র সর্বক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত চলত। পরবর্তী খলিফাগণও এ নিয়ম বহাল রেখেছিলেন। সারা বিশ্বে এটাই একমাত্র জায়গা, যেখানে চারশ' বছর পর্যন্ত অবিরাম কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত চলেছে; এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ থাকেনি। খিলাফতের বিলোপ সাধনের পর মোস্তফা কামাল পাশা এ নিয়মও বিলুপ্ত করে দেয়। তাবাররুকগুলিকে অত্যন্ত মূল্যবান কাঠের বাকসে রাখা হয়েছে। বছরে মাত্র একবার রমাযানের সাতাশ তারিখের রাতে বাইরে এনে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তাছাড়া সারা বছর তা বাকসের মধ্যে আটকা থাকে। ব্যস কেবল বাকসটিই দেখা যায়। তা সে বাকস দেখতে পারাটাও একটা বড় নি'আমত বৈকি! তাবাররুকধারী সে বাকসটি দেখতে ও ছুঁতে পারাও কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

সনদ ও সূত্র বিচারে এসব তাবাররুক যে মানেরই হোক না কেন, যেহেতু তার সত্যতা ও বিশুদ্ধতার অবকাশ রয়েছে, তাই একজন উম্মতের জন্য সেই সম্ভাবনাও কি কম গুরুত্বপূর্ণ?

এ কক্ষের ভেতর আরও কিছু তাবাররুক শোকেসে সাজানো রয়েছে, যা স্বচ্ছ গ্লাস থেকে দেখা যায়। তার মধ্যে একটি তরবারি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, সেটি হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ব্যবহৃত। চারটি তরবারি চার খুলাফায়ে রাশিদীনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। তাছাড়া আরও কয়েকটি তরবারি আছে। কথিত আছে, সেগুলি হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযি., হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি., হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির রাযি. ও হযরত আবুল হুসায়ন রাযি.-এর ব্যবহৃত। কক্ষের এক দিকে আছে কা'বা শরীফের দরজার অংশ বিশেষ, কা'বা শরীফের তালা ও চাবি, মীযাবে রহমতের দু'টি টুকরা এবং একটি থলি, যার ভেতর এক কালে হাজারে আসওয়াদ রক্ষিত ছিল। রওযা মুবারকের কিছু মাটিও সেখানে আছে। কিন্তু মুহাক্কিকদের মতে তরবারিগুলি যথেষ্ট প্রমাণ নির্ভর

নয়। যাদের নামে প্রকাশ, আসলেই এগুলো তাদের ব্যবহৃত কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে।[২০৬]

হযরত আনাস রাযি. ওসিয়ত করেছিলেন, আমার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চুল সংরক্ষিত আছে। আমার মৃত্যুর পর সেটি আমার মুখের ভেতর রাখবে এবং সে অবস্থায়ই আমাকে দাফন করবে। সুতরাং তাঁর ওসিয়তমতো তাকে এভাবেই দাফন করা হয়। এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের স্মৃতিসমূহকে বরকত হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

---

২০৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য জাহানে দীদাহ, পৃষ্ঠা ৩৩৮

রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদও এক নি'আমত*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ.

অর্থ : সর্বাপেক্ষা কঠিন বিপদাপদ নবীগণেরই আসে, তারপর যারা নবীগণের অনুসরণে বেশি অগ্রগামী তাদের এবং তারপর যারা তাদের পরবর্তী পর্যায়ের।[২০৭]

অর্থাৎ এভাবে নবীগণের অনুসরণে অগ্রগামিতার ক্রমানুসারেই বালা-মসিবতের ন্যূনাধিক্য হয়ে থাকে।

যন্ত্রণা-পীড়িতদের জন্য সুসংবাদ

যারা বিভিন্ন রকম দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মসিবতের ভেতর দিন কাটায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখে, কষ্ট-ক্লেশ দূর করার জন্য তাঁরই শরণাপন্ন হয় এবং তাঁর কাছেই ফরিয়াদ জানায়,

---

* ইসলাহী খুতবাত, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১০৭-১২৭

২০৭. কানযুল উম্মাল, হাদীছ নং ৬৭৮৩

তাদের জন্য এ হাদীছ এক সুসংবাদ ও সান্ত্বনাবাণী। এ হাদীছ জানাচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহব্বতের নিদর্শন এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের আলামত হিসেবেই এ কষ্ট দিয়ে থাকেন। এ কষ্ট তাঁর অসন্তুষ্টির প্রকাশ নয়।

দুঃখ-কষ্ট দু'প্রকার

দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, অভাব-অনটন, বিপদাপদ ইত্যাদি যত রকমের পেরেশানি ইহজীবনে দেখা দেয় দু'প্রকার হয়ে থাকে। এক প্রকার পেরেশানি এমন, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ দেওয়া হয়। গুনাহের আসল সাজা তো আখিরাতেই হবে। কিন্তু অনেক সময় দুনিয়াতেও তা দিয়ে থাকেন, যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'এবং (আখিরাতের) সেই বড় শাস্তির আগে আমি (দুনিয়ায়) তাদেরকে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও গ্রহণ করাব, যাতে তারা তাদের দুষ্কর্ম থেকে ফিরে আসে।[২০৮]

আর দ্বিতীয় প্রকারের পেরেশানি এমন, যা দ্বারা বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। বান্দা যাতে আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে এবং বাড়তি ছাওয়াব ও পুরস্কারপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়ে ওঠে, সে লক্ষ্যেও আল্লাহ তা'আলা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ দিয়ে থাকেন।

উভয় প্রকার দুঃখ-কষ্ট চেনার আলামত

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে উভয় প্রকার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে প্রভেদ করার উপায় কী? কিভাবে বোঝা যাবে কোন কষ্ট প্রথম প্রকারের এবং কোনটা দ্বিতীয় প্রকারের? হাঁ উভয়ের জন্য পৃথক-পৃথক আলামত আছে, যা দেখে কোনটা কোন প্রকারের তা নিরূপণ করা সম্ভব।

---

২০৮. সাজদা, আয়াত ২১

বিপদাপদে পড়ে মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন না হয়, উল্টো বিপদের কারণে সে তাকদীরকে দোষারোপ করে, যেমন বলল, এই বিপদের জন্য বুঝি আমাকেই পাওয়া গিয়েছিল? এত বড় বিপদ আমার উপর কেন? ইত্যাদি-ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহ!) এতদসঙ্গে আমলেও অবহেলা শুরু করে দেয়, আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম পালন করা ছেড়ে দিতে থাকে, উদাহরণত আগে নামায পড়ত, এখন দুঃখ-কষ্টের অজুহাতে নামায পড়া ছেড়ে দিয়েছে, আগে নিয়মিত যিকির-আয্‌কার করত, এখন আর তা করে না এবং এমনিভাবে দুঃখ-কষ্টের অবসানকল্পে যদি বাহ্যিক আসবাব-উপকরণ অবলম্বন করে, কিন্তু তাওবা-ইস্‌তিগফার না করে এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজূ' ও তাঁর কাছে দু'আ না করে, তবে বুঝতে হবে এ বিপদ প্রথম প্রকারের। অর্থাৎ তাঁর এই কর্মপন্থাই এ কথার আলামত যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ বিপদাপদ তার পাপের শাস্তিস্বরূপই দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুমিনকে এর থেকে রক্ষা করুন।

পক্ষান্তরে দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও সে যদি আল্লাহর অভিমুখী থাকে এবং তাঁর কাছে দু'আ করে– হে আল্লাহ! আমি বড় দুর্বল। এ কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না, আপনি নিজ রহমত ও দয়ায় আমাকে এ কষ্ট থেকে মুক্তি দিন, সেই সঙ্গে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে কষ্ট অনুভব করে বটে, কিন্তু অন্তরে সে কারণে অভিযোগ আনে না, মুখে তো উচ্চারণ করেই না, হ্যাঁ, দুঃখ-বেদনার প্রকাশ হয় ঠিক, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে কোনও আপত্তিকর কথা বলে না, তাকদীর সম্পর্কে অনুচিত মন্তব্য করে না; বরং কষ্টের কারণে আগের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার দিকে আরও বেশি রুজূ' হয়, আগের চেয়ে বেশি নামায পড়ে, বেশি যিকির-আয্‌কার করে এবং বেশি বেশি দু'আ করে, তবে এসব দ্বিতীয় প্রকারের দুঃখ-কষ্টের আলামত। অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝা যাবে তার এ দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ তা'আলার রহমতস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান এবং তাকে বাড়তি ছাওয়াব ও পুরস্কারের যোগ্য বানাতে চান। সুতরাং এ কষ্টও তার জন্য আল্লাহ তা'আলার

রহমত। এটা তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও ভালোবাসার পরিচায়ক।

দুঃখ-কষ্ট থেকে কোনও লোকই মুক্ত নয়

প্রশ্ন হতে পারে, কেউ যখন কাউকে ভালোবাসে, তখন সেই ভালোবাসার দাবিতে তাকে তো আরাম ও সুখ-শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কাজেই কোনও বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার মহব্বত থাকলে তাকে তো আরাম-আয়েশেই রাখার কথা, উল্টো তাকে কষ্ট দেন কেন? এর উত্তর বোঝার আগে দুনিয়ার স্বরূপ উপলব্ধি করা চাই।

এ দুনিয়া এমন এক জায়গা, যেখানে কোনও লোকই কষ্টবিহীন জীবন লাভ করতে পারে না। এমন কোনও লোক নেই, যে কখনও কোনও কষ্ট, কোনও আঘাত ও কোনও রকম পেরেশানিতে পড়েনি। কোনও নবী হন বা অলী, সূফী-সাধক হন বা রাজা-বাদশাহ, ক্ষমতাবান লোক হোক বা বিত্তবান, কারও পক্ষেই দুনিয়ায় ঝক্কিবিহীন জীবন-যাপন সম্ভব হয়নি, তা সম্ভবও নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইহজগতকে বানিয়েছেনই সুখ-দুঃখ, আরাম-কষ্ট ও আনন্দ-বিষাদের সংমিশ্রণ দিয়ে। উভয় অবস্থায়ই পাশাপাশি থাকবে। অবিমিশ্র সুখের জায়গা এ জগৎ নয়। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, যে সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

'সেখানে তাদের কোনও ভয় নেই এবং সেখানে তাদের কোনও দুঃখও থাকবে না।'[২০৯]

প্রকৃত সুখ ও আনন্দের জায়গা কেবল জান্নাতই। দুনিয়া তো এমন এক জায়গা, যেখানে কখনও আনন্দ থাকবে, কখনও বেদনা, কখনও ঠান্ডা থাকবে, কখনও গরম এবং কখনও রোদ, কখনও ছায়া। এক অবস্থা কিছুতেই থাকবে না। কাজেই ইহজগতে কোনও ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব থাকবে তা সম্ভবই নয়।

---

২০৯. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. তাঁর 'মাওয়ায়েয' এ বলেন, একবার হযরত খাযির আলাইহিস সালামের সাথে এক ব্যক্তির দেখা হয়ে গেল। লোকটি তাঁর কাছে আরয করল, হযরত! আমার জন্য দু'আ করুন, জীবনে যেন কোনও দুঃখ-কষ্টে পড়তে না হয়। সারা জীবন যেন নিশ্চিন্তে কাটাতে পারি।

হযরত খাযির (আ.) বললেন, এ দু'আ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। কেননা দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্ট থাকবেই। হ্যাঁ, একটা কাজ করতে পারি। তা এই যে, তুমি দুনিয়ায় এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করো যাকে তোমার সর্বাপেক্ষা কম দুঃখী মনে হয়। তারপর আমাকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জানাবে। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করব, যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তার মতো বানিয়ে দেন।

লোকটি খুব খুশী হল। সে ভাবল দুনিয়ায় খুঁজলে সুখী লোক তো কাউকে না কাউকে পাওয়াই যাবে। ব্যস আমি আমাকে তাঁর মতো করে দেওয়ার জন্য দু'আ করতে বলব। সে দ্রুত সন্ধানে বের হয়ে পড়ল। কখনও একজন সম্পর্কে ধারণা করে নেয়, সে একজন সুখী লোক। মনে মনে ভাবে, আমি তার মতো করে দেওয়ার জন্য দু'আ চাব, তারপর আরেকজনকে দেখে আরও বেশি ধনবান। তখন সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলে এবং এই দ্বিতীয় ব্যক্তির মতো দু'আ করানোর ফয়সালা নেয়। এভাবে সে একেকজনকে দেখে আর সিদ্ধান্ত বদলাতে থাকে। দীর্ঘকাল সে এরকম অনুসন্ধানে লেগে থাকল। পরিশেষে সে এক জহুরী (রত্নবণিক)-এর সন্ধান পেল। সে সোনা-রুপা, মণি-মুক্তা ও বিভিন্ন রকম বহুমূল্য পাথরের ব্যবসা করত। বড় জমকালো তার দোকান এবং শানদার বাড়ি। চাকর-নকরে সে বাড়ি সদা সরগরম। কী সুন্দর স্বাস্থ্যবান তার পুত্র, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আরও আছে দামী বাহন এবং আরাম-আয়েশের সব উপকরণ। বাহ্য অবস্থা দৃষ্টে তাকে একজন বড় সুখী মানুষই মনে হয়। কাজেই মনস্থির করে ফেলল, এই ব্যক্তির মতো বানিয়ে দেওয়ার জন্যই দু'আ চাইবে। ফিরে আসবে এমন সময় তার

মনে হল, এই ব্যক্তির বাহ্য অবস্থা তো খুব ভালোই লাগল, কিন্তু ভেতরে তার কোনও রোগ-ব্যাধি বা পেরেশানি আছে কি না তা তো জানি না। সে খবরটাও নেওয়া উচিত। কাজেই জহুরীকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো যে, সে বাস্তবিকপক্ষে কেমন আছে?

লোকটি জহুরীর কাছে গেল এবং তাকে বলল, ভাই দেখতে তো তোমাকে বড় সুখী মানুষ মনে হচ্ছে। সম্পদের অভাব নেই। চাকর-বাকর, আসবাব-উপকরণ সবকিছুতে সমাকীর্ণ তোমার বাড়ি। আমি জানতে চাচ্ছি প্রকৃতই তুমি সুখী কি? না কি ভেতরে তোমার কোনও রকম রোগ-ব্যাধি ও পেরেশানি আছে, যদ্দরুন তোমার জীবন অতিষ্ঠ?

জহুরী তাকে নিভৃত স্থানে নিয়ে গেল। তারপর বলল, তুমি হয়তো ভাবছ আমি বড় সুখী, তা ভাবাই স্বাভাবিক। কারণ আমার প্রচুর অর্থ-সম্পদ। চাকর-বাকর আমার হুকুম পালনে সদাব্যস্ত। বাহ্যত কোনও কিছুর অভাব আমার নেই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমি জানি না দুনিয়ায় আমার চেয়ে বেশি অসুখী ও দুঃখী মানুষ আর কেউ আছে কি না। তারপর সে তার স্ত্রীর চারিত্রিক অধঃপতনের যে ঘটনা শোনাল তা বড়ই হৃদয়-বিদারক। বলল, এই যে রূপবন্ত ঝকমকে যুবকটিকে দেখছ, আসলে কিন্তু সে আমার পুত্র নয়। বুঝতেই পারছ কী যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছি। প্রতিটি মুহূর্ত আমি দুঃখের আগুনে দগ্ধ হচ্ছি। আমার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ তো কেউ দেখে না, তাই বাহ্য অবস্থা দেখে সবাই ভাবে আমি মহা সুখে আছি। সাবধান! আমার মতো হওয়ার দু'আ কিছুতেই করাতে যেয়ো না। এতক্ষণে সেই লোকের মনশ্চক্ষু খুলল। সে বুঝতে পারল, আসলে যত বিত্তবান ও আয়েশী লোকদের দেখা যায়, তারা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়েই দিন কাটাচ্ছে।

দ্বিতীয়বার যখন হযরত খাযির (আ.)-এর সাথে তার সাক্ষাত হল, তিনি বললেন, হ্যাঁ, বলো তুমি কার মতো জীবন চাচ্ছ? আমি তো দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত এমন কোনও লোকের দেখা পেলাম না, যার মতো হওয়ার জন্য দু'আ করতে বলব।

হযরত খাযির (আ.) বললেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম, এ জগতে দুঃখ-দুশ্চিন্তাহীন কোনও লোক নেই। থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আমি তোমার জন্য দু'আ করছি, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আফিয়াত ও নিরাপত্তার জীবন দান করুন।

প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা সম্পদ দেওয়া হয়েছে

ইহজগতে সম্পূর্ণ দুঃখ-কষ্টহীন জীবন কারও হতেই পারে না? হাঁ এ কথা ঠিক যে, কারও কষ্ট কম, কারও বেশি এবং একজনের একরকম কষ্ট, অন্যজনের অন্যরকম। আল্লাহ তা'আলা ইহজগতের ব্যবস্থাটাই করেছেন এমন যে, এখানে একজনকে এক রকমের সম্পদ দান করেছেন তো অন্যরকম সম্পদ থেকে তাকে বঞ্চিত রেখেছেন। একজনকে সুস্বাস্থ্য দিয়েছেন, কিন্তু তার টাকা-পয়সা তেমন নেই। আবার একজনের বিপুল অর্থ-কড়ি, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো থাকে না; নানা রকম রোগ-ব্যাধিতে জর্জরিত। কারও দেখা যায় পারিবারিক অবস্থা শান্তিপূর্ণ কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা সংঘাত পীড়িত, আবার কারও অর্থনৈতিক দিক ঝঞ্ঝাটমুক্ত কিন্তু পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত। মোটকথা প্রত্যেকেরই ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও কষ্টের ভেতর আছে। কাজেই কষ্ট থাকাটা খারাপ কিছু নয়। লক্ষণীয় হচ্ছে কষ্টের প্রকারটা, প্রথম প্রকারের কষ্ট হলে সেটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পাপের শাস্তি। সেজন্য অবিলম্বে তাওবা-ইস্তিগফারে রত হওয়া চাই। আর দ্বিতীয় প্রকারের কষ্ট হলে বুঝতে হবে তা তার পক্ষে আল্লাহর রহমত এবং ছাওয়াব ও পুরস্কার লাভের কারণ।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দুঃখ-কষ্ট কেন?

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا

'আল্লাহ তা'আলা যখন কোনও বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তার উপর বিভিন্ন রকমের বালা-মসিবত ঢেলে দেন।[২১০]

---

২১০. কানযুল-উম্মাল, হাদীছ নং ৬৮১১; জামিউল-আহাদীছ, হাদীছ নং ১১২৯; সুয়ূতী, আল-জামিউল-কাবীর, হাদীছ নং ১১৪০

বিপদাপদ তার উপর বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতে থাকে। কোনও কোনও রিওয়ায়েতে আছে, ফিরিশতাগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া আল্লাহ! এই ব্যক্তি তো আপনার প্রিয় বান্দা, বড় ভালো মানুষ। আপনাকে ভালোবাসে। তা সত্ত্বেও তার উপর এত কষ্ট-ক্লেশ কেন বর্ষণ করছেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ বান্দাকে এ অবস্থায়ই থাকতে দাও। কেননা তার দু'আ, কান্নাকাটি ও উহ্-আহ্ ধ্বনি শুনতে আমি ভালোবাসি। এ হাদীছ সনদের বিচারে যদিও দুর্বল, কিন্তু এই অর্থের আরও বহু হাদীছ আছে, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দার কাছে যাও এবং তাকে বিপদাপদে ফেলো। কেননা আমি তার উহ্-আহ্ ও কান্নাকাটির আওয়াজ পসন্দ করি। তো কথা ওই একটাই যে, দুনিয়ায় বিপদাপদ আছেই। আর নেক লোকদের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ তো আমার প্রিয় বান্দা। আমি কষ্ট-ক্লেশকে তার জন্য স্থায়ী শান্তির অছিলা বানাতে চাই। আমি এর মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চাই এবং আখিরাতে সে যখন আমার সাথে মিলিত হবে আমি চাই সে গুনাহ হতে বিলকুল পবিত্র হয়ে মিলিত হোক। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নেককার বান্দাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দান করেন।

সবরকারীদের পুরস্কার

এ জগতে আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালাম অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার বেশি প্রিয় আর কেউ নেই এবং থাকতে পারে না। অথচ হাদীছ শরীফে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

সর্বাপেক্ষা কঠিন বিপদাপদ আসে নবীদের উপর, তারপর যারা তাদের অনুসরণে অগ্রগামী তাদের উপর এবং তারপর তাদের পরবর্তী স্তরের লোকদের উপর।[২১১]

---

২১১. কানযুল-উম্মাল, হাদীছ নং ৬৭৮৩

অর্থাৎ অনুসরণ অনুকরণে যারা নবীদের যত বেশি নিকটবর্তী সেই ক্রমানুসারেই তাদের উপর বালা-মসিবত এসে থাকে। যে যত বেশি নিকটবর্তী তার উপর বালা-মসিবতও তত বেশি আসে।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দেখুন। তিনি আল্লাহ তা'আলার এত বেশি প্রিয় ছিলেন যে, তার উপাধিই ছিল খলীলুল্লাহ- আল্লাহর বন্ধু। অথচ কত বড়-বড় বিপদ তার উপর দিয়ে গেছে। কত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে। তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। পুত্র যবাহের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। আদেশ করা হয়েছে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে জনমনুষ্যহীন এবং গাছপালা ও পানিশূন্য উপত্যকায় রেখে আসো। তা এত বড় বড় কষ্ট এবং এতসব কঠিন পরীক্ষায় তাঁকে কেন ফেলা হল? তা ফেলা হয়েছিল তিনি আল্লাহ তা'আলার বন্ধু বলেই। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। সুতরাং কিয়ামতের দিন যখন এসব কষ্টের বিনিময়ে সর্বসমক্ষে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে এবং এমনিভাবে আরও যারা ইহজীবনে দুঃখ-কষ্টে সবর করেছে তারাও পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে, তখন বোঝা যাবে এসব দুঃখ-কষ্টের কী মূল্য। সেই পুরস্কারের বিপরীতে তখন এসব কষ্ট কোনও কষ্টই মনে হবে না; বরং তারা ইহজীবনের সব দুঃখ-বেদনার কথা সেদিন ভুলে যাবে।

এক হাদীছে আছে, ইহজীবনের দুঃখ-কষ্টে যারা সবর করেছে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করবেন, তখন অন্যসব লোক তা দেখে আক্ষেপ করবে আর বলবে, আহা দুনিয়ায় যদি কাঁচি দ্বারা আমাদের চামড়া কেটে ফেলা হতো আর আমরা তাতে সবর করতাম, তবে তো আমরাও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয়ে যেতাম![২১২]

দুঃখ-কষ্টের উৎকৃষ্ট উদাহরণ

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, আল্লাহপ্রদত্ত এসব কষ্ট-ক্লেশকে অপারেশনের কষ্টের সাথে তুলনা করা

---

২১২. যাদুল মা'আদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭৩

যায়। কারও শরীরে যদি এমন কোনও রোগ দেখা দেয়, যার চিকিৎসা অপারেশন ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে ডাক্তার অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, তবে সেই রোগী অপারেশনের কঠিন কষ্টের কথা জেনেও ডাক্তারকে শীঘ্র অপারেশন করে দেওয়ার জন্য তাগাদা দেয়। প্রয়োজনে অন্যদের দিয়ে সুপারিশও করায়। অপারেশনের যে মোটা অংকের ফি, তাও খুশী মনে বহন করে, অর্থাৎ তার শরীরে ছুরি চালানোর জন্য সে ডাক্তারকে টাকা দেয়। কেন সে এসব করে? এই জন্য করে যে, সে জানে অপারেশনের কষ্ট সাময়িক, কিছুদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু অপারেশনের ফলে যে আরোগ্য লাভ হবে, সেটা অনেক বড় মূল্যবান। এতই মূল্যবান যে, তার বিনিময়ে টাকা-পয়সা খরচ ও এই সাময়িক কষ্ট কোনও ব্যাপারই নয়। আর ডাক্তার যে তাকে কাটাছেঁড়া করছে, তাতে বাহ্যিকভাবে তাকে কষ্ট দিলেও প্রকৃত পক্ষে তার অনেক বড় উপকার করছে। এই কষ্টদানের ভেতরই রোগীর প্রতি তার দরদ ও কল্যাণকামিতা নিহিত রয়েছে। কেননা এই অপারেশন ও কষ্টদানের মাধ্যমে সে তার আরোগ্যের ব্যবস্থা করছে ও তার জীবন রক্ষার উপায় অবলম্বন করছে।

অবিকল এ-রকমই আল্লাহ তা'আলা যখন কোনও বান্দাকে কষ্ট দেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তার অপারেশন চলে, যার মাধ্যমে বান্দাকে ভুল-বিচ্যুতি ও পাপাচারের আবলিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা হয়, যাতে কিয়ামতে যখন আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হবে, তখন এক নিষ্পাপ ও পবিত্র বান্দারূপেই মিলিত হয়।

কষ্ট-ক্লেশের আরও একটি উদাহরণ

কিংবা মনে করুন আপনার এক পরম বন্ধু আছে। দীর্ঘ দিন তার সাথে দেখা-সাক্ষাত নেই। মনে বড় আগ্রহ, যদি তার সঙ্গে দেখা হতো! আপনি সেই প্রতীক্ষাতেই আছেন। হঠাৎ এক অবকাশে বন্ধুটি আপনার কাছে আসল এবং চমকে দেওয়ার জন্য পেছন থেকে আপনাকে জাপটে ধরল। প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে তার সে ধরাটা এমন জোরেই হল যে, আপনার

হাঁসফাঁস লেগে গেল। পাঁজরও যেন ভেঙে যাবে। বলে উঠলেন, কে ভাই, ছাড়, ব্যথা লাগছে যে! সে বলল, আমি তোমার অমুক বন্ধু। ব্যথা লাগলে ঠিক আছে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে ধরছি, যাতে তোমার কষ্ট লাঘব হয়। তা আপনি তার এ কথায় কি খুশী হয়ে যাবেন? আপনি কি বলবেন, হ্যাঁ ছেড়ে দিয়ে এ ব্যথা থেকে আমাকে মুক্তি দাও। ভালোবাসায় আন্তরিক হলে বরং আপনি বলবেন, না বন্ধু কিছুতেই ছাড়বে না। তুমি আরও জোরে চেপে ধরো। দাও, আরও বেশি কষ্ট দাও। কতদিন ধরে প্রতীক্ষায় আছি আসবে। এত দিন পরে এলে। কী যে ভালো লাগছে। আরও বলবেন–

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

'তোমার তরবারিতে ধ্বংস হওয়ার সৌভাগ্য যেন তোমার শত্রুর না হয়। এই তো তোমার বন্ধুর মাথা রয়েছে। তোমান খঞ্জর এখানেই কেন পরখ করো না?

দুঃখ-কষ্টে ইন্নালিল্লাহ... পড়া

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে দুঃখ-কষ্ট আসে বস্তুত তা দ্বারা বান্দার মর্যাদাবৃদ্ধিই উদ্দেশ্য থাকে, সেই বান্দার মর্যাদা, যে সবর করে ও আল্লাহর দিকে রুজূ' হয়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ۟ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

'আর দেখো, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কখনও ভয়-ভীতি দ্বারা, কখনও ক্ষুধা দ্বারা এবং কখনও জান-মাল ও ফসলহানি দ্বারা। যেসব লোক এরূপ অবস্থায় সবরের পরিচয় দেয়, তাদেরকে

সুসংবাদ শোনাও। এরা হল আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। এরা সেইসব লোক, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুনা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হিদায়াতের উপর।[২১৩]

মোটকথা আল্লাহ তা'আলার নীতি এটাই যে, তিনি তার নেক বান্দাদেরকে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের কষ্ট-ক্লেশ দিয়ে থাকেন।

আমি বন্ধুদের কষ্ট দিই

আমার মহান পিতা হযরত মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী রহ. মাঝে মাঝে আবেগাপ্লুত হয়ে এই বায়েতটি পড়তেন–

ما پر ورمیم دشمن و مای کشیم دوست

کس را چوں و چرانہ رسد در قضاء ما

'অর্থাৎ অনেক সময় আমি আমার শত্রুদের লালন করি। পার্থিব জীবনে তাদেরকে বাড়-বাড়ন্ত করে তুলি। আর বন্ধুদেরকে কষ্ট দিই, পীড়ন করি। আমার সিদ্ধান্তে কারও কোনওরূপ আপত্তি তোলার এখতিয়ার নেই। আমার হিকমত ও রহস্য কার পক্ষে বোঝা সম্ভব?

একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. তাঁর 'মাওয়ায়েয'-এ একটি আশ্চর্য ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এক শহরে দু'জন লোক মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিল, একদম মুমূর্ষু অবস্থা। তাদের একজন মুসলিম অন্যজন ইহুদী। ইহুদীর মাছ খেতে ইচ্ছে জাগল। কিন্তু ধারে কাছে কোথাও মাছ পাওয়া যাচ্ছিল না। আর মুসলিম ব্যক্তিটির খেতে ইচ্ছে হয়েছিল যায়তুনের তেল। আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফিরিশতা ডাকলেন। একজনকে বললেন, অমুক শহরে এক ইহুদীর মৃত্যু আসন্ন। সে মাছ

---

২১৩. বাকারা : ১৫৫-১৫৭

খেতে চাচ্ছে। তুমি একটা মাছ নিয়ে তার বাড়ির পুকুরে ফেলে দাও, যাতে তারা সহজে সেটি পেয়ে যায় এবং লোকটি তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। দ্বিতীয় ফিরিশতাকে বললেন, অমুক শহরে এক মুসলিম মৃত্যু পথযাত্রী। তার শেষ ইচ্ছা যায়তুনের তেল খাবে, তার আলমারিতে যায়তুনের তেল আছে। তুমি গিয়ে সেই তেল কোথাও ফেলে দাও, যাতে সে তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে না পারে।

সুতরাং উভয় ফিরিশতা আপন-আপন কাজে বের হয়ে গেল। পথে উভয়ের দেখা। একে অন্যকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী কাজে যাচ্ছ? এক ফিরিশতা বলল, অমুক ইহুদীকে মাছ খাওয়াতে যাচ্ছি। অপরজন বলল, অমুক মুসলিমের যায়তুন তেল নষ্ট করতে চলছি, যাতে সে তা খেতে না পারে। উভয় ফিরিশতার আশ্চর্যবোধ হল। তাদেরকে এরকম পরস্পরবিরোধী দুই কাজ দিয়ে পাঠানো হল কেন? কিন্তু হুকুম যেহেতু আল্লাহ তা'আলার তাই প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। সুতরাং তারা প্রত্যেকে আপন-আপন কাজ সম্পাদন করল।

ফিরে এসে রিপোর্ট করার সময় তারা আরয করল, ইয়া আল্লাহ! আমরা আপনার আদেশ তো পালন করে এসেছি, কিন্তু এ বিষয়টা আমাদের বুঝে আসছে না যে, একজন মুসলিম মুমূর্ষু, যে কিনা আপনার অনুগত ছিল, তার শেষ ইচ্ছা ছিল যায়তুনের তেল খাবে এবং যে তেল তার কাছে ছিলও, তা সত্ত্বেও আপনি তার তেল নষ্ট করিয়ে দিলেন। ফলে সে তার শেষ ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে পারল না। অপরদিকে ইহুদী লোকটির কাছে মাছ ছিল না আর আপনি তাকে মাছ খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। সে তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারল। এর রহস্য তো আমরা বুঝতে পারলাম না।

আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার কাজের রহস্য তোমাদের জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের সাথে আমার ব্যবহার একরকম হয়ে থাকে আর মুমিনদের সাথে অন্যরকম। কাফেরদের ক্ষেত্রে আমার ব্যবহার হয় কেবল ইহজগত কেন্দ্রিক, অর্থাৎ কাফেররাও তো ইহজগতে কিছু না কিছু

ভালো কাজ করে, দান-খয়রাত করে, গরীবের সাহায্য করে ইত্যাদি। ঈমান না থাকার কারণে তাদের এসব ভালো কাজ আখিরাতে কোনও কাজে আসবে না। তাই তাদের প্রতিদান আমি ইহজগতেই দিয়ে দিই, যাতে আখিরাতে যখন আমার কাছে আসবে, তখন আমার যিম্মায় তাদের কোনও প্রতিদান অবশিষ্ট না থাকে; বরং দুনিয়াতেই তার শোধবোধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুসলিমদের যেহেতু ঈমান আছে এবং তাদের নেক কাজের মূল উদ্দেশ্য আখিরাতই হয়ে থাকে, তাই তাদের সাথে আমার ব্যবহারও সেই হিসেবেই হয়ে থাকে। আমি চাই তারা আখিরাতে যখন আমার সাথে মিলিত হবে তখন যেন তাদের কোনও গুনাহ অবশিষ্ট না থাকে এবং তার আবিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র হয়েই আমার সাথে মিলিত হয়। তাই তার গুনাহের হিসাব আমি দুনিয়াতেই চুকিয়ে দিই। এ নীতি হিসেবেই ওই ইহুদী যত ভালো কাজ করেছিল তার সমুদয় বদলা আমি দিয়ে ফেলেছিলাম। কেবল একটা বাকি থেকে গিয়েছিল। এখন যখন তার আমার কাছে আসার সময় হয়ে গেল আর সে মাছ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল তখন আমি তার এ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তাকে মাছ খাইয়ে দিলাম, যাতে আমার কাছে যখন পৌঁছবে তখন তার কোনও নেকি অবশিষ্ট না থাকে, তার সমস্ত নেকির বদলা ভোগ করেই আসে। আর ওই মুসলিম ব্যক্তির অসুস্থাবস্থায় সব গুনাহই মাফ হয়ে গিয়েছিল কেবল একটা গুনাহ অবশিষ্ট ছিল। এখন যখন তার আমার সাথে মিলিত হওয়ার সময় এসে গেল, তখন যদি সেটি মাফ করানোর ব্যবস্থা করা না হয়, তবে তো সে তার আমলনামায় একটি গুনাহ নিয়েই উপস্থিত হবে। তাই আমি চাইলাম, তার যায়তুনের তেলটুকু নষ্ট করে দিয়ে তার ইচ্ছা অপূরণ রেখে দিই, যাতে তার মনে কষ্ট লাগে আর সেই কষ্টের বিনিময়ে তার অবশিষ্ট গুনাহটিও ক্ষমা হয়ে যায়। ফলে সে গুনাহের পঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হতে পারবে। যা হোক এসব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও গুপ্ত রহস্য। তিনি বলে না দিলে এটা উপলব্ধি করা কার পক্ষে সম্ভব? আমাদের আকল-বুদ্ধি তো খুবই সামান্য! এ মহাজগত চলছে তাঁর অপার জ্ঞান-প্রজ্ঞা অনুযায়ী। তাঁর প্রতিটি কাজের ভেতর কোনও না

কোনও হিকমত ও রহস্য নিহিত আছে। তা বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। কোন মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার কোন হিকমত সক্রিয় তা আমরা কিভাবে উপলব্ধি করব?

দুঃখ-কষ্ট হচ্ছে অনিচ্ছাজনিত সাধনা

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বলতেন, আগের জমানায় কেউ যখন কোনও শায়খ ও বুযুর্গের কাছে নিজের ইসলাহের জন্য যেত, তখন তাকে দিয়ে কঠিন-কঠিন মুজাহাদা ও কৃচ্ছ্র-সাধনা করানো হতো। সে সাধনা হতো স্বেচ্ছাকৃত। এখন আর সে রকম কঠিন সাধনা করানো হয় না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদেরকে সাধনা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়নি। তাঁর পক্ষ থেকে অনেক সময় মুজাহাদা ও সাধনা করানো হয়ে থাকে। তবে সে মুজাহাদা বান্দার স্বেচ্ছাকৃত নয়; বরং তার ইচ্ছার বাইরে হয়ে থাকে। ইচ্ছারহিত সেসব মুজাহাদা ও কৃচ্ছ্রতা অপেক্ষা অনেক বেশি গতিশীল। সাহাবায়ে কেরামের জমানায়ও ইচ্ছাধীন মুজাহাদা খুব বেশি ছিল না। ইচ্ছাকৃত অনাহার বা ইচ্ছাকৃত আত্মপীড়ন তাদের ক্ষেত্রে তেমন একটা ছিল না। কিন্তু তাদের জীবনে ইচ্ছারহিত কৃচ্ছ্রতা ও আল্লাহপ্রদত্ত মুজাহাদা বড় বেশি ছিল। সুতরাং কালিমায়ে তাইয়্যিবা পড়ার অপরাধে তাদেরকে তপ্ত বালুতে শুইয়ে রাখা হতো, বুকের উপর বড় বড় পাথর চাপা দেওয়া হতো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার দায়ে তাদেরকে যে কত রকম জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে সেসব লোমহর্ষক ঘটনা সকলেরই জানা। এসব ছিল তাদের অনিচ্ছাজনিত মুজাহাদা, যা তাঁরা সইতে বাধ্য ছিলেন, আর এর ফলে তাদের মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এত বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা সাহাবী নয় এমন কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই বলেছেন যে, অনিচ্ছাজনিত মুজাহাদা দ্বারা অতি দ্রুত গতিতে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়। মানুষের যা কিছু দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি পেরেশানি দেখা দেয় তা দ্বারা মূলত এই ইচ্ছারহিত মুজাহাদাই করানো হয়ে তাকে। কাজেই কষ্ট হলেও বাস্তবিকপক্ষে এসব আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মহব্বতেরই নিদর্শন।

দুঃখ-কষ্টের তৃতীয় উদাহরণ

এর আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যায় ছোট শিশুদের দ্বারা, তারা হাত-মুখ ধুইতে ও গোসল করতে ভয় পায়। তাতে কিছুটা কষ্টও পায়, যে কারণে এসব করতে চায় না। কান্নাকাটি করে। কিন্তু মা জোরপূর্বক তাকে গোসল করায় এবং মেজে-ঘষে শরীরের ময়লা দূর করে। সে যতই চিৎকার ও কান্নাকাটি করুক, হাত-পা ছোড়াছুড়ি করুক, গোসল করানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত মা তাকে ছাড়ে না। শিশু মনে করে তার উপর জুলুম করা হচ্ছে, তাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব তো তা নয়। তার প্রতি মায়ের ভালোবাসা ও মমতা অপরিসীম। সেই নিবিড় মমতার তাগিদেই গোসল করানো ও ঘষে-মেজে পরিষ্কার করানোর কষ্টটুকু তাকে দিতে বাধ্য হচ্ছে। শিশুটি যখন বড় হবে তখনই এই স্নেহপীড়নের মর্ম বুঝতে পারবে। তখন সে বুঝবে এটা ছিল তার প্রতি গভীর স্নেহ ও মমতারই বহিঃপ্রকাশ, যাকে সে পীড়ন মনে করত এবং যাতে কষ্ট পেয়ে সে কান্নাকাটি করত। মা যদি তখন এই কষ্টটুকু তাকে না দিত, তবে সে মলিন ও পঙ্কিল হয়ে থাকত এবং নানা রকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তার জীবন শঙ্কাটাপন্ন হয়ে পড়ত।

চতুর্থ উদাহরণ

কিংবা মাদরাসা ও স্কুলে ভর্তি করানোর বিষয়টাই চিন্তা করুন। পিতা-মাতা তাদের আদরের শিশুকে শিক্ষিত ও সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে কোনও প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দিল। এখন রোজ সকালে তাকে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। সে যেতে চায় না। কান্নাকাটি করে। তাও জোর করে পাঠায়, সেখানে চার-পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকার বন্দীদশা তার পক্ষে অসহনীয় বোধ হয়। কিন্তু তার যতই কষ্টবোধ হোক তা সত্ত্বেও স্নেহ-মমতার দাবিতে পিতা-মাতা এই কষ্টটুকু তাকে দিয়েই যায় এবং দেওয়াই চাই। সে যখন বড় হবে তখন বুঝবে শৈশবে এই কষ্ট যদি তাকে না দেওয়া হতো এবং তাকে স্কুলে পাঠিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া না হতো, তবে সে অশিক্ষিত মূর্খদের কাতারে থেকে যেত। মানুষ হিসেবে তার বিশেষ মর্যাদা লাভ হতো না।

ঠিক এরকমই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের উপর যে বালা-মসিবত ও দুঃখ-কষ্ট আসে তাও তাঁর মহব্বত ও ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। প্রিয় বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি ও তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের জন্যই তাকে এ কষ্ট দিয়ে থাকেন। কাজেই এ কষ্টের কারণে হতাশ হলে চলবে না। বরং তাঁরই দিকে রুজূ হতে হবে এবং তাঁরই কাছে দু'আ করতে হবে। এই রুজূ হওয়া ও দু'আ করাই এ কথার আলামত যে এ দুঃখ-কষ্ট তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত বৈ কিছু নয়।

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর কষ্ট-ক্লেশ

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামকে দেখুন। রোগ-ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে কী কঠিন কষ্টই না তিনি ভোগ করেছেন। কল্পনা করলেও শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। সেই কষ্টের ভেতর শয়তান তার কাছে আসল এবং এই বলে কাটা ঘাঁয়ে লবণ দেওয়ার চেষ্টা করল যে, আইয়ুব এই মসিবত আপনার গুনাহের কারণেই দেখা দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি নাখোশ। নাখোশ বলেই তিনি আপনাকে এত দুঃখ-কষ্ট দিচ্ছেন। এই দাবির স্বপক্ষে সে নানা রকম যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করাতে থাকল। হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম তার এ দাবি আমলে নেননি। তিনি তা খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। এ নিয়ে শয়তানের সঙ্গে তার যে তর্ক-যুদ্ধ হয়েছে বাইবেলের "আইয়ুব পুস্তকে" তার কিছুটা বিবরণ দেওয়া আছে। হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম উত্তরে শয়তানকে বলেছিলেন, তোর কথা একদম ঠিক নয়। গুনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলার গযব হিসেবেই আমার উপর এই মসিবত দেখা দিয়েছে বলে তুই যে দাবি করেছিস তা বিলকুল গলত। আসলে আমার এ বিপদ আমার প্রতি আমার সৃষ্টিকর্তা ও আমার মনিবের মহব্বতেরই পরিচায়ক। আমার প্রতি ভালোবাসার কারণেই এ কষ্টটুকু তিনি আমাকে দিচ্ছেন। আমি তাঁর কাছে অবশ্য দু'আ করব, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আরোগ্য দান করুন, কিন্তু এ রোগের কারণে আমার মনে তাঁর প্রতি কোনও আপত্তি নেই। তিনি আমাকে কেন এই রোগে আক্রান্ত করলেন-

সে অভিযোগ আমি কখনই করব না। বরং আলহামদুলিল্লাহ! আমি প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজূ হচ্ছি। আমি দু'আ করি–

رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ۝

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কষ্ট-ক্লেশ স্পর্শ করেছে। আপনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু! আপনি আমার এ কষ্ট দূর করে দিন।'[২১৪]

এই যে আমি আল্লাহ-অভিমুখী হয়ে তাঁর কাছে দু'আ করছি– এটাও তাঁরই দান। তিনি যখন এ কষ্টের ভেতর আমাকে তাঁর অভিমুখী হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন, তখন এটা প্রমাণ করে এ কষ্টও আমার প্রতি তাঁর রহমতবিশেষ এবং এটা আমার প্রতি তার ভালোবাসার পরিচায়ক। এসব কথা বাইবেলের আইয়ুব পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে। কোন কষ্ট আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং কোন কষ্ট তাঁর গযব তা বোঝার আলামত হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম এ ঘটনার ভেতর ব্যক্ত করেছেন।

যেসব কষ্ট-ক্লেশ আল্লাহর রহমতস্বরূপ তা চেনার আলামত

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম বর্ণিত সে আলামত এরকম যে, বিপদ ও কষ্টে মানুষ আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হয় না, বরং উল্টো আল্লাহ তা'আলার উপর অভিযোগ তোলে ও তাকদীর সম্পর্কে আপত্তিকর কথাবার্তা বলে, সেটাই আল্লাহ তা'আলার আযাব। এর দ্বারাই বোঝা যাবে তার পাপের শাস্তি হিসেবেই আল্লাহ তা'আলা তাকে এ বিপদ ও কষ্টে ফেলেছেন। পক্ষান্তরে বিপদাপদ যদি আল্লাহ তা'আলার রহমত হয়, তবে বান্দা তাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে না; বরং আল্লাহ অভিমুখী হয়ে সে দু'আ করে, হে আল্লাহ! আমি বড় দুর্বল, এই কষ্ট ও পরীক্ষা আমার পক্ষে বরদাশত করা কঠিন। নিজ রহমতে আপনি আমাকে এর থেকে মুক্তি দান করুন।

সুতরাং রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মসিবতকালে যদি আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজূ হওয়ার তাওফীক হয়, তবে বুঝে নেবে যে,

---

২১৪. সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৩

আলহামদুলিল্লাহ, এসব পেরেশানি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। কাজেই ঘাবড়াবে না। পরিশেষে ইনশাআল্লাহ এসব কষ্ট দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার পক্ষে প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে। শর্ত একটাই আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী থাকতে হবে। আল্লাহ অভিমুখী হওয়ার তাওফীক লাভ হওয়াটাই এ কষ্ট যে রহমতস্বরূপ তার পরিচায়ক। কেননা বালা-মসিবত আল্লাহর আযাব ও গযব হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাম নেওয়ার ও তাঁর দিকে রুজূ হওয়ার তাওফীক দিতেন না। এ তাওফীক যখন দিচ্ছেন, তখন বোঝা গেল বিপদরূপে তিনি রহমতেরই ব্যবস্থা করেছেন।

দু'আ কবুলের আলামত

প্রশ্ন হতে পারে, অনেক সময় তো দেখা যায় বিপদাপদে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজূ হওয়া ও তাঁর কাছে দু'আ করা সত্ত্বেও বিপদ দূর হয় না এবং দু'আ কবুল হয় না। তা হলে দু'আ করার ফায়দা কী? এর উত্তর হল, আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করা ও তাঁর সকাশে নিজ মনোবাঞ্ছা পেশ করার তাওফীক লাভ হওয়াটাই এ কথার আলামত যে দু'আ কবুল হয়ে গেছে। তা না হলে দু'আ করার তাওফীকই লাভ হতো না। কষ্ট ও বিপদ দূর হল কি না সেটা ভিন্ন ব্যাপার। দু'আ করতে পারাটাই মুখ্য। দু'আর তাওফীক লাভ হলে কষ্ট দূর হোক না হোক, দু'আটাই যেহেতু এক ইবাদাত তাই এ কারণে স্বতন্ত্র পুরস্কার লাভ হবে আর কষ্টের পুরস্কার তো বরাদ্দ রয়েছেই। আবার তৎক্ষণাৎ কষ্ট দূর না হওয়ায় সেই দু'আর পর পুনরায় যে দু'আ করা হবে তার জন্যও আলাদা পুরস্কার পাওয়া যাবে। এভাবে ক্রমাগত চলতে থাকলে দুঃখ-কষ্ট মর্যাদার ক্রমোন্নতি সাধনের অছিলা হয়ে যাবে। সুতরাং মাওলানা রূমী রহ. বলেন,

گفت آں اللہ تو لبیک ماست

তুমি যখন আমার নাম নাও এবং বলে ওঠ 'আল্লাহ'! তখন তোমার এই নামোচ্চারণটাই আমার পক্ষ থেকে সাড়াদান ও লাব্বায়কা বলার

নামান্তর। অর্থাৎ তোমার 'আল্লাহ' বলাটাই ইঙ্গিত বহন করে যে, আমি তোমার ডাক শুনেছি এবং তোমার দু'আ কবুল করেছি। কাজেই দু'আর তাওফীক লাভ হওয়াটাই দু'আ কবুল হওয়ার ইঙ্গিতবাহী। তবে তোমার কষ্ট কখন লাঘব করা হবে, কতক্ষণ তোমার পেরেশানি বাকি রাখা হবে সেটা আমার হিকমতের ব্যাপার। তুমি যেহেতু ত্বরাপ্রবণ, তাড়াহুড়া করাই তোমার স্বভাব, তাই চাও শীঘ্র তোমার কষ্ট দূর হয়ে যাক। তুমি জানো না, একটু সময় নিয়ে, তোমার কষ্ট খানিকটা বিলম্বে লাঘব করলে তাতে তোমারই লাভ। তাতে তোমার মর্যাদা অনেক উঁচুতে চলে যাবে। কাজেই দুঃখ-কষ্টে মনে কোনও অভিযোগ-আপত্তিকে স্থান দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, দু'আ করা চাই, ইয়া আল্লাহ! আমি বড় দুর্বল। আমার তো সহ্য হচ্ছে না, মেহেরবানী করে আমার কষ্ট দূর করে দিন।

এভাবে কষ্ট লাঘবের দু'আ করা চাই। এটা ভালো। উল্টা বোঝা ঠিক হবে না যে, দুঃখ-কষ্টে যেহেতু অনেক লাভ, তাই আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে কষ্ট চেয়ে নিই না কেন। এখন থেকে দু'আ করব হে আল্লাহ! আমাকে দুঃখ দাও, কষ্ট দাও। না এটা বান্দাসুলভ আচরণ নয়। বান্দা কষ্ট চেয়ে নেবে না; বরং কষ্ট এসে গেলে তাতে সবর করবে এবং কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করবে। সবর করার অর্থ, সে কষ্টে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ না তোলা, কোনও আপত্তিকর কথা না বলা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ-কষ্ট চেয়ে নেননি; বরং তা থেকে পানাহ চেয়েছেন। দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে খারাপ রোগ-ব্যাধি থেকে পানাহ চাচ্ছি। কাজেই দুঃখ-কষ্ট আসার জন্য দু'আ করবে না। বরং এসে গেলে সবর করবে এবং তাকে নিজের জন্য রহমত মনে করবে। সেই সঙ্গে দু'আ করবে, যেন আল্লাহ তা'আলা তা থেকে মুক্তি দান করেন।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর ঘটনা

হযরত থানভী রহ. তার 'মাওয়ায়েয'-এ উল্লেখ করেছেন যে, একবার হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. তাঁর মজলিসে বলছিলেন, মুমিনদের যত কষ্ট-ক্লেশ দেখা দেয়, তা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে রহমতস্বরূপ– যদি বান্দা তার কদর বোঝে এবং সেজন্য আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজূ হয়। এই বয়ান চলাকালে এক ব্যক্তি মজলিসে উপস্থিত হল। সে ছিল কুষ্ঠ রোগী। এ রোগের কারণে তার সারা শরীরে পচন ধরেছিল। মজলিসে এসে সে হযরত হাজী সাহেব রহ.-কে বলল, হযরত! দু'আ করুন আল্লাহ তা'আলা যেন আমার এ কষ্ট দূর করে দেন। মজলিসের সকলে চিন্তা করছিলেন, এইমাত্র হযরত বয়ান করছিলেন যে, সব দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ আর এই ব্যক্তি তার কষ্ট লাঘবের জন্য দু'আ করতে বলছে, তা হযরত তার আবেদনমতো দু'আ করবেন কি? এরই মধ্যে হযরত হাজী সাহেব রহ. দু'আর জন্য হাত তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দার যে রোগ ও কষ্ট, তা যদিও আপনার রহমতস্বরূপ, কিন্তু আমরা আমাদের দুর্বলতার কারণে সহ্য করতে পারছি না। সুতরাং হে আল্লাহ! এই রোগের নি'আমতকে সুস্থতার নি'আমত দ্বারা বদলে দিন। এই হল দ্বীনের বুঝ। এটা বুযুর্গদের সাহচর্য দ্বারাই অর্জিত হয়।

হাদীছের সারমর্ম

যা হোক হাদীছটির সারমর্ম হল, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনও বান্দাকে মহব্বত করেন, তাকে কোনও পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন এবং বলেন, এই বান্দার ডাক, কাতরতা ও কান্নাকাটি আমার ভালো লাগে। তাই আমি তাকে কষ্ট দিচ্ছি, যাতে এ কষ্টের ভেতর সে আমাকে ডাকে। আর তার ডাকের বিনিময়ে আমি তার মর্যাদা বৃদ্ধি করি, তাকে অনেক উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়ে দিই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে রোগ-ব্যাধি কষ্ট-ক্লেশ থেকে পানাহ দিন। আর কখনও কোনও কষ্ট এসে গেলে তাতে সবর করার ও তাঁর দিকে রুজূ হয়ে দু'আ করার তাওফীক দিন। আমীন।

দুঃখ-কষ্টে বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ করা উচিত

কোনও কোনও বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কোনও কষ্টে পড়লে খুব উহ্-আহ্ করতেন এবং সেই কষ্ট প্রকাশ করতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই উহ্-আহ্ করাটা এক ধরনের ধৈর্যহীনতা। যেন অভিযোগ করা হচ্ছে আমাকে এই কষ্ট কেন দেওয়া হল? অথচ কষ্টে অধৈর্য হওয়া এবং আপত্তি-অভিযোগ তোলা জায়েয নয়। এর উত্তরও আলোচ্য হাদীছ দ্বারা জানা গেল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যারা নেক বান্দা, তারা অভিযোগরূপে নয়; বরং কষ্ট-ক্লেশ প্রকাশ করেন এই ভাবনা থেকে যে, আমার উহ্-আহ্ শোনার জন্যই আমাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা চান আমি তার সামনে নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করব, বন্দেগীসুলভ আচরণ করব, হায়-হায় করব ও কান্নাকাটি করব। কাজেই এ ক্ষেত্রে বাহাদুরি দেখানো সংগত নয়। এই বন্দেগীর মানসিকতা থেকেই কষ্ট-ক্লেশ প্রকাশ করে, আপত্তির মনোভাব থেকে নয়।

এক বুযুর্গের ঘটনা

আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর কাছে শুনেছি, একবার এক বুযুর্গ অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য এক বুযুর্গ তাকে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখেন সেই বুযুর্গ অসুস্থতা সত্ত্বেও 'আলহামদুলিল্লাহ' 'আলহামদুলিল্লাহ' যিকির করছেন। তিনি বললেন, ভাই আপনার এ আমল তো খুবই ভালো যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছেন। কিন্তু এ অবস্থায় একটু উহ্-আহ্ও করা চাই। যতক্ষণ সেটা না করবেন আরোগ্য লাভও হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ রোগ তো আপনাকে এজন্যই দিয়েছেন যে, আপনি তার দরবারে কাতরতা প্রকাশ করবেন। বান্দা আল্লাহ তা'আলার সামনে বীরত্ব না দেখিয়ে নিজ অক্ষমতা ও হীনতা প্রকাশ করবে, কাতরভাবে বলবে, ইয়া আল্লাহ আমি বড় দুর্বল, এই রোগযন্ত্রণা তো আমি সইতে পারছি না, আপনি আমাকে সুস্থ করে দিন– এভাবে নিজেকে তাঁর সামনে এক দুর্বল ও তাঁর দয়ার ভিখারীরূপে পেশ করবে– এটাই বন্দেগীর দাবি।

আমার বড় ভাই মরহুম যাকী কায়ফী একজন কবি ছিলেন। তার কবিতাগুলি খুব মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিষয়টা তিনি কী সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন দেখুন–

اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں
توڑنا ہے حسن کا پندار کیا

'দুঃখ-বেদনায় এতটা সংযমত্ত ভালো নয়
তুমি কি তার রূপের গৌরব চূর্ণ করতে চাও?'

'অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাকে কষ্ট দিচ্ছেন তখন কিছুটা উহ্-আহ্ও করো। মুখে একটু উহ্-আহ্ও করবে না, একটুও আর্তধ্বনি প্রকাশ করবে না, এটাও কিছু ভালো কথা নয়। এর দ্বারা কি আল্লাহ তা'আলার সামনে বীরত্ব দেখাতে চাও না কি যে, আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, আমার ভাবান্তর হবে না, আমি নির্বিকার থাকব– নাউযুবিল্লাহ। কাজেই আল্লাহ তা'আলার সামনে বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ করা চাই।

একটি নসীহতপূর্ণ ঘটনা

হযরত থানভী রহ. এক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন যে, একবার ভাবাবেগবশে তার মুখ দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল–

لَيْسَ لِىْ فِىْ سِوَاكَ حَظٌّ
فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِىْ

'তুমি ভিন্ন আর কারও কাছে, আর কোনও কাজে আমার কোনও সুখ ও আনন্দ নেই। কাজেই তুমি যেভাবে চাও আমাকে পরখ করে দেখতে পারো।' (নাউযুবিল্লাহ)

যেন আল্লাহ তা'আলাকে পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা খুব বেশি কিছু করলেন না। তার প্রস্রাব বন্ধ করে দিলেন। প্রস্রাব আর হচ্ছে না। হচ্ছে না তো হচ্ছেই না। টানা কয়েকদিন এ অবস্থা চলল। প্রস্রাবের থলি ফুলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম।

যন্ত্রণায় কষ্টে ছটফট করতে লাগল। জীবন নিয়ে সংশয় দেখা দিল। পরিশেষে তাঁর চৈতন্য হল। বুঝতে পারলেন কী মারাত্মক কথা তার মুখ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। তার কাছে ছোট-ছোট শিশুরা পড়তে আসত। তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমাদের এই চাচার জন্য দু'আ করো, আল্লাহ তা'আলা যেন এই রোগ থেকে মুক্তিদান করেন।

বস্তুত তার দাবি ছিল ভুল, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া তাঁর কোনও পরীক্ষায় কারও পক্ষেই উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। দাবি করেছিল, আল্লাহ ছাড়া আর কিছুতেই তার মজা নেই। আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দিলেন, তোমার তো প্রস্রাবের মধ্যেও অনেক মজা। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার সামনে বাহাদুরি চলে না।

কষ্টের অবস্থায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম

জীবনের শেষ ক'টি দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন, সে অবস্থায় তিনি বারবার পানিতে হাত ভেজাচ্ছিলেন এবং তা দিয়ে চেহারা মুবারক মুছছিলেন। এভাবে তার রোগের কষ্ট প্রকাশ পাচ্ছিল। তা দেখে হযরত ফাতিমা রাযি. বললেন,

وَاكَرْبَ اَبَاهُ

'আহা! আমার আব্বার কত কষ্ট!

উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لَاكَرْبَ اَبِيْكَ بَعْدَ الْيَوْمِ

'আজকের পর তোমার পিতার আর কোনও কষ্ট থাকবে না।

দেখুন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্টের কথা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অভিযোগ করেননি; বরং পরবর্তী ধাপে যে আরাম ও শান্তি লাভ হবে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই পন্থাই সুন্নত। প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পুত্র ইবরাহীমের ইন্তিকাল হলে তিনি বলেছিলেন–

إِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ

'হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিরহে শোকাহত।'[২১৫]

কন্যা যয়নাব রাযি.-এর মেয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে। মৃত্যুযন্ত্রনা চলছে। সেই ছটফটানি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ বেয়ে টপ-টপ করে পানি পড়ছে।[২১৬]

এই অশ্রুধারা আর কিছুই নয়, এটা আব্দিয়াত ও বন্দেগীর প্রকাশ। যেন বলা হচ্ছে, হে আল্লাহ! আপনার ফয়সালা সঠিক অবশ্যই, কিন্তু আমি যে বড় দুর্বল, এ কষ্ট তো আমি সইতে পারছি না। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমার কষ্ট দূর করে দিন। আল্লাহ তা'আলা কষ্ট দেনই এজন্য, যাতে বান্দা চোখের পানি ফেলে, কান্নাকাটি করে এবং আল্লাহর সামনে নিজ অক্ষমতা ও হীনতা প্রকাশ করে। আর কোনও রকম অভিযোগমূলক আপত্তিকর কথা উচ্চারণ না করে। এভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলা চাই। এটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। হাদীছ দ্বারা এটাই বোঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

২১৫. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ১২২০; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৪২৭৯

২১৬. সুনানে ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ১৫৭৭

মুনাফিকীর আলামত*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

'চারটি খাসলাত এমন যার সবগুলি কারও মধ্যে থাকলে সে খালেস মুনাফিক; আর যার মধ্যে তার কোনও একটি থাকবে, সে যতক্ষণ না তা পরিত্যাগ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি খাসলাতই থাকবে। (খাসলাত চারটি হচ্ছে এই) যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে তাতে খিয়ানত করে; যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; যখন কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে এবং যখন কারও সাথে ঝগড়া করে গালাগালি করে।[২১৭]

এ হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি অপগুণকে মুনাফিকীর আলামত সাব্যস্ত করেছেন। বোঝানো উদ্দেশ্য, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবি করে, তার মধ্যে এ চারটি গুণ থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়। কাজেই কারও মধ্যে এগুলো পাওয়া গেলে আইনের

---

* নশরী তাকরীরেঁ, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৬

২১৭. সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং ৮৮

দৃষ্টিতে সে মুসলিম হলেও কাজে কর্মে মুনাফিক। তার মধ্যে প্রথম খাসলাত হল আমানতের খিয়ানত করা। খিয়ানতের একটা রূপ তো সকলেরই জানা। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের খিয়ানত। কেউ নিজের কোনও অর্থ-সম্পদ কারও কাছে আমানত রাখল। তারপর আমানতগ্রহীতা তা যথারীতি মালিককে ফেরত দিতে গড়িমসি করল বা আত্মসাৎ করল। এটা তো খিয়ানতের সুস্পষ্ট ও নিকৃষ্টতম রূপ। এটাকে সকলেই পাপ বলে জানে। কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় খিয়ানত কেবল এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং খিয়ানতের আরও বিভিন্ন রূপ আছে। যেমন কারও গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া। অন্যের গোপন কথাও আমানত। শরী'আতসম্মত কারণ ছাড়া তা প্রকাশ করা জায়েয নয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন,

اَلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ

'মজলিস-বৈঠক আমানতের সাথে সম্পৃক্ত।'[২১৮]

অর্থাৎ কোনও মজলিসে যেসব কথা হয়, মজলিসে উপস্থিত লোকদের জন্য তা আমানতস্বরূপ। বিনা অনুমতিতে তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করলে খিয়ানত বলে গণ্য হবে। সুতরাং কোনও মুসলিমের জন্য এটা জায়েয নয়।

এমনিভাবে কেউ কোথাও চাকরি করলে ডিউটিকালীন সময়টা তার কাছে আমানত। কাজেই ডিউটির সেই সময়টা নিজ দায়িত্ব পালনে না লাগিয়ে ব্যক্তিগত কাজে খরচ করলে সে খিয়ানতকারী গণ্য হবে। এভাবে খিয়ানতের অভ্যাস গড়ে তোলা কোনও মুসলিমের কাজ হতে পারে না। এটা কেবল মুনাফিক ব্যক্তিই করতে পারে।

হাদীছে মুনাফিকের দ্বিতীয় আলামত বলা হয়েছে 'মিথ্যা বলা'। কুরআন ও হাদীছের পাতায়-পাতায় রয়েছে মিথ্যাকথনের নিন্দা। ঈমান ও মিথ্যাকথন চরমভাবে পরস্পরবিরোধী। হযরত সাফ্ওয়ান ইবন

---

২১৮. সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪২২৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৪১৬৬

সুলায়ম রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, কোনও মুসলিম কি ভীরু হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ (মুসলিম ব্যক্তি ভীরু হতে পারে)। জিজ্ঞেস করল, মুসলিম ব্যক্তি কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ (মুসলিম ব্যক্তির চরিত্রে কৃপণতাও থাকা সম্ভব)। সবশেষে সে জিজ্ঞেস করল, কোনও মুসলিম কি মিথ্যুক হতে পারে? তিনি বললেন, না।[২১৯] (অর্থাৎ ঈমানের সাথে মিথ্যা বলার স্বভাব মিলিত হতে পারে না)।

অনেক সময় মিথ্যা বলার কুফল ব্যক্তির নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু অনেক সময় তার ক্ষতি হয় অনেক বিস্তৃত। পরিবার, খান্দান ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ছাপিয়ে গোটা সমাজ ও জাতিকেই তা ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেবল ব্যক্তিগত ক্ষতি হলে সে মিথ্যাও কবীরা গুনাহ বৈ কি! কিন্তু ক্ষতি যদি হয় সামষ্টিক পর্যায়ে, তবে অনেক সময় কেবল একবারের মিথ্যা অনেকগুলি মহাপাপের সমষ্টি হয়ে যায়।

মিথ্যাকথা এমনই গুরুতর জিনিস, ইসলাম যাকে হাসি-তামাশাচ্ছলেও অনুমোদন করে না। কাজেই ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিতভাবে যদি মিথ্যা বলে এবং এভাবে অন্যের ক্ষতি করতে চায়, তবে তা কতই না ন্যাক্কারজনক হবে! এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে মুনাফিকীর আলামত বলেছেন।

মুনাফিকীর তৃতীয় আলামত বলা হয়েছে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মুসলিম ও মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। সে একবার কাউকে কোনও প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করবে। যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন, প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষার খাতিরে সে তা মেনে নিতে অকুণ্ঠ থাকবে। ইসলামের ইতিহাস এ জাতীয় ঘটনায় সমাকীর্ণ। এমন ভুরি ভুরি ঘটনা আছে, যাতে এ জাতি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ত্যাগ স্বীকারেও পরওয়া করেনি। হযরত মুআবিয়া রাযি. এর ঘটনা প্রসিদ্ধ যে, তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশঙ্কায়

---

২১৯. মুআত্তা মালিক, হাদীছ নং ১৫৭১

একবার নিজ দখলে আনা বিস্তৃত এলাকা রোমানদের হাতে ফেরত দিয়েছিলেন।[২২০] সভ্যতার ইতিহাসে যা এক অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা।

মুনাফিকীর চতুর্থ আলামত বলা হয়েছে, ঝগড়া-বিবাদে গালাগালি করা। মূলত মুনাফিক ব্যক্তিই অন্যের সাথে কলহ-বিবাদে লিপ্ত হলে মুখ খারাপ করে এবং অবলীলায় অশ্রাব্য গালমন্দ শুরু করে দেয়। যাপিত জীবনে কত রকম মানুষের সাথে মেলামেশা ও লেনদেন ইত্যাদি করতে হয়। তাতে মতের অমিলও দেখা দেয় এবং বহু ক্ষেত্রেই তা কলহ-বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু একজন সাচ্চা মুমিন কোনও অবস্থাতেই মুখ খারাপ করতে পারে না। খিস্তিখেউড় অন্তত তার মুখে শোভা পায় না। সর্বদা সে নিজ ভদ্রতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। এসব তার মহাধন। কোনও অবস্থাতেই সে এ ধন হাত ছাড়া করবে না। দৃষ্টিভঙ্গিগত মতভেদ হোক, চিন্তা চেতনার অমিল হোক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক বা খানদানী বিরোধ হোক কোনও অবস্থাতেই একজন মুসলিম তার মুখ দিয়ে কুবাক্য উচ্চারণ করবে না– করতে পারে না। হাদীছের দৃষ্টিতে এরূপ করাটা মুনাফিকের আলামত। এটা কর্মগত মুনাফিকী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে মুনাফিকীর খাসলাতসমূহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন– আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

২২০. সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ১৫০৬; সুনান আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২৫৭৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৬৪০

ইসলাম ও আমাদের জীবন সিরিজের বইসমূহ

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১
ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস

ইসলাম ও আমাদের জীবন-২
ইবাদত-বন্দেগী

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৩
ইসলামী মু'আমালাত

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৪
ইসলামী মু'আশারাত

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৫
ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৬
তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৭
মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৮
উত্তম চরিত্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৯
ইসলামী জীবনের কল্যাণময় আদব

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১০
প্রিয়নবীর সা. প্রিয় দুআ ও আমল

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১১
ইসলামী মাসসমূহ

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১২
সীরাতে রাসূল সা. ও আমাদের জীবন

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১৩
দীনী মাদরাসা, উলামা ও তলাবা

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১৪
ইসলাম ও আধুনিক যুগ

ইসলাম ও আমাদের জীবন-১৫
মুসলিম মনীষীগণের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি কিতাব

মাকতাবাতুল আশরাফ
দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: +৮৮০২২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.com
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.com